হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)

মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)

মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

মোহাম্মদ সিরাজুল হক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)
মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ আকবরাবাদী
অনুঃ মোহাম্মদ সিরাজুল হক

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৪৪৮/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৪
ISBN No. 984-06-0581-0

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৭
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ১৯৯৯
আষাঢ় ১৪০৬
রবিউল আউয়াল ১৪২০

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বর্ণ সংযোজন
প্রভাত প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ শিল্পী
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

মূল্য ঃ ৭২.০০

HAZRAT SIDDIQUE AKBAR (R.) (The Life of Hazrat Abu Bakar (R.): written by Maulana Syeed Ahmad Akbarabadi in Urdu, translated by Muhammad Sirajul Haque into Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 1999
Price : Tk. 72.00 U.S Dollar : 3.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁদের আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হয়েছি সেই মরহুম আব্বা-আম্মা এবং যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার আলো পেয়েছি সেই সমস্ত আসাতিযায়ে কিরামের রূহের মাগফিরাত কামনায় —

অনুবাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূলে করীম (সা)-এর আশৈশব বন্ধু ও সঙ্গী। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান হওয়ার দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি রাসূল (সা)-কে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও রাসূলে করীম (সা)-এর সন্তুষ্টিকে নিজের জীবনের চেয়েও অগ্রাধিকার দিতেন। রাসূলে করীম (সা)-এর ওফাতের পর এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সংকট মুকাবিলা করে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করেন। তাঁর স্বল্প সময়ের খিলাফতকালে তিনি মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার ও যাকাত অস্বীকারকারীদের কঠোর হস্তে দমন-করেন এবং নবীজী (সা)-এর অসম্পূর্ণ অভিযানসমূহ সম্পন্ন করেন। তাঁর দৃঢ় ঈমান আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য, পরহেজগারী, দানশীলতা ইত্যাদি বিবেচনায় নবীদের পরে এই উম্মতের মধ্যে 'উত্তম ব্যক্তি' হিসেবে তিনি রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি সমগ্র উম্মতের জন্য এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, জার্মানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহামনীষীর অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তবে তাঁর গ্রন্থ প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় লিখিত 'হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)' একটি অনন্য গ্রন্থ। এ অমূল্য গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ সিরাজুল হক। বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি এবারও বইটি আগের মত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিশ্বনবী (সা)-এর আবির্ভাবের সময় আরব জাহানের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জোর যার মুল্লুক তার এই ছিল সমাজের ক্ষমতাসীনদের স্বৈরাচারী নীতি। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পরিবর্তে পবিত্র কাবা ঘরে চলছিল ৩৬০টি দেবদেবীর পূজা। এমনি অন্ধকারে আলোর মশাল নিয়ে, তাওহীদের বাণী নিয়ে এলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু সমাজের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে, শির্‌কে নিমজ্জিত এ পরিবেশে তাওহীদে বিশ্বাস করবে কে? মক্কায় কাফির মুশ্‌রিকগণ বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে এ নতুন বাণী শুনে ক্রোধে অধির হয়ে উঠলো। এমনি মুহূর্তে যিনি সর্বাগ্রে বিনা দ্বিধায় নিঃসংকোচে মহানবী (সা)-এর আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে হয়েছিলেন নবী (সা)-এর একান্ত সঙ্গী, তিনিই হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

বাংলা ভাষায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবনী খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। যে কয়টি হয়েছে তাও খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই প্রথম খলীফার একটি তথ্যবহুল ও বিস্তারিত জীবনী লেখার বাসনা বহুদিন থেকে আমার মনে সুপ্ত ছিল। একবার হঠাৎ পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলিম, গবেষক ও লেখক মরহুম মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী কর্তৃক লিখিত "হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)" শীর্ষক উর্দূ গ্রন্থখানা পাঠ করার সৌভাগ্য হলো। এই তত্ত্ব ও তথ্যবহুল জীবনীটি আমার নিকট অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলে মনে হলো। তাই উর্দূ গ্রন্থখানা বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে অনুবাদ করার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। আমাকে এ মহান সুযোগ প্রদান করায় আমি অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক মুহতারাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। সহকারী পরিচালক জনাব আবুল বাশার আখন্দ ও অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন গ্রন্থখানা দ্রুত শেষ করার জন্য আমাকে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন এ জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উভয় জাহানের মঙ্গল দান করুন। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী অতি যত্ন সহকারে ও দক্ষ হাতে পাণ্ডুলিপিখানা আদ্যোপ্রান্ত সম্পাদনা করে গ্রন্থখানার শ্রীবৃদ্ধি ও সুখপাঠ্য করেছেন। তাই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। যদি গ্রন্থখানার মধ্যে কোন কৃতিত্ব থাকে তা তাঁরই প্রাপ্য। যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে এর দায়িত্ব এ অধম গ্রহণ করতে বাধ্য। অনেক কষ্ট করে গ্রন্থখানার প্রুফ দেখেছেন অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের জনাব আবদুস সামাদ। তাঁকে তাঁর শ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ

www.pathagar.com

জানাচ্ছি। এই বিরাট গ্রন্থখানা অনুবাদ করার কাজে গভীর রাত জেগে আমাকে যে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী মিসেস শামসাদ বেগম লাকী। দু'আ করি আল্লাহ্ তাঁকে নেক্কার মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। প্রথম সংস্করণ হিসেবে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে অবহিত করলে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব। গ্রন্থখানা পাঠ করে কেউ উপকৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করব। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে এই মুনাজাত করছি যেন, তিনি হাশরের ভয়াবহ সময় আহকারকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে বেহেশত নসীব করেন। আমীন।

— অনুবাদক

খিলগাও,
ঢাকা।
তারিখ ঃ ২৮/৬/৮৭ ইং

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবূ-বকর (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে অনায়াসে বুঝা যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাস্উদ বলেন ঃ

لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم مقاما كنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر (رض) –

"হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমরা এমনি অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।"

খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে হযরত ওমর (রা)-এর খ্যাতি সবচেয়ে বেশী। বাস্তব সত্য এই যে, যদি প্রথম খলীফা সমগ্র আরবকে ইসলামের একই পতাকাতলে একত্র না করতেন তা'হলে হযরত ওমর (রা) এর বিরাট সাফল্য অর্জন এতটা সহজ হ'ত না।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল প্রায় দু'বছর তিন মাস। এই অল্পকালের মধ্যেও তিনি যে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন তা বৈশিষ্ট্য গুণাবলী ও নীতিমালার দিক দিয়ে এতই অনন্য ও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এর উপর বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ পর্যায়ে হাফিয ইবনে হাজার ইসাবা নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ইবনে আসাকির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসিরও (البداية والنهاية) (আলবিদায়াহ্ ওয়ান্নিহায়াহ্) গ্রন্থে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফত কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে একটি পৃথক গ্রন্থের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়ে পূর্ববর্তীগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তা দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন —

১. এইরূপ গ্রন্থ যাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এইরূপ গ্রন্থ যাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ধর্মত্যাগীদের বিশৃংখলা, মালিক ইবনে নাবীরাহ্র হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

ইবনে নাদীম-এর আল্ ফিহরিস্ত এবং খাতীব বাগদাদী, ইবনে খাল্লীকান প্রমুখের বর্ণনা থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কিত ইবনে নাদীম যে সমস্ত রচনার সন্ধান পেয়েছেন, নিম্নের ছকে তার একটি তালিকা পেশ করা গেল।

লেখকের নাম	মৃত্যুর বছর	রচনা
আবূ মুহনাফলুত ইবনে ইয়াহ্ইয়া	১৭০ হিঃ	কিতাবুর রিদ্দাত (আল ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা—১৩৬ মিসরী)
সাইফ ইবনে আমর আল আসাদী আত্তামীমী	খলীফা হারুনুর রশীদের যুগে ইনতিকাল করেন।	কিতাবুর রিদ্দাত, (আলফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা—১৩৭)
ইসহাক ইবনে বাশার	২০৬ হিঃ	ইবনুন নাদীম তাঁর কিতাব 'আর রিদ্দাহ্-এর উল্লেখ করেছেন। (আল ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা—১৩৭)। এ ছাড়াও তাঁর একটি গ্রন্থের নাম কিতাবুল মুবতাদা (তারীখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬ এবং মিজানুল ই'তেদাল ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬)
আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নে ওমর আল্ওয়াকিদী	২০৭ হিঃ	ইব্নে নাদীম হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতকাল সম্পর্কে তাঁর রচিত নিম্নের কয়েকটি গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। (১) কিতাবুর রিদ্দাত (২) কিতাবুস সাকীফা ও বয়'আতে আবি বকর (রা) (৩) কিতাবু সীরাতে আবি বকর ওয়া ওফাতিহি, পৃষ্ঠা-১৪৪।
আবুল হাসান আলী ইব্নে মুহাম্মদ আল্মাদায়িনী	২১৫ হিঃ	তিনি এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, একটি হলো, "কিতাবুর রিদ্দাহ" দ্বিতীয়টি হলো, "কিতাবু হুজ্জাতে আবি বকর সিদ্দীক" (আল ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮)
আবূ ইসহাক ইসমাঈল্ ইব্নে ঈসা আল্আতা	২৩২ হিঃ	ইসহাক ইবনে বাশারের ছাত্র এবং তার গ্রন্থের বর্ণনাকারী ছিলেন, (তারীখে বাগ্দাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২) ইবনে নাদীম তার কিতাবের নাম আর-রিদ্দাহ বলে উল্লেখ করেছেন। (আল ফিহরিস্ত পৃষ্ঠা-১৫৯)

www.pathagar.com

আবূ যায়েদ অসীমা ইব্‌নে মূসা ইব্‌নে আল ফুরাত আল ওশা	২৩২ হিঃ	ইবনে খালকান এই গ্রন্থের "আর রিদ্দাহ" অধ্যায়ের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি মালিক ইবনে নাবীরাহের ঘটনা প্রসঙ্গে পেশ করেছেন (৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪ নং ৭৪০) (মিসরে ১৯৪৯ ইং প্রকাশিত) এই উদ্ধৃতি ইবনে শাকির এর ফাওয়াতুল ওয়াফিয়াতে হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে। (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৫) হাফিয ইবনে হাজার কিতাবুল ইসাবায় মাঝে মাঝে এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই রচনাগুলো একজন জার্মান প্রাচ্যবিদ একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন।
আবূ মুহাম্মদ আহম্মদ ইবনে আ'সাম আলকুফী	মৃত্যুর সঠিক তারিখ অজ্ঞাত, মুকতাদির বিল্লাহ্‌র শেষ যুগেও জীবিত ছিলেন।	তাঁর গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল ফুতুহ' এই গ্রন্থের প্রথমদিকে ধর্মত্যাগী আরবদের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ মূল আরবীর তুলনায় অধিকতর বিখ্যাত।
আবূ রিয়া'শ আহমদ ইবনে আবি হাশিম আল কাইমী	৩৩৯ হিঃ	তিনি হযরত খালিদ (রা) এবং মালিক ইবনে নাবীরাহের ঘটনা সম্পর্কে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। (খাজানাতুল আদব, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩৬) খাতীব বাগদাদীও এ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি নিয়েছেন। ইয়াকুত মু'জিমুল উদাবা, ২য় খণ্ডে এর উল্লেখ করেছেন।

পাটনায় ওয়াকিদীর গ্রন্থ আর-রিদ্দাহ্‌

ঐতিহাসিকদের মধ্যে ওয়াকিদীর যে খ্যাতি ও গুরুত্ব রয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা তার গ্রন্থ 'আর-রিদ্দাহ্‌' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি তাহালে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ওলামা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, এর একটি কপি পাটনার বাকিপুর কুতুব খানায়ে শারকীয়ায় রক্ষিত আছে। সাধারণভাবে এই কুতুব খানা খোদা বখ্‌শ লাইব্রেরী বলে প্রসিদ্ধ। মরহুম খান বাহাদুর আবদুল মুকতাদির খান এর তালিকায় ১০৪২ নাম্বারে (১৫শ' খণ্ড , পৃষ্ঠা ১০৮) এই সংকলনের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সাধারণ লোক এটাকে ওয়াকিদীর কিতাব

www.pathagar.com

'আর-রিদ্দাহ্' এর সংকলন বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু কিতাবের ভেতরের পৃষ্ঠায় কিতাবুর রিদ্দাহ্র পরিবর্তে নিম্নলিখিত শিরোনামা পরিদৃষ্ট হয়।

هذا مما كان من أخبار أهل الردة من مسيلمة الكذاب و طليحة وكندة و بني بكر وائل و غيرهم من القبائل ـ

এই শিরোনাম দ্বারা অনুমিত হয় যে, আলোচ্য কপিটি পৃথক কিতাব হওয়ার পরিবর্তে কোন একটি বিরাট গ্রন্থের অংশ বিশেষ। অতঃপর কিতাবের সনদের উপর দৃষ্টিপাত করলে এই অনুমান আরো সুদৃঢ় হয় এবং প্রমাণিত হয়। এই কিতাব প্রকৃতপক্ষে ওয়াকদীর 'কিতাবুর রিদ্দাহ্-এর কপি নয়—যদিও ওয়াকিদীর রিওয়ায়েতের অংশ বিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লিখিত সনদটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

روى أبو القاسم عبد الله بن حفص بن مهران البردعي أعزه الله تعالى قال حدثني أبو محمد أحمد بن أعثم الكو في قراءة عليه قال حدثني أبو جعفر بن عبد العزيز بن المبارك قال حدثني نعيم بن مزاحم النقري قال حدثني محمد بن عمر بن الواقد الواقدي السلمي وحدثني إبراهيم ابن عبد الله بن العلاء القرشي المدني قال حدثني أحمد بن الحسين الكندي ونصر بن الخالد النحوي وأبي حمزة القرشي من محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي قال حدثني الزهري زيد بن رومان وصالح بن كيسان ويحيى بن عروة عن الزبير بن العوام ومعوذ بن لبيد وعاصم بن عمر بن قتادة كل هذا يذكر أنه لما قبض النبي ﷺ وسلم شمتت اليهود والنصارى بأهل الإسلام الخ —

উপরোক্ত সনদ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়। যেমন ঃ

১.কিতাবের বর্ণনাকারী হলেন আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ আল বারদায়ী।

২.আহ্মদ ইবনে আ'সাম আল কুফী হতে বর্ণনাকারী অনুমতি লাভ করেছেন।

৩.এই কিতাবে যে সব বর্ণনার উল্লেখ আছে তা আহমদ ইবনে আ'সামের কাছে দু'টি ক্রমধারায় পৌঁছেছে। প্রথম ক্রমধারা হলো, আবূ জা'ফর আব্দুল আযীয ইবনে মুবারক, যিনি এক দিক দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আ'মর আল ওয়াকিদীর ছাত্র। দ্বিতীয় ক্রমধারাটি হলো ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ আল কুরায়শী আল মাদানী, যাতে ওয়াকিদীর উল্লেখ কোথাও নেই। মরহুম খান বাহাদুর আব্দুল মুকতাদির এই সনদকে অসম্পূর্ণ ناقص বলে উল্লেখ করেছেন এবং ওয়াকিদীর পরের ক্রমধারাকে বিলোপ করে দিয়েছেন। এর ফলে শুধু তালিকার উপর নির্ভরকারীদের এই গ্রন্থের মূল লেখক সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ নেই। অথচ পূর্ণাঙ্গ সনদ যখন সামনে আসে তখন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রচয়িতা হিসেবে এই কিতাবের সাথে ওয়াকিদীর কোন সম্পর্ক নেই, বরং যাকে এর রচয়িতা হিসেবে স্বীকার করা হয়ে থাকে তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ আহমদ ইবনে আসাম আল কূফী যিনি ওয়াকিদী এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

পূর্ববর্তীদের রিওয়ায়েতকে এই কিতাবে সংকলিত করেছেন এবং স্বীয় বর্ণিত ধারাসমূহকে একত্র করে দিয়েছেন।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের জানামতে " কিতাবুল ফুতুহ্" এর আরবী সংকলন কোথাও বিদ্যমান নেই। এর একটি ফার্সী অনুবাদ যা বোম্বাই হতে প্রকাশিত হয়েছিল তা এক সময় পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে হস্ত লিখিত সংকলন সাধারণ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে এর দু'টি লিখিত সংকলন বর্তমানে মজুদ আছে। এই দু'টি সংকলনের সাহায্যে ইব্নে আ'সামের কিতাব এবং ওয়াকিদীর কিতাব (আর-রিদ্দাহ্) এক সাথে যাচাই করে দেখলে এতে মূল ও অনুবাদের বিশেষ পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন মৌলিক পার্থক্য নযরে পড়ে না। নিম্নে কিতাবুর রিদ্দাহ্র বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে কিতাবুল 'ফুতুহ' এর বিভিন্ন তথ্যাদির একটি তুলনামূলক বিবরণ দেয়া গেলো। এর দ্বারা আমাদের দাবীরই যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

পৃষ্ঠা ইবনে আসামের কিতাবুল ফুতুহের অধ্যায়, কলকাতা	পৃষ্ঠা ওয়াকেদীর কিতাবুর রিদ্দাহর অধ্যায়, পাটনা
(১) اخبار سقيفه بني ساعدة	(১) أخبار سقيفة بني ساعدة
(২) ذكر اخبار اهل رده	(২) ذكر أخبار الردة
(৩) قصه رفتن اسامه بشام	(৩) ذكر خروج أسامة بن زيد
(৪) ذكر فجاءة عبد يا ليل اسلمي	(৪) ذكر فجاءة بن يا ليل
(৫) الف — ذكر رفتن خالد بن الوليد بجنك مالك	(৫) خبر مالك بن النويرة و مسيلمة الكذاب
ب — قصه مسيلمه وجنكهائـ كـ خالد بن الوليد راياداء افتاد	(৬) ذكر ارتداد أهل البحرين
(৬) ذكر مرتد شدن اهل بحرين	(৭) ذكر ارتداد ارض حضرموت من (৮) كندة وغيرها
(৭) قصه مرتد شدن حضرموت وكندة	نبذة في ذكر المثنى بن حارثة الشيباني وهو أول الفتوح بعد قتال أهل الردة
(৮) ذكر فتحها كـ بعد از مرتد شدن اين جماعت در بلاد روم فرض مسلمانا را يسر شد	

www.pathagar.com

মরহুম খান বাহাদুরের সংকলিত তালিকায় কিতাবুর-রিদ্দাহ্ সর্বশেষ অধ্যায় অনুরূপভাবে আছে। কিন্তু মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি নিম্নরূপঃ

نبذة في ذكر المثنى بن حارثة الشيباني وهو أول الفتوح بعد قتال أهل الردة وهو أيضا من رواية الأعثم الكوفي ــ

সনদের সূচনা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওয়াকিদীর কিতাব মূলত ইব্‌নে আসামের রিওয়ায়েতসমূহের সমষ্টি যা ওয়াকিদী ব্যতীত অন্যভাবেও ইব্‌নে আ'সামের নিকট পৌঁছেছে। অবশ্য কিতাবের সর্বশেষ অধ্যায়ের বাক্যের দ্বারা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই সংকলন ওয়াকিদীর কিতাব আর-রিদ্দাহ্ অথবা শুধু তার রিওয়ায়েতসমূহের সমষ্টি নয়। তবে এক্ষেত্রে এতটুকু অবশ্যই গ্রহণীয় যে এই সংকলনে ওয়াকিদীর ঐ সমস্ত রিওয়ায়েতের প্রয়োজনীয় অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ওয়াকিদীর মূল কিতাব আর-রিদ্দায় ছিল। অতএব বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ের সংকলনকে ওয়াকিদীর কিতাব 'আররিদ্দাহ্' সংকলন মনে করা সঠিক নয়।

ওয়াকিদীর আররিদ্দাহ্ এবং ইব্‌নে আ'সামের কিতাবুল ফুতুহের বাক্য যদি একত্রে মিলিয়ে পড়া হয় তা হলে এর বাস্তবতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূল এবং অনুবাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে হস্তলিখিত সংকলনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিতাবুর রিদ্দাহর এই একটি মাত্র কপি নতুন হস্তাক্ষরে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তা ভুল-ত্রুটিতে পূর্ণ। অন্যদিকে ইব্‌নে আ'সামের কিতাবুল ফুতুহের দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলনটি কিছুটা এ ধরনেরই। এবার নিম্নে বিভিন্ন বাক্যের তুলনামূলক পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন।

لما قبض النبي ﷺ شمتت اليهود والنصارى بأهل الإسلام وظهر النفاق في المدينة ممن كان يخفيه قبل ذلك و ماج الناس و اضطربوا و أقبل مالك بـــن التيـــهان الأنصاري متى وقف على قومه فقال يا معشر الأنصار أنصتوا واسمعوا مقـــالتي وتفهموا ما ألقيه إليكم اعلموا أنه قد شمتت اليهود والنصارى بموت نبينا محمـــد ﷺ و قد ظهرت حسيكة أهل الردة و عظم المصائب علينا أن مسيلمة الكذاب بأرض يمامة يرعد و يبرق و قد تعلمون أنه يدعي النبوة في حياة نبينا محمـــد ﷺ و الآن قد بلغني أن طليحة بن خويلد الأسدي أيضا ببلاد نجد ــ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে হযরত আলী (রা)-এর বয়'আতের আলোচনায় সর্বশেষ বাক্য হলো —(২)

www.pathagar.com

قال فانصرف علي إلى منـــزله فلم يبايع حتى توفيت فاطمة ثم بايع بعـــــد خمـــس وسبعين ليلة من وفاتها وقيل إلى بعد ستة أشهر والله أعلم أي ذلـــك كـــان فـــهذا أكرمك الله ما كان من سقيفة بني ساعدة وهذا رواية العلماء و لم أرد أن أكتـــــب ههنا شيئا من زيادات الرافضة فيقع هذا الكتاب في يد عترك فتنسب إلى أمر مـــــن الأمور والله ــ

কিতাবুর রিদ্দাহ্‌র সর্বশেষ বাক্য হলো—(৩)

قال كان خالد بن الوليد كلما افتتح موضعا من العراق أخرج مـــــن غنائمـــه الخمس فيوجه به إلى المدينة إلى أبي بكر الصديق ويقسم باقي المغنم في أصحابـه قال إلى أن تحركت الروم بأرض الشام فنرجع الآن إلى ذكر فتوح الشام بعـــون الله وكرمه إنشاء الله تعالى ــ

সীরাতে সিদ্দীকের উৎস হিসেবে হাদীস

হুযূর (সা)-এর যুগ এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উৎস হলো নীতিগতভাবে দু'টি। একটি হলো হাদীস গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি হলো ইতিহাস গ্রন্থ। এর মধ্যে প্রথমটি হলো হাদীস গ্রন্থ, তাই আমরাও এটাকে প্রথমেই স্থান দিয়েছি এবং যতটুকু সম্ভব সহীহ্ হাদীস থেকে সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানে এটাও স্পষ্ট করে দেখা প্রয়োজন যে, যে হাদীসে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা হয় তার মান-মর্যাদা ঐ হাদীস থেকে নিশ্চয় কিছুটা ভিন্ন থাকে, যাতে শরীয়তের কোন নির্দেশ বা ক্রমান্বয়ে হুযূর (সা)-এর কোন উক্তি বা আমল বর্ণনা করা হয়েছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাহাবিগণ স্বভাব, অনুরাগ এবং মিযাজের দিক দিয়ে একাকার ছিলেন না। তাই কোন কোন ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এই মতপার্থক্যের কারণেই কখনো কখনো তাদের মধ্যে কটু কথাবার্তা অথবা অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের সূত্রপাত হত। এ ধরনের হাদীস অধ্যয়ন করে একজন অভিজ্ঞ সমালোচক অনায়াসে বুঝতে পারেন, কোন রিওয়ায়েত কতটুকু সঠিক এবং কোন্ রিওয়ায়েতে কার কতটুকু ব্যক্তিগত কথাবার্তা ঢুকে পড়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বাপর বিষয়টি বিবেচনা করে একজন গবেষকের উচিত, রিওয়ায়েতের সাধারণ নীতি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতিও দৃষ্টি রাখা।

১. ঘটনার মূল বর্ণনাকারীর সাথে ঘটনার নায়কের সম্পর্ক কিরূপ?

২. নায়কের গুণাবলীর ও কামালাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার প্রকাশ কি তার দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব?

www.pathagar.com

৩. মূল ঘটনা ছিল কি ধরনের? ঘটনার নায়কের ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য না করলে, ঐ ঘটনা কি ঐ পরিবেশে সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল?

৪. যদি ঘটনাকে সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ঘটনার যে ফলাফল হওয়া উচিত ছিল তা কি হয়েছে?

মোটকথা ইতিহাসের একটি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার যে নীতি রয়েছে এই ঘটনার উপর তার প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। যার উল্লেখ কোন সহীহ্ হাদীসেও রয়েছে, এমনকি যদি তা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমেও হয় তবুও। কেননা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা সত্ত্বেও এটা সম্ভব যে, বর্ণনাকারীর কিছুটা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় জ্ঞানে সঠিক মনে করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিকদের কর্তব্য হলো, হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে—শুধু এই প্রেক্ষাপটে তিনি যেন তা গ্রহণ না করেন বরং সমালোচনার নীতিতে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখেন। এ ব্যাপারে উপরে যে নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে সে দিকেও দৃষ্টি রেখে তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করতে হবে।

যেমন— হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে হযরত আলী (রা)-এর বয়'আত গ্রহণের ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে সাধারণভাবে একটি কথা প্রচলিত যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আলী (রা) তাঁর হাতে বয়'আত গ্রহণ করেন। এই ধারণার মূল ভিত্তি সহীহ্ বুখারীর ঐ রিওয়ায়েত যা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু রিওয়ায়েতটি বুখারী শরীফে রয়েছে একথা মেনে নেওয়ার পরও তা অধ্যয়ন করে একজন গবেষক ও দার্শনিকের মনে স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল?

২. হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাধারণ বয়'আতের সময় হযরত আয়েশা (রা) কি উপস্থিত ছিলেন?

৩. হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক বায়'আত না করাটা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাই এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই সাধারণভাবে আলোচনা পর্যালোচনা হতেছিল। তাহলে হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবা হতে কি এই রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে?

৪. বিলম্বে বয়'আতের যে কারণ বর্ণনা করা হয় তা হলো, খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলীর (রা)-এর সাথে পরামর্শ করা হয়নি। এটা কি হযরত আলী (রা) নিঃস্বার্থ চরিত্র এবং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ?

৫. হযরত আলী (রা)-এর বয়'আত না করাটা মুসলমানদের ঐক্যের জন্য বিরাট বিপদ হতে পারত। কিন্তু হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর যখন ইসলামবিরোধী ঝড় প্রবাহিত হচ্ছিলো তখন হযরত আলী (রা)-এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পক্ষে এটা কি সম্ভব ছিল যে, মুসলমানদের ঐক্যে কোন প্রকার ফাটলের সৃষ্টি হয় এমন কাজ তিনি করবেন ?

www.pathagar.com

৬. ইসলামে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মর্যাদা ছিল এবং তাঁর উপর হুযূর (সা)-এর যে নির্ভরতা ছিল সে প্রেক্ষিতে এবং হুযূর (সা)- উক্তি ও কার্যের দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে হযরত আলীর (রা) চেয়ে কে অধিক জ্ঞাত আছে ? অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আলী (রা) থেকে কি এটা আশা করা যায় যে, তিনি সাধারণ বয়'আতের সময় সমস্ত মুসলমান থেকে দূরে ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তো ছিলেন সবার উর্ধ্বে। হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর বয়'আতে খিলাফতের সময়ও তো তিনি সাধারণ মুসলমান থেকে দূরে ছিলেন না এবং নিজের জন্য কোন দাবী উত্থাপন করেন নি। رضي الله عنهم ورضوا عنه

৭. যদি মেনে নেয়া হয় যে, হযরত আলী (রা) বাস্তবিকই ছয় মাস পর্যন্ত বয়আত করেন নি। তাহলে এর অর্থ স্পষ্ট দাঁড়ায়, এই সময় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘঠিত হয়েছিল এবং যেগুলোর সাথে প্রকৃত পক্ষে ইসলামের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত ছিল, হযরত আলী (রা) কি সেগুলো থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন ? তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে উপরোক্ত ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করেননি, মূল ঘটনায় এর কি কোন প্রমাণ মিলে?

৮. যদি এটা মেনে নেয়া যায় যে, হযরত আলী (রা) বয়'আত গ্রহণ করেন নি, তাহলে কেন হযরত আবূ বকর (রা) এই অবাঞ্ছিত ঘটনা সহ্য করে ইসলামী ঐক্যের প্রাচীরে এরূপ একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অবকাশ রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তো ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন যে, হযরত আলী (রা)-এর বয়'আত না করা তাকে কমপক্ষে বনু হাশিম গোত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা হতে বঞ্চিত করবে।

৯. সহীহ্ বুখারীর এই রিওয়ায়েতের বিপরীতে এমন কোন রিওয়ায়েত কি রয়েছে, যা সহীহ্ বুখারীতে না থাকলেও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে রয়েছে এবং যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা) সাধারণ বয়'আতের দিন বয়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসের কিতাবের মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই সিদ্ধান্ত সামগ্রিক ও সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে এর অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, বুখারী ও মুসলিমের প্রতিটি রিওয়ায়েত অন্যান্য কিতাবের প্রতিটি রিওয়ায়েত থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য। বরং আসল কথা হলো, বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবের রিওয়ায়েতও যদি অধিক গ্রহণযোগ্য হয় তা হলে নিঃসন্দেহে সেটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কোন কোন মুহাদ্দিস বুখারী ও মুসলিমের যে কয়টি হাদীসের সমালোচনা করেছেন সেগুলোর উল্লেখ করে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন —

www.pathagar.com

فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدار قطني وغيره وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما يعني على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى عما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول —

'সুতারাং এগুলো এমন জায়গা যার সঠিক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেননা এই কিতাব (সহীহ্ বুখারী)-এর একটি বিরাট অংশকে উম্মতে মুহাম্মদী যেভাবে গ্রহণ করেছে (এর সত্যতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে) এই স্থলে সেভাবে গ্রহণ করে নি। দারে কুত্নী প্রমুখ বুখারীর যে সমস্ত জায়গায় সমালোচনা করেছেন ইবনে সালাহও সেগুলোকে বাদ দিয়ে ঐ একই বিষয়ের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মুসলিম শরীফের শরাহ্র মুকাদ্দামায় লিখেছেন, আমরা যে দাবী করেছি যে, বুখারী ও মুসলিম পর পর সাক্ষাতকে কবুলের শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে দাবী থেকে বুখারী ও মুসলিমের ঐ সমস্ত রিওয়ায়েত বাদ দিতে হবে যেগুলোর উপর সমালোচনা হয়েছে এবং যেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা এ সমস্ত রিওয়ায়েতের পর অপর সাক্ষাতের ব্যাপারে ইজমা হয় নি। (মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী-পৃ ঃ ৩৪৪)

যদি ঐতিহাসিকগণ এই নীতির মাধ্যমে রিওয়ায়েতসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের মর্যাদার পরিপন্থী যে সব কথা ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর সংশোধন অনায়াসে হতে পারে। হযরত আলীর (রা) বয়'আতের আলোচনায় পাঠকবর্গ প্রত্যক্ষ করেছেন যে, সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়েতকে আমরা বানাওট বা موضوع বলি নি। বরং হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এই রিওয়ায়েতও এর বিরোধী রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে তিনি যে সমন্বয় গঠন করেছেন আমরা তা গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে, এ ধরনের ব্যাপারে এটাই সতর্কতামূলক পদ্ধতি। অবশ্য যেখানে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই সেখানে আলোচনা বা সমালোচনা ছাড়া উপায়ন্তরও থাকে না।

হাদীসের পর দ্বিতীয় উপায় হলো ইতিহাস গ্রন্থ। এ পর্যায়ে আমরা কোন রিওয়ায়েতকে শুধু এ কারণে গ্রহণ করিনি যে, এটা কোন পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রিওয়ায়েত। কেননা হতে পারে যে, কেহ পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই তাঁর রিওয়ায়েত সংগ্রহ করেছেন। অপর দিকে কেহ পরবর্তী ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সতর্কতার সাথে তার রিওয়ায়েত সংগ্রহ করেছেন। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তীর চাইতে পরবর্তী রিওয়ায়েতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর জীবনী ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর উপর লিখিত মাওলানা শিবলীর 'আল ফারূক' শীর্ষক গ্রন্থ উর্দূভাষা ও সাহিত্যে একটি অনন্য মর্যাদার অধিকারী। যতদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থটি বিদ্যমান থাকবে ততদিন মাওলানার নামও উর্দূ ভাষাভাষীদের মধ্যে জাগরূক থাকবে। যদিও ক্রমধারা ও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে মাওলানার হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবন কাহিনী রচনা করা উচিৎ ছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর যুগে যে বিরাট বিজয় অর্জিত হয় এবং দশ বছরের খিলাফতকালে তিনি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানার জন্য সর্বাগ্রে হযরত ওমর (রা)-এর ইতিহাস রচনারই প্রয়োজন ছিল। মাওলানা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে ইসলামী ইতিহাসের সঠিক ধারা সম্পর্কে অবহিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে উদ্যোগ সম্ভবত আলাদারূপে পরিবেশিত তথ্যাদি দ্বারা সর্বাধিক সফল হয়েছে।

মাওলানা শিবলীর ইন্তিকালের পর বেশ কয়েকজন লেখক উর্দূ ভাষায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনী লিখেছেন। হাজী মুঈনুদ্দীন আহমদ নদভী 'খুলাফায়ে রাশেদীন'শীর্ষক পুস্তকে, অতঃপর ঐ একই নামে অপর ব্যক্তি মাওলানা শাহ্ মুইনুদ্দীন আহমদ নদভী "তারিখে ইসলাম" শীর্ষক পুস্তকের প্রথম খন্ডে প্রথম খলীফার জীবন কাহিনী এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দু'টি গ্রন্থ দারুল মুসান্নিফীন আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনা যেহেতু আনুষঙ্গিক ধরনের ছিল, তাই পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে নি। অন্যান্য যারা বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া গেল।

(১) 'সীরাতে সিদ্দীক' রচনায় — মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী মূল গ্রন্থ উর্দূতে ছিল। পরে ডঃ সাইয়েদ মুঈনুল হক ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন এবং তা শায়খ মুহাম্মদ আশরাফ লাহোর থেকে প্রকাশ করেছেন। (২) জনৈক ব্যক্তি 'আল আতীক' العتيق নামেও একটি গ্রন্থ লিখেছেন। (৩) কয়েক বছর পূর্বে আতা মহীউদ্দীন ইংরেজী ভাষায় 'আবূ বকর' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তা লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (৪) বর্তমানে মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং উর্দূ ভাষায়-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। أبو بكر الصديق

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ববর্তী লেখকদের মর্যাদা এই অধমের অনেক উপরে। এতদসত্ত্বেও সীরাতে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর উপর এমন একটি কিতাব লেখার প্রয়োজন ছিল যাতে সমস্ত ঘটনাবলী সনদের সাথে বর্ণিত হবে এবং আলোচিত হবে। ইলমে উসূলের দৃষ্টিতে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর আধ্যাত্মিক ও

www.pathagar.com

বস্তুগত উভয় প্রকারের ফাযায়েল ও কামালাত সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ অবহিত হতে পারেন। এই পুস্তকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সীরাত বর্ণনায় যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত প্রচলিত আছে সেগুলোর আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল সৃষ্টি হয়েছে তারও সঠিক সমাধান পেশ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর(রা)-এর সম্পর্কিত ঘটনাবলী যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত প্রয়োজন মিটানোর জন্য এই কিতাব লিখিত হয়েছে। সেই প্রয়োজন কতটুকু পূর্ণ হয়েছে তার বিচারভার শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের উপর অর্পিত হলো।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

কলিকাতা
২৪শে সেপ্টেম্বর,
১৯৫৭ ইং।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ্‌র শুক্‌র,"সিদ্দীকে আকবর" এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর পাক-ভারতের শিক্ষা ও ইসলামি জগতে তা সমাদৃত হয়েছে। পত্র পত্রিকায় এর দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ওলামা সমাজ পত্রের মাধ্যমে ও মৌখিকভাবে এজন্য লেখককে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ সভায় উপস্থিত শ্রোতাদেরকে এটা ধারাবাহিকভাবে পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং এজন্য লেখকের প্রশংসা করেছেন এবং তার জন্য দু'আও করেছেন। ইউরোপের কোন কোন ইসলামিয়াতের শিক্ষকও এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং এর কোন কোন আলোচনা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পুস্তকটি দ্রুত ছাপা হওয়ার কারণে তাতে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল সেজন্য লেখক যারপরনেই লজ্জিত হয়েছেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। হাদীস ও আসমাউর রিজাল বিষয়ে পাক-ভারতের প্রখ্যাত আলীম মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমীর কাছে অত্যন্ত বিনয় সহকারে আবেদন করা হয়েছিল, যদি আপনি "সিদ্দীকে আকবর" একবার পাঠ করে তাতে যে ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা চিহ্নিত করে দেন তা হলে যারপরনেই সান্ত্বনা লাভ করবো।" মাওলানা সাহেব সহানুভূতির সাথে ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে কিতাবের প্রতিটি বাক্য পাঠ করে তাতে যে ভুল-ত্রুটি আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। তাই আমি দ্বিতীয়বার পাঠ করার সময় মাওলানার পত্রের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। তাঁর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমি আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দক্ষিণ হায়দরাবাদের উসমানিয়া ইউনিভারসিটির ইসলামিয়াতের সাবেক বিভাগীয় প্রধান সাইয়িদ মাওলানা ফজলুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এবং দিল্লীর ফতেহপুর আলীয়া মাদ্রাসাহ্‌র হেড মাওলানা সাজ্জাদ হোসাইন সাহেবের কাছেও কৃতজ্ঞ। কেননা তাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রন্থখানা পাঠ করে ভুল চিহ্নিত করে আমাকে অবহিত করেছেন। অবশ্য এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ভুল-ত্রুটি এমন ছিল যা আমি দ্বিতীয় বার দেখার সময় সংশোধনের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। অবশ্য কিছু কিছু বিষয় এমনও ছিল, যে ব্যাপারে আমি ঐ সমস্ত বুযুর্গদের সাথে একমত হতে পারিনি। তবুও তাদের লেখা থেকে নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছি। অতএব আমি তাঁদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

فجزاهم الله عني أحسن الجزاء

মানুষের কোন কাজই পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং তা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তাই দাবী করা যাবে না যে, এই দ্বিতীয় সংস্করণে কোন ভুল নেই। অবশ্য প্রথম সংস্করণে যে ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ গুরুত্বের সাথে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করেছি।

والله هو المستعان وعليه التكلان —

সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী
আলীগড়
১৯শে এপ্রিল ১৯৬১ই

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নাম ও বংশ	৩৩
হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাতা	৩৪
জন্ম	৩৪
আতীক উপাধির কারণ	৩৪
সিদ্দীক পদবীর কারণ	৩৫
ব্যবসা	৩৫
আইয়্যামে জাহেলিয়াতে উঁচু মর্যাদা	৩৫
স্বভাব চরিত্র	৩৬
স্বভাব প্রকৃতি	৩৬
আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব	৩৬
ইসলাম গ্রহণ	৩৭
প্রথম মুসলিম সম্পর্কে বিতর্ক	৩৭
পরীক্ষা-নিরীক্ষা	৩৮
আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্য	৪০
ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ	৪১
গোলামদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর সহানুভূতি	৪২
হযরত বিলাল হাবশী (রা)	৪২
আমের ইবনে ফুহাইরা (রা)	৪৩
হযরত আবূ ফকীহ (রা)	৪৩
হযরত লুবাইনাহ (রা)	৪৪
হযরত যুনাইরাহ্ (রা)	৪৪
হযরত নাহ্দীয়া ও উম্মে উবাইস	৪৪
হযরত আবূ বকর (রা)-এর অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব	৪৬
কুরআন মজীদের স্বীকারোক্তি	৪৬
হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে আঁ-হযরত (সা)-এর বিবাহ	৪৭
মদীনায় হিজরত	৪৮
মদীনায় ইসলামের জনপ্রিয়তা	৪৮
কুরাইশদের চক্রান্ত	৪৮
হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা	৪৯
হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতের প্রস্তুতি	৪৯
হিজরত	৫০
সাওর পর্বতের গুহায় গোপনে অবস্থান	৫১

www.pathagar.com

সূরাকা বিন জা'শম ঘটনা	৫৩
মদীনায় প্রাথমিক জীবন	৫৪
নবী করীম (সা)-এর মদীনায় প্রবেশ	৫৪
মদীনায় আগমনের তারিখ	৫৫
মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়া ও নবী (সা)-এর দু'আ	৫৬
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	৫৬
মসজিদ নির্মাণ	৫৭
হযরত আয়েশা (রা)-এর বিদায় যাত্রা	৫৮
খিলাফতের পূর্বে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	৫৮
বদরের যুদ্ধ	৫৯
ওহোদের যুদ্ধ	৬৩
খন্দকের যুদ্ধ	৬৫
বনী মুসতালিকের যুদ্ধ	৬৬
তাইয়াম্মুমের আয়াত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা	৬৭
হুদায়বিয়ার সন্ধি	৬৯
খায়বারের যুদ্ধ	৭১
মক্কা বিজয়	৭১
হুনায়নের যুদ্ধ	৭২
তায়েফের যুদ্ধ	৭৩
মুতার যুদ্ধ	৭৪
জাতুস্ সালাসিলের যুদ্ধ	৭৪
তাবুকের যুদ্ধ	৭৫
বনু ফাযারার যুদ্ধ	৭৬
হজ্জের নেতৃত্ব	৭৭
মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জ	৭৮
আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল	৭৮
দায়িত্ব সম্পন্ন করার ঘোষণা	৭৮
হযরত আবূ বকর (রা)-এর আশংকা	৭৯
রোগের সূচনা	৭৯
হযরত আবূ বকর (রা)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ	৮০
আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল	৮১
সাকীফায়ে বনী সায়েদা	৮৩
হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণ	৮৪
সাধারণ বায়'আত	৮৬

www.pathagar.com

প্রথম ভাষণ ৮৬
হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ ৮৭
হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) ১০০
হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা) ১০১
একটি সন্দেহের অপনোদন ১০৪
খিলাফত ১০৪
খিলাফতের সংজ্ঞা ১০৪
খলীফার পদমর্যাদা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ১০৫
খলীফার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ১০৭
খিলাফতের জন্য রাসূল (সা)-এর আত্মীয়তার শর্ত ১০৮
খিলাফতের জন্য কুরাইশী হওয়ার শর্ত ১১০
ইবনে খালদুনের অভিমত এবং তার প্রমাণাদি ১১১
আল্লামা ইবনে খালদুনের প্রমাণাদারি উপর আলোচনা ১১২
আল্লামা ইবনে খালদুনের বর্ণনায় পরস্পর বিরোধিতা ১১৪
খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি ১১৬
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের যোগ্যতা ১২১
পবিত্র কুরআনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ ১২২
আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব ১২৬
হুযূর (সা)-এর সাথে চরিত্রের সামঞ্জস্য ১২৭
কার প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর অধিক আস্থা ছিল? ১২৮
আঁ-হযরত (সা) তাঁর কথা বা কাজের দ্বারা কারো খিলাফতের ইঙ্গিত করেছিলেন? ১৩০
হাদীসে কিরতাস-এর উপর আলোচনা ১৩৩
সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা ১৩৬
খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ১৩৭
সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আলোচনা ১৩৭
হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী রওয়ানা ১৩৮
বাহিনী প্রেরণের গুরুত্ব ১৩৯
বাহিনীর উদ্দেশ্যে হযরত উসামা (রা)-এর ভাষণ ১৪০
যুদ্ধের ফলাফল ও উপকারিতা ১৪১
একটি আলোচনা ১৪২
ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ এবং তার কারণসমূহ ১৪৩
বিধর্মীদের অভিমত ১৪৪
নবী (সা)-এর ইনতিকালের সময় আরব গোত্রসমূহ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত ১৪৪

আরব ১৪৫

www.pathagar.com

অবাধ্য ও বিদ্রোহী গোত্রসমূহ	১৪৯
বনু তামীম	১৫০
বনু হানীফা	১৫০
মুদার	১৫১
দূস	১৫২
নাজরানবাসী	১৫২
হাজরামাউতবাসী	১৫২
বনু আমের	১৫২
উয়াইনাহ্ ইবনে হাসান আল ফাযারী	১৫৪
খোদ উয়াইনার স্বীকারোক্তি যে, সে মুসলমান ছিল না	১৫৭
অন্যান্য লোক	১৫৭
কারণসমূহ	১৫৯
নবূওতের দাবীদারগণ	১৬১
আসওয়াদ আনসী	১৬২
আসওয়াদ আনসীর ধর্মত্যাগের সময় ইয়ামনের অবস্থা	১৬২
আসওয়াদ আনসীর নবূওতের দাবী	১৬৩
আসওয়াদ আনসীর পরিণাম	১৬৩
তুলায়হা আসাদী	১৬৪
সাজাহ্ বিনতে হারিস	১৬৫
মুসায়লামা কায্যাব	১৬৫
হযরত আবূ বকর (রা)-এর সামরিক উদ্যোগ	১৬৭
মদীনায় যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতিনিধি দল	১৬৭
সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আলোচনা	১৬৮
প্রতিনিধি দলের বিফল প্রত্যাবর্তন ও মদীনা হিফাযতের ব্যবস্থা	১৬৯
মদীনা আক্রমণ	১৭০
মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি	১৭১
আবস্ ও যুবইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা	১৭২
জুলকিস্সার দিকে রওনা	১৭২
যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন	১৭২
নবূওতের দাবীদার এবং ধর্ম বিমুখদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ	১৭৩
মুসলিম বাহিনীর এগারটি দল	১৭৩
খলীফায়ে রাসূলর (স)-এর সাধারণ ঘোষণা	১৭৫
চুক্তিপত্র	১৭৭
বুযাখার যুদ্ধ	১৭৮
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান	১৭৮
বনু ত্বায়ের ইসলাম গ্রহণ	১৭৮

www.pathagar.com

বনু জুদায়লাহ্-এর ইসলাম গ্রহণ	১৭৯
তুলায়হার সাথে যুদ্ধ	১৮০
তুলায়হার পলায়নও ইসলাম গ্রহণ	১৮১
বনু আমেরের ইসলাম গ্রহণ	১৮২
যালিমদের কঠোর শাস্তি দেন	১৮২
উম্মে যামাল-এর বিদ্রোহ দমন	১৮২
বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার	১৮৩
সাজাহ এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্	১৮৪
বনু তামীম-এর গুরুত্ব	১৮৪
মালেক ইবনে নুভায়রার বিদ্রোহ	১৮৪
সাজাহ্-এর আগমন	১৮৫
সাজাহ্-এর গোত্রের সাথে যুদ্ধ	১৮৫
ইয়ামামাহ্র উপর আক্রমণের প্রস্তুতি	১৮৬
মুসায়লামা এবং সাজাহ্র বিবাহ	১৮৬
বার্তাহ্-এ হযরত খালিদ (রা)-এর অবতরণ	১৮৭
মালিক ইবনে নুভায়রাহ্কে হত্যা	১৮৮
মালিক ইবনে নুভায়রাহ্-এর হত্যার উপর একটি পর্যালোচনা	১৮৮
ঘটনার বিভিন্ন অবস্থা	১৮৯
প্রকৃত ঘটনা	১৯০
মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র প্রকৃত অবস্থা	১৯১
মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ কর্তৃক ইসলামের সাক্ষ্য	১৯৩
একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর	১৯৫
উম্মে তামীম-এর সাথে বিয়ে	১৯৭
একটি আনুষঙ্গিক আলোচনা	২০০
হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক শোণিতপণ পরিশোধ	২০১
হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য	২০২
মুসায়লামা এবং ইয়ামামাহবাসীদের সাথে যুদ্ধ	২০৪
হযরত খালিদ (রা)-এর নাম ঘোষণা	২০৪
নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের অংশ গ্রহণ	২০৪
মাজাআহ বন্দী হ'ল	২০৫
সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ	২০৫
যুদ্ধ শুরু	২০৬
মুজাহিদদের উৎসাহ-উদ্দীপনা	২০৬
মুসলমানদের দ্বিতীয় হামলা	২০৭
মুসায়লামার হত্যা	২০৮
অন্যান্য দুর্গ অধিকার	২০৯

www.pathagar.com

ইয়ামামার যুদ্ধ কখন হয়েছিল ?	২০৯
হাদীকাতুল মাউত-এর অবস্থান	২১০
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	২১০
বাহ্‌রাইন	২১৩
আম্মান ও মাহ্‌রাহ্‌	২১৪
ইয়ামন	২১৬
ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব	২১৭
কুন্দাহ্‌ ও হাযরামাউত	২১৭
ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের যুদ্ধের উপর একটি পর্যালোচনা	২১৯
বিজয়সমূহ	২২০
ইরাক আক্রমণ	২২৬
আক্রমণের সূচনা	২২৭
হযরত খালিদ (রা) এর নামোল্লেখ	২২৮
হযরত খালিদ (রা) এর প্রতি নির্দেশ	২২৮
উবাল্লাহ্‌র গুরুত্ব	২২৯
যাতুস সালাসিল-এর যুদ্ধ	২২৯
উবাল্লাহ্‌ কখন বিজিত হয় ?	২৩২
মুযার-এর যুদ্ধ	২৩৩
ওলজাহ্‌-এর যুদ্ধ	২৩৪
উল্লাইসের যুদ্ধ	২৩৫
হিরা বিজয়	২৩৬
বিনতে বাকীলাহ্‌র কাহিনী	২৩৭
হিরায় হযরত খালিদ (রা)-এর দীর্ঘ অবস্থান	২৩৯
আম্বারের ঘটনা	২৪০
আইনুত তামার বিজয়	২৪১
দুমাতুল জান্দালের যুদ্ধ	২৪২
ইরাকে বিদ্রোহ	২৪৪
ভুলক্রমে দু'জন মুসলমানকে হত্যা	২৪৪
ফারাযের যুদ্ধ	২৪৬
হযরত খালিদ (রা)-এর হজ্জ আদায়	২৪৬
সিরিয়া বিজয়	২৪৭
সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ	২৪৮
রোম সম্রাটের যুদ্ধ প্রস্তুতি	২৫০
পরামর্শ সভা	২৫১
আমন্ত্রণপত্র	২৫১

www.pathagar.com

বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং তাদের মদীনায় আগমন ২৫২
রোম সম্রাটের কাছে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দূত ২৫২
বিভিন্ন গোত্রের অধৈর্য অবস্থা ২৫৩
মসুলিম বাহিনীর বিন্যাস ২৫৩
সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা ২৫৩
রোমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ ২৫৫
মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গন ২৫৬
রোমান সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ ২৫৬
ইয়ারমুকে সমাবেশ ২৫৭
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ সেনাপতি মনোনীত ২৫৮
হযরত খালিদ (রা)-এর অগ্রযাত্রা ২৫৯
আজনাদায়েনের যুদ্ধ ২৬০
হযরত আবূ বকর (রা)-এর নামে হযরত খালিদ (রা)-এর পত্র ২৬১
একটি আলোচনা ২৬২
ইরাকে বিদ্রোহ ২৬৩
বিজয়ের কারণসমূহ ২৬৬
পাশ্চাত্যের লেখকদের মতে বিজয়ের কারণসমূহ ২৬৬
বিজয়ের মূল কারণ ২৬৮
মৃত্যু রোগ এবং ইন্তিকাল ২৭০
স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের জন্য পরামর্শ ২৭১
হযরত ওমর (রা)-এর নাম ঘোষণা ২৭২
হযরত ওমর (রা)-কে ওসীয়ত ও নসীহত ২৭৩
ব্যক্তিগত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ২৭৪
দাফন কাফন সম্পর্কে ওসীয়ত ২৭৫
সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া ২৭৭
হযরত আলী (রা)-এর সমবেদনাপূর্ণ ভাষণ ২৭৮
আঁ-হযরত (সা)-এর একটি সুসংবাদ ২৮২
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ২৮৩
হযরত আবূ বকর (রা)-এর রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ২৮৭
মজলিশে শুরা বা পরামর্শ সভা ২৮৭
রাষ্ট্রীয় নীতি ২৮৮
রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন ২৮৯
নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নীতি ২৮৯
স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকা ২৮৯
প্রশাসক নিয়োগে তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিক বিবেচনা ২৯০
প্রশাসকদের মনস্তুষ্টি ও মর্যাদার দিক লক্ষ্য রাখা ২৯০

www.pathagar.com

নির্বাচনে সতর্কতা	২৯১
পরীক্ষামূলক নিয়োগ	২৯১
প্রশাসকদের পদচ্যুতি	২৯১
গভর্নরদের কর্তব্য	২৯২
পদসমূহের বণ্টন	২৯২
বিচারক	২৯৩
একটি তথ্য	২৯৩
প্রধানমন্ত্রী	২৯৬
কোষাগার বিভাগ	২৯৬
হস্তলিপি বিভাগ	২৯৬
প্রশাসকদের নামে নির্দেশাবলী প্রেরণের পদ্ধতি	২৯৭
ফতওয়া বিভাগ	২৯৭
পুলিশ	২৯৭
প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশাবলী	২৯৭
তাকওয়া ও পবিত্রতার নির্দেশ	২৯৮
প্রশাসক ও আমীরদের কাজের মূল্যায়ন	৩০০
সাধারণ ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা	৩০১
প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা	৩০২
হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাতা	৩০২
অর্থ ব্যবস্থা	৩০৪
রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়	৩০৪
হুযূর (সা)-এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা	৩০৪
যাকাতের হার	৩০৬
ভূমিকর	৩০৭
লাগান ইজারাহ	৩০৭
খেরাজ বা রাজস্ব	৩০৮
জিযিয়া	৩০৮
ফাই ও গনীমত	৩০৯
জায়গীর প্রদান	৩০৯
খনির উপর কর	৩১০
আমদানি বা আয়ের অন্যান্য উৎস	৩১১
যাকাত আদায় করা একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব	৩১১
রাষ্ট্রের ব্যয়	৩১৩
রাসূল (সা)-এর ওয়াদা পূরণ	৩১৩
সমবণ্টন	৩১৪
গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল বণ্টন	৩১৪

www.pathagar.com

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)

একটি ভুল বর্ণনা ৩[illegible]
অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা ৩১৬
যে সব জিনিস করমুক্ত ৩১৭

সামরিক ব্যবস্থা ৩১৭
সৈন্যদের বিভিন্ন অংশ ৩১৭
সৈন্যদের জন্য নসীহতকারী ৩১৮
যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র ৩১৮
দাবাবাহ্ ৩১৯
আদদাবুর ৩১৯
সৈন্যদের পোশাক ৩১৯
মহিলারাও যুদ্ধে সৈন্যদের সাথে থাকত ৩১৯
সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ ৩২০
প্রধান সেনাপতির পদ ৩২০
সৈন্যদের নির্বাচনে সতর্কতা ৩২০
মুসলিম মুজাহিদদের মূল্যায়ন ৩২১
অস্ত্র সরবরাহ ৩২১
সেনাবাহিনীকে হিদায়াত প্রদান ৩২২
সেনাবাহিনী বা সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন ৩২৪
হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশের প্রতিক্রিয়া ৩২৪
পাশ্চাত্যের লেখকদের মতামত ৩২৫
কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ৩২৫
গ্রামবাসীদের প্রতি ব্যবহার ৩২৬
বিপক্ষীয় সৈন্যদের সাথে ব্যবহার ৩২৬
হীরার সন্ধিপত্র ৩২৭

শাস্তি ৩২৮
অপরাধীর অপরাধ উপেক্ষা ৩২৯
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ৩২৯
মদ্যপানের শাস্তি ৩৩০
চুরির শাস্তি ৩৩১
ব্যভিচারের শাস্তি ৩৩১
ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন ৩৩১

দীনী সেবা ৩৩১
আকায়িদ সংশোধন ৩৩১
সৎকাজের আদেশ ৩৩২
বিদআতের উপর সর্তকবাণী ৩৩৩

www.pathagar.com

[illegible]র প্রচার ও প্রসার ৩৩৩
পবিত্র কুরআন সংকলন ৩৩৩
একটি ভুল বর্ণনা ৩৩৪
কুরআন জমা করার মূল কারণ ও একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ৩৩৫
হুযূর (সা)-এর যুগে সূরাসমূহের বিন্যাস ৩৩৬
হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রকৃতি ৩৩৭
হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর
কুরআন সংকলনের মধ্যে পার্থক্য ৩৩৮
হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ৩৩৯
হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সামাজিক জীবন ৩৩৯
পোশাক ৩৩৯
খাদ্যদ্রব্য ৩৪০
জীবন-জীবিকার উপায় ৩৪০
স্বাধীন ব্যবসা ৩৪১
হস্তশিল্প ও স্বাধীন পেশা ৩৪১
হযরত সিদ্দীকে আকবর (সা)-এর যুগে বেতন ভাতা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ ৩৪২
সমাজের সাধারণ অবস্থা ৩৪২
ইজতিহাদ ও কিয়াস ৩৪২
হুযূর (সা)-এর যুগে কিয়াস ৩৪২
শরীয়তের আহকামের তিনটি উসূল ৩৪৩
চতুর্থ উসূল অর্থাৎ কিয়াস ৩৪৩
খায়বার ও ফিদাকের মাসআলা ৩৪৪
মূল ঘটনা ৩৪৪
হযরত আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসমূহ ৩৪৫
হুযূর (সা)-এর জন্য নির্ধারিত হওয়ার অর্থ ৩৪৫
খয়বার ও ফিদাকের ব্যয়খাত ৩৪৭
হযরত ফাতিমা যুহরা (রা)-এর কর্মপদ্ধতি ৩৪৭
হযরত আবূ বকর (রা)-এর দূরদর্শিতামূলক চিন্তাধারা ৩৪৯
হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর অনমনীয়তা ৩৫০
কালালাহ্ সম্পর্কে আলোচনা ৩৫১
সন্তান কাকে দেয়া হবে ৩৫২
ঈমানী দূরদর্শিতা ৩৫২
জ্ঞানের আভিজাত্য ও পূর্ণতা ৩৫৩
বংশতালিকার জ্ঞানে পারদর্শিতা ৩৫৩
আইয়ামুল আরব ৩৫৪
কাব্য চর্চা ৩৫৫

www.pathagar.com

বক্তৃতা বিবৃতি	৩৫৬
রচনা ও লেখনী শক্তি	৩৬০
হস্তাক্ষর জ্ঞান	৩৬২
ইলমে কুরআন	৩৬২
হাদীস	৩৬৪
খবরে ওয়াহেদ-এর সম্পর্কে নীতিমালা	৩৬৬
হযরত আবূ বকর (রা) বর্ণিত রিওয়াতেরে সংখ্যা	৩৬৭
ফিকাহ্	৩৬৭
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৩৬৮
তাসাউফ	৩৬৯
নবী প্রেম	৩৭১
হুযূর (সা)-এর সম্ভ্রম রক্ষা	৩৭৩
হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ	৩৭৪
আহলে বায়ত বা নবী পরিবারের সাথে মহব্বত	৩৭৪
উত্তম চরিত্র	৩৭৫
তাকওয়াহ্ ও পবিত্রতা	৩৭৫
আল্লাহ্ ভীতি	৩৭৭
অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ	৩৭৭
সংসারের প্রতি উদাসীনতা	৩৭৯
বিনয় ও সরলতা	৩৭৯
ব্যক্তিগত স্বার্থ	৩৮১
ফকীরী ও দরবেশী	৩৮১
আল্লাহ্র পথে ব্যয়	৩৮১
বীরত্ব ও সাহসিকতা	৩৮২
সহনশীলতা ও নম্রতা	৩৮২
উত্তম চরিত্র	৩৮৩
ব্যক্ত ও কৌতুক	৩৮৪
আত্ম-সমালোচনা	৩৮৪
প্রকৃষ্টতা ও গুণাবলী	৩৮৫
সিদ্দীকয়ত-এর অবস্থান ও মর্যাদা	৩৮৬
অগ্রবর্তিতা	৩৮৯
ব্যক্তিগত অবস্থা ও জীবনচরিত	৩৯০
আকৃতি ও গঠন	৩৯০
পোশাক ও খাদ্য	৩৯০
জীবিকার উপায়	৩৯০
খিলাফতের ভাতা	৩৯০

www.pathagar.com

খলীফা হওয়ার পরবর্তী জীবন পদ্ধতি	৩৯০
ইবাদত	৩৯১
জনগণের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি	৩৯১
অন্তরের কোমলতা	৩৯১
কিভাবে শপথ করতেন	৩৯১
বৈবাহিক জীবন	৩৯২
উম্মে রোমান	৩৯২
আসমা বিনতে উমায়স	৩৯২
হাবীবাহ্ বিনতে খারিজাহ্	৩৯৩
সন্তান	৩৯৩
হযরত আবদুর রহমান	৩৯৩
আবদুল্লাহ্	৩৯৪
মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর	৩৯৫
হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)	৩৯৫
হযরত আশেয়া (রা)	৩৯৬
উম্মে কুলসুম	৩৯৬
অঙ্গুরী	৩৯৭
একটি পর্যালোচনা	৩৯৭

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

নাম

নাম-আবদুল্লাহ্। উপনাম–আবূ বকর। উপাধি–আতীক ও সিদ্দীক। পিতার নাম–ওসমান, উপনাম–আবূ কুহাফা। মাতার নাম–সালমা, পারিবারিক নাম–উম্মুল খায়ের। বংশগত সম্পর্কে তিনি স্বামীর চাচাত বোন ছিলেন।[১]

বংশ

হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা হলো, আবদুল্লাহ্ বিন ওসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সাদ বিন তাইম বিন মুররাহ্ বিন কা'ব বিন লুই বিন গালিব বিন ফিহির বিন মালিক বিন নযর বিন কিনানাহ্। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা হলো, সালমা বিনতে সখর বিন আমর বিন কা'ব।[২]

আবূ কুহাফা

হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা আবূ কুহাফা মক্কার অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়সও পেয়েছিলেন। তাঁর তিন জন সন্তান ছিল। পুত্র সন্তান আবূ বকর (রা) এবং অপর দু'জন কন্যা সন্তান। এদের নাম উম্মে ফারওয়াহ্ ও কুরাইবাহ্। প্রথমতঃ ইযদ গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে উম্মে ফারওয়াহ্-এর বিবাহ হয়। সে পক্ষে একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। এরপর তার বিবাহ হয় তামীমদারী-এর সাথে। তিনি প্রথমে খৃস্টান ছিলেন। অতঃপর ৯ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে ফারওয়াহ্ যখন ইসালাম গ্রহণ করেন তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর আশ্‌আস্ বিন কায়েসের সাথে তার বিবাহ হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর দ্বিতীয় বোন কুরাইবাহ-এর বিবাহ হয় হযরত কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদাহ্ আনসারীর সাথে। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং সমসাময়িককালের একজন সাহসী বীর ছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে তার উল্লেখ আছে। ইসলাম প্রচারের সূচনায়ই হযরত আবূ বকর (রা) তা গ্রহণ করেন। আবূ কুহাফা এটাকে তার যৌবনের একটি উন্মাদনা বলে ধরে নিলেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ (সম্ভবতঃ আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সা) হিজরতের বাসনা নিয়ে যখন সাওর গুহায় গমন করেন তখন আমি হুযূর (সা)-এর খবর জানার উদ্দেশ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে যাই। আবূ কুহাফা

---

১. তাবাকাত ইবনে সা'আদ ঃ হযরত আবূ বকর অধ্যায়।

২. ইবনে জারীর তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৫।

www.pathagar.com

আমাকে দেখে ক্রোধান্বিত হন এবং একটি লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে আসেন। তিনি কর্কশ স্বরে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, এটাও ঐ ছোক্‌ড়াদের অন্যতম যারা আমার ছেলে (আবূ বকর)-কে বিপথগামী করেছে।[১]

মক্কা বিজয়ের পর যখন আঁ-হযরত (সা) সমজিদে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পিতা আবূ কুহাফাকে নিয়ে হুযূর (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। ঐ সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি বকের পালকের মত সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছিল। শান্তির দূত মহানবী (সা) তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, তুমি কেন তাঁকে কষ্ট দিলে, আমি স্বয়ং তাঁর কাছে যেতাম। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি তাঁর কাছে যাওয়ার চাইতে তিনিই আপনার কাছে আসবেন এটাই তো বাঞ্ছনীয়। এরপর হুযূর (সা) তাঁর বুকের উপর হাত রাখলেন এবং তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। ১৪ হিজরীতে ৯৭ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। এভাবে আবূ কুহাফাই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন খলীফার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।[২]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাতা

হযরত উম্মুল খায়ের সালমা বিনতে সাখ্‌রা আপন স্বামীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। তিনিও দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর, কিন্তু আবূ কুহাফার মৃত্যুর পূর্বে ইন্‌তিকাল করেন।[৩]

জন্ম

বাদশাহ্‌ আবরাহা কর্তৃক হাতী দ্বারা মক্কা আক্রমণের আড়াই বৎসর পর, অর্থাৎ হিজরী সনের পঞ্চাশ বৎসর ছয় মাস পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর চেয়ে কম বেশী তিন বৎসরের ছোট ছিলেন। এ হিসেবে ৫৭৩ খৃীঃ হলো তাঁর জন্ম সাল।

আতীক উপাধির কারণ

আল্লামা তাবারীর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ছিল তিন ভাই। তাঁদের নাম আতীক, মু'তেক এবং উ'তাইক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, আতীক তাঁর নাম নয় বরং পদবী। একদিন আঁ-হযরত (সা) তাঁকে দেখে বললেন, أنت عتيق الله من النــار [৪] (তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দোযখ থেকে মুক্ত) ঐ

---

১. আল-ইসাবা,২য় খণ্ড,অক্ষর-আ'ইন ৪৫৩।
২. আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪।
৩. আল-ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড,পৃঃ ৪২৯,অক্ষর-খা।
৪. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

www.pathagar.com

সময় থেকে তাঁর পদবী হয় আতীক। হযরত আয়েশা (রা) হতে পরিষ্কার বর্ণিত আছে যে, আতীক তাঁর পদবী ছিল।[১]

সিদ্দীক পদবীর কারণ

হযরত আবূ বকরের দ্বিতীয় পদবী বা উপাধি ছিল সিদ্দীক। কেউ কেউ এর কারণ হিসেবে বলে থাকেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা মতে এর সঠিক কারণ হলো, আঁ-হযরত (সা) মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোত্রের কোন্ ব্যক্তি এ ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করবে ? তিনি উত্তর দিলেন, আবূ বকর (রা), কেননা তিনি সত্যবাদী।[২]

ব্যবসা

কুরাইশ গোত্র মান-মর্যাদায় অনেক উচ্চে অবস্থান করলেও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের কোন উপায় অবলম্বনকে তাঁরা দূষণীয় মনে করতেন না। এ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কাজ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করতেন না। হযরত ওমর (রা) ব্যবসা করতেন। হযরত সা'আদ বিন আবি ওক্কাস (রা) তীর তৈরী করতেন। হযরত ওসমান বিন আফফান (রা) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। হযরত আমর বিন আস (রা) কসাইয়ের কাজ করতেন। এমনকি হযরত আলী (রা) অন্যের জন্য কূপ হতে পানি উত্তোলন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত আবূ বকর (রা) জাহেলিয়াতের যুগে বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার সিরিয়া ও ইয়ামেন সফর করেন। আঠার বৎসর বয়সে প্রথম বারের মত তিনি বিদেশ সফর করেন। আল ইসাবা ও উসদুল গাবা নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতে উঁচুমর্যাদা

আরবে যথারীতি কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিলেন না। কুরাইশ বংশ সবচেয়ে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ছিল বিধায় তাদেরই বিভিন্ন গোত্র আরবের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের যিম্মাদার ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) জ্ঞানবুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতায় অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। শোণিতপণ আদায়ের জিম্মাদারী তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। অর্থাৎ কোন হত্যাকান্ড ঘটলে হত্যাকারীর নিকট থেকে শোণিতপণ আদায়ের ব্যাপারটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। বংশ গণনায়ও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে, তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কাব্য চর্চা ও কবিতা আবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। ইবনে সা'আদ আঁ-হযরত (সা)-এর শোক-গাথায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৫।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ আবূ বকর (রা) অধ্যায়।

www.pathagar.com

স্বভাব চরিত্র

প্রথম থেকেই হযরত আবূ বকর (রা) উত্তম স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি মূর্তিপূজা ও মদ্যপানকে ঘৃণা করতেন। হযরত জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র) 'তারীখুল খুলাফা' নামক গ্রন্থে আবূ নাঈম থেকে হযরত আয়েশা (রা)-এর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لقد حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية

"জাহেলিয়াতের যুগেও হযরত আবূ বকর (রা) নিজের উপর মদ হারাম করে নিয়ে ছিলেন।"

স্বভাব প্রকৃতি

হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্বভাব প্রকৃতি ছিল আঁ-হযরত (সা)-এর উত্তম স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। এক জায়গায় ইবনুদ দাগানা তাঁর ঐ চরিত্র ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করছেন, যা হযরত খাদীজা (রা) ওহী নাযিলের প্রথম অবস্থা প্রসংগে স্বয়ং আঁ-হযরত (সা) হতে বর্ণনা করেছেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব

সমবয়সী ও একই স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে হযরত আবূ বকর (রা) ও আঁ-হযরত (সা)-এর মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। হাকিম ইবনে হাজার (রা) মায়মুন বিন মাহারান এর একটি বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) বাহিরা রাহিবের ঘটনার পর থেকেই হুযূর সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবতঃ হযরত আবূ বকর (রা) সিরিয়া সফরে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথী ছিলেন। আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রা)-এর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে হযরত আবূ বকর (রা) মধ্যস্থতা করেছিলেন।[১] এতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক পূর্ব হতেই আঁ-হযরত (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, নবুয়তের মাত্র এক বছর পূর্বে এ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তবে ইসলাম গ্রহণের পর এই সম্পর্ক এত নিবিড় হয় যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে, আমাদের এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন আঁ-হযরত (সা) সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নি।[২]

---

১. আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, অক্ষর সোয়াদ।
২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫২, মুজতাবা প্রেস থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ

'উসদুল গাবাহ্' গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তবে সেগুলোর কোন কোনটি ইসলাম-বহির্ভূত ও কল্পনা প্রসূত। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ঘটনা হলো, আঁ-হযরত (সা) এর উপর যখন সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয় তখন হযরত আবূ বকর (রা) বাণিজ্য ব্যাপদেশে ইয়ামেনে ছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দেখা করতে যান। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন নতুন খবর আছে কি ?" তারা উত্তর দেয়, "হাঁ, এক নতুন খবর আছে, আর তা হলো আবূ তালিবের ইয়াতীম বাচ্চা নবুয়তের দাবী করছে।" এটা শুনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর দুলে উঠলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকট থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি সোজা হুযূর (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হন এবং আঁ-হযরত (সা)-কে তাঁর নবূওয়াত ও আবির্ভাব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ বৈঠকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আঁ-হযরত (সা) একদা বলেছেন, আমি যার নিকটই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছি তিনিই কম-বেশী চিন্তা-ভাবনা বা ইতস্ততঃ করেছেন। কিন্তু যখনই আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করি তিনি কোন রূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সংগে সংগে তা গ্রহণ করেছেন।

প্রথম মুসলিম সম্পর্কে বিতর্ক

সর্ব প্রথম মুসলিম কে—এ নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা) এবং কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ বিন হারিসাই (রা) এ সম্মানের অধিকারী। মুহাদ্দিসীনে কিরাম উপরোক্ত মতপার্থক্যের মধ্যে যেভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা হলো, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা), মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), বালকদের মধ্যে হযরত হযরত আলী (রা) এবং কৃতদাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) বলেন, আমি যখন সর্বপ্রথম আঁ-হযরত (সা) এর সাথে সাক্ষাত করি তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন ৫ জন কৃতদাস, ২জন মহিলা এবং অন্যজন হযরত আবূ বকর (রা)।[১] হাফিয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' নামক কিতাবের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচ জন গোলাম এবং দু'জন মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন, যথা ঃ (১) হযরত বিল্লাল (রা), (২) হযরত যায়িদ বিন হারিসা (রা), (৩) হযরত আমের বিন ফহিরাহ (রা), (৪) হযরত আবূ ফাকীয়াহ (রা), (৫) হযরত ইয়াসির (রা) এবং হযরত খাদীজা (রা), কিন্তু হযরত সুমাইয়া (রা) (হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা)-এর মাতা)-এর একটি প্রশ্ন বাকী থাকে।

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।

www.pathagar.com

হযরত সা'য়াদ বিন আবি ওককাস (রা)-এর নিজের সম্পর্কে দাবী হলো, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সে দিন কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং সাত দিন আমি এমনভাবে ছিলাম যে, আমিই ছিলাম ৩ জন মুসলমানের অন্যতম।[১] উক্ত বর্ণনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সা'আদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হযরত আবূ বকর (রা)-এর পূর্বেকার।

হযরত আল্লামা কিরমানী (র) উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আবূ বকর (রা) ঐ দিন সকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত সা'আদ (রা) বিকালে। তাই হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর তিনি জানতে পারেন নি।[২]

এখানে সকাল-সন্ধ্যা প্রশ্ন খুব একটা গুরুত্বপর্ণ নয়। এক্ষেত্রে হযরত সা'য়াদ (রা) অথবা অন্য কেউ হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর অগ্রগামী হতে পারেন।[৩] তবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, স্বয়ং নবী করীম (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিঃসংকোচে মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য একবার হুযূর (সা) খবর পান যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে হযরত আবূ বকর (রা) দুঃখ পেয়েছেন, তখন তিনি ক্রোধভরে বলে উঠেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন তখন তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন এবং স্বীয় জীবন ও ধন-সম্পদের দ্বারা আমার চিন্তা ও দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছিলেন। এরপরও কি তোমরা আমার সাথীর (হযরত আবূ বকর (রা) খাতির করবে না? অর্থাৎ তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত হবে না ? বর্ণনাকারী বলেন হুযূর (সা) দু'বার এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন।[৪]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তাওহীদের প্রথম আহ্বানকে হযরত আবূ বকর (রা) তখনই লাব্বাইক জানিয়ে দিলেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম)। যখন মক্কার সমগ্র এলাকায় এক আল্লাহ্র দাওয়াতের বিরোধিতা চরমে উঠেছিল এবং এর আহ্বানকারী ও সহযোগিতাকারীদের বিরুদ্ধে শত্রুরা লাফিয়ে উঠেছিল তখন মাত্র কয়েকজন গোলাম ও মহিলার ইসলাম গ্রহণ শত্রুদের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত প্রভাবশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি যখন এ সত্যদীন ও এর প্রচারকারীর সাহায্য ও সহযোগিতায় অগ্রসর হন তখন শত্রুরা তার উপর ক্রোধে এবং আক্রোশে ফেটে

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪।
২. টীকা নং ৫ সহীহ বুখারী,১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪।
৩. এখানে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন কোন বর্ণনায় আছে স্বয়ং হযরত সা'আদ বিন আবি ওক্কাস (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
৪. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।

www.pathagar.com

পড়ে। হযরত শায়খুল আল মুহিব্বত আত্তাবারী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। তা হলো এই যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় মক্কায় আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গী মুসলমানদের সংখ্যা যখন উনত্রিশে গিয়ে পৌঁছল তখন হযরত আবূ বকর (রা) হুযূরের নবুওয়ত প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাসূলে পাক (সা) বললেন, আমরা এখনো সংখ্যায় কম, এরপরও হযরত আবূ বকর (রা) আগ্রহ দেখালেন। এবারও আঁ-হযরত (সা) তাকে নিরস্ত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে গেলেন। তখন সমস্ত মুসলমান মসজিদে এসে বসলেন। হযরত আবূ বকর (রা) খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং হুযূর (সা) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে মুশরিকদের কাছে খবর পৌছে গিয়েছিল। তারা মসজিদে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালালো এবং নির্যাতন করতে লাগল। ওতবা বিন রাবিয়া একজন যালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারধর করতে লাগল যে, তার নাক চেপ্টা হয়ে চেহারার সাথে মিশে গেল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিজ গোত্র বনু তামীম যখন এ খবর পেল তখন দৌড়ে মসজিদে এল এবং মুশরিকদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে গেল, এ সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে ঐ সমস্ত লোকেরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, বনু তমীম-এর লোকজন এবং তাঁর পিতা আবূ কুহাফা তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথম যে কথা বললেন তা হলো, "রাসূল (সা)-এর অবস্থা কি ?" এটা শুনে বনু তামীমের লোক ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে তিরস্কার করে চলে গেল,, এরপর হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় মাতা উম্মুল খায়েরকে একই প্রশ্ন করলেন, রাসূল (সা) কেমন আছেন ? কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। অবশেষে হযরত ওমর (রা)-এর বোন উম্মে জামীল আসলেন এবং তার কাছ থেকে অবগত হলেন যে, আঁ-হযরত (সা) সুস্থ ও নিরাপদে আছেন এবং হযরত আকরাম (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেছেন, তখন তিনি শান্ত হলেন কিন্তু সাথে সাথে একথাও বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে স্বচক্ষে হুযূর (সা)-কে না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পানাহার করবো না, সুতরাং উম্মে জামীল ও স্বীয় মাতার সহযোগিতায় হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। হুযূর (সা) তার পবিত্র চেহারা দর্শন করেই এগিয়ে এসে তাকে চুমো খেলেন। আঁ-হযরত আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা দর্শন করে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সেদিন হুযূর (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাতা উম্মুল খায়ের ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১]

---

১. আররিয়ায়ুন নাযরাহ ফি মানকিবিল আশারাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

www.pathagar.com

আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্য

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এমন কি, জীবন উৎসর্গকারী মুসলমানদের পক্ষে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তখন আঁ-হযরত (সা) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন।[১] হুযূর (সা)-এর বিচ্ছেদ ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য অসহ্যকর। কিন্তু যেহেতু ঐ হিযরতের উদ্দশ্যে শুধু কাফিরদের যুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য নয় বরং স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যও ছিল, তাই হযরত আবূ বকর (রা) আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কা থেকে ইয়ামেনের দিকে পাঁচ দিনের দূরত্বে বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌছলে পর কার[২] গোত্রের নেতা ইবনুদ্‌ দাগনো-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইবনুদ্‌ দাগনো জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গমনের ইচ্ছা করেছেন?" হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "আমার গোত্র আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে, তাই আমি ভ্রমণ করবো এবং আমার প্রভুর ইবাদত করব।" ইবনুদ দাগানা আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, "আপনার মত লোককে ওরা কী করে বহিষ্কার করলো। আপনি তো দরিদ্রের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন, আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বিকলাঙ্গদের সহায়তা করেন এবং দুর্ঘটনার সময় সততার সাথে সবার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আপনাকে আমিই নিরাপত্তা দান করলাম। আপনি ইচ্ছা মতো আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন।" অতঃপর ইবনুদ্‌ দাগানা হযরত আবূ বকর (রা)-কে সংগে নিয়ে মক্কা এলেন এবং তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করে কুরাইশদের বললেন, "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এমন একজন ব্যক্তিকে শহরে অবস্থান করতে দিচ্ছ না।" কুরাইশরা বললো, "যদি তিনি চুপ করে ইবাদত করেন তাহলে আমরা তার বিরোধীতা করবো না, তিনি এখানেই থাকবেন তুমি তাঁকে যে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরা উপরোক্ত শর্তে তা মেনে নিলাম। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত আবূ বকর

---

১. স্মরণ রাখা উচিত যে, হিজরতের উপরোক্ত নির্দেশ এই জন্য হয়নি যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় কুরাইশদের যুলুম অত্যাচার সহ্য করার শক্তি মুসলমানদের ছিল না বরং এতে হিকমত ও কৌশল ছিল এই যে, এই অসিলায় অন্যান্য দেশেও ইসলামের দাওয়াতের কাজ ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এই কারণেই মুহাজিরদের তালিকায় কুরাইশ বংশের ঐ সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম দৃষ্টিগোচর হয় যারা তাদের ব্যক্তিত্ব, বাকপটুতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে সক্ষম ছিলেন। দ্বিতীয় হিকমত ছিল এই যে, হুযূর (সা)-কে এ বিষয়টি অবগত করানো যে, যদি কোথাও মুসলমানদের উপর এ ধরনের অত্যাচার চালানো হয় এবং তারা আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে তাদের উপর ঐ জায়গা থেকে হিজরত করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া এবং সেখানে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা।

২. এটা ছিল বনু আলহুন বিন খোজায়মা বিন কেনাহনা-এর গোত্র। ওদের তীর নিক্ষেপের খ্যাতি রূপকথায় পরিণত হয়েছিল। যেমন বলা হত أنصف القارة من راماها অর্থাৎ যে ব্যক্তি কা'বা গোত্রের সাথে তীর নিক্ষেপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তিনি এর (তীর নিক্ষেপ) প্রতি ইনসাফ করেছেন (আন-নেহায়া লি ইবনিল কাসীর এবং তাজুল উরুস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১০)।

www.pathagar.com

(রা) কিছুদিন পর্যন্ত গোপনে ইবাদত করতে থাকেন। তিনি নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করে সেখানে সালাত আদায় করতেন, কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর আবেগপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সুমিষ্ট সুর, কুরাইশ মহিলা ও যুবকদের আকৃষ্ট করতে থাকে। তাই কুরাইশরা ইবনুদ্ দাগানা-এর নিকট এই মর্মে অভিযোগ করে যে, "হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেছেন, আপনি তাঁকে বলুন, যদি তিনি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চান তাহলে যেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গোপনভাবে ইবাদত এবং কুরআন তিলওয়াত করেন। যদি তিনি এতে সম্মত না হন তাহলে যেন আপনার আশ্রয় থেকে বের হয়ে যান।" ইবনুদ দাগানাহ্ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এ কথা বললে, তিনি উত্তর দেন, "আমি এখন আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আছি তাই আপনার আশ্রয়ের কোন প্রয়োজন নেই"।[১]

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ

ইসলামের জন্য এই আত্মত্যাগকারী ব্যক্তি অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অসীম ধৈর্যধারণ করেছেন। স্বয়ং আঁ-হযরত (সা) এবং তাঁর সাথে জীবন উৎসর্গকারীদের উপর তখন এত নির্মম অত্যাচার চালানো হত যা চিন্তা করলে এখনও শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের নেশা নয় যা দৈহিক নির্যাতনের তীব্রতায় ছুটে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা) নিজের জন্য কখনও ভাবতেন না। তিনি ভাবতেন যেন হুযূর (সা)-এর কোন প্রকার কষ্ট না হয়। যখন এ ধরনের কোন ঘটনা সংঘটিত হত তিনি সাথে সাথে সেখানে পৌঁছতেন এবং হুযূর (সা)-এর সাহায্য করতেন। একদিন আঁ-হযরত (সা) কা'বা শরীফে বক্তৃতা করছিলেন, এমন সময় মুশরিকরা তাঁকে আক্রমণ করল এবং এরূপ কঠোর নির্যাতন করলো যে হুযূর (সা) মূর্ছা গেলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তখন এগিয়ে গিয়ে বললেন, "রে হতভাগার দল! তোমরা কি শুধু এ কারণে তাঁকে হত্যা করতে চাও যে, তিনি এক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করেন ?[২]

একদিন আঁ-হযরত (সা) কা'বা শরীফে সালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় ওকবা বিন আবি মুয়ীত সেখানে এসে আপন চাদর দিয়ে হুযূর(সা)-এর গলা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। হযরত আবূ বকর (রা) তড়িত গতিতে সেখানে গিয়ে ওকবাকে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন, "যালিম! তুমি কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্"।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫২ ও ৫৫৩।
২. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।
৩. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪।

www.pathagar.com

মুসনাদ 'বাযযার' নামক গ্রন্থে হযরত আলী (রা) থেকে একটি রিওয়ায়েত আছে। হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন আমি দেখি যে, আঁ-হযরত (সা)-কে কুরাইশরা বেষ্টন করে আছে। কেউ তাঁকে ধরে টানছে আবার কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। সবাই সমস্বরে বলছে, "তুমি সেই ব্যক্তি যে সব খোদাকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে।" হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে, আমাদের মধ্যে কারোরই হুযূরের নিকট পৌঁছার সাহস হয় নি। ঠিক তখনি হযরত আবূ বকর (রা) এগিয়ে গেলেন। তিনি কুরাইশদের কাউকে মার দিয়ে আবার কাউকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে হটিয়ে দিলেন। তিনি ঐ সময় বলছিলেন "রে দুর্ভাগার দল! তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলবে যিনি আল্লাহ্‌কে আপন প্রতিপালক বলে থাকেন।" বর্ণনাকারী বলেন, এটা বলেই হযরত আলী (রা) তাঁর চাদর উঠালেন এবং কাঁদতে লাগলেন, এতে তাঁর দাড়ি পানিতে ভিজে গেল। অতঃপর তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলত, ফেরাউনের আমলের মুমিন উত্তম ছিল, না হযরত আবূ বকর (রা) ?" লোকজন চুপ থাকলেন। তিনি তখন বললেন, "তোমরা কি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না?" অতঃপর তিনি বললেন, "খোদার শপথ, হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগের একটি মুহূর্ত ফেরাউনের যুগের মুমিন ব্যক্তিদের হাজার মুহূর্তের চেয়েও উত্তম।

গোলামদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর সহানুভূতি

ইসলাম প্রচারের ঐ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাব্বুল আলামীনের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে উৎসর্গ করে ছিলেন। তিনি একদিকে কুরাইশদের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে আসেন এবং অপরদিকে স্বীয় ধন-সম্পদের দ্বারা ঐ সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় গোলামদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন যারা দাওয়াতে হক বা সত্য গ্রহণ করার অপরাধে কুরাইশদের যুলুম ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। আমরা এসমস্ত গোলামদের অবস্থা সম্পর্কে গোলামানে ইসলাম শীর্ষক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নিম্নে তাঁদের নামসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া গেল।

হযরত বিলাল হাবশী (রা)

তিনি হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াযযিন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন' أول من اظهر الإسلام অর্থাৎ, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হাবশী বংশোদ্ভুত ছিলেন এবং উমাইয়া বিন খাল্‌ফের গোলাম ছিলেন। ঠিক দুপুর বেলা যখন আরবের জমি সূর্যের তাপে আগুনের তাওয়ার মত উষ্ণ হয়ে যেত তখন উমাইয়া হযরত বিলাল (রা)-কে তাওয়ায় বা উষ্ণ বালির

www.pathagar.com

উপর চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর একটি পাথর রেখে দিত যাতে তিনি নড়চড়া করতে না পারেন। অতঃপর বলতো, ইসলাম পরিত্যাগ কর নতুবা এভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তখন হযরত বিলাল (রা) শুধু আহাদ বা এক আল্লাহ্ এক আল্লাহ্ উচ্চারণ করতেন। অতঃপর ঐ দুর্বৃত্ত তাঁর গলায় একটি রশি বেঁধে দুষ্ট ছোকড়াদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দিত তারা তাঁকে টেনে হে'চড়ে শহরের অলিগলি প্রদক্ষিণ করতো। এত যুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি উচ্চারণ করতে থাকতেন 'আহাদ, আহাদ'। হযরত আবূ বকর (রা) যখন এই অমানুষিক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেন তখন উমাইয়া বিন খালফের নিকট থেকে হযরত বিলাল (রা)-কে ক্রয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকে মুক্ত করে দেন। তাই তো হযরত ওমর (রা) বলতেন, أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا [১] অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের সর্দার এবং তিনি আমাদের সর্দারকে আযাদ করেছেন।"

আমের বিন ফুহাইরা (রা)

হযরত আমের বিন ফুহাইরা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর আখ্ইয়াফী (মা-এর দিকের) ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহ্র ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত বিলাল (রা) হযরত আম্মার (রা) এবং হযরত মাসআব বিন উমাইর (রা)-এর সাথে হযরত আমের বিন ফুহাইরা (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকেও নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকেন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তাঁকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, মদীনা হিজরত প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ করা হবে।[২]

হযরত আবূ ফকীহ্ (রা)

আযদ্ গোত্রের সাথে হযরত আবূ ফকীহ (রা)-এর বংশগত সম্পর্ক ছিল। তিনি সাফওয়ান বিন ওমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন। মক্কায় যখন কুফরীর বিরুদ্ধে ইসলামের আওয়াজ ধ্বনিত হলো তখন তিনিও হযরত বিলাল (রা) ও হযরত সুহাইব (রা)-এর মত হঠাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন চালানো হয়। দুপুর বেলা উত্তপ্ত বালুর উপর সাফওয়ান তাঁকে উপুর করে শুইয়ে কোমরের উপর ভারী পাথর রেখে দিত যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। হযরত আবূ ফকীহ সে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বেহুশ হয়ে যেতেন, তবু ঐ দুর্ভাগাদের করুণা হত না। তারা ঐ অবস্থায় পায়ের উপর শিকল বেঁধে তাকে টানা হেঁচড়া করত। একদিন সাফওয়ান তাকে উত্তপ্ত বালুর উপর চেপে ধরে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করল যে তিনি মৃতপ্রায়

---

১. উসদুল গাভা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯০।
২. এসাবা, তাযকিরায়ে হযরত আবূ ফকীহ (রা)।

www.pathagar.com

হয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা) সে দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবূ ফকীহ (রা)-এর ঐ অবস্থা দেখে তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন। অতঃপর তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত লুবাইনাহ (রা)

লুবাইনাহ হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর দাসী ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর কঠোর স্বভাব সর্বজনখ্যাত। তিনি এই অসহায়াকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকেন যে, প্রহার করতে করতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন বলতেন, "আমি একটু বিশ্রাম নেই, তার পর আবার প্রহার করব।" কিন্তু হযরত লুবাইনাহ (রা) অত্যন্ত সহনশীলতা ও সাহসিকতার সাথে জওয়াব দিতেন, "যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর তা হলে আল্লাহ্ এর প্রতিশোধ নেবেন"।[১]

হযরত যুনাইরাহ (রা)

তিনিও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর দাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা) তাঁকেও উত্যক্ত ও নির্যাতন করতেন। আবূ জেহেল তাঁকে একবার এমনিভাবে নির্যাতন করল যে, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

হযরত লুবাইনাহ ও হযরত যুনাইরাহ (রা)-এর জন্য এটা কি কম সম্মানের কথা যে, হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর মত মনিবের পূর্বে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) এই অসহায়াদের দুঃখ কষ্টের কথা অবগত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

হযরত নাহ্দীয়া ও উম্মে উবাইস

এ দু'জনও ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁদের উপরও কঠোর যুলুম নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর করুণা ও দানশীলতায় এরাও দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে।

তিবরানী হযরত উরওয়াহ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) যে সমস্ত দাস-দাসীকে নিজস্ব অর্থের দ্বারা মুক্ত করেন তাদের সংখ্যা ছিল সাত। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা) যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ওদের প্রকৃত সংখ্যা সাত-এর চাইতে অনেক বেশী হবে। অন্যান্য নওমুসলিম দাস-দাসীদের যেহেতু কোন প্রসিদ্ধি ছিল না তাই তারা এ গণনার মধ্যে পড়েনি।[২]

---

১. ইসতিয়াব, তাযকিরায়ে ওমর বিন খাত্তাব।

২. এসাবা উসদুল গাবাহ নামক গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলামদের সংখ্যা সাত বলা হইয়াছে। ঐ সাতজন গোলামের উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তা হলো আল্লাহর রাস্তায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সহানুভূতি বা ঔদার্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ছিল। একদিন তার পিতা আবূ কুহাফা বলেছিলেন, "আচ্ছা আবূ বকর, তুমি তো শুধু মহিলা, বিশেষ করে বৃদ্ধাদেরকে খরিদ করে আযাদ করে থাক। তারা তো তোমার কোন উপকারে আসবে না। এদের পরিবর্তে যদি তুমি সুস্থ ও সবল গোলামদের আযাদ করতে তাহলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তারা তোমার সাহায্য করতে পারত"।

হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, "আব্বা, আমি তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই এরূপ করে থাকি"।[১]

প্রকৃত ইসলাম পরবর্তী যুগে বিশ্বের মানব জাতির ইতিহাসকে যারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকাবাহী, সহযোগিতাকারী ও জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সেই কয়েকজন দাস-দাসীর অন্যতম যাঁদের বেশ কয়েকজনকে হযরত সিদ্দীক (রা) নিজের অর্থে গোলামী থেকে মুক্তি করে দিয়েদিলেন। ঐ সমস্ত মুসলমানদের সন্তুষ্টির প্রতি খোদ রহমতে আলম (সা) এত বেশী লক্ষ্য রাখিতেন যে, যদি হযরত আবূ বকর (রা)-এর দ্বারাও তাদের সম্পর্কে কখনো এ ধরনের কথা বের হতো যা তাদের মনঃকষ্টের কারণ তাহলে সাথে সাথে হুযূর (সা) তাকেও সতর্ক করে দিতেন। একদা আবূ সুফিয়ান (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) হযরত সালমান ফারসী (রা) হযরত বিলাল হাবশী (রা) এবং হযরত সুহাইব রুমী (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ঐ তিনজন তাকে দেখে বললেন, "আল্লাহ্র তলোয়ার তার শত্রুর গর্দান উড়াতে পারে নি। অর্থাৎ তাকে ধ্বংস করতে পারে নি।" ঘটনাক্রমে ঐ সময় হযরত আবূ বকর (রা) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাদের ঐ মন্তব্য শুনে বললেন, "তোমরা কি কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করছো? অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) যখন আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন আঁ-হযরত (সা) বলে উঠেন, "আবূ বকর তুমি সম্ভবত ওদেরকে (গোলামদের) অসন্তুষ্ট করেছ।" যদি ঘটনা তাই হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করেছ।" হযরত আবূ বকর (রা) ঐ কথা শুনার সাথে সাথে ঐ তিন ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, "আমার প্রিয় ভাইরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?" তারা বললেন, "না! আমরা অসন্তুষ্ট হয়নি, হে ভাই! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন"।[২]

করা হতো। কিন্তু উভয় গ্রন্থে তাদের সংখ্যা এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের নামের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) আযাদকৃত গোলামের সংখ্যা সাত-এর চাইতে বেশী ছিল

৩. ইবনে জারীর তাবারী।

১. আততাজুল জামিউল উসূল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৪।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)-এর অর্থব্যয়ের গুরুত্ব

ইসলাম ঐ সময় পর্যন্ত দুর্বল ছিল। ঐ সমস্ত গোলামরাই ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মক্কার ভূমিতে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেন। আর হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। আঁ-হযরত (স) যেখানে ঐ সমস্ত গোলামদের সন্তুষ্টির চেষ্টা করতেন সেখানে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর অর্থ ব্যয়ের গুরুত্বও স্বীকার করতেন। হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থে এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। একদিন হুযূর (স) বললেন ঃ

ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر

"(হযরত) আবূ বকর (রা)-এর সম্পদ দ্বারা আমার যে উপকার হয়েছে, অন্য কারো মাল সম্পদ দ্বারা সেরূপ হয়নি।[1]

অন্য জায়গায় আঁ-হযরত (সা) অত্যন্ত করুণা ও কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে বলেন -

إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر

"নিঃসন্দেহে জান ও মালের দিক দিয়ে আমার উপর আবূ বকর (রা)-এর চাইতে অধিক ইহ্‌সান বা সহানুভূতি অন্য কারো নেই।"

একথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার এ জীবন ও সম্পদ অন্য কারো জন্য কি হতে পারে ?[2]

কুরআন মজীদের স্বীকারোক্তি

স্বয়ং কুরআন মজীদে ঐ সমস্ত সৎ লোকদেরকে যাঁরা মক্কা বিজেয়ের পূর্বে স্বীয় জীবন ও সম্পদ দ্বারা ইসলামের সাহায্য করতেন (এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) এর নাম ছিল শীর্ষে) তাঁদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর এরূপ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

لا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْـــنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوْا ـــ (سورة الحديد)

"তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (ইসলামের সাহায্যে) অর্থ ব্যয় করেছেন এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করেছেন তাঁরা সম্মানের দিক দিয়ে ঐ সমস্ত লোকদের চেয়ে অতি উচ্চে যারা মক্কা বিজয়ের পর অর্থ ব্যয় করেছেন এবং জিহাদ করেছেন।"(সূরাহ্ আল্-হাদীদ)

---

১. জা'মে তিরমিযী মানাকেবে আবি বকর সিদ্দীক (রা)।
২. কানযুল উমমাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

www.pathagar.com

যখন হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম জমা ছিল, কিন্তু যখন তিনি মদীনায় পৌছেন তখন তাঁর নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।[১] বাকী সব অর্থ তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে ফেলেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে আঁ-হযরত (সা)-এর বিবাহ

কুরাইশগণ বিভিন্নভাবে হুযূর (সা)-কে কষ্ট দিত, যদিও হযূর (সা)-এর স্ত্রী মুহ্‌তারিমা হযরত খাদীজা (রা) কুরাইশদের একটি সম্মানিত গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন এবং হুযূর (সা)-এর চাচা আবূ তালিব কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তবে তাঁদের উভয়ের বর্তমানে আঁ-হযরত (সা)-এর ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ১০ হিজরীতে কয়েকদিনের ব্যবধানে যখন উভয়ে ইন্‌তিকাল করলেন, তখন আঁ-হযরত অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এ কারণেই তিনি ঐ বৎসরকে 'আমুল হুয্‌ন' অর্থাৎ দুঃখের বৎসর বলে অভিহিত করেন। এরপর অধিকাংশ সময় তাঁকে উদাস ও চিন্তিত দেখা যেত; এ সময় খাওলা বিনতে হাকীম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে আঁ-হযরত (সা)-এর বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে পূর্বেই হুযূর (সা)-কে স্বপ্নে অবহিত করানো হয়েছিলো।[২] তাই তিনি সম্মত হয়ে গেলেন। খাওলা বিন্‌তে হাকীম হযরত আয়েশা (রা)-এর মাতা উম্মে রোমান এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি যুবাইর ইবনে মুতয়িম এর সাথে কথা দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যখন যুবাইর ইবনে মুতয়িমের সাথে এ ব্যাপারে পুনরায় আলোচনা হলো তখন তিনি এ ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবার হযরত আবূ বকর (রা) স্বাধীন। তিনি চারশত দিরহাম দিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে হুযূর (সা)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করেন। এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বস্তুতঃ এই নতুন আত্মীয়তার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত আবূ বকর (সা)-এর স্থান আরো বৃদ্ধি পেল এবং আঁ-হযরত (সা) এর জন্য এমন জীবন সঙ্গিনীর ব্যবস্থা হলো যিনি পরবর্তীতে ইসলামী আহ্‌কাম এবং মাসায়েলের ব্যাখ্যা প্রদান এবং সত্য ধর্মেও প্রচারে তাঁর বাহু হিসেবে প্রতিপন্ন হন।

---

১. ইসাবা, মুদ্রণে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩১।
২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।

www.pathagar.com

মদীনায় হিজরত

মদীনায় ইসলামের জনপ্রিয়তা

ইসলামের যে আলোকবর্তিকা মক্কার দিগন্তে উদিত হয়েছিল তার কিরণমালা মদীনাকেও আলোকময় করতে লাগল। প্রতি বছর মদীনায় যে সমস্ত লোক হজ্জ-অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতেন নবী করীম (সা) তাদের কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ শোনাতেন এবং সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতেন। অধিকাংশ সময় হযরত আবূবকরও (রা) তাঁর সাথে থাকতেন। ইয়াহূদীদের সাথে এ সমস্ত লোকদের বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক থাকায় আল্লাহ্র দীনের চিন্তা-ধারণা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ বা অমনোযোগী ছিলেন না। তাওরাতের ভবিষ্যদ্ববাণী অনুযায়ী তারা বরং একজন নবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায়ই ছিলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা নবী করীম (সা)-কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কুরআন মজীদও শ্রবণ করতে লাগলেন। ফলে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রইল না। মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায় যাতে এই সৌভাগ্যের কাজে তাদের চাইতে অগ্রগামী হতে না পারে সেজন্য তারা একাজে স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা বেশীই তৎপর হলেন। যাহোক মদীনার হজ্জ পালনকারীগণ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী আঁ-হযরত (সা) নিজের পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ বা ইসলাম প্রচারকারী দল মদীনায় প্রেরণ শুরু করেন। তারা মদীনায় অবস্থান করে সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহর জন্মভূমিতে যে ইসলাম দুর্বল ও অসহায় ছিল তা মদীনার ভূমিতে সজীব ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো।

কুরাইশদের চক্রান্ত

কুরাইশরা যখন প্রত্যক্ষ করল যে, এ পর্যন্ত তারা হযরত (সা) এবং তাঁর জীবন উৎসর্গকারী সহযোগীদের যত উৎপীড়ন, ভীতি-প্রদর্শন ও নির্যাতনই করুক না, তা কোন কাজে আসে নি। এমন কি তিন বছর পর্যন্ত হাশিম বংশের লোকদের শাবে আবি তালিবে ক্ষুধিত ও তৃষিত অবস্থায় অবরুদ্ধ করে রাখা সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হয় নি। বরং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই যে, মদীনায় দিন দিন ইসলাম প্রসার লাভ করছে এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অগত্যা কুরাইশরাই তাদের পরামর্শ স্থল দারুন নাদওয়ায় এক সভা আহ্বান করে। তারা পরামর্শ করতে থাকে কি করে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করা যায়। ঐ সভায় নেতৃস্থানীয় কুরাইশরা অংশ গ্রহণ করেছিল। তাতে বিভিন্ন মতামত পেশ করা হয়। অবশেষে আবূ জেহেল বলেন, "প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে লোক নেয়া হোক এবং তারা একসাথে সবাই মিলে তরবারী দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিক। এতে তাঁর রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। ফলে হাশিম বংশের পক্ষে একা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।" আবূ জেহেলের এই প্রস্তাবে সবাই একমত হয়।

www.pathagar.com

হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা

মদীনায় ইসলামের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে আঁ-হযরত (সা) অধিকাংশ সাহাবাকে পূর্ব হতেই মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অধিকাংশ সাহাবী (রা) সেখানে গিয়ে বসতিস্থাপন করেছিলেন। হযরত আবূ বকরও (রা) মদীনায় হিজরত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল। হুযূর (সা)-তাকে হিজরত থেকে নিবৃত্ত করছিলেন এবং নিজে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে সে সুযোগ ও সময় উপস্থিত হলো। অপরদিকে দারুন নাদওয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, রহমতে আলম (সা)-কে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালনকারী আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় ও সম্মানিত বন্ধুকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন,

"إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ"

অর্থাৎ "যদিও তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য না কর কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করবেন।"

ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় হিজরতের যে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর পয়গাম্বরসুলভ শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা এবং হুযূর (সা)-এর প্রতি হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপরিসীম মহব্বত ও গভীর সম্পর্ক সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা, সূক্ষ্ম-দর্শিতা এবং পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই আমরা হুবহু ঐ বিবরণ পেশ করব। তবে মূল বর্ণনায় কোথাও কোথাও অন্যান্য বর্ণনা থেকে সাহায্য নেয়া হবে যাতে পূর্ণ ঘটনা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত আয়েশা (রা) যদিও ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বর্ণনা তিনি সম্ভবত আঁ-হযরত (সা) অথবা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে শুনেছেন।"[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতের প্রস্তুতি

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের কাছে বলেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে এবং তা এরূপ, তখন অনেক মুসলমান মদীনায়

১. ইমাম বুখারী (র) " مناقب المهاجرين وفضلهم " শীর্ষক অধ্যায়ে হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)-এর বর্ণনাকৃত একটি দীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা তার বর্ণনা এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা (যা ইমাম বুখারী (র) "هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة" শীর্ষক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। একত্র করে হিজরতের বিবরণ পেশ করছি।

www.pathagar.com

যেতে শুরু করে। এমন কি যে সমস্ত মুসলমান হাবশা গমন করেছিলেন তারাও সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবূ বকরও (রা) হিজরতের প্রস্তুতি নেন কিন্তু হুযূর (সা) তাঁকে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। আশা করি আমাকে অচিরেই অনুমতি প্রদান করা হবে।"

হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, "আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি কি এই আশা করেন ? হুযূর (সা) বললেন, হাঁ। এটা শুনে হযরত আবূ বকর (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি হুযূর (সা)-এর সাথেই মদীনায় হিজরত করবেন। তাঁর নিকট দু'টি উট ছিল। চার মাস পূর্ব হতেই তিনি সেগুলোকে বাবুল বৃক্ষের পাতা খাওয়াচ্ছিলেন যাতে তারা হিজরতের সফরে সুষ্ঠুভাবে কাজ দেয়।

হিজরত

চার মাস এভাবে অতিবাহিত হলো। একদিন দুপুর বেলা আমরা সবাই আমাদের ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, ঐ দেখুন রাসূল (সা) তাঁর পবিত্র মাথা রুমাল দিয়ে ঢেকে এদিকে আসছেন। এ সময় তো হুযূর (সা)-এর এদিকে আসার কথা নয়। হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-কে দর্শন করা মাত্র বলে উঠলেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, এ অসময়ে নিশ্চয়ই আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এসেছেন।" আঁ-হযরত এগিয়ে এলেন এবং "দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন।" অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, "যে সমস্ত লোক এখন আপনার কাছে রয়েছে তাদেরকে একটু সরিয়ে দিন।" হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, হুযূর (সা) এখানে তো আপনার পর কেউ নেই। হুযূর (সা) তখন বললেন, "আমি হিজরতের নির্দেশ পেয়ে গেছি।" হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "আমিও আপনার সাথে যাব?" হুযূর (সা) বললেন, "হাঁ"। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "আমাদের দু'টি উট হতে আপনি একটি গ্রহণ করুন।" হুযূর (সা) বললেন, "তাই হবে, তবে এর মূল্য প্রদান করে।"[১]

দ্রুততার সাথে ভ্রমণের প্রস্তুতি চললো। বেশ কয়েক দিনের রাস্তা ছিল বলে পথের হিসাবে খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে পাত্রে রাখা হল। পাত্র বাঁধার মত কিছু ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে তাঁর বড় কন্যা হযরত আসমা (রা) তাঁর কোমরবন্দ[২] দু'টুকরা করে সেটা দিয়ে নাশতার পাত্র বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে ذات النطاقين বা দু'কোমরবন্দ ওয়ালী বলা হয়।

---

১. চিন্তা করুন এত উত্তম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই সংকটময় মুহূর্তেও আঁ-হযরত (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর উট বিনামূলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। অপরদিকে চমৎকার আদব ও আনুগত্যের নমুনা এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) মূল্য গ্রহণে অস্বীকার করেন নি। ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ উটের মূল্য ছিল আটশত দিরহাম।

২. نطاق অর্থ হল পটকাহ্। আরবের প্রথা ও অভ্যাস অনুযায়ী মহিলারা ফটকা বাঁধতেন। আশ্চর্যের বিষয় মাওঃ আবদুল্লা আ'মাদি نطاق এর অর্থ দো-পাট্টা লিখেছেন। (তরজমা, তাবকাতে ইবনে সায়দ, ৫ম খণ্ড, ৯ম অধ্যায়, ৫ পৃঃ) অথচ দোপাট্টার জন্য আরবীতে خمار শব্দ ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

সাওর পর্বতের গুহায় গোপনে অবস্থান

দারুন নাদওয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী কুরাইশদের লোকজন যারা হুযূরকে হত্যা করার জন্য মনোনীত হয়েছিল, সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁর গৃহ অবরোধ করে ফেলে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কুরাইশরা মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করাকে অন্যায় জ্ঞান করত। তাই তারা অপেক্ষায় ছিল হুযূর (সা)-এর বাইরে আগমনের কালে যাতে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে। হুযূর (সা)-এর কাছে অনেক লোকের আমানত ছিল এবং প্রয়োজন ছিল সেগুলোর ফেরৎদানের ব্যবস্থা করার। অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট সেগুলো সমর্পণ করেন।[১] এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন অবরোধকারীদের চোখের পলক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল তখন তিনি ঘর হতে বের হয়ে হযরত আবূ বকর (রা) -এর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন।[২] সেখান থেকে উভয়ে মক্কা নগরীকে বিদায় জানিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে 'সাওর' নামক একটি পর্বত রয়েছে। তারা পর্বতের একটি গুহার মধ্যে গোপনে তিন রাত অবস্থান করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ তখন যুবক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন। তিনিও ঐ গুহায় রাত্রি যাপন করতেন এবং ভোরের অন্ধকারে মক্কায় এসে কুরাইশদের সাথে মিশে যেতেন। দিনের বেলা কুরাইশরা যে সকল পরামর্শ করত বা সিদ্ধান্ত নিত তিনি রাতের বেলা সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছে উভয়কে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। ইবনে সাদ লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর (রা) ঘর থেকে খাবার নিয়ে যেতেন। আমির ইবনে ফাহিরাহ্ হযরত আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বকরী নিয়ে সেখানে যেতেন, এবং সাওর পর্বতে অবস্থানরত উভয় বন্ধু সে বকরীর দুধ পান করতেন। অন্ধকারে আমির বিন ফাহিরাহ্ বের হয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যা হওয়ার পর পুনরায় ঘরে ফিরে আসতেন। তিন দিন এভাবেই অতিবাহিত হল।

এদিকে ভোরে আঁ-হযরত (সা)-এর নিরাপদে চলে যাওয়ার খবর কুরাইশদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা তাদের সিদ্ধান্তে ব্যর্থ হওয়ায় অত্যন্ত আক্ষেপ করতে থাকে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর খোঁজে লোক পাঠায়। ওদের একজন গুহার একেবারে নিকটে পৌঁছে যায়। তাদের পদধ্বনি শুনে হযরত আবূ বকর (র) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আরয করলেন, হুযূর (সা) ওরা যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। হুযূর (সা) বললেন, "ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما" অর্থাৎ "হে আবূ বকর (রা) ঐ দুজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, যাদের তৃতীয়[৩] 'জন হল আল্লাহ্।"

---

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ তাযকিরায়ে হযরত আলী (রা)।

২. বুখারী শরীফে শুধু আঁ-হযরত (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মক্কা হতে বের হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) তার ঘরের পিছনের জানালা বা দরজা দিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন। আমরা এখানে উভয় বর্ণনা একত্রিত করেছি।

৩. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬ (باب مناقب المهاجرين)

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ বিন আরীকাতকে, যিনি আবদ বিন আদী গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও তার আমানত ও সততার উপর নির্ভর করে আঁ-হযরত (সা) পারিশ্রমিক দিয়ে পথ প্রদর্শনের জন্য পূর্ব হতেই নিয়োগ রেখেছিলেন। তার কাছে দু'টি উট সমর্পণ করে এ চুক্তি হয় যে, তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি খুব ভোরে উট নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় উপস্থিত হবেন। আব্দ তাই করেন। এবার আঁ-হযরত (সা), আবূ বকর (রা) ও আমির বিন ফাহিরা (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে আরীকাতের পথ নির্দেশনায় মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

একদিন একরাত ক্রমাগত চলার পর দ্বিতীয় দিন দুপুরের সময় রোদের প্রখরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। তখন হযরত আবূ বকর (রা) চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, কোথাও ছায়া পাওয়া যায় কি না। ঘটনাক্রমে এমন একটি কঙ্করময় মরুভূমি দৃশ্যমান হল যেখানে ছায়া ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) ঐ স্থানটিকে সমতল করে তাতে বিছানা বিছিয়ে আঁ-হযরত (সা)-কে বিশ্রাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। হুযূর (সা) শুয়ে পড়লেন। হযরত আবূ বকর (রা) তখন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, পিছন থেকে কোন লোক তাদের অনুসরণ করছে কিনা। একজন রাখালকে দেখা গেল। সে ছায়ার খোঁজে তার বকরীগুলোকে এদিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" সে কুরাইশদের এক ব্যক্তির নাম বলল যার পরিচয় হযরত আবূ বকর (রা) জানতেন। রাখাল বলল; 'আমি তার চাকর"। হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে কি দুধওয়ালা বকরী আছে?" সে বলল, হাঁ। আবূ বকর বললেন, "তুমি আমাদের জন্য দুধ দোহন করে দেবে।"

রাখালটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দুধ দোহনের জন্য প্রস্তুত হলো। তখন হযরত আবূ বকর (রা) (সুক্ষ্মদর্শিতা ও হুযূর (সা)-এর মহব্বতের কারণে) বললেন, বকরীর স্তনগুলো থেকে ধুলোবালি ও ময়লা পরিষ্কার কর। তোমার হাতও ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার কর। তিনি এক হাতের উপর অন্য হাত মেরে বললেন, এভাবে পরিষ্কার কর। রাখাল সেরূপ করেই দুধ দোহন করল। হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর জন্য চামরার একটি পাত্র নিয়ে এসেছিলেন। তাতে দুধ ভর্তি করে তিনি পাত্রটি কাপড় দিয়ে বাঁধলেন এবং নিয়ে হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আঁ-হযরত (সা) তখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেছেন। আবূ বকর আরয করলেন, হুযূর দুধ পান করে নিন। আঁ-হযরত (সা) তা গ্রহণ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর থেকে ধীরে ধীরে ভীতি দূর হতে লাগল। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল (সা), যাত্রার সময় হয়েছে।" হুযূর (সা) বললেন, "অতি উত্তম"। তারা পুনরায় রওয়ানা হলেন।

www.pathagar.com

সুরাকা বিন জা'শমের ঘটনা

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর যখন আঁ-হযরত (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন কুরাইশরা চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করে ঘোষণা করে দিল যে, যে ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা) অথবা হযরত আবূ বকর (রা)-কে হত্যা করতে পারবে অথবা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে পারবে তাকে এঁদের প্রতিজনের বিনিময়ে একশত উট অথবা সমমূল্য পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে। বনী মুদলাজ গোত্রের সুরাকা বিন জা'শম এ ঘোষণা শুনে ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং বর্শা হাতে ঐ দু'জনের খোঁজে রওয়ানা হল। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ তার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সেও ঘোড়া হতে পড়ে গেল। তখন সে প্রচলিত কুসংস্কার অনুযায়ী ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে তুনী থেকে তীর বের করে দেখলো, এ অবস্থায় পশ্চাদ্ধাবন করা তার জন্য ঠিক হবে কি না, ফল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গেল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করতে না পারায় দ্বিতীয়বার ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হল এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) অতি নিকটে পৌঁছে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এই লোকটি আমাদের খোঁজে আসছে। হুযূর (সা) বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا (تَوْبَة) ভয় করোনা,[১] নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।"

স্বয়ং সুরাকা যিনি পরে মুসলমান হয়ে ছিলেন, বলেছেন, 'আমি তাঁদের এত নিকটে পৌঁছি যে, আঁ-হযরত (সা) কিছু পাঠ করেছেন শুনতে পাই। তিনি আরো বলেছেন, আমি ঐ সময় প্রত্যক্ষ করলাম, হুযূর (সা) কোন দিকেই তাকাচ্ছেন না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) (দুর্ভাবনায়) এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। হঠাৎ আমার ঘোড়ার উভয় পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে বসে গেল, আমি নিচে পড়ে গেলাম। পুনরায় ঘোড়ার ওপর চড়ে চীৎকার দিলাম। ঘোড়াটি উঠবার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু মাটির ভিতর থেকে পা বের করতে পারল না, পুনরায় আমি ভবিষ্যৎ গণনা করলাম এবং পূর্বের মতই অবস্থা পরিলক্ষিত হলে, ভাবলাম নিশ্চয় এখানে অন্য কোন ব্যাপার আছে। তখন আমি নিরাপত্তা চাইলাম। নবী (সা) ও হযরত সিদ্দীক (রা)-এর কাফেলা থেমে গেল। নিরাপত্তা পেয়ে আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং কুরাইশদের ঘোষণা এবং তাঁর খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটি তাঁকে শুনালাম। আমি পানাহারের যে দ্রব্যাদি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম তা পেশ করলাম এবং আমার জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করলাম। হুযূরের নির্দেশে আমির ইবনে ফাহিরা চামড়ার একটি টুকরার উপর নিরাপত্তা লিখে আমার কাছে অর্পণ করেন।

---

১. এই বাক্য হুযূর (সা) সাওর পাহাড়ের গুহায়ও বলেছিলেন। যেমন—কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই বর্ণনায় এই উভয় স্থানে একই বাক্য পাওয়া যায়। অবশ্য কুরআনে শুধু সাওর পাহাড়ের গুহার কথা উল্লেখ আছে। সুরাকার ঘটনা সম্পর্কে কুরআন নীরব।

www.pathagar.com

ঘটনাক্রমে হযরত যুবাইর (রা) তখন মুসলমান ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এখানে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। হযরত যুবাইর (রা) কয়েকটি মূল্যবান সাদা কাপড় হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে প্রদান করলেন, আসাবপত্রহীন অবস্থায় এই দান তাদের জন্য অতি মূল্যবান ও উপকারী প্রমাণিত হল। ইবনে সাদ হযরত যুবাইর (রা)-এর স্থলে এখানে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ এ উভয় ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে ঘটেছে অথবা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ স্বয়ং হযরত যুবাইর (রা)-এর সাথে ব্যবসায় সফর সঙ্গী ছিলেন।

হুযূরের কাফেলা পুনরায় রওয়ানা হলো। আঁ-হযরত (সা) যদিও বয়সে আবূ বকর (রা)-এর চাইতে কিছু বড় ছিলেন কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে তাকে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক ও যুবক মনে হত এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে মনে হত অধিক বয়স্ক। ব্যবসার কারণে যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা) বিদেশে গমনাগমন করতেন তাই রাস্তায় তাঁর অপেক্ষা পরিচিত লোক মিলে। কেউ হুযূর (সা) সম্পর্কে আবূ বকরকে (রা) জিজ্ঞাসা করলে তিনি পরোক্ষ ভাষায় জবাব দিতেন 'ইনি আমার পথ প্রদর্শক।"[১]

মদীনায় প্রাথমিক জীবন

নবী করীম (সা)-এর মদীনায় প্রবেশ

আঁ-হযরত (সা) এর মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার খবর ইতিমধ্যে মদীনায় যথা সময় পৌঁছে গিয়েছিল। তাই সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর ধুম পড়ে। আনসারদের ছেলে-মেয়েরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। মদীনা হ'তে তিন মাইল দূরে একটি উঁচু বসতি ছিল। যেটাকে হিরাহ্ বা কুবা (حرة يا قبا) বলা হত। মুহাম্মদী সৌন্দর্যে বিমোহিত পাগলপারা মদীনার মুসলমানরা প্রতিদিন ভোরে সেখানে যেত এবং গর্দান উচুঁ করে লক্ষ্য করত নবী (সা)-এর কাফেলার শুভাগমন হচ্ছে কিনা। এরূপ করতে করতে যখন তাদের চোখ ধাধিয়ে উঠত এবং দুপুরে আলোর প্রখরতা বৃদ্ধি পেত তখন তারা বিমর্ষচিত্তে মদীনায় ফিরে যেত। এটা তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। একদা সবাই মদীনায় ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় উঁচু টিলার উপর দণ্ডায়মান জনৈক ইয়াহূদীর দৃষ্টি সাদা বস্ত্র পরিহিত আঁ-হযরত (সা) এবং তাঁর সাথীদের উপর পড়ে। সে তখন প্রায় আত্মহারা হয়ে চীৎকার দিয়ে বলে উঠে, হে মদীনাবাসী! তোমরা যার অপেক্ষায় আছ তিনি আগমন করছেন। আনসাররা তখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হুযূরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়। হিরাহ্ নামক স্থানে হুযূর (সা)-

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৬।

www.pathagar.com

এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে হযরত আমর ইবনে আওফের একটি বিশিষ্ট পরিবার বাস করত। ইহ-পরকালের বাদশাহ্ সর্বপ্রথম তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বাহন থেকে অবতরণ করে আঁ-হযরত (সা) নিশ্চুপ বসে ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। যে সব আনসার তখনও নবী (সা)- কে দেখেনি তাঁরা হযরত আবূ বকর (রা)-কেই শেষ যুগের নবী মনে করে সালাম করছিলেন। ইতিমধ্যে রোদের প্রখরতা বৃদ্ধি পেল। তখন হযরত আবূ বকর (রা) আপন চাদর দ্বারা আঁ-হযরত (সা)-এর উপর ছায়া দিয়ে দাঁড়ালেন। এতে সমস্ত লোকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো প্রকৃতপক্ষে কে তাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি।[১]

ইমাম বুখারী (রা) এক বর্ণনা অনুযায়ী আঁ-হযরত (সা) কুবায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন যার উল্লেখ কুরআন মজীদে করা হয়েছে।

"لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى"

মদীনায় আগমনের তারিখ

হাফিয ইবনে হাজারের বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা) রোববার দিন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে তিন দিন সাওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করেন এবং বুধবারে সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হন। ইমাম বুখারী (রা) কুবায় আগমনের দিন রোববার এবং সে মাস রবিউল আউয়াল ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তারিখের মতভেদ আছে। কেউ ঐ দিন এক, কেহ দুই, কেহ সাত, কেহ বার, কেহ তের এবং কেহ পনের তারিখ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২] কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যদি আগমনের দিন রোববার হয় যেমন মাওঃ শিবলী (রা) লিখেছেন যে, নতুন হিসেবেও এই দিন মিলে।[৩] তাহলে উপরোল্লিখিত তারিখের কোনটিও সঠিক হয় না। প্রফেসার ফিলিপ হিট্টি খ্রীস্ট বৎসরের হিসাব অনুযায়ী ঐ দিনটি ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃস্টাব্দ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

কুবায় দু'সপ্তাহ অবস্থানের পর আঁ-হযরত (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) পুনরায় মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনা পৌঁছে আঁ-হযরত (সা) হযরত আবূ আইউব আনসারীর (রা) অতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মদীনার পার্শ্ববর্তী 'মুখ' নামক স্থানে খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে আবি জুহাইরের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানেই ব্যবসা আরম্ভ করে দেন। পরে খারিজার

---

১. সহীহ বুখারী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯।
২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৫।
৩. সীরাতুন্নবী (সা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭, টীকা নং-২।
৪. আরবদের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১৬।

www.pathagar.com

কন্যা হাবীবাহ্‌র সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং একটি পৃথক বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। কয়েকদিন পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী বিবি উম্মে রোমান সাহেবজাদা হযরত আবদুল্লাহ্ এবং সাহেবজাদী হযরত আসমা ও হযরত আয়েশা (রা)সহ মদীনায় পৌঁছেন। হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পরও প্রায় ছয় মাস সেখানেই বসবাস করেন।[১]

মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়া ও নবী (সা)-এর দো'আ

মদীনায় পৌঁছার কয়েকদিন পর হযরত আবূ বকর (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা) পিতার সেবার জন্য তাঁর কাছে আসেন এবং ব্যথিত কণ্ঠে এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

"كل امرئ مصبح في أهله + والموت أدنى من شراك نعله"

"প্রত্যেকেই স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে সুখী জীবন ও প্রফুল্লতা দান করে থাকেন, অথচ মৃত্যু তাদের জুতার ফিতার চেয়ে অধিক নিকটে।"

হযরত আয়েশা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন আঁ-হযরত (সা) আল্লাহ্‌র মহান দরবারে দু'আ করলেন "হে আল্লাহ্! মক্কা আমাদের নিকট যেরূপ প্রিয় ছিল, মদীনাকেও আমাদের নিকট সেরূপ বা তার চেয়েও বেশী প্রিয় করে দাও। এখানকার আবহাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল করে দাও।" এখানকার মাপ ওজনের মধ্যে বরকত দাও এবং জ্বর ব্যাধিকে এখান থেকে দূর কর।[২]

হযরত আয়েশা একদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া অন্যান্য মুহাজেরীনদের জন্যও মদীনার আবহাওয়া অনুকূল হয়নি। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর দো'আর ফল হল এই যে, তখন থেকে মদীনা আবহাওয়ার দিক দিয়ে সমগ্র হিজাজের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত হয়।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

যে সমস্ত মুহাজিরীন একমাত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের মাতৃভূমি ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছিলেন, মদীনায় তাঁরা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় হাযির হন। থাকার মত তাদের কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। মদীনাবাসী যারা পরবর্তী সময়ে আনসার নামে খ্যাত হল, এ সমস্ত বিদেশী মেহমানদেরকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করে। তাদের এই আচরণ ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আঁ-হযরত (সা) মদীনা পৌঁছে মুহাজেরীন ও আনসার উভয়ের মধ্যে পরস্পর

---

১. তাবকাতে ইবনে সায়াদ, তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।

২. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজনকে অন্যজনের ভাই বানিয়ে দেন। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল সহোদর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চাইতেও গভীর। আনসাররা তাদের মুহাজির ভাইদের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সমস্ত মাল আসবাব হিসাব করার পর বলেন, এখান থেকে এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক তোমার। এমন কি যার দু'জন স্ত্রী ছিল তিনি বলেন, আমি এদের একজনকে তালাক দিচ্ছি, ইদ্দতের পর তুমি তাকে বিয়ে করে নেবে। মুহাজির ভাইরা তখন উত্তরে বলেন, "আপনার মাল আসবাব ও স্ত্রী আপনার জন্যই থাক। এগুলোতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।" মোটকথা এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে মুহাজিরদের সেখানে বসবাসের বিষয়টি অতি সহজে মীমাংসা হয়ে গেল।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার সময় আঁ-হযরত (সা) উভয় পক্ষের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি হযরত ওমর ফারূক (রা)-কে বনু সালেম গোত্রের সর্দার ওতবান ইবনে মালিকের ভাই বানিয়ে দেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে হযরত খারিজা ইবনে যায়েদ আনসারী (রা)-এর। তিনি মদীনার নিকটেই মুখ নামক স্থানে বসবাস করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।[১]

মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে সকল মুসলমান সেখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও দলীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে আঁ-হযরত (সা) যে স্থানটি নির্ধারণ করেন তার মালিক ছিলেন সাহল ও সুহাইল নামক দু'জন ইয়াতীম বালক। এই বালকদ্বয় সাদ বিন জাবরাহ-এর পৃষ্ঠ-পোষকতায় ছিল। আঁ-হযরত (সা) জমির ঐ অংশের ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করেন। তারা উভয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই জমিটুকু আমরা আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করলাম। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) সে উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে উচিত মূল্য দিয়েই তা ক্রয় করা হল।[২] কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ঐ জমির মূল্য ছিল দশ দীনার। ঐ মূল্য আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর। তিনি যে শুধু মূল্য আদায় করে দিয়েছিলেন তাই নয় বরং ইহকাল পরকালের নেতা মহানবী (সা) যখন শ্রমিকের মত মসজিদ নির্মাণের কাজ করছিলেন এবং ইট উঠিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনিও তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে থাকেন।[৩]

---

১. ফতহুল বারীর ভূমিকা, পৃঃ ৩২১।
২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৫।
৩. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা)-এর বিদায় যাত্রা

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পবিত্র মক্কায়ই হুযূর (সা)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মদীনায় পৌঁছার পর হযরত আবূ বকর (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর কাছেই হযরত আয়েশা (রা) রুখসতির ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন হুযূর (সা) বললেন, "মোহর আদায় করার মত অর্থ আমার কাছে নেই।" হযরত আবূ বকর (রা) তখন মোহরের অর্থ হুযূর (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন।[১] এদিকে হযরত উম্মে রোমান হযরত আয়েশা (রা)-কে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে দুলহিন সাজিয়ে নবী (সা)-এর পবিত্র গৃহে প্রেরণ করেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।[২]

খিলাফতের পূর্বে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

মুসলমানদের মক্কার জীবন ছিল মুসীবত ও দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের উন্মুক্ত স্থানে ইবাদত করা দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই ছিল তখন কষ্টকর। তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করা হত। ঐ সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে ঈমানের দৃঢ়তায় ও আমলে (কার্যক্রমে) পরিপক্ক বানাতে চেয়েছিলেন। ঐ স্তরে পরিপূর্ণ আনুগত্য, ধৈর্য, আত্মসমর্পণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মত গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল বেশী। এ কারণেই কুরআন মজীদে মক্কায় অবতীর্ণ যেগুলো সূরা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ধৈর্য ও সালাতের সাথে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা এবং মুসীবতের সময় আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পৌঁছার পর সেখানে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার মুসলমানদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, নিজেদের ছড়িয়ে পড়া শক্তিকে সুসংগঠিত করতে হবে, প্রয়োজন বোধে অমুসলমানদের সাথে চুক্তি করতে হবে, জাতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা) সমগ্র ব্যাপারে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথী ছিলেন তাই এক্ষেত্রে তার বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন সঠিক মতামত, উত্তম ও ফলদায়ক কৌশল, দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানের পরিপক্কতা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

---

১. মুসতাদরিকে হাকিম ও ইসতিয়ার ইযালাতুলখিফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১।

২. বুখারী হযরত আয়েশা (রা)-এর পরিণয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

মদীনায় হিজরতের পর থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার সবগুলোতেই আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথী ছিলেন। যুদ্ধের মাঠে তিনি একজন বীর সেনানী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন উঁচু স্তরের পরামর্শদাতা, প্রতিকূল অবস্থায় পাথরের পাহাড়ের মত সুদৃঢ় এবং অনুকূল পরিবেশে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্ররূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। মিঃ ডব্লিউ, মন্টোগোমারী ওয়াট-এর মতে হযরত আবূ বকর (রা) এক দিকে উঁচু স্তরের আনুগত্য প্রদানকারী এবং অপরদিকে একজন উঁচু দরের নেতা ও সর্দার ছিলেন।[১]

বদরের যুদ্ধ

আঁ-হযরত (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত কুরাইশদের ক্রোধাগ্নি আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে যে, মদীনায় এমন একটি শক্তির অভ্যুদয় হতে চলেছে যা সমগ্র আরবের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বিস্তার করবে এবং কুরাইশদের কর্তৃত্বকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে। অতএব এই শক্তিকে প্রতিহত বা ধ্বংস করার জন্য যা কিছু করণীয়, তার সবকিছুই তারা করতে লাগলো। মদীনার যে সমস্ত লোক তাদের প্রভাবাধীন ছিল তাদেরকে নির্দেশ দিল, হুযূর (সা)-কে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত বসবাসকারী ছিল তাদের কাছে তারা প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে সচেষ্ট হলো। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করতেন। ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় ঐ সমস্ত সেনাদলকে বলা হত সারিয়াহ্।

কিন্তু কুরাইশরা সহজেই বুঝতে পারল যে, এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কোন ফল হবে না। তাই তারা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত করতে হলে সর্ব প্রথমে মূলধনের প্রয়োজন। এর জন্য সিদ্ধান্ত নিল যে, আবূ সুফিয়ান (হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতা যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের একটি বিরাট দল সিরিয়ায় প্রেরণ করা হবে। এবং এর দ্বারা যা আয় হবে তা দীনে হক বা ইসলামের মূলোৎপাটনের কাজে ব্যয় করা হবে। একদিকে যেমন মূলধন ও আসবাবপত্র সঞ্চয়ের চেষ্টা চললো অন্যদিকে তেমনি কুরাইশদের যুবক ও বীর যোদ্ধারা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

আবূ সুফিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্য করে যখন সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন তখন তার কাফেলাটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তাতে ছিল একহাজার উট এবং সেগুলোর উপর পঞ্চাশ হাজার দিনার বোঝাই। কাফেলাটি চল্লিশ বা ষাটজন লোকের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, নতুন সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১।

www.pathagar.com

যে কোন বিবেকসম্মত ব্যক্তি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, আবূ সুফিয়ানের ব্যবসার ঐ বিরাট লভ্যাংশ ছিল প্রকৃতপক্ষে গোলা বারুদের একটি বিরাট ভান্ডার যা শুধু ইসলাম ও ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ লোকদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়েছিল। অতএব ঐ সময় আঁ-হযরত (সা)-এর জন্য এটা শুধু বৈধ নয় বরং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল যে, ঐ আসবাবপত্র যাতে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।[১] সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে,

إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عير قريش (باب قصة غزوه بدر)

"আঁ-হযরত (সা) কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।" (অধ্যায়, বদর যুদ্ধ)

কুরাইশদের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিতই ছিল। তাই সাথে সাথে মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এদিকে আঁ-হযরত (সা) উৎসর্গীকৃত প্রাণ তিন শত তের শত জন সাহাবীকে নিয়ে ২য় হিজরীর ১২ই রমযান মদীনা হতে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রমযান বদর নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা তাঁবু স্থাপন করেন।

ইতিপূর্বেও কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা হয়েছে কিন্তু ন্যায় ও অন্যায় (হক ও বাতিল) এবং ইসলাম ও কুফরের এটাই ছিল সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ যার মধ্যে ছিল বিশ্ব ইতিহাসের একটি নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি। একদিকে হুযূর (সা) কুরাইশদের সংখ্যা, তাদের আসবাবপত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, অন্যদিকে লক্ষ্য রাখেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ঐ সমস্ত মুজাহিদদের প্রতি যাদের ঘোড়ার জিন বা গদি সংগ্রহের সামর্থ্য ছিল না এবং সংখ্যায়ও যারা ছিল শত্রুদের এক-তৃতীয়াংশ। তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমার নিকট যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর। হে আল্লাহ্! যদি মুসলমানদের এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে (দুনিয়ায়) তোমার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না।"

---

১. আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ একটি সরল বাস্তবতাকে মাওঃ শিবলী উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। তিনি সীরাতুন্নবী প্রথম খণ্ডে বদর যুদ্ধের উপর এক বিস্তারিত আলোচনায় সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের বিরোধিতা করে ঐ ঘটনার সমালোচনা করেছেন। বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় কি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে না? বরং অহরহ দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধরত উভয় দল পরস্পর পরস্পরের দূত ও আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রতিরোধ করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে, ব্যবসা কেন্দ্রে বোমা নিক্ষেপ করে সেগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে, মাল বোঝাই জাহাজ লুট করা হচ্ছে। হিজরতের পরও যখন কুরাইশগণ মুসলমানদের ক্ষতি করার অপচেষ্টা পরিত্যাগ না করে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল উপরোক্ত ব্যবসায়ী দলটি ছিল তারই পূর্বগামী। তখন আঁ-হযরত (সা)-এর এই মহোত্তম আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতির দৃষ্টিতে অন্যায় হয় কি করে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা ছিল হুযূর (সা)-এর রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা) হাত উঁচু করে এই দু'আ করছিলেন এমতাবস্থায় যে, অস্থিরতার কারণে বার বার তাঁর পবিত্র কাঁধ থেকে চাঁদর খসে পড়েছিলো। তখন আবূ বকর (রা)চাদর উঠিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর কাঁধের উপর রাখলেন এবং হুযূর (সা)-এর পিঠের উপর হাত[১] রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "হুযূর (সা) এখন থামুন, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই আপনার ওয়াদা পূরণ করবেন।" ঠিক তখনি ওহী নাযিল হল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান করা হল।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করেছিলে তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে।" (৮ : ৯)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকরের (রা) ঐ কথা বলার পরই হুযূর (সা) বলে উঠেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"অর্থাৎ, কাফিরদের দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পিছন ফিরে পলায়ন করবে" অতঃপর বাইরে চলে আসেন।

উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর (সা)-এর জন্য একটি ছাউনী তৈরি করে দেন। তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই মুসলিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকে। ঐ ছাউনীতে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে অবস্থান এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাগ্যে জুটেছিল।[২]

মসনদে বাযারে হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ দিন হযরত আবূ বকর (রা) কোষ থেকে তরবারি বের করে আঁ-হযরত (সা)-কে পাহারা দিচ্ছিলেন। যে কেহ হুযূর (সা)-এর দিকে অগ্রসর হত তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ فهو أشجع الناس অর্থাৎ, "আবূ বকর (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বীর।"

কুফর ও ইসলামের এই প্রথম যুদ্ধের মধ্যে ছিল উভয় পক্ষের ধৈর্য-সহিষ্ণুতার অগ্নি পরীক্ষা। কেননা উভয় দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, ভাই-ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমনকি পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

---

১. সহীহ মুসলিম এর 'কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার' হতে ঘটনাটি সংগৃহীত। বুখারী (র) প্রথমতঃ কিতাবুল জিহাদে-এর পর বদর যুদ্ধের অধ্যায়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এতে রয়েছে فأخذ أبو بكر بيده অর্থাৎ আবূ বকর (রা) আঁ হযরত (সা)-এর হাত ধরলেন।

২. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রহমান তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি তাই মক্কায়ই থেকে গিয়েছিলেন, বদর যুদ্ধে তিনিও কুরাইশ বাহিনীর একজন যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের মাঠে অবতরণ করে তিনি চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলেন এমন কে আছে, যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে? হযরত আবূ বকর (রা) স্বয়ং তরবারি নিয়ে তার মুকাবিলায় রওয়ানা হলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) এটা পছন্দ করলেন না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "متعني بنفسك" অর্থ্যাৎ তুমি নিজে আমার সেবায় নিয়োজিত থাক।[১] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ১/ نفجعنا بنفسك (অর্থ উভয়ের বাক্যেরই এক)।

যুদ্ধ শেষে গনীমতের মাল ছাড়াও মক্কার কাফিরদের সত্তর জন গ্রেফতার হল যাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রা) এবং আঁ-হযরত (সা)-এর জামাতা (হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামী) আবুল আস (রা) ছিলেন। আঁ-হযরত (সা) বন্দীদের সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। হযরত ওমর (রা) বললেন, গ্রেফতারকৃতদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, এরা সবাই আপনার আত্মীয়-স্বজন, এদের উপর করুণা করা যেতে পারে এবং ফিদইয়ার (বন্দী উদ্ধার মূল্য) বিনিময়েই এদেরকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। আঁ-হযরত (সা) আবূ বকরের রায় পছন্দ করেন এবং ফিদইয়ার বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া হয়।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধারণ ইতিহাসে এবং কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতানুযায়ী আঁ-হযরত (সা) কর্তৃক বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে ফিদইয়া নিয়ে মুক্তি দেয়া এবং তাদেরকে হত্যা না করা আল্লাহ্ তায়ালা পছন্দ করেন নি। তাই উপরোক্ত ঘটনার নিন্দায় নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন।

لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ — (أنفال)

"যদি পূর্ব হতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে এটা লিপিবদ্ধ না হত তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ এর জন্য তোমাদের উপর কঠিন আযাব হত। (সুরা আনফাল)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে উপরোক্ত আয়াতটি নিন্দার প্রমাণ বহন করে। তবে নিন্দার প্রধান কারণ বন্দীদের হত্যা না করা এবং ফিদইয়া নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া

---

১. উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫। এখানে হুযূরের বাক বিন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আঁ-হযরত (সা)-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবূ বকর (রা)কে তার পুত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তখন অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। তাই এই সম্ভাবনা ছিল যে, হুযুর যদি তাকে সরলভাবে বাঁধা প্রদান করতেন এবং বলতেন, তুমি এখানেই থাক তাহলে হয়ত তার উপর এত প্রতিক্রিয়া হত না অথবা হলেও তিনি মনে ব্যথা পেতেন। তাই হুযূর (সা) এমন একটি কথা বললেন, যা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ হুযূর (সা)-এর নিকট অবস্থান করে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। متعني بنفسك এর অর্থ হল তুমি নিজে আমার সেবার জন্য এখানে থাক।

২. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়—বদর যুদ্ধে ফিরিশতাদের সাহায্য এবং গণীমতের বৈধতা।

www.pathagar.com

নয় বরং এর প্রধান কারণ ছিল গনীমতের মাল সম্পর্কে কোন আহ্কাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই গনীমতের মাল হস্তগত করার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া। সুতরাং ইমাম মুসলিম (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর যে রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন এতে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত বাক্য রয়েছে।

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ إِلٰى قَوْلِهِ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ (باب الإمداد بالملائكة في بدر)

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ

এই আয়াত থেকে ¦ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا এই আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দিয়েছেন। (মুসলিম, বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের সাহায্য অধ্যায়)

ওহোদের[১] যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পরাজয় কুরাইশদেরকে আরো উত্তেজিত করে তুলে। তারা ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। তাদের কবিরা অনলবর্ষী কবিতা দ্বারা মক্কার আশেপাশের সমস্ত গোত্রের মধ্যে ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে। এদিকে কুরাইশ মহিলারাও বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের শোকগাথা বর্ণনা করে কুরাইশের প্রতিটি যুবককে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এমনভাবে উত্তেজিত করে তুলে যে, প্রত্যেকের মুখেই তখন الثار الثار 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ' উচ্চারিত হচ্ছিল। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের যে দলটি মক্কায় ফিরে এসেছিল তাদের বিরাট লভ্যাংশ বন্টিত হয়েও তা আমানত হিসেবে রেখে দেয়া হয়েছিল। মহিলাদেরও একটি বিরাট দল সেনাবাহিনীর সাথে যাওয়ায় অনুমিত হচ্ছিলো যে, এবার কুরাইশরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হয় তারা বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, নয়ত যুদ্ধ করতে করতে মারা যাবে। হযরত আব্বাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেও গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। তিনি সেখানে থেকে একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে হুযূর (সা)-কে কুরাইশদের ঐ প্রস্তুতির খবর দেন। আঁ-হযরত (সা) ঐ খবরের সত্যতা ও বিস্তারিত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে আনাস ও মুনিসকে মক্কায় প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনার এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, তাদের ঘোড়াগুলো বিস্তীর্ণ চারণভূমি নস্যাৎ করে দিয়েছে। তারা ওহোদ পাহাড়ে তাঁবু স্থাপন করেছে। তখন আঁ-হযরত (সা) সাতশত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীকে সাথে নিয়ে ওহোদের দিকে রওয়ানা হন এবং ওহোদ পাহাড়ের পিছন দিকে মুসলিম বাহিনীকে মুকাবিলার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

---

১. পবিত্র মদীনার উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল (এক ফরসখ) দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

www.pathagar.com

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। হযরত হামযাহ্ (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ দাজানাহ্ (রা) এমন ভয়ানকভাবে যুদ্ধ শুরু করেন যে, তারা শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেন। কুরাইশদের এক একজন পতাকাবাহী এগিয়ে আসত এবং তাওহীদের সুধা পানকারী আল্লাহ্ ভক্তদের আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। অবশেষে শত্রুসৈন্যরা পলায়ন করতে শুরু করে, মুসলিম বাহিনী এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গনীমতের মাল সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হয়। তখন কুরাইশদের একটি ক্ষুদ্র দল ওহোদ পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিল তারা সুযোগ বুঝে পিছন দিক থেকে এমন বীরবিক্রমে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে যে, যুদ্ধের চেহারাই পাল্টে যায়।

এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত। মুসলিম বাহিনীর প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধারা শিথিল হয়ে পড়েছিল। ফলে তাড়াহুড়ার মধ্যে এক মুসলমানদের তরবারির আঘাত অন্য মুসলমানদের উপর পতিত হচ্ছিলো। তখন শত্রুরা গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, বিশ্বনবী (সা) শাহাদত বরণ করেছেন। এটা শুনে ব্যাঘ্র সদৃশ বীর হযরত ওমর (রা) হতাশায় ভেংগে পড়লেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) তখন যুদ্ধের ময়দানে একপাশে কয়েকজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাহাবাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অন্যতম। কুরাইশ বাহিনী তীর নিক্ষেপ করছিল। আঁ-হযরত (সা) পবিত্র গর্দান উঁচু করে তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তখন হযরত তালহা (রা) বললেন, "আপনার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোন, আপনি গর্দান উঠাবেন না। কেননা শত্রু তীর নিক্ষেপ করছে। আমার বুকই তাদের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।"[১]

কিন্তু এ অবস্থায়ই হুযূর (সা) আহত হন। তখন হুযূর (সা)-কে পাহাড়ের উপর নিয়ে যান। তখন আবূ সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, "তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা) আছেন?" এর কোন উত্তর দেয়া হল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কি হযরত আবূ বকর আছেন?" এরও কোন উত্তর দেয়া হল না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কি হযরত ওমর (রা) আছেন"?[২] এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশরাও আঁ-হযরত (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা)-কেই মুসলমানদের নেতা জ্ঞান করত।

মুসলমানরা যখন অবগত হল যে, হুযূর (সা) জীবিত আছেন তখন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা তাদের ছড়িয়ে পড়া শক্তিকে একত্রিত করে অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে শুরু করে। ফলে কুরাইশরা পরাভূত হয় এবং যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। আঁ-হযরত তখন বলে উঠেন, কে আছে যে "তাদের পশ্চাদ্ধাবন

---

১. সহীহ বুখারী, গাযওয়ায়ে ওহোদ অধ্যায়।
২. সহীহ বুখারী, গাযওয়ায়ে ওহোদ অধ্যায়।

www.pathagar.com

করবে?" সত্তর জন সাহাবী তখন তাদের নাম পেশ করেন। ইমাম বুখারী (রা) এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত যুবাইর (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[১]

স্মরণ রাখা উচিত যে, আঁ-হযরত (সা)-এর সময়ে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছিল ইতিহাস- বিদদের পরিভাষায় সেগুলো দু'প্রকার। একটির নাম গাযওয়াহ্ এবং অন্যটির নাম সারিয়া। আঁ-হযরত (সা) যে যুদ্ধে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন সেটি হচ্ছে গাযওয়াহ্। সারিয়া শাব্দিক অর্থ টুলী বা দল, হুযূর (সা) স্বয়ং যে যুদ্ধে অংশ করেন নি (বরং দল প্রেরণ করেছেন) সেটি সারিয়া।

হযরত আবূ বকর (রা) যেহেতু হুযূর (সা)-এর অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন তাই সাধারণতঃ তাঁকে সারিয়ায় প্রেরণ করা হত না। তিনি পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে মদীনায় আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে অবস্থান করতেন। হযরত হুযাইফা (রা)-হতে বর্ণিত আছে যে, একদা আঁ-হযরত (সা) বলেন, "আমার ইচ্ছা হয় বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন অঞ্চলে ফরয ও সুন্নতের তালীম ও শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের মধ্যে হতে কিছু লোক প্রেরণ করি। যেমন হযরত ঈসা (আ) তাঁর সহচরদেরকে প্রেরণ করতেন।" তখন একজন আরয করলেন, আপনি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে কেন প্রেরণ করেন না? হুযূর (সা) বললেন, "আমি সর্বদা এ দু'জনের সহযোগিতা কামনা করি। এরা দু'জন দীনের কান এবং চক্ষুস্বরূপ।[২]

খন্দকের যুদ্ধ

বনু নযীর নামক মদীনার একটি ইয়াহূদী গোত্র তাদের অসদাচরণের কারণে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে খায়বারে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের দলপতিরা কুরাইশ, বনু গাত্ফান, বনু সালীম, বনু আসাদ প্রভৃতি গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। শেষ পর্যন্ত কুরাইশ এবং ঐ সমস্ত গোত্রের সম্মিলিত দশ হাজার সাহসী বীর যোদ্ধার একটি বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হয়। আঁ-হযরত (সা) তিন হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পরিখা খনন করেন এবং দুর্গ তৈরি করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ৫ম হিজরীর জিলক্বাদ-মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধেও মুসলিম বাহিনীর একটি উপদলের কামান এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র আবূ বকর (রা)-এর দায়িত্বে ছিল। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (র) লিখেছেন, যে স্থানে হযরত আবূ বকর (রা) তার বাহিনী নিয়ে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন সেখানে "মসজিদে সিদ্দীক" নামে একটি মসজিদ রয়েছে যা উক্ত ঘটনা এখনও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪।
২. মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪।
৩. ইযালাতুলখিফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩।

www.pathagar.com

বনী মুসতালিকের যুদ্ধ

এই সালেই মুস্তালিক যুদ্ধে বা গাযওয়াতুল মরীসী[১] সংঘটিত হয়েছিল। বনু মুস্তালিকের সর্দার হারিস বিন জাবার আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রথমে তার গোত্রের লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে। যে সমস্ত লোক তাদের সাথে আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল তাদেরকেও একত্রিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত একটি বাহিনী গড়ে উঠে। যখন এই অবস্থা সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা) অবগত হন তখন বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তিনি বারীদা বিন হাসিব আসলামী (রা)-কে প্রেরণ করেন। বারীদা (রা) স্বয়ং হারিসের সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। সে অনুযায়ী আঁ-হযরত (সা) একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। হযরত আবূ বকর (রা) এই যুদ্ধেও হুযূরের সাথী ছিলেন। মুহাজিরদের পতাকা তাঁর হাতেই ছিল। মরীসী নামক স্থানে যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে তীর নিক্ষেপ চলতে থাকে। অবশেষে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশে সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে মুসলমানরা বীর বিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[২]

ঐ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে হাদীসে ইফ্ক (حَدِيْثِ إِفْك) নামে খ্যাত। এখানে তা বর্ণনা করার সুযোগ নেই। সে ঘটনার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হযরত আয়েশাকে উপলক্ষ করে একটি অপবাদ ছড়ানোর কারণে কুরআনের আয়াত ¦

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُم الآية

(তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক যারা অপবাদ ছড়িয়ে থাকে) নাযিল হয় এবং হযরত আয়েশাকে নির্দোষ ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়।

হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে মিস্তাহ্ বিন আসাসাহ ছিল অন্যতম। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে আর্থিক সাহায্য দান করতেন কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি সাহায্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এটা পছন্দ হয়নি। তাই

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُم وَالسَّعَةِ

¦ এই আয়াত নাযিল করে হযরত আবূ বকর (রা)-কে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। হযরত আবূ বকর (রা) খুবই লজ্জিত হন এবং পুনরায় মিস্তাহ্কে আর্থিক সাহায্য প্রদান শুরু করেন।

---

১. মাসউদী ও তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী মারীসী কোন পুকুর বা কূপের নাম ছিল। তার ধারে কাছে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যে যুদ্ধকে গাযওয়াতুল মারীসী বলা হয়।

২. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২।

www.pathagar.com

তাইয়াম্মুমের আয়াত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হাদীসে ইফ্ক-এর মধ্যে যেভাবে হযরত আয়েশা (র)-এর হার হারিয়ে যাওয়া এবং খোঁজ করার ঘটনা রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে এই সাথে আরো একটি ঘটনা। ইমাম বুখারী (র) এই ঘটনাকে প্রথমে কিতাবুত তাইয়াম্মুমে অতঃপর باب مناقب المهاجرين وفضلهم অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে এক সফরে গিয়েছিলাম। যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) অথবা জাতুল জাইশ্ (একটি স্থানের নাম) নামক স্থানে পৌঁছি তখন আমার গলার হার হারিয়ে যায়। এটা খোঁজ করার জন্য রাসূল (সা) তাঁবু স্থাপন করেন। হুযূর (সা)-এর সাথে যে সমস্ত লোক ছিলেন তাঁরাও সেখানে থেমে যান। সেখানে কোথাও পানি ছিল না। আমাদের দলের কারো কাছেও পানি ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের কাছে আসেন। এ সময় রাসূল (সা) তাঁর পবিত্র মাথা আমার রানের উপর রেখে শয়ন করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এসেই আমাকে বললেন, তুমি রাসূল (সা) এবং লোকদেরকে এমন এক স্থানে থামিয়ে দিয়েছ যেখানে কোন পানি নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'হযরত আবূ বকর (রা) এমনি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মুখে যা আসছিলো তাই তিনি বলছিলেন। সেই সাথে হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা মারছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা)-এর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি নড়াচড়া না করে একদম চুপ হয়ে বসে ছিলাম। অবশেষে ভোর বেলায় রাসূল (সা) ঘুম থেকে জাগ্রত হন। কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। সেদিন তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয় এবং সকলে তাইয়াম্মুম করে (সালাত আদায় করেন)।' এ সময় উসাইদ বিন হুজাইর বলেন, "হে আবূ বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ! এটা তোমাদের প্রথম বরকত নয়।' হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শেষ পর্যন্ত যখন আমার উট শোয়া থেকে উঠে রওয়ানা হলো তখন দেখা গেল হারখানা তার নিচেই পড়েছিল"।[১]

হাফিয ইবনে হাজার ইবনে সা'আদ, ইবনে হাবান এবং ইবনে আবদুল বার হতে বর্ণনা করেন যে, এই ঘটনা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় ঘটে। এটা হল মুহাদ্দিসীনের মতামত।[২] ইয়াকুব হামুবীও জাতুল জাইশ এর বর্ণনায় লিখেছেন যে, এটা সেই স্থান যেখানে বনু মুসতালিক এর যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর গলার হার খোয়া গিয়েছিল এবং সেখানেই তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮ ও ৫১৮।
২. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, কিতাবুল তায়াম্মুম।
৩. মুজমাউল বুলদান ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫১৫।

www.pathagar.com

কিন্তু তাবারীর মধ্যে 'হাদীসে ইফ্‌ক'-এর যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তার কোথাও তাইয়াম্মুমের ঘটনা উল্লেখ নেই। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তাইয়াম্মুমের আয়াত মরীসীর যুদ্ধে নাযিল হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশা (রা)-এর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা দু'বার ঘটেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল। তাইয়াম্মুমের ঘটনায় হযরত উসাইদ বিন হুজাইর (রা) উক্তিই এর প্রমাণ। তিনি বলেছেন, "হে আবূ বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ; এটা তোমাদের প্রথম বরকত বা কল্যাণ নয় যে, তোমাদেরই কারণে কুরআনের কোন নির্দেশ নাযিল হয়েছে।"

এছাড়া হাফিয ইবনে কাইয়েম মা'জামে তাব্‌রানীর উদ্ধৃতি দিয়ে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা)-এর যে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন তার দ্বারাও বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়। রিওয়ায়েতটি হলো ঃ

عن عائشة (رض) قالت ولما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قـــالوا فخرجت مع النبي ﷺ في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التاسه النـــاس و لقيت من أبي بكر ما شاء و قال يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة في التيمم ـــ[১]

"হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, প্রথমবার আমার হার সম্পর্কে যে ঘটনা ঘটেছিল, তাতে অপবাদকারীরা যা ইচ্ছা তাই রটিয়েছিল। আমার হার সম্পর্কে অন্য একটি ঘটনাও ঘটেছিল। আমি অন্য একটি যুদ্ধে আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গিনী ছিলাম। ঐ সফরেও আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। সেটা খোঁজ করার উদ্দেশ্যে কাফেলার সবাইকে থামতে হয় এবং সে কারণে আমাকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হতে হয়। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি প্রতিটি সফরে বিপদ হয়ে দাঁড়াও, দলের লোকের কারো কাছে পানি নেই। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ সফর তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল তা গাযওয়ায়ে বনু মুস্‌তালিক, যার মধ্যে ইফক-এর (অপবাদের) ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা থেকে পৃথক ঘটনা। সুতরাং আল্লামা ইবনে কাইয়েম মা'জামে তাবরানীর এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

و هذا ينـــزل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغـــزوة وهـــو الظاهر ولكن كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد و التماسه فالتلبس على بعضـــهم إحدى القصتين بالأخرى ـــ[২]

---

১. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩।
২. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,'হার'-এর যে ঘটনায় তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল তা ঐ গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের পরে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটাই সর্বজনবিদিত। যেহেতু ঐ যুদ্ধে হার হারিয়ে যাওয়া এবং তা খোঁজ করার কারণে ইফ্ক (অপবাদ)-এর ঘটনা ছড়িয়েছিল তাই কারো কারো নিকট উভয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ইবনে সা'দ ইবনে হাবান ও ইবনে আবদুল বার-এর উপরোল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করার পর হাফিয ইবনে হাজার লিখেছেন যে, "আমাদের কোন কোন প্রবীণ আলিম এটাকে সঠিক মনে করেন। তারা বলেন এই উভয় ঘটনা একই। মারীসী' কাদীদ এবং উপকূলের মধ্যে মক্কার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, আর ঐ ঘটনা খায়বার অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। কেননা এতে বায়দা বা জাতুল জাইশ-এর উল্লেখ রয়েছে। এই উভয় স্থান যেমন ¦ইমাম নববী নিশ্চিতভাবে লিখেছেন মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[১]

অবশ্য এই আলোচনার শেষ দিকে ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন তাঁর ঝোঁক একাধিক ঘটনার প্রতি ছিল বলে মনে হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত সব সত্ত্বেও ইবনে হাজার লিখেছেন وما تقدم من اتحاد القصة فهو أظـــهر "এবং ঘটনা এক হওয়া সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা হয়েছে তা অধিকতর স্পষ্ট।"

হুদাইবিয়ার[২] সন্ধি

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে ঘটে। ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কুরআন মজীদে এটাকে ফাত্হে মুবীন (فتح مـبين) বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কিভাবে সম্ভব যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আঁ-হযরত (সা) চৌদ্দশত, অন্য একটি বর্ণনা মতে পনেরশত সাহাবা (রা) সাথে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। মদীনাবাসীদের মীকাত অর্থাৎ ইহ্রাম বাঁধার স্থান, জুল্হুলায়ফায় পৌঁছে হুযূর (সা) ইহ্রাম বাঁধেন। খাযায়ী গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোপন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি আগেই প্রেরণ করেছিলেন। গাদীরুল আসতাতে (যা হুদাইবিয়ার সম্মুখে ছিল) পৌঁছতেই গুপ্তচর-এর সাথে হুযূরের সাক্ষাৎ হয়। তিনি হুযূর (সা)-কে বললেন, কুরাইশগণ আপনাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত করতে বাঁধা দেবে। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায়

১. ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫।
২. পবিত্র মক্কা হতে বিশ কিলোমিটার দূরে হুদাইবিয়া নামে একটি কূপ আছে। সেখানে সন্ধির ঘটনাটি ঘটেছিল, সেটাকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়।

www.pathagar.com

কি করা যায় আঁ-হযরত (সা) সে সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল আপনি তো বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। আপনার কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা নেই এবং কারো সাথে যুদ্ধ করারও ইচ্ছা নেই। অতএব আপনি বায়তুল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হোন। যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদেরকে বাঁধা দেয় অথবা আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আঁ-হযরত এটা শুনে বললেন, তা হলে আল্লাহ্র নামে এগিয়ে চলো।[১]

হুযূর (সা) রওয়ানা হলেন এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি বুদাইল বিন ওয়ারাকা আল্ খাযায়ীর মাধ্যমে কুরাইশদের বলে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি, শুধু ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যেই এসেছি। অতএব এটা উত্তম যে, তোমরা আমাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ কর। নতুবা ঐ আল্লাহ্র শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার গর্দান দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়। (অর্থাৎ দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে যুদ্ধ করে যাবো)।

ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ ও একের পর এক পরাজয়ের কারণে কুরাইশদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। কিছুটা চিন্তা ভাবনার পর তারা হুযূরের প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত চতুর উরওয়াহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-কে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করল। আঁ-হযরত (সা) উরওয়াহ্-এর নিকট তাই বললেন যা তিনি ইতিপূর্বে বুদাইল-এর মাধ্যমে বলেছিলেন। উরওয়াহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, "হে মুহাম্মদ (সা) যদি আপনি যুদ্ধ করে কুরাইশদেরকে শেষ বা ধ্বংস করে দেন তা হলে আপনি কি আপনার পূর্বে এমন কোন ব্যক্তির নাম শুনেছেন যিনি স্বয়ং তার জাতির শক্তি সামর্থ্যকে পরাভূত করে দিয়েছেন। যদি যুদ্ধের ফলাফল অন্যরূপ দাঁড়ায় (অর্থাৎ আপনি পরাজিত হয়ে যান) তা হলে আমি আপনার সাথে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করছি যিনি আপনাকে একা ছেড়ে পলায়ন করতে পারেন।"

হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন কিন্তু উরওয়াহ্র মুখে এই কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং বলেন, বদমাশ! আমরা কি রাসূল (সা)-কে ছেড়ে পলায়ন করবো? উরওয়াহ্ এই কটাক্ষ দৃষ্টি লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?" লোকজন বললো, 'হযরত আবূ বকর (রা)"। তখন উরওয়াহ্ হযরত আবূ বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, যদি আমার প্রতি তোমাদের সহানুভূতি ও করুণা না হত যার প্রতিদান আমি এখনও পরিশোধ করতে পারিনি তাহলে আমি এর সমুচিত জবাব দিতাম।[২]

---

১. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, গাযওয়াতুল হুদাইবিয়া অধ্যায়।
২. সহীহ বুখারী, যুদ্ধরতদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির শর্ত অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮।

www.pathagar.com

অবশেষে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা হল এবং যখন চুক্তি পত্র লিখা শুরু হল তখন এর কোন কোন দফা যা কুরাইশদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়ছিল মুসলামানদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ঠেকলো। সেদিন হযরত ফারূক আযম (রা) ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা হুযূর (সা) -কে বলে বসেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বলেন, কুরাইশদের নিকট এরূপ নত হয়ে কিভাবে সন্ধি হতে পারে? কিন্তু হযরত সিদ্দীক (রা) উত্তরে বললেন, হুযূর (সা) যা কিছু করেন তা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশেই করেন। নিশ্চয়ই এতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ কখনো তাঁকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর আয়াতে ফতহ (آية فتح) নাযিল হয়। তাতে হযরত ওমর (রা) শান্তি ও আরাম বোধ করেন।[১]

খায়বারের যুদ্ধ

ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে অথবা সপ্তম হিজরীর প্রারম্ভে খায়বারের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খায়বার ছিল শক্তিশালী দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত আরবের ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। তার মধ্যে একটি দুর্গের নাম ছিল কামুস। এটা আরবের প্রখ্যাত বীর মারহাবের আয়ত্তাধীন। আঁ-হযরত (সা) বিভিন্ন দুর্গ জয় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল নিয়োগ করেন। প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন করে নেতা নির্ধারণ করা হয়। কামুস দুর্গের দায়িত্ব হযরত আবূ বকর (রা)-কে দেয়া হয়। কিন্তু এটা বিজয় করা শেরে-খোদা হযরত আলী মুর্তাজা (রা-এর ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল। তাই তো প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা) অতঃপর হযরত ওমর (রা) প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু সফল হতে পারেন নি।[২]

মক্কা বিজয়

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এটা ইসালামের ইতিহাসে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হুদায়বিয়া সন্ধির বিরোধিতা করার পর একদা আবূ সুফিয়ান যখন কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় আগমন করেন এবং চুক্তি নবায়নের জন্য আবেদন করেন তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা)-কে তার সুপারিশকারী হতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আবূ বকর স্পষ্টভাবে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। এরপর আবূ সুফিয়ান হযরত ওমর (রা)-এর নিকট যান। যাহোক শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন হয় নি এবং আঁ-হযরত (সা) দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীকে সাথে নিয়ে

---

১. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৬, অধ্যায় হুদায়বিয়ার সন্ধি।
২. ইজালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

কুরাইশদের উপর চড়াও হন এবং মক্কা বিজয় করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সা) মক্কায় প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ করেন যে মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে ঘোড়ার মুখের উপর চাপড় মারছে। তখন হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন "আবূ বকর (রা) তোমার কি হাস্‌সান ইবনে সাবিতের ঐ কবিতা স্মরণ আছে যাতে তিনি এই দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন?" হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঐ কবিতা স্মরণ ছিল। সাথে সাথে তিনি তা আবৃত্তি করে শুনালেন।[১]

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। আরবের প্রসিদ্ধ বাজার যুল মাজায-এর সন্নিকটে অবস্থিত। মুসলমানদের মক্কা বিজয় এবং কুরাইশদের পরাজয়ের কারণে অন্যান্য অমুসলিম গোত্রের শক্তিও দ্রুত হ্রাস পেতে লাগলো এবং তারা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। কিন্তু হাওয়াযিন ও সাকীফ এই দু'গোত্র যুদ্ধ বিদ্যায় এবং অস্ত্র চালানায় ছিল খুব পারদর্শী তাই তারা ইসলামের শত্রুতায় আরো কঠোর হয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের উপর পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। আঁ-হযরত (সা) এ ব্যাপারে অবগত হলেন এবং গোয়েন্দা প্রেরণ করে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পর সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পরপরই বার হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী হুনাইনের দিকে অগ্রসর হল। যুদ্ধ আরম্ভ হল, প্রথম সংঘর্ষেই মুসলমানরা জয়ী হল। কিন্তু তারা যখন গনীমতের মাল একত্র করার কাজে আত্মনিয়োগ করে ঠিক তখন হাওয়াযিন গোত্রের অভিজ্ঞ তীর নিক্ষেপকারীরা মুসলিম বাহিনীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে।[২] ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে যে কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবা অবস্থান করছিলেন, আল্লামা তাবারীর মতে, হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন তাদের অন্যতম।[৩]

অবশেষে আঁ-হযরত (সা)-এর আহ্বানে বিক্ষিপ্ত আনসার ও মুহাজিররা একত্রিত হলেন এবং সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপর এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন যে, তারা বিশৃংখল হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পুনরায় 'গণীমতের মাল একত্র করার কাজ শুরু হল। আঁ-হযরত (সা) ঘোষণা করলেন, "من قتل قتيلا فله سلبه" অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুদ্ধে কাউকে হত্যা করবে, নিহত

---

১. ইজালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬।
২. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭।
৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭।

www.pathagar.com

ব্যক্তির আসবাবপত্র (অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য যুদ্ধের সময় তার যা সাথে ছিল) পাবে। হযরত আবূ কাতাদা (রা) একজন শক্তিশালী মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাক্ষি পাওয়া গেল না। তিনি প্রকৃত ঘটনা আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা)-কে বললেন, "হাঁ, তিনি (কাতাদা) সত্য বলেছেন যে ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করেছেন, তার পরিত্যক্ত মাল আমার কাছেই আছে। আপনি ঐ সমস্ত মাল আমাকেই প্রদান করুন। হযরত আবূ বকর (রা) নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এটা শুনে বললেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ এটা কখনো হতে পারে না। আঁ-হযরত (সা) কুরাইশদের একটি কাপুরুষকে (এরূপ কাপরুষ যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি) নিহত ব্যক্তির আসবাবপত্র প্রদান করবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার এমন একজন বাঘকে (বীর) প্রদান করবেন না যিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছেন, এটা কখনো হতে পারে না। তখন আঁ-হযরত (সা) বললেন, "হযরত আবূ বকর (রা) সত্য কথাই বলেছেন" সুতারং ঐ আসবাবপত্র হযরত আবূ কাতাদা (রা)-কেই প্রদান করা হয়।[১]

তায়েফের যুদ্ধ

হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত শত্রুবাহিনী তায়েফের এক নিরাপদ স্থানে দুর্গ স্থাপন করে অবস্থান গ্রহণ করে। আঁ-হযরত (সা) হুনাইনের গনীমতের মাল ইত্যাদি জি'রান নামক স্থানে রেখে তায়েফের দিকে রওয়ানা হলেন এবং দুর্গ অবরোধ করলেন। কিন্তু দুর্গবাসীরা প্রচুর অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তারা দুর্গের ভিতর থেকে প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে যে, মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। অতএব দুর্গ জয় করা সম্ভব হল না। হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, কোন এক ব্যক্তি আমাকে এক পেয়ালা হালুয়া উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করলেন কিন্তু একটি মোরগ এতে ঠোকর মারল। ফলে পেয়ালার মধ্যে যা কিছু ছিল সবই পড়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, এই স্বপ্ন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই অবরোধের দ্বারা আপনার বিজয় হবে না। হুযূর (সা) বললেনঃ হাঁ আমিও এরূপ মনে করি।[২] সুতরং অবরোধ তুলে নেয়া হল।

এই অবরোধে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)এরূপ আহত হন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি এ কারণেই শাহাদাত বরণ করেন।

---

১. সহীহ বুখারী, অধ্যায় হুনাইনের যুদ্ধ।

২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫, কায়রো হতে মুদ্রিত ১৯৩৯ ইং—এই গ্রন্থে ভুলবশতঃ হুযুর (সা)-এর উত্তর وانـــا لا أرى ذلـــك ছাপা হয়েছে। অর্থ "আমি এরূপ মনে করি না।" প্রকৃত পক্ষে لا أرى এটা নয় বরং لأرى হবে। পূর্বাপর বাক্যের দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) ও এটা এভাবে পড়েছেন। দ্রষ্টব্য ইযালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

www.pathagar.com

মূতার যুদ্ধ

মূতা বালকার নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি স্থানের নাম। এখানকার তৈরি তরবারি প্রসিদ্ধ। বালকার সর্দার শুরাহবিল ইবনে আমর ছিলেন একজন আরব। তবে ধর্মীয় দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খৃস্টান এবং রোম সম্রাটের (হেরাকেল) অধীনস্থ। তিনি হুযূর (সা)-এর একজন পত্র বাহক হারিস ইবনে উমাইরকে হত্যা করেছিলেন। আঁ-হযরত (সা)-এর কিসাস (রক্তপণ) গ্রহণের জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাতে নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ ও আনসাররা অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু হুযূর (সা) ঐ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এর সমালোচনা করেন। আঁ-হযরত (সা) এটা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। নেতৃস্থানীয় মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি শুধু যে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তা নয়, এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ জীবনে তার আচরণের উপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম কাজ হিসেবে হযরত যায়েদ (রা)-এর পুত্র হযরত উসামা (রা)-কে যিনি কম বয়স্ক ও গোলাম পুত্র ছিলেন; সেনাপতি হিসেবে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামী সাম্যের এটিই একটি আশ্চর্য নিদর্শন যে, হযরত সালমা ইবনে আকওয়াহ্ (রা) একদিন বলেছিলেন, আমি হুযূর (সা)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ ছাড়াও আরো নয়টি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ গুলোর মধ্যে কখনো আমাদের বাহিনীর সেনাপতি হতেন আবূ বকর (রা) আবার কখনো হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা)।[১] এই মুতার যুদ্ধও ৮ম হিজরীত সংঘটিত হয়।

জাতুস্ সালাসিল-এর যুদ্ধ

জাতে ইত্লাহ সিরিয়ার একটি অঞ্চলের নাম যেখানে কুযাআ' গোত্রের লোকজন বসবাস করত। তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য আঁ-হযরত (সা) আমর ইবনে কা'ব গাফফারী (রা)-এর নেতৃত্বে পনের জনের একটি দল প্রেরণ করেন। কিন্তু কুযাআ'রা এই দলের সবাইকে হত্যা করে। একমাত্র আমর ইবনে কা'ব (রা) নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে। হুযূর (সা) এ সমস্ত লোকদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে ৮ম হিজরীর জামাদিউল আখির মাসে হযরত আমর বিন আস (রা)-এর নেতৃত্বে তিনশত সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, তিনশত যোদ্ধা প্রয়োজনের তুলনায় কম তখন আঁ-হযরত (সা) দু'শত মুহাজির ও আনসারের আরো একটি দল হযরত আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এই দলে হযরত আবূ বকর (রা) ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২]

---

১. ইসাবা, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।
২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৫।

www.pathagar.com

তাবুকের যুদ্ধ

তাবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এমন কি হুযূর (সা)-এর প্রিয় গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) হযরত জাফর তাইয়্যার (রা) (যিনি হযরত আলী (রা)-এর সহোদর ভাই এবং হুযূর (সা)-এর প্রিয় পাত্র ছিলেন) এবং প্রসিদ্ধ আনসার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা) এই যুদ্ধেই একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। এ কারণে যখন মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে তখন সমগ্র মদীনা একটি মাতম ও বিলাপকেন্দ্রে পরিণত হয়। এতে আরব ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় যে সমস্ত আরব গোত্র বসবাস করছিলো এবং যে সমস্ত খৃস্টান রোম সম্রাটের শাসনাধীন ছিল তাদের সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। রোম সম্রাটও এই সুযোগে সকলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। হুযূর (সা) বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর একটি প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে নবম হিজরীর রজব মাসে একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে চৌদ্দ মন্‌যিল দূরে, মদীনা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান তাবুকে গিয়ে পৌছেন

নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সাথে হযরত আবূ বকর (রা) ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এইজন্য যুদ্ধে হুযূর (সা) সাহাবা কেরামদেরকে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান। সে আহ্বানের উত্তরে হযরত ওসমান গনী (রা) এরূপ উদারতা প্রদর্শন করেন যে, দানের ক্ষেত্রে তিনি সকলের অগ্রগামী হন।[১] কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) দীনের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা অর্জন করেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সা) যখন চাঁদার জন্য আবেদন করেন তখন আমার নিকট প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। আমি এর অর্ধেক নিয়ে হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হই এবং মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি আমি কোনদিন হযরত আবূ বকর (রা)-কে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারি তবে আজই পারবো। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ঐ দিন যা কিছু তাঁর ঘরে ছিল সবই নিয়ে হুযূরের খেদমতে হাযির হন। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করেন আবূ বকর (রা) তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ? আবূ বকর (রা) আরয করলেন, "আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা-কে রেখে এসেছি।" হযরত ওমর (রা) বলেন, "তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি কখনো হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামি হতে পারব না।[২]

---

১. তারীখে ইবনে আসাকির-এর ২য় খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, উপরোক্ত বাহিনীর প্রস্তুতি ও আসবাবপত্র বাবদ যা ব্যয় হয়েছিল হযরত উসমান (রা) তার এক তৃতীয়াংশ দান করেন। এরূপর ঐ বাহিনীর এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যা পূরণ হয় নি। হুযুর (সা) আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এরূপর হযরত উসমান (রা) যা কিছু করুন না কেন তার কোন ক্ষতি হবে না। ما يضر عثمان ما فعل بعد

২. জামে তিরমিযী অধ্যায় মানাকিবে আবূ বকর সিদ্দীক (রা); আবূ দাউদ, কিতাবুয যাকাত।

www.pathagar.com

ইবনে আসাকির হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই চাঁদার পরিমাণ চার হাজার দিরহাম বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বর্ণনা করেন যে, উপরোক্ত যুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অংশ গ্রহণের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১। মুসলিম বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব এবং তার অধিনায়কত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল।

২। সফরের মধ্যে হুযূর (সা) কতিপয় লোকদের সাথে এক স্থানে রাত্রি যাপন করেন এবং মুসলিম বাহিনী থেকে কিছু দূরে চলে যান। এ অবস্থায় হুযূর (সা) ইরশাদ করেন, "মুসলিম বাহিনী যদি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর আনুগত্য করে তাহলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।[২] (মুসলিম শরীফ)

বনু ফাযারার যুদ্ধ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাধারণভাবে যে সব সারিয়া প্রেরণ করা হত হযরত আবূ বকর (রা) তাতে অংশ গ্রহণ করতেন না। তখন তিনি মদীনায় হুযূরের (সা) সাথে অবস্থান করতেন। কিন্তু এটা কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কোন কোন গুরুত্ব পূর্ণ সারিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বেও প্রেরণ করা হত। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু ফাযরাহ্ গোত্রের দিকে যে সারিয়া প্রেরণ করা হয়েছিল সাধরণভাবে ধারণা করা হয় যে, তা হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা)-এর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন ঐ সারিয়ার নেতা এবং তিনি বিজয়ী বেশেই মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। কয়েদীদের মধ্যে ফাযরাহ গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ঐ মহিলা উপঢৌকন স্বরূপ হযরত সালমাহ্ ইবনে আকওয়া (রা)-কে দান করেছিলেন। কিন্তু মদীনা পৌঁছার পর আঁ-হযরত (সা) এই মহিলাকে হযরত সালমাহ্ (রা)-এর কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান কয়েদী অবস্থান করছিলেন তাদের (فدية) ফিদইয়া হিসেবে তাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। বনু ফাযরাহ্ গোত্র অত্যন্ত বিদ্রোহী ছিল। তারা ইতিপূর্বে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) এবং তাঁর সাথীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যেই এই সারিয়া প্রেরিত হয়েছিল।[৩]

ঐ বছরই শা'বান মাসে বনু কিলাবকে দমনের উদ্দেশ্যে একটি সারিয়া প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তারও অধিনায়ক ছিলেন।[৪]

---

১. তারিখে ইবনে আসাকির, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।

২. ইজালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬,১৭।

৩. তবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮, সহীহ মুসলিম অধ্যায়, আততাফসীল ওয়া ফিদাইল মুসলেমীন বিল উসারা।

৪. জুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭।

www.pathagar.com

হজ্জের নেতৃত্ব

৮ম হিজরীতে মক্কা মুকাররামা বিজিত হয়। অতঃপর যেহেতু হুনাইন ও তায়েফের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাই সে বছর ইসলামী পদ্ধতিতে হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয় নি। কাবা শরীফকে কুফর ও শিরক-এর অন্ধকার ও অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা এবং সুন্নাতে ইবরাহীমী অনুযায়ী হজ্জের বিধান সময়মত আদায় করার কাজ সর্বপ্রথম ৯ম হিজরীতে সম্পাদন করা হয়। ঐ বছর জিলক্বাদ মাসের শেষ দিকে অথবা জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে আঁ-হযরত (সা) তিনশত মুসলামানের একটি দল হজ্জের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) ঐ দলের প্রধান ছিলেন। দলের সাথে বিশটি উট ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) নিজের কুরবানীর জন্য পাঁচটি উট নিয়েছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) মাত্র উরজ নামক স্থানে পৌছেছেন। এমন সময় পিছন দিক থেকে হুযূর (সা)-এর উটনী জাদ্‌আ-এর আওয়ায শুনতে পেলেন। এই আওয়াযের সাথে আবূ বকর (রা) পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই সংগে সংগে পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন, হযরত আলী (রা) উট-এর উপর চড়ে আসছেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) ভাবলেন, সম্ভবতঃ মদীনা হতে তার রওয়ানা হওয়ার কোন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে হুযূর (সা) হজ্জের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি অধিনায়ক বা নেতা হিসেবে আগমন করেছেন, না দূত হিসেবে?" হযরত আলী (রা) উত্তর দিলেন, "আমার সাথে সূরা বারায়াত-এর চল্লিশটি আয়াত আছে। হজ্জের সময় এগুলো ঘোষণা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।[১]

এবার সব লোক রওয়ানা হলো। হজ্জের সময় হযরত আবূ বকর (রা) তারবীয়াহ্ আরাফা ও নহরের (৮, ৯ ও ১০ই জিলহজ্জ) দিন হজ্জের আমীর হিসেবে খুতবা প্রদান করেন, এবং হযরত আলী (রা) সূরা বারায়াতের আয়াতসমূহের ঘোষণা করেন। ঘোষণাকারীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-ও ছিলেন। তিনি এত উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন যে, তার গলার স্বর বসে যেত। ঘোষণার বাক্যগুলো ছিল এই ;

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটিও রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) স্বয়ং জুল হালীফা নামক স্থান হতে ফিরে হুযূর (সা)-এর নিকট এসে আরয করেন, 'আমার সম্পর্কে কি কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর (সা) বললেন 'না'। কিন্তু যে বিষয় (অর্থাৎ সূরাহ বারায়াতের ঐ কয়টি আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত মুশরিকদের সাথে চুক্তি রয়েছে এবং যারা চুক্তি ভঙ্গ করে নি তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হল। অতঃপর তাদেরকে মক্কায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না। এর প্রচার প্রয়োজন তা আমি নিজেই করব অথবা আমার আপন কেউ তা পালন করবে। হে আবূ বকর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হেরা পর্বতের গুহায় আমার সাথী ছিলে এবং হাউজে কাওসার এর নিকট (কিয়ামতের দিন) তুমি আমার সাথী থাকবে। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কেন সন্তুষ্ট হব না? এর পর হযরত আবূ বকর (রা) হজ্জের আমীর হিসেবে এবং হযরত আলী (রা) ঘোষণাকারী হিসেবে রওয়ানা হলেন।

www.pathagar.com

এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে[১] পারবে না।

মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জ

দশম হিজরীর জিলকদ মাসে আঁ-হযরত (সা) হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে গমন করেন। এটাকেই বিদায় হজ্জ বলা হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-ও এই সফরে হুযূর (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। এই সফরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হুযূর (সা)-এর যাবতীয় আসবাবপত্র হযরত আবূ বকর (রা)-এর উটের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) এই সফর প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা সকলে হুযূর (সা)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, একটিমাত্র উটের উপর হুযূর (সা) আরোহণ করেছিলেন এবং আমাদের মালপত্র ঐ উটের উপর বোঝাই করা হয়েছিল। উরজ্ নামক স্থানে পৌঁছে হুযূর (সা) বাহন থেকে নেমে এক জায়গায় উপবেশন করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন হুযূর (সা)-এর বাহুর উপরে বসেছিলেন এবং আমি আমার পিতার কোলে বসেছিলাম। যে উটের উপর আসবাবপত্র বোঝাই করা হয়েছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর একজন চাকরের উপর তার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর যখন ঐ চাকর বাড়ী পৌঁছল তখন হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'উট কোথায়? সে উত্তরে বললো, 'গতরাতে হারিয়ে গিয়েছে।' হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, 'একটি মাত্র উট ছিল তাও তুমি হারিয়ে ফেললে? এই বলে তিনি চাকরকে প্রহার করতে শুরু করলেন। হুযূর (সা) তা দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'দেখ দেখ, এই মুহ্‌রিম (হজ্জের ইহ্‌রামকারী) কি করছে'।[২] হুযূর (সা) মুচকি হেসে শুধু এতটুকুই বললেন, কিন্তু আবূ বকর (রা)-কে প্রহার থেকে বিরত রাখলেন না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) চাকরকে কঠোরভাবে প্রহার করেন নি বরং এমনিতে দু'চারটি চড় লাগিয়েছিলেন মাত্র।

আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তেকাল

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

দায়িত্ব-সম্পন্ন করার ঘোষণা

বিদায় হজ্জের সময় হুযূর (সা) একটি গুরত্বপূর্ণ খুতবা বা ভাষণ প্রদান করেন। তাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল। হুযূর (সা) এই সমস্ত নীতিমালা কঠোরভাবে

---

১. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৬ এবং ৬৭১ সুনান নিসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪।

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্ভবত এটা ছিল তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ঘোষণা। ভাষণের শেষাংশে হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি?"সবাই এক বাক্যে বললেন, "নিশ্চয়ই", হুযূর (সা) বললেন, "হে আল্লাহ্ তুমি স্বাক্ষী থাক।[১] ঐ দিনই আরাফাতের প্রান্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(مائدة)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করলাম, এবং দীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।"

হযরত আবূ বকর (রা)-এর আশংকা

মদীনায় আগমন করার পর হুযূর (সা) এক ভাষণে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তার এক বান্দাকে পৃথিবীতে যা আছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তার কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেন। তখন সে বান্দা [হুযূর (সা)] مَا عند الله আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে অর্থাৎ তার নৈকট্য পছন্দ করে।

হযরত আবূ বকর (রা) এটা শুনে কাঁদতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম আশ্চর্য হলেন এই ভেবে যে, এতে কাঁদার মত কি কারণ আছে? কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন নবুয়তের ভেদের গুপ্ত ভাণ্ডার এবং রাসূল (সা)-এর রহস্যপূর্ণ কথার সাথে পরিচিত।[৩] তিনি ঐ কথা দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ঐ বান্দা স্বয়ং হুযূর (সা) এবং এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত (সা)-এর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

রোগের সূচনা

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর একদা হুযূর (সা) জান্নাতুল বাকী হতে ফিরে আসার পর মাথায় মারাত্মক ব্যথা অনুভব করেন। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, হযরত আয়েশা (রা)-ও ঘটনাক্রমে মাথা ব্যথায় চীৎকার করেছেন। ঐ অবস্থায়ও হুযূর (সা) প্রত্যেক উম্মুল মু'মেনীন-এর ঘরে পালাক্রমে যেতেন। অবশেষে হযরত মায়মুনাহ্ (রা)-এর পালার দিন ব্যথা তীব্রতর হয়ে উঠল। তখন উম্মুল মু'মেনীনগণ হুযূর (সা)-এর ইঙ্গিত পেয়ে হুযূর (সা)-কে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করার

---

১. আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ ঃ মানাক্বিবে আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবি কুহাফা।
২. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬২।
৩. বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।

www.pathagar.com

অনুমতি দেন। ঐ সময় হুযূর (সা) অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি (সা) একাকী চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন বলে হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আলী (রা) তাঁকে ধরে হযরত আয়েশার ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ

যতক্ষণ চলফেরার শক্তি ছিল হুযূর (সা) মসজিদে নববীতে গিয়েই নামাযের ইমামতি করতেন। যখন তিনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েন তখন হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন, আবূ বকর (রা)-কে নামাযে ইমামতি করতে বলো। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর অত্যন্ত নরম তাই যখন তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন তাঁর ক্রন্দনের তীব্রতায় তাঁর আওয়ায কেউ শুনতে পাবে না। আপনি বরং হযরত ওমর (রা)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিন। হযরত আয়েশার (রা) এ কথার উপর হযরত হাফসা (রা)-ও তার পিতা হযরত ওমর (রা)-এর পক্ষে সুপারিশ করেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) কারো কথা শুনলেন না। পুনরায় অনুরোধ করার সাথে সাথে তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-কেই নামাযে ইমামতি করতে বলো। তখন হযরত আয়েশা (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর প্রতি রাগান্বিত হয়ে বললেন, "তোমরা ঐ নারীজাতি, যারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে ধাঁধায় ফেলেছিলে"। তখন হযরত হাফসা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, "তোমার পক্ষ থেকে আমার প্রতি কেন এই মঙ্গল পৌছতে লাগলো"?[২]

উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা) তিন দিন পর্যন্ত নামাযে ইমামতি করেন।[৩] অবশেষে একদিন হুযূর (সা) একটু আরাম বোধ করেন এবং হুজরা হতে বের হয়ে নিজেই মসজিদে আগমন করেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) নামাযের ইমামতি শুরু করে দিয়েছিলেন। হুযূর (সা)-কে দেখে তিনি পিছনে চলে আসেন। তখন আঁ-হযরত (সা) ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করেন এবং স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসে নামায আদায় করেন। ঐ দিনই হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা) এবং অন্যান্য মুসল্লীদের ইমামতি করেন।

---

১. আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪।

২. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৩. এটা সহীহ বুখারীর বর্ণনা ইবনে সাআ'দ কুযায়েল ইবনে আমর হতে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা) জীবিতকালে হযরত আবূ বকর (রা) তিনবার ইমামতি করেন। এই রেওয়ায়েত বর্ণনার পর ইবনে সায়াদ বলেন, এই তিন নামাযের দ্বারা ঐ নামাযসমূহকে বুঝানো হয়েছে যাতে আঁ হযরত (সা) স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইকতেদা করেছিলেন। নতুবা তিনি সতের বার নামাযে ইমামতি করেছিলেন। ইবনে সায়াদ, তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।

www.pathagar.com

পূর্ব নিয়মানুযায়ী একদিন আবূ বকর (রা) নামাযে ইমামতি করার জন্য এগিয়ে এসেছেন এমনি সময় হুযূর (সা)-এর কামরার পর্দা উঠল এবং তাঁর পবিত্র চেহারা প্রকাশ পেল। হুযূর (সা) সেদিন অত্যধিক খুশী ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) পিছিয়ে আসতে চাইলেন কিন্তু হুযূর (সা) ইঙ্গিত করায় তিনিই ইমামতি করলেন। সেদিন হুযূর (সা) কামরার বাইরে যেতে চাইলেন, কিন্তু তা সম্ভব হল না। অতঃপর তিনি ভিতরে চলে গেলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন।[১] হাফিয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর লিখেছেন, এটা সর্বশেষ ফজরের নামায ছিল যাতে হযরত আবূ বকর (রা) ইমামতি করেছিলেন।[২]

আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তেকাল

সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতির অন্তর তাদের প্রিয় নবীর অসুস্থতার কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। হুযূর (সা)-এর পবিত্র চেহারার উজ্জ্বল দ্যুতি এক পলক প্রত্যক্ষ করে তাঁদের অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের কি এ খবর ছিল যে, এটাই সূর্যের সর্বশেষ দ্যুতি ও আলোকচ্ছটা বিকিরণ।[৩]

হযরত আবূ বকর (রা) নামায শেষে হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরায় গমন করেন। যেহেতু হুযূর (সা)-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু উন্নতির দিকে ছিল এবং ব্যথার তীব্রতাও একটু হ্রাস পাচ্ছিল তাই হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে সাখ্ নামক জায়গায় চলে যান, সেখানে তাঁর স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনতে খারিজা বাস করতেন। সেখানে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হুযূর (সা) ইহলোক ত্যাগ করে প্রকৃত বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) সাথে মিলিত হন। সালিম বিন উবাইদের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট মর্মান্তিক খবর পৌঁছে। তিনি সাথে সাথে ঘোড়ায় আরোহণ করে মদীনায় আগমন করেন। এখানে মসজিদে নববীতে লোকদের খুব ভীর ছিল। তিনি কারো সাথে কিছু না বলে সোজা সেই ঘরে প্রবেশ করেন যেখানে হুযূর (সা) একটি নকশা করা ইয়ামনী চাদর পরিহিত অবস্থায় চিরনিদ্রায় শায়িত ছিলেন। তাঁর পবিত্র দেহের নিকট দাঁড়িয়ে হযরত আবূ বকর (রা) পবিত্র মুখমন্ডল হতে চাদর উত্তোলন করে তাতে চুমা দিলেন এবং কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর হুযূর (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتين أبدا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها

---

১. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪।
২. আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪।
৩. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

"আমার পিতা-মাতা উভয় আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আপনি ইহকাল ও পরকালে পবিত্র থাকুন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে দুটি মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন তা অবশ্যই আপনার উপর আপাতত হয়েছে।

এরপর তিনি মসজিদে গমন করেন সেখানে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ও বিলাপ চলছিল। হযরত ওমর (রা) দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলছিলেন, রাসূল (সা)-এর ইন্তেকাল হয় নি। যেমন তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, সেদিন তার এ কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, হুযূর (সা)-এর ইন্তিকাল হতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বসুন' কিন্তু তিনি বসলেন না। পুনরায় তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, বুঝালেন কিন্তু তিনি তাতে আশ্বস্ত হলেন না। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "হে শপথ গ্রহণকারী! একটু থাম, তাড়াহুড়া কর না।' হযরত ওমর (রা) এবার বসে গেলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার হামদ বর্ণনার পর নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেন।

ألا من كان يعبد محمدا ﷺ فإن محمدا ﷺ قد مات ومن كان يعبد الله فـــإن الله حي لا يموت

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করত সে শুনে নিক যে, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে শুনে নিক নিশ্চয় আল্লাহ্ জীবিত আছেন, তার কোন মৃত্যু নেই।"

অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করেন।

(١) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُم مَيِّتُوْنَ (٢) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِـــنْ قَبْلِـــهِ الرُّسُل أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُم عَلَى أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُـــرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِيْنَ

"হে মুহাম্মদ! (সা) আপনারও মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং নিশ্চয়ই তারাও মৃত্যুবরণ করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন সুতরাং যদি তিনিও মৃত্যুবরণ করেন অথবা শাহাদতবরণ করেন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাকে অচিরেই প্রতিদান দেবেন।"

এটা শুনে লোকজন অঝোরে ক্রন্দন করতে লাগল। তাদের মনে হল যে, এটাই বুঝি সর্বশেষ আয়াত যা তাদের মনে ছিল না। এবার হযরত আবূ বকর (রা) যখন

www.pathagar.com

এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন তাদের চোখ হতে পর্দা উঠে গেল এবং প্রত্যেকের অন্তরে এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, সবাই এই আয়াতটি পাঠ করতে লাগলেন।[১]

সাকীফায়ে বনী সায়েদাহ্

একদিকে হুযূর (সা)-এর দাফন-কাফনের প্রস্তুতি চলছিল। অপরদিকে মুনাফিকদের কুটিল চক্রান্ত এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায়, যা তাদের পরামর্শের স্থান বা দারুন নাদওয়া ছিল, একত্রিত হয়েছে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন সে সম্পর্কে সেখানে জোর আলোচনা চলছে। সাদ ইবনে উবাদাহ্ (রা) একজন বিখ্যাত আনসার ছিলেন। সমস্ত যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তাঁর হাতেই ছিল। আনাসারদের মতে তাঁকেই হুযূর (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত করা উচিৎ। তবে অপর একদলের মতে, দু'জন আমীর বা নেতা হওয়া উচিৎ; একজন আনসার হতে এবং অন্যজন মুজাহির হতে।

প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কোন মতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটা গ্রহণ করা হলে ইসলামী ঐক্যের বাধন চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে এবার বিবেচ্য বিষয় হলো, আরবদের মধ্যে কুরাইশ গোত্রের কর্তৃত্ব সবাই মানত। কেননা, অন্যান্য গোত্রের চেয়ে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুণাবলী ছিল অধিক স্বয়ং হুযূর (সা) الأئمة من قريش। (অর্থাৎ কুরাইশদের থেকে নেতা হবে) এ কথা ঘোষণা করে কুরাইশদের এই বিশেষত্ব ও মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখন যদি তাদেরকে নেতৃত্বে বসানো না হয় তাহলে এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ইসলামী সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আনসারগণ ইসলাম ও আঁ-হযরত (সা)-এর যে বিরাট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তা অনস্বীকার্য। তবে মুহাজিরদের মধ্যে একটি দল ছিল যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানও ছিলেন, তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে যেন খুব একটা গুরুত্বের নযরে দেখতেন না। আনাসারদের মধ্যেও দু'টি গোত্র ছিল, আউস ও খাযরাজ। এদের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। ইসলাম গ্রহণের পর অবশ্য এটা হ্রাস পেয়েছিলো কিন্তু সম্পূর্ণ দূরিভূত হয় নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সময়টি ছিল ইসলামী ঐক্যের জন্য অত্যন্ত সংকটময়। খিলাফতের বিষয়টি সফলতার সাথে সমাধা করার উপরই এই সংকটের স্থায়ী সমাধান নির্ভর করছিলো। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এই

---

১. ইমাম বুখারী (রা) হযরত আয়েশা (রা) হতে এই বর্ণনাটি কিছু শব্দের পরিবর্তন ও হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সহীহ বুখারীতে দুটি জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এক باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه এর অধীনে এবং দ্বিতীয় باب مناقب المهاجرين وفضلهم এর অধীনে। আমরা উভয় রিওয়ায়েত এখানে একত্রিত করেছি।

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান হয় এবং ইসলামের মধ্যে যে বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তার অবসান ঘটে।[১]

যাহোক ঐ মতবিরোধের সংবাদ অবগত হওয়ার সাথে সাথে হযরত আবূ বকর (রা) সব কিছু স্থগিত রেখে এই উম্মতের "আমীন" أمين هذه الأمة হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্‌কে নিয়ে সাকীফায়ে বনী সায়েদায় যান। সেখানে তাঁরা মারাত্মক হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল প্রত্যক্ষ করেন। এই তিনজন সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে আনসারদের মধ্য হতে একজন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, "আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী এবং ইসলামের বাহিনী। হে মুহাজিরীন, তোমরা হলে হুযূর (সা)-এর সাথী। কিন্তু এখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছ এবং আমাদের মর্যাদা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ।"

এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) কিছু বলার ইচ্ছা করেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দেন এবং নিজেই দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বাকপটুতা ও বাগ্মিতার সাথে এক ভাষণ প্রদান করেন। স্বয়ং হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি অনেক চিন্তা করে ঐ সময় অনুযায়ী একটি ভাষণ মনে মনে তৈরী করে নিয়েছিলাম এবং ভাবছিলাম, হযরত আবূ বকর (রা) এইরূপ ভাষণ দিতে পারবেন না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যখন দাঁড়ালেন তখন তিনি ঐ সমস্ত কথা তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত বাগ্মিতার সাথে পেশ করলেন যা অনেক চিন্তার পর আমি আমার মস্তিষ্কে জমা করেছিলাম।[২]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণ

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও হুযূর (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করার পর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে মহাজিরদের মর্যাদা, ইসলামের জন্য তাঁদের অসাধারণ আত্মত্যাগ এবং আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন, "হে আনসারগণ, তোমরা তোমাদের সম্পর্কে যে দাবী করছ তোমরা অবশ্যই তার যোগ্য এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তোমাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। কোন

---

১. ফাতহুল বারীর ৭ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হুযূর (সা)-এর পরিবারবর্গ দাফন ও কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ দেয়ালের পিছন থেকে হযরত ওমর (রা)-কে ডেকে বলল, একটু বাইরে আসুন। ফারূকে আযম (রা) উত্তর দিলেন, "সরে যাও" আমরা হুযূর (সা)-এর কাজে ব্যস্ত, সময় নেই। তখন ঐ ব্যক্তি বলল,"আরে দেখুন! বিরাট বিপদ, আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্রিত হয়েছে। কোন ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আপনারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন। এটা শুনে হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন,চলুন। তখন উভয়ে সাকীফায়ে বনী সায়েদার দিকে রওয়ানা হলেন।

২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৮, باب مناقب المهاجرين

www.pathagar.com

কোন উম্মুল মু'মেনীন তোমাদেরই গোত্রের ছিলেন।[১] কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আরবরা কুরাইশদের ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করবে না। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবূ উবাইদা (রা)-এর হাত ধরে বলেন, এ'দের মধ্যে যে কোন একজনের হাতে সবাই বায়'আত গ্রহণ কর।[২]

এতে গণ্ডগোল দেখা দিল। এমনকি আনসারদের মধ্যে হতে হাবাব ইবনে মুনযির (রা) এ সম্পর্কে কিছু কটুক্তিও করে বসলেন। তখন হযরত ওমর (রা) এগিয়ে গিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, 'আমরা আপনার হাতেই বায়'আত করব, কেননা আপনি আমাদের সবার চেয়ে উত্তম ; আপনি আমাদের নেতা। হুযূর (সা) আপনাকেই বেশী ভালবাসতেন। এই বলেই তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। হযরত ওমর (রা)-এর বায়'আতের পর মুহাজির ও আনসারদের সবাই হাত বাড়িয়ে হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত করেন।[৩]

ইবনে ইসহাক হইতে বর্ণিত আছে যে, বশির ইবনে সা'দ আল্ আনসারী (রা) হযরত ওমর (রা)-এর পূর্বেই আবূ বকরের হাতে বায়'আত করেছিলেন।[৪] মূলতঃ উভয় বর্ণনায় কোন মতানৈক্য নেই। কেননা এই ধরনের গন্ডগোলের সময় প্রথমতঃ সঠিকভাবে খোঁজ রাখাই সম্ভব নয় যে, কে অগ্রবর্তী ছিলেন। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে, মুহাজিরদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম বায়'আত করেন এবং আনসারদের মধ্যে হযরত বশির ইবনে সা'দ (রা)।

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় বায়'আত গ্রহণের কাজ শেষ হলে হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা) এর পবিত্র মরদেহের কাছে আসেন এবং দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। কোথায় দাফন করা হবে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, "আমি হুযূর (সা)-এর নিকট হতে একটি হাদীস শুনেছি যা এখনও ভুলিনি। তা হ'ল ঃ

---

১. ইবনে জারীর তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭। সাকীফায়ে বনী সায়েদার উক্ত সভা এবং এতে যে বক্তৃতা হয়েছিল তাবারী তার বিবরণী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে বিস্তারিত বর্ণনা এখানে পরিত্যাগ করেছি।

২. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ইমাম বুখারী (র) এ সমস্ত কাহিনী স্বয়ং হযরত ওমর (রা) এর ভাষায় শুনিয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতের জন্য যখন হযরত ওমর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন, হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, তখন আমার জন্য এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল। আল্লাহ্‌র শপথ, কোন অপরাধ ছাড়াই যদি আমার গর্দান কাটা যেত তা হলে সেটাই আমার জন্য সহজ হত ঐ কাজের অনুপাতে যে, আমি এমন একটি জাতির আমীর হব যেখানে স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা) বর্তমান আছেন। হযরত আবূ বকর (রা) দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ্ (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। তাঁর সম্পর্কে ইবনে সায়াদ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, যখন কোন কোন লোক তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা করল, তখন তিনি বললেন, "তোমরা আমার নিকট আগমন করছ অথচ তোমাদের মধ্যে তিনজনের তৃতীয় ব্যক্তি (সাওর গুহার সাথী) অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) বর্তমান আছে। (ইবনে সায়াদ, তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর)।

৩. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৮, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০৯ باب رجم الحبلى من الزنا لحصنت

৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।

www.pathagar.com

ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي أن يدفن فيه

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবীকে ঐ স্থানেই মৃত্যু প্রদান করেন যেখানে তাঁকে দাফন করা পছন্দ করেন।"

এরপর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, ادفنوه في موضع فراشه তোমরাও হুযূর (সা)-কে তার শয়নকক্ষে দাফন কর সুতরাং তাই করা হ'ল।[১]

সাধারণ বায়'আত

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় মাত্র কিছু লোক বায়'আত করেছিলেন। আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১১ হিজরীর ১৩ই রবিউল আউয়াল সোমবার মুতাবিক ২৮শে মে ৬৩২ খৃঃ মসজিদে নববীতে এক সাধারণ বায়'আতের ব্যবস্থা করা হয়। সকল মুসলমান একত্র হন। হযরত ওমর (রা) মিম্বরে বসে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, "আমি আশা করেছিলাম, হুযূর (সা) আমাদের পরেও জীবিত থাকবেন। কিন্তু তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সামনে এমন এক নূর রেখে দিয়েছেন যার থেকে তোমরা ঐ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে যা হুযূর (সা) থেকে প্রাপ্ত হতে। নিঃসন্দেহে হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর সাথী এবং হেরা গুহার বন্ধু ছিলেন। তোমাদের সব রকম পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে উত্তম। সুতরাং দাঁড়িয়ে যাও এবং বায়'আত গ্রহণ কর"। হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে চুপ করে বসেছিলেন, হযরত ওমর (রা) ভাষণ সমাপ্ত করে তাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি মিম্বরের উপর উপবেশন করুন'। কিন্তু আবূ বকর (রা) উঠলেন না। অবশেষে যখন কয়েকবার অনুরোধ করা হ'ল তখন তিনি মিম্বরের উপর পদার্পণ করলেন এবং মুসলমানরা তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[২] এটা ছিল সাধারণ বায়'আত।

প্রথম ভাষণ

অতঃপর তিনি এক ভাষণ দেন। এ সম্পর্কে ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, এরূপ ভাষণ এরপর আর কারো মুখে শুনা যায় নি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা এবং হুযূর (সা)-এর উপর দরূদ পাঠের পর তিনি বললেন ঃ

أما بعد أيها الناس ! فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح عليه إن شاء الله — والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد

১. শামায়েলে তিরমিযী পৃঃ ৩০।
২. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭২, খিলাফত অধ্যায়।

www.pathagar.com

في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ــ ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمــهم الله بــالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قومــوا إلى صلاتكم ــ رحمكم الله ــ[১]

"হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের আমীর মনোনীত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তাহলে আমার সাহায্য করবে, আর যদি অন্যায় করি তাহলে আমাকে সতর্ক করে দেবে। সততা একটি আমানত আর মিথ্যা হ'ল খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী। কেননা আমি তার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তার দাবী পূরণ করে দেব, আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল কেননা আমি তার থেকে অন্যের হক আদায় করে দেব। যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেন। যে জাতির মধ্যে অন্যায় ও অসৎকাজ ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্ তাদের উপর মুসীবত ও সমস্যা ছড়িয়ে দেন, যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করব ততক্ষণ তোমরা আমরা অনুসরণ করবে। যখন আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে দূরে সরে যাব তখন আমার অনুসরণ করা তোমাদের উপর ফরয নয়। এখন নামাযের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন"।

ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের নাম পাওয়া যায় যাদের সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে লিখে থাকেন যে, তাঁরা ঐ দিন হযরত আবূ বকর (রা)-এ হাতে বায়'আত করেন নি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন হযরত আলী (রা)। এর পর হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও প্রসিদ্ধ আনসারী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা)। যদিও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দীনের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত তবু ইতিহাসবিদগণ এর উপর কেন জানি না, তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আমরা উক্ত তিনজন মহান ব্যক্তির বায়'আত সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করছি।

হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, তিনি ছয়মাস অর্থাৎ ¦ হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রথম খলীফার হাতে বায়'আত করেন নি বরং অসন্তুষ্ট হয়ে ঘরে বসে ছিলেন। যখন হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকাল হয় তখন হযরত আলী (রা) এবং তাঁর সাথে অবস্থানকারী বনী হাশিম গোত্রের লোকজন হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আলাপ আলোচনা

---

১. আল্-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৪৮।

www.pathagar.com

হয়। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগও আনা হয়। অবশেষে যখন সুষ্ঠুভাবে সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন। এই খবর শুনে সকল মুসলমান অত্যন্ত খুশী হন।

ইতিহাসবিদ ও পর্যটকদের উক্ত বর্ণনার মূল উৎস হ'ল প্রকৃতপক্ষে সহীহ্ বুখারীর নিম্নলিখিত হাদীস :

عن عائشة أن فاطمة بنت النبي ﷺ أرسلت إلى أبي بكر (رض) تسئله ميراثها من رسول ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر -

فقال أبو بكر (رض) أن رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد (ص) في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله (ص) عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله (ص) ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله (ص) فأبى أبو بكر (رض) أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا و لم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته و لم يكن يبايع تلك الا شهر فأرسل إلى أبي بكر أن أئتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية يحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عستهم أن يفعلوه بي والله لآتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال انا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله و لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله (ص) نصيبها حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير و لم أترك أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العيشة للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقى علي المنبر فتشهد وذكر شأن علي و تخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدك أنه لم يحمله عل الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف [১]

১. সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৮-৯ ও গাযওয়ায়ে খায়বার অধ্যায়।

www.pathagar.com

"হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে মদীনায় 'ফাই' হিসেবে যে সমস্ত বস্তু প্রদান করেছেন এবং ফিদক ও খায়বারের এক পঞ্চমাংশের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার যে পাওনা আছে তা আমাকে প্রদান করুন।

হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, আঁ-হযরত (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাব তা সাদকা হবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারবর্গ এ থেকে খাবে। আল্লাহর শপথ ঃ হুযূর (সা)-এর সাদকা হুযূর (সা)-এর জীবিতকালে যে অবস্থায় ছিল আমি তাতে কোন পরিবর্তন করব না এবং আমি এ সম্পর্কে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যা হুযূর (সা) করেছেন। এই বলে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে ঐ সমস্ত বস্তু প্রদান করতে অস্বীকার করেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা) অসন্তুষ্ট হন এবং সে দাবী পরিত্যাগ করে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেন নি। হযরত ফাতিমা (রা) হুযূর (সা)-এর পর ছয়মাস জীবিত ছিলেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা) রাতের বেলাই তাকে দাফন করে ফেলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে কোন সংবাদ দেন নি। হযরত আলী (রা) তাঁর জানাযার নামায পরিচালনা করেন। হযরত ফাতিমা (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত আলী (রা)-এর একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) যখন অনুভব করলেন যে, এখন তাঁর সম্পর্কে লোকদের অন্তরে পূর্বের মত অনুভূতি নেই, তখনই তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে একটি মীমাংসায় আসতে এবং তার হাতে বায়'আত করতে মনস্থ করেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর ঘরে আসার জন্য অনুরোধ জানান। সাথে সাথে এটাও বলে পাঠান যে, "আপনার সাথে যেন অন্য কেউ না আসে। কেননা হযরত ওমর (রা) তাঁর সাথে আসুন এটা তিনিও পছন্দ করতেন না। হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে একাকী না যাওয়ার পরামর্শ দেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমার এই আশংকা নেই যে, তাঁরা (বনু হাশিম) আমার সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করবে। আল্লাহ্র শপথ আমি তাদের নিকট যাব। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা) তাদের নিকট আসেন। হযরত আলী (রা) প্রথমে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করেন, এরপর বলেন, 'আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ্তা'আলা আপনাকে যে মঙ্গল (খিলাফত) দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আল্লাহ্ আপনাকে যে সম্মান ও মর্যাদা (খিলাফত) দান করেছেন আমরা সে জন্য হিংসা করি না। তবে হাঁ, খিলাফতের বিষয়টি আপনি নিজেই মীমাংসা করে নিয়েছেন, অথচ আঁ-হযরত (সা)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে এতে আমাদেরও একটা অংশ আছে বলে আমরা মনে করতাম। এটা শুনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর

www.pathagar.com

অশ্রুস্বজল হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতেও হুযূর (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার আমার কাছে অধিক প্রিয়। অতঃপর বলছি, আমার ও তোমাদের মধ্যে ঐ ধন-সম্পদ সম্পর্কে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমি যথোচিত কাজ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করি নি এবং হুযূর (সা) যে কাজ করেছেন আমি তা না করে থামি নি। এটা শুনে হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আচ্ছা ; আপনি বায়'আতের জন্য দুপুর বেলা আসুন।

এরপর যখন হযরত আবূ বকর (রা) যোহরের নামায আদায় করেন তখন তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর অবস্থা, বায়'আত গ্রহণ থেকে তাঁর দূরে থাকা ও তাঁর বর্ণিত ওযরের কথা বর্ণনা করেন, এরপর তিনি ইস্‌তিগফার পাঠ করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যা কিছু বলেছি এর অর্থ এই নয় যে, আমি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর যে করুণা প্রদান করেছেন তা অস্বীকার করছি। বরং আসল কথা হ'ল খিলাফতের ব্যাপারে আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে বলে আমরা মনে করতাম, হযরত আবূ বকর (রা)-এ ব্যাপারে আমাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেসই করেন নি, তাই আমরা আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়েছি। এটা শুনে সমস্ত মুসলমানই খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারা বললেন,"আপনি ঠিক বলছেন"। হযরত আলী (রা) যখন সৎকাজের নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুসলমানরা তার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হ'ল।

এছাড়া সহীহ্ মুসলিমে ইমাম যুহরী হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্‌তিকাল পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি। তিনি বলেছেন, শুধু আলী (রা) নন বরং বনু হাশিম গোত্রের কেউই বায়'আত করেন নি। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার (র) বায়হাকী হতে বর্ণনা করেছেন যে এই বর্ণনাটি দুর্বল (ضعيف) কেননা যুহরী এর সনদ বর্ণনা করেন নি।[১] বায়হাকী এই রিওয়ায়েতের দুর্বলতার যে কারণ বর্ণনা করেছেন তাছাড়াও এর মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে তা হলো, 'বানু হাশিম গোত্রের কেউ বায়'আত করেন নি'; এর এ অংশটি যাবতীয় রিওয়েতের বিরোধী।

এখন বাকী থাকলো সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়েতের ব্যাপারটি। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হযরত আলী (রা)-এর ছয় মাস পর্যন্ত বায়'আত থেকে বিরত থাকাটা যেমন ছিল তাঁর মর্যাদা ও বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ বিরোধী তেমনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষেও এতদিন ধৈর্য ধরে থাকাটা ছিল একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

---

১. ফাত্‌হুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯।

www.pathagar.com

একথা অনস্বীকার্য যে, সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল, তাঁর ওপর আঁ-হযরত (সা)-এর যে বিশেষ নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস ছিল এবং সে কারণেই, আঁ-হযরত (সা) ইঙ্গিতে এবং স্পষ্টভাবেও (পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের অগ্রগণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন যে, হযরত আলী (রা) সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। আর হযরত আলী (রা)ও যে দরবেশী, স্বার্থহীনতা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে খলীফা মান্য করেন নি। সহীহ্ বুখারীর উক্ত রিওয়ায়েত মতেও হযরত আলী (রা) স্পষ্ট ভাষায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা, সম্মান এবং তাঁর খিলাফতের অধিকার ও দাবীর স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে এটাও বলেছেন যে, খিলাফত বিষয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে তাঁর কোন মতবিরোধ নেই এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি তিনি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষও পোষণ করেন না।

কোন কোন লোক পরশ্রীকাতরতা ও প্রাচীন শত্রুতার কারণে ঐসময় অযাচিত কুপরামর্শের মাধ্যমে হযরত আলী (রা)-কে ক্রোধান্বিত করার অপচেষ্টা চালালেও তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। একদিন হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতা আবূ সুফ্য়ান হযরত আলী (রা)-কে তার অমর্যাদার কথা উল্লেখ করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অপপ্রচেষ্টা চালান। তিনি আলীকে বলেন, "দেখ! কুরাইশদের মধ্যে সেটা সবচাইতে নিম্নমানের গোত্র তারাই আজ খিলাফতের অধিকারী হয়ে গেল। আল্লাহ্র শপথ; যদি আপনি এর অভিলাষী হন তাহলে আমি আপনার পক্ষাবলম্বনে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা মদীনা ভরে তুলবো। আবূ সুফিয়ানের একথা শুনে হযরত আলী (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগত স্বরে বলেন, "হে আবূ সুফিয়ান! তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের পুরাতন শত্রু। তবে তুমি এরূপ কথা ও পরামর্শের দ্বারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে খিলাফতের জন্য উপযুক্তই পেয়েছি।[১]

---

১. এটা তাবারীর বর্ণনা (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯); কিন্তু কান্‌যুল উম্মালে দু'টি সনদ দ্বারা এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সনদের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হলেন মুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রা), যিনি ঠিক ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত হন যখন লোকজন হুযূর (রা)-এর দাফন কাজ সবেমাত্র শেষ করেছে। মুয়াইদ হযরত আলী (রা)-এর বিশেষ অনুসারী ছিলেন। দ্বিতীয় সনদের শেষ বর্ণনাকারী হযরত আলী (রা)-এর পৌত্র হযরত যয়নুল আবিদীন (রা) এ দু'টো বর্ণনায় আবূ সুফিয়ানের উক্তি তাই, যা তাবারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর উক্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। আর তাহলো,

www.pathagar.com

একটি বর্ণনায় আছে, আবূ সুফ্য়ান হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন যে, "ابسط يدك حتى أبايعك" অর্থাৎ আপনার হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার হাতেই বায়'আত করব। কিন্তু হযরত আলী (রা) তার সে প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখান করেন এবং আবূ সুফিয়ানকে এজন্য ভর্ৎসনাও করেন।[১]

হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত আলী (রা)-এর বিনয় এরূপ ছিল যে, হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর বিপরীতেও তিনি নিজের পক্ষে খিলাফতের দাবী উত্থাপন করেন নি বা এব্যাপারে জমহুর উম্মতের সাথে কোন মতানৈক্য পোষণ করেন নি। একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বললেন, এটা কিরূপ কথা যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না, কিন্তু আপনার খিলাফতের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা গেল। হযরত আলী (রা) তখন উত্তরে বললেন, 'হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) আমার মত মুসলমানদের শাসক ছিলেন, আর আমি হচ্ছি তোমাদের মত মুসলমানদের শাসক।[২]

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর কোন মতবিরোধ ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন না। তবে হাঁ বুখারী ও অন্যান্য রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি তাঁর ব্যথা বা বিমর্ষতার ভাব অবশ্যই ছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, যখন হযরত আলী (রা) এবং হুযূর (সা) এর অন্যান্য পরিবারবর্গ হুযূর (সা)-এর দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) সাকীফায়ে বনু সায়েদার খবর শুনে হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবূ উবাইদা ইবন জাররাহ্ (রা)-কে সাথে নিয়ে সেখানে যান এবং খিলাফতের বিষয়টিও মীমাংসা করে আসেন, কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর সাথে কোন পরামর্শ করেন নি। দ্বিতীয় কারণ হলো, হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিষণ্নতা যা মানবীয় কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে হযরত আলী (রা)-এর অসন্তোষের এ দু'টি কারণ ছিল একেবারে ব্যক্তিগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিক্রিয়া এটা হতে পারত যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে

لا والله ما أريد أن تملاها عليه خيلا ورجالا ولولا انا رأينا أبا بكر لذلك أهلا ما خلفناه إياها يا أبا سفيان أن المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض متوادون و إن بعدت ديارهم وأبدانهم وأن المنافقين غششة بعضهم لبعض —

কানজুল উম্মাল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০-১৪১ (হায়দরাবাদে মুদ্রিত)।

১. তারীখে ইয়াকূবী ঃ ২য়ঃ পৃঃ ২৪০।

২. তারীখে ইবনে খালদুন ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ১৭৬।

www.pathagar.com

মধুরতা বা আন্তরিকতার সৃষ্টি হত' না, যা সমাজ জীবনের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু খিলাফতের ফায়সালা ছিল যেহেতু একটি জাতীয় ও সম্মিলিত মাসআলা, তাই এটা কি করে সম্ভব যে, ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণে হযরত আলী (রা) প্রথম হতে বায়'আত গ্রহণ না করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতি হযরত আলী (রা)-এর শ্রদ্ধাবোধ এত প্রখর ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় যখন হযরত ওমর (রা)-এর নাম স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন তখন হযরত আলী (রা) যদিও ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত ছিলেন না এবং তিনি নিজের ব্যক্তিগত মত হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে ব্যক্তও করেছিলেন, তবু অবশেষে যখন হযরত ওমর (রা)-এর নাম চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়ে গেল তখন তিনি এর কোন বিরোধিতা করেন নি বরং সকল মুসলমানদের সাথে নিজেও বায়'আত গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন এমনি চরিত্রের অধিকারী তার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও তিনি সকল মুসলমান থেকে পৃথক থাকবেন এবং বায়'আত করবেন না?

মাযরী ও আশ'আরী, হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত থেকে বিরত থাকার একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানেরাই পৃথক পৃথকভাবে খলীফার নিকট বায়'আত করার প্রয়োজন নেই। হাযার হাযার মুসলমানতো বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাই হযরত আলী (রা) যদিও সঙ্গে সঙ্গে বায়'আত গ্রহণ না করে থাকেন তাহলে এটাকে বিরোধিতার পর্যায়ভুক্ত করা ঠিক হবে না।[১]

কিন্তু আমাদের নিকট এই কারণও সঠিক নয়। কেননা হযরত আলী (রা) শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ একটি দল বা গোত্র। তাঁর বায়'আত না করাটা ইসলামী ঐক্যের জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা হতে পারত এবং তিনি এই অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনবহিত ছিলেন না।[২]

সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়েত সম্পর্কে আমরা উপরে যে আলোচনা করেছি তা নিছক ব্যবহারিক। বর্ণনার প্রেক্ষাপটে যদি এ সম্পর্কে আলোচনা করা যায় তা হলে প্রতীয়মান হবে যে, এই বর্ণনার বিপরীতে এমন কয়টি বর্ণনাও রয়েছে যার দ্বারা ছ'মাস বায়'আত না করার বিষয়টি অনায়াসে খণ্ডিত হয়ে যায়। এই ক্রমধারায় ঐ

---

১. ফাতহুলবারী : ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮ এবং ফায়যুলবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪২।

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'ইতকান' নামক গ্রন্থে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেটাকে তিনি সঠিক বলেও প্রমাণিত করেছেন। তা হল হযরত আলী (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর একটি ভাষণে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পবিত্র কুরআন একত্র না করব ততক্ষণ ঘর হতে বের হব না। কেহ কেহ এই কুরআন জমা করার কাজকে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ না করার কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা একটা কারণ হলেও খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা কয়েক মিনিটের জন্য বায়'আত গ্রহণের ব্যাপারে বাইরে আসা কুরআন জমা করার কাজে তো কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

www.pathagar.com

হাদীসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা হাকীমের মুস্তাদরাকে বর্ণিত হয়েছে। হাকীম বলেছেন যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তাদের শর্ত অনুযায়ী এটিও সহীহ্। বর্ণনাটি হলো ঃ

أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب ﷺ وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله في سر وعلانية ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به قال علي والزبير ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله ﷺ إنه لصاحب الغار وثاني اثنين و إنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد أمره رسول الله ﷺ بالصلاة بالناس وهو حي - (المستدرك : جلد : ٣ ص : ٦٦)

"হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হযরত ওমর (রা)-এর সাথে ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা হযরত যুবায়ের (রা)-এর তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, "আল্লাহ্র শপথ; কোন দিনই নেতৃত্বের প্রতি আমার লোভ বা আসক্তি ছিল না। গোপনে বা প্রকাশ্যে আমি কখনো এ জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করি নি। তবে হাঁ; আমি বিশৃংখলাকে ভয় করি। নেতৃত্বের মধ্যে আমার কোন শান্তি নেই। বরং এর মাধ্যমে আমার স্কন্ধে এমন এক বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ছাড়া সম্পাদন করার কোন শক্তি আমার মধ্যে নেই। কামনা করি আজ আমার স্থানে অন্য কোন অভিজ্ঞ বা জ্ঞানী ব্যক্তি হলে কতই না ভাল হত! হযরত আবূ বকর (রা) যা কিছু বললেন মুহাজিরগণ তা গ্রহণ করেন। তখন হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা) বলেন, আমাদের দুঃখ হ'ল শুধু এই বিষয় যে, খিলাফত সম্পর্কে পরামর্শের সময় আমাদেরকে ডাকা হয় নি। নতুবা হুযূর (সা)-এর পর আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করি। তিনি হুযূরের গর্তের সাথী এবং দু'জনের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের কথা আমরা ভালভাবে জানি। হুযূর (সা) জীবিতকালেই তাঁকে নামাযে ইমামতির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আল্-মুস্তাদরাক ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬)

অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। যদি হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ না করতেন তা হলে মুসলিম উম্মাহ্র স্বার্থে

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল যে, তিনি ধৈর্যধারণ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন এবং বিশৃংখলার একটি ফটক এভাবে উন্মুক্ত রেখে দেবেন। এ বিষয়ে আমরা আরো একটি বর্ণনা পেশ করছি যার দ্বারা বায়'আত গ্রহণের বিষয়ে হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত আলী (রা) উভয়ের চিন্তাধারার উপরই আলোকপাত করা হবে। সাকীফায়ে বনী সায়েদার প্রাথমিক ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

فلما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر (رض) ابن عم رسول الله ﷺ وختنـه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله ﷺ فبايعه هذا حديث صحيـح على شرط الشيخين و لم يخرجاه - المستدرك للحاكم : ج ٣ ص ٧٦

"যখন হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরের উপর উপবেশন করে জনতার দিকে চাইলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা)-কে সেখানে দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কয়েকজন আনসার দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে (আলীকে) নিয়ে আসেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনি হচ্ছেন রাসূল (সা)-এর চাচত ভাই এবং জামাতা। আপনি কি মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে চান? তখন হযরত আলী বলেন হে রাসূল (সা)-এর খলীফা; আমাকে ভৎর্সনা করবেন না। এরপর হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।" ইমাম হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী এটা সহীহ্। (আল্-মুস্তাদরাক হাকীম; ৩য় খণ্ড , পৃঃ ৭৬)

ইবনে সা'দ হযরত হাসান (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রা) বলেন, যখন আঁ-হযরত (সা) ইন্তিকাল করেন তখন আমরা খিলাফতের বিষয়ে চিন্তা করি। আমরা ভেবে দেখলাম হুযূর (সা) তাঁর জীবিতকালে হযরত আবূ বকর (রা)-কে নামাযে ইমামতি করতে দিতেন অর্থাৎ হুযূর (সা) দীনের ব্যাপারে তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন অতএব আমরা দুনিয়ার ব্যাপারেও তাঁকে (আবূ বকর (রা))-কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করলাম অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করলাম।[১]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা হুযূর (সা)-এর সাথে তাঁদের বিশেষ সম্পর্ক, অতঃপর খিলাফতের গুরুত্ব এবং আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামের প্রচার, প্রসার ও স্থায়ীত্বের জন্য পরস্পর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে

১. ইবনে সায়াদ, তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।

www.pathagar.com

যে, হযরত আলী (রা)একবার নয়, বরং দু'বার হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। প্রথম বার খিলাফতের বায়'আত, যা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের দ্বিতীয় দিন সাধারণ বায়'আত হিসেবে মসজিদে নববীতে করেন, দ্বিতীয় বার সম্মতি বা স্বীকৃতির বায়'আত, যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর করেন। এই বায়'আতের উদ্দেশ্য হ'ল পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া এবং প্রাথমিক অবস্থার মত উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

সুতারং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে হাদীসটি মুসতাদরাকের উদ্ধৃতি দিয়ে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা) প্রথমেই বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, হাফিয ইবনে হাজার সেটিকে সর্বাপেক্ষা সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم وعلى هذا قول الزهري لم يبايعه علي (رض) في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك فإن انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك وبسبب ذلك ظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة -[১]

"অন্যান্য লোকজন উভয় বর্ণনার মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে,হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট প্রথম যে, বায়'আত করেছিলেন তা অধিকতর জোরদার বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয়বার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। যাতে মিরাস বা অংশীদারত্বের ব্যাপারে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হয়। এই উক্তির প্রেক্ষাপটে ইমাম যুহরী বলেন, হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন নি তাহলে এর অর্থ হবে, হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে উঠাবসা করতেন না এবং তাঁর নিকট যাতায়াতও করতেন না। কেননা যে ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তিনি হযরত আলী (রা)-এর মত ব্যক্তিকে হযরত আবূ বকর-এর মত ব্যক্তি হতে আলাদা থাকতে দেখে এটাই মনে করতে থাকে যে, হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের উপর সম্মত ছিলেন না। আর এই ভুল বুঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যেই হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) আবূ বকর (রা)-এর হাতে পুনরায় বায়'আত করেন।"

ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত দার্শনিক ও গবেষক হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর উল্লেখিত রিওয়ায়েত এবং ঐ একই মর্মের অন্যান্য রিওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

১. ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯।

www.pathagar.com

وهذا لائق بعلي (رض) والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلاة وخر وجـــه معه إلى ذي القصة بعد موت الرسول ﷺ كما سنورده وبذله له من النصيحـــة والمشورة بين يديه -[১]

"এবং এটাই ছিল হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদার অনুকূল এবং অন্যান্য (آثار) আসার এটাকে সমর্থন করে। যেমন; হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হযরত আলী (রা)-এর নামাযে অংশ গ্রহণ, যুল কিস্‌সার যে ঘটনা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর সংঘটিত হয়েছিল (এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে) তাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হযরত আলী (রা)-এর অংশ গ্রহণ এবং তাঁকে পরামর্শ ও উপদেশ দান।

অতঃপর তাঁরা হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কিত রিওয়ায়েতটির সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন, -

وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر فذالك محمول علـــى أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث -

"এখন বাকী রইল ঐ রিওয়ায়েত যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) বায়'আত করেছিলেন এই বায়'আত দ্বারা দ্বিতীয় বা শেষ বায়'আতকে বুঝানো হয়েছে। এই বায়'আত মিরাস বা অংশীদারীত্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট-পরস্পর মনোমালিন্য দূর করেছিল।"

হযরত আলী[২] (রা)-এর মানবীয় প্রকৃতিগত মনোবেদনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা নিজস্ব আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সঠিক দীনের ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ হতে কোন প্রকার বিরোধিতা কখনো পরিলক্ষিত হতে পারে না। ইমাম কুরতবী বলেন, "হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং পরে হযরত আলী (রা) এজন্য যে দুঃখ প্রকাশ করেন, এই পূর্বাপর ঘটনার উপর যদি কেউ গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তারা উভয়ে একজন অপর জনের সম্মান ও মর্যাদা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন এবং তাদের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মানবীয় স্বভাব কখনো সীমা অতিক্রম করতে চাইলেও তাদের সাধুতা ও সততা সেটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসত।[৩]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০২, এতে যুল কিস্‌সার ঘটনায় হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে হযরত আলী (রা)-এর অংশ গ্রহণের যে উল্লেখ রয়েছে তা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০২।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯।

www.pathagar.com

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) হতে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে তাতে এ বিষয়টি প্রাণিধানযোগ্য যে, হযরত আয়েশা (রা) যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ যখন হযরত ফাতিমা (রা) মিরাসের (অংশীদারীত্বের) দাবী করেন তখন থেকেই এ বিষয়টির সূচনা। প্রকাশ থাকে যে, এই দাবী আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের দিন অথবা সাধারণ বায়'আতের দিন উত্থাপিত হওয়ার কথা নয়, বরং কয়েকদিন পর যখন হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম খলীফা হিসেবে খিলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়মানুযায়ী পালন করে যাচ্ছিলেন তখনই উত্থাপিত হওয়ার কথা। অতএব সাধারণ বায়'আতের দিন হযরত ফাতিমা (রা) মনোবেদনার কারণে, হযরত আলী (রা) উক্ত বায়'আত হতে দূরে ছিলেন এমন কথার কোন অর্থ নেই। কেননা, ঐ সময়তো কোন প্রকার মনোবেদনার সৃষ্টিই হয় নি। এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে আলোচনার সময় হযরত আলী (রা) স্বীয় মনোবেদনার কারণ হিসেবে মিরাসের (অংশীদারীত্বের) বিষয়টি উল্লেখ করেন নি বরং তিনি বলেছেন যে, আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কারণে তিনি এটা স্বীয় অধিকার বলেই মনে করতেন। খিলাফতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সঙ্গে রাখবেন যেমন তিনি রেখেছেন হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে। হযরত আলী (রা)-এর অসন্তোষের পরবর্তী কারণ ছিল হযরত ফাতিমা (রা)-এর মনোবেদনা। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) মিরাস সম্পর্কিত আঁ-হযরত (সা)-এর পবিত্র বাণী যখন তাকে শুনালেন তখন মিরাসের ব্যাপারটিকে নিজের অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করার অবকাশই হযরত আলী (রা)-এর জন্য বাকী ছিল না। এ কারণেই হযরত আবূ বকরের সাথে আপোষ মীমাংসার সময় হযরত আলী এ বিষয়টির কোন উল্লেখই করেন নি বরং তিনি খিলাফতের বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ না করার অভিযোগ করেছেন। এটা হ'ল ঐ ধরনের কথা যেটাকে ভাষাবিদদের ভাষায় نكتة بعد الوقوع (ঘটিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন) বলা হয়।

এক্ষেত্রে আরো প্রাণিধানযোগ্য যে, হযরত আয়েশা (রা) وما كان بايعه ইত্যাদি স্পষ্ট শব্দের দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত না করার বিষয়টি বর্ণনা করেন নি (যেমন হযরত ইমাম যুহ্‌রী (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে) বরং ولم يكن يبايع تلك الأشهر "এর মত পরোক্ত বাক্যের দ্বারা তা বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এর পরপরই যেহেতু অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কারণেই তিনি দূরে অবস্থান করছিলেন, তাই তাঁর বায়'আত গ্রহণ করা না করা উভয়ই ছিল সমান। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যদিও তিনি বায়'আত করেছিলেন কিন্তু বাস্তবে ছিল তা না করারই মত। এ প্রসঙ্গে তাবারীর নিম্নলিখিত দু'টি রিওয়ায়েতও দেখা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد أ شهدت وفاة رسول الله ﷺ قال نعم قال فمتى بويع أبو بكر (رض) قال يوم مات رسول الله كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة قال فخالف عليه أحد قال لا الأمر قد أومن قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار قال فهل قعد أحد من المهاجرين قال لا تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم

"হযরত আমর ইবনে হারিস (র) হযরত সায়ীদ ইবন যায়েদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন হাঁ। এর পর জিজ্ঞাসা করেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে কখন বায়'আত করা হয়? তিনি বলেন, যেদিন আঁ-হযরত (সা) ইন্তিকাল করেন ঐ দিন সাহবায়ে কিরাম (রা) এটা পছন্দ করেন নি যে, জামা'আত বিহীন অবস্থায় একটি দিনও অতিবাহিত হোক। তখন আমর ইবনে হারিস জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের বিরোধিতা করেছিলেন? হযরত সায়ীদ ইবন যায়েদ (রা) বলেন না, তবে ধর্মত্যাগীরা বিরোধিতা করেছিল এবং আনসারদের মধ্যেও কিছু লোক বিরোধিতা করেছিল। যদি আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা না করতেন তাহলে তাদের প্রায় মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। এরপর আমর ইবনে হারিস (রা) জিজ্ঞাসা করেন, মুহাজিরদের মধ্যে কেউ কি বায়'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন? হযরত সায়ীদ ইবন যায়েদ বলেন, না। বায়'আতের দাওয়াত ছাড়াই মুহাজিরগণের মধ্যে বায়'আত করার হিরিক পড়ে গিয়েছিল।"

এই রিওয়ায়েতে সাধারণ মুহাজিরদের বায়'আতের উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত আলী (রা) নিশ্চয়ই মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আলী (রা) স্বয়ং যে বায়'আত করেছিলেন তার পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে অন্য একটি রিওয়ায়েতে। যেমন;

حدثنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرني عمي قال أخبرني سيف عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال كان علي في بيته لذاتي فقيل له قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم مجلسه

"হযরত হাবীব ইবন সাবিত হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) স্বীয় ঘরে অবস্থান করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন, 'হযরত আবূ বকর (রা) বায়'আতের জন্য বসে আছেন।' এটা শুনে তিনি শুধু জামা পরিধান করেই বাইরে আসেন। এ সময় তাঁর দেহে কোন চাদর বা লুঙ্গি ছিল না। তিনি বায়'আত করা

www.pathagar.com

থেকে পিছিয়ে থাকা পছন্দ করতেন না বলেই এত তাড়াহুড়া করেছিলেন। যাহোক তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন এবং তাঁর নিকট উপবেশন করেন। অতঃপর স্বীয় পোশাক চেয়ে পাঠান। পোশাক আনা হলে তিনি তা পরিধান করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মজলিসেই বসে থাকেন।[১]"

এই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করার বিষয়ে সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক বা পিছনে ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁর ও আবূ বকরের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি বায়'আত করেন নি বলে রিওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ঘটনা ছিল একরূপ কিন্তু ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণে তা অন্যরূপ ধারণ করেছে।

হযরত যুবাইর ইব্‌নে আওয়াম

হযরত আলী (রা)-এর পর এ বিষয়ে হযরত যুবাইর (রা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত যুবাইর (রা) আঁ-হযরত (সা) এবং হযরত আলী (রা)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন হযরত আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা সুফিয়া। আট বা বার বছরের বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যে দশজন সাহাবায়ে কিরামকে এই পৃথিবীতে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। হযরত যুবাইর, তাঁর উপাধি ছিল হাওয়ারীয়ে রাসূল বা রাসূল (সা)-এর সহচর। এই উপাধি খোদ হুযূর (সা) তাঁকে প্রদান করেছিলেন।[২]

বর্ণিত আছে যে, হযরত যুবাইর (রা) যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়'আতের খবর শুনেন তখন তিনি খাপ হতে তরবারি বের করে বলেন, لا أغمده حتى يبايع علي অর্থাৎ আমি ঐ সময় পর্যন্ত তরবারি খাপে রাখব না যতক্ষণ না হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করা হয়। হযরত যুবাইর (রা)-এর এটাই সেই তরবারি যা মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মুসতাদরাকে হাকীম-এর যে রিওয়ায়েতে হযরত আলী (রা)-এর উল্লেখ আছে, তাতে হযরত যুবাইর (রা)-এরও উল্লেখ আছে। তা পাঠ করলে দেখা যাবে, যখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি কখনো খিলাফতের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম না তবে এ ভয় অবশ্যই ছিল যে, না জানি মুসলমানদের মধ্যে এটাকে কেন্দ্র করে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবাইর (রা) উভয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, খিলাফতের বিষয়ে যে পরামর্শ সভা হয় তা হতে আমাদেরকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে। ফলে আমাদের মনে কষ্ট হয়েছে। নতুবা আমাদের মতে হযরত আবূ বকরই (রা) হলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।"

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।

২. ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬।

www.pathagar.com

মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় যেখানে হযরত আলী (রা)-এর আলোচনা রয়েছে সেখানে হযরত যুবাইর (রা)-এরও আলোচনা রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) সাধারণ বায়'আতের দিন যখন হযরত যুবাইর (রা)-কে দেখতে পাননি তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোথায়? যখন লোকজন গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসল তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন "আপনি হলেন হুযূর (সা)-এর সহচর, এর পরও কি আপনি মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে আগ্রহী?" হযরত যুবাইর (রা) প্রথমে ঐ উত্তর দেন যা হযরত আলী (রা) দিয়েছিলেন। এরপর বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা! ভৎর্সনা করবেন না।' অতঃপর হযরত আলী (রা) সেখানে বায়'আত করেছিলেন হযরত যুবাইর (রা) যেখানে বায়'আত করেন।

হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)

হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও কোন কোন রিওয়ায়েতে এ তথ্যকে খণ্ডন করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন। যে যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন, আনসারদের পতাকা তাঁর হাতেই থাকত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আনসার, বিশেষ করে খাযরাজ গোত্রের সর্দার মনে করা হত। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন। কিন্তু কয়েকটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে তিনি একটু কঠোর ছিলেন এবং স্বীয় মতের উপর কিছুটা জেদী। সাকীফায়ে বনী সায়েদার সভায় আনসারগণ তাকেই খলীফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর (রা) নির্বাচিত হয়ে গেলেন তখন সা'দ ইবনে উবাদা (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে তিক্ত ও উষ্ণ কথাবর্তা হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ তাবারীতে রয়েছে।

হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালেই সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে হুরান নামক স্থানে ১৫ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। 'সাকীফায়ে বনী সায়েদায় তাঁর ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে উষ্ণ কথাবার্তা হয়, অতঃপর তিনি সিরিয়ায় গমন করেন, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি। এ ব্যাপারে স্বয়ং হাফিয ইবনে হাজার লিখেছেন;

وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة [১]

"হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে তাঁর (সা'দের) বায়'আত না করার কাহিনী প্রসিদ্ধ।"

---

১. আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮।

www.pathagar.com

আবূ মুহাম্মদ কাল্‌বী হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা) হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট সিরিয়ায় লোক পাঠান এবং এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, যেভাবে হোক, তাঁকে বায়'আত করতে বাধ্য করতে হবে। ঐ ব্যক্তি সিরিয়ায় পৌঁছে হুরান নামক স্থানে এক বাগানে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বায়'আত করার জন্য আহ্বান জানান। তখন সা'দ বলেন, "আমি একজন কুরাইশীর হাতে কখনো বায়'আত করবো না।" তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, "তাহলে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করব।" হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) বলেন, "যদিও তুমি আমার সাথে যুদ্ধ কর তবুও।" ঐ ব্যক্তি পুনরায় বলেন, "সমস্ত উম্মত যে বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন আপনি কি এর থেকে বাইরে থাকবেন?" উত্তরে হযরত সা'দ (রা) বলেন, "হ্যাঁ আমি বায়'আতের ব্যাপারে উম্মত থেকে দূরে থাকব।" তখন ঐ ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-কে হত্যা[১] করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। বাস্তব ঘটনা এই যে, হযরত যুবাইর (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর মত হযরত সা'দ (রা)ও বায়'আত করেছিলেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বলেন, হে মুহাজিরের দল! তোমরা আমার নেতৃত্বের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করেছ। হে আবূ বকর (রা)! আপনি এবং আমার গোত্র আমাকে আপনার বায়'আতে বাধ্য করেছে। এর উত্তরে মুহাজিরগণ বলেন, যদি আমরা আপনাকে বিচ্ছিন্নতার জন্য বাধ্য করতাম এবং আপনি ঐক্যের পক্ষপাতিত্ব করতেন তাহলে এটা আপনার জন্য উত্তম হত (অর্থাৎ, আপনি ন্যায়ের উপর হতেন), কিন্তু আমরা আপনাকে ঐক্যের উপর বাধ্য করেছি। তাই এর উপর আপনার আপত্তি উত্থাপনের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তাঁকে বলা হয় :

لئن نزعت يدا من طاعة أو فرقت جماعة لنضربن الذي فيه عيناك

"যদি আপনি আনুগত্য থেকে বিরত থাকতেন অথবা জামাআতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতেন তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার মাথা উড়িয়ে দিতাম।"

এই রিওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন, কিন্তু এর চেয়েও স্পষ্ট, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর নিম্নলিখিত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) সন্তুষ্ট চিত্তেই বায়'আত করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) সাকীফায়ে বনী সায়েদায় যখন ভাষণ দান করেন। তখন আনসারদের এমন কোন গুণবলী ছিল না যা তিনি বর্ণনা করেন নি। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, যখন আঁ-হযরত (সা)

১. আল-ইকদুল ফরিদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬।

www.pathagar.com

قريش ولاة هذا الأمر

(অর্থাৎ, কুরাইশগণ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন) বলেছিলেন, তখন আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একথা কি আপনার স্মরণ আছে? হযরত সা'দ (রা) বলেন, "জি হাঁ" আপনি সত্য বলেছিলেন।" অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা (রা) বলেন,

نحن الوزراء وأنتم الأمراء [১]

"আমরা অর্থাৎ, আনসারগণ হব উজীর এবং আপনারা অর্থাৎ, কুরাইশগণ হবেন আমীর। স্মরণ থাকতে পারে যে,এটা হুবহু একই কথা যা সাকীফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবূ বকর (রা) আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। মুসনাদে আহমদের এই বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণের পর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন এবং উভয়ের মধ্যে আর কোন মতানৈক্য বাকি ছিল না। একারণেই আল্লামা ইবনে হাজার হায়সুমী এটা বর্ণনা করার পর বলেছেন, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বায়'আত করেন নি এই মর্মে ইবনে আবদুল বার যে কথা বলেছেন তা এই রিওয়ায়েত দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।[২] তাবারীতে স্পষ্টভাবে এই মর্মে একটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সমস্ত জাতি-বায়'আতের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে এবং হযরত সা'দ (রা) বায়'আত করেন।" (তাবরী ২য় খন্ড , পৃঃ ৪৫৯)

হাফিয ইবনে হাজার ও ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সিরিয়ায় চলে যান। কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত কালেই তিনি সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন না যিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি কিংবা বায়'আতের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নগণ্য কিছু লোক এমন ছিল যারা প্রকাশ্য বা গোপনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচনের ব্যাপারে সমালোচনা করত এবং এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসও চালাত, কিন্তু তারা ছিল ঐসমস্ত লোকের অন্যতম যারা শুধু মুখে মুখে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুসলমান হয়েছিলেন। প্রধানত ওরাই পরবর্তীকালে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ওদের সমালোচনার জওয়াবে বলতেন

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০।

২. আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকা, পৃঃ ৭।

www.pathagar.com

ألست أول من أسلم [১]

"আমি কি প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী নই?"

একটি সন্দেহের অপনোদন

প্রশ্ন উঠতে পারে, নির্বাচনের সময় যে ব্যক্তি তার প্রথম ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'আমি নিজেকে খিলাফতের জন্য তোমাদের চাইতে অধিক উপযুক্ত মনে করি না, সেই তিনিই পরবর্তী সময়ে নিজেকে কি করে أحق بالخلافة বা খিলাফতের অধিক দাবীদার বলে ঘোষণা করলেন ? এর উত্তর এই যে, তাঁর ভাষণে হযরত আবূ বকর (রা) যা কিছু বলেছিলেন এটা ছিল তাঁর বিনয়, নতুবা তার চাইতে নবুওতের বড় রহস্যবিদ আর কে ছিলেন? তাছাড়া খিলাফতের আসনে বসে জামহুরের মত অনুসরণে নিজেকে যোগ্যতম ঘোষণা করা সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ মাত্র ছিল নতুবা যে ব্যক্তির নিজের উপর ভরসা নেই সে কি করে অন্যের আস্থা অর্জনের আশা করতে পারে?

খিলাফত

সাধরণ বায়'আতের মাধ্যমেই হযরত আবূ বকর (রা) যথা নিয়মে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হন। তবে তাঁর খিলাফতের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পূর্বে খিলাফতের সংজ্ঞা, মর্যাদা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং আঁ-হযরত (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের যোগ্যতার দিকে যে সমস্ত ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

খিলাফতের সংজ্ঞা

খলীফা خليفة শব্দটি-খিলাফত خلافة হতে উদ্ভূত। খিলাফতের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। খলীফাকে খলীফা বলার কারণ হল, তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি। কারো কারো মতে, খলীফা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। যেমন নিম্ন লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً —

"স্মরণ কর, (হে নবী-সা) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি।"

---

১. তিরমিযি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ –

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় খলীফা বানিয়েছেন।"[১]

হযরত দাউদ (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الأَرْضِ –

"হে দাউদ (আ)! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খলীফা আল্লাহ্র খলীফাকে আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ওলামার মতে, এরূপ বলা জায়েয নয়, বরং কেউ কাউকে আল্লাহ্র খলীফা বলে আহ্বান করলে তাকে ফাসিকই বলা হবে। কারণ ব্যক্তি প্রতিনিধি হতে পারে অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা উপস্থিত এবং সবকিছুরই দর্শক অতএব এক ব্যক্তি কিভাবে তার প্রতিনিধি হতে পারে? একদা হযরত আবূ বকর (রা)-কে কোন এক ব্যক্তি "হে আল্লাহ্র খলীফা" বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্র খলীফা নই, বরং আমি রাসূল (সা)-এর খলীফা।[২]

খলীফার পদমর্যাদা এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য

খলীফা যেহেতু রাসূল (সা)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন, তাই সর্বাগ্রে জানা আবশ্যক, আঁ-হযরত (সা)-এর মর্যাদা কি ছিল? কি ছিল তাঁর দায়িত্ব বা কর্তব্য?

আঁ-হযরত (সা)-এর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল নীতি অনুযায়ী তা হলো দু'প্রকার। (১) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে ওহীর মাধ্যমে আহকাম ও হিদায়াত গ্রহণ করে তা উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দেয়া। (২) উম্মতের জন্য আনুগত্য ও অনুসরণের উত্তম নমুনা দেয়া, চাই সে কাজ ইহকাল বা পরকালের সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা বস্তুজগত বা আধ্যাত্মিক জগতের সাথে, চাই তা রাজনৈতিক বিষয় হোক অথবা সামাজিক কোন ব্যবহারিক বিষয় হোক অথবা অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই তাঁর (আঁ-হযরত সা) উক্তি বা বর্ণনা চূড়ান্ত নির্দেশ বলে পরিগণিত হয়। তা থেকে বিরত থাকা বা তাঁর বিরোধিতা করা বৈধ ছিল না। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا –

"রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা কিছু (নির্দেশ) প্রদান করেছেন তা অনুসরণ কর এবং যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাক।"

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম দায়িত্ব শুধু আঁ-হযরত (সা)-এর মঙ্গলময় সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। যখন আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল হয় তখন ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আর কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

---

১. আল-আহ্কামুস সুলতানিয়া লিল মাওয়ারদী, পৃঃ ১৪।

২. আল-আহ্কামুস সুলতানিয়া লিল মাওয়ারদী, পৃঃ ১৪।

www.pathagar.com

অবশ্য দ্বিতীয় দায়িত্ব সর্বদা অব্যাহত ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আঁ-হযরত (সা) যখন ইন্‌তিকাল করেন তখন اليوم اكملت لكم دينكم এর ঘোষণা অনুযায়ী শরীয়ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং আহ্‌কাম ও মাসায়েলসমূহের নীতি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর পরবর্তীদের ফরয বা দায়িত্ব হল, তারা তাঁর প্রদর্শিত নীতির আলোকে উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। দ্বিতীয় ফরযের আবার দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলীর প্রচার ও প্রসার। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত হুকুম জারি এবং পর্যালোচনা ও প্রচার। প্রত্যেক সাহাবীর জন্যেই ছিল এগুলো ফরয বা কর্তব্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়া এ ফরয পালন সম্ভব নয়। অতএব রাষ্ট্রনীতি, যাকে আমরা শরীয়তী রাষ্ট্রনীতি বলে থাকি, যিনি তার কেন্দ্র বিন্দু হবেন তাকেই খলীফা বা ইমাম বলা হবে।

একজন খলীফা তার খিলাফতকালে সমগ্র উম্মতের আনুগত্য ও অনুসরণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। তিনি লাভ করেন মুসলমানদের উপর আত্মিক ও দৈহিক, প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক কর্তৃত্ব। তাঁরা মর্যাদা, নীতির[১] ব্যাখ্যাকারী ও বাস্তবায়নকারীর মত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রত্যেকটি উক্তিই সর্বশেষ্ঠ উক্তি। তার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনই সাধারণের জন্য ওয়াজিব, তার বিদ্রোহী হওয়া বা তার সাথে নাফরমানী করা হুযূর (সা) এর বিদ্রোহী হওয়া বা নাফরমানী করারই নামান্তর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে যে, "উলুল আমর" বা নেতার আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে সে নেতা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি খিলাফতের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত।

সহীহ বুখারীতে আছে।

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني - (كتاب الأحكام)

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করে সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানী করে, যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে,সে আমার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করে, সে আমারই নাফরমানী করে।" (কিতাবুল আহ্‌কাম)

উপরোক্ত হাদীসে "আমীর" শব্দ দ্বারা খলীফাকেই বুঝান হয়েছে, সুতরাং ইমাম বুখারী (র) যে অধ্যায়ের আওতায় এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন তার শিরোনাম দিয়েছেন।

---

১. স্মরণ রাখা উচিত যে, খলীফা শুধু শরীয়তের বিধান ব্যাখ্যাকারী বা বর্ণনাকারীর বিধান তৈরিকারী নয়। বিধান হল সেটাই যা আল্লাহ এবং তাঁর রসুল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন খলীফা যদি ইসলামী শরীয়তের সর্বজন স্বীকৃত বিধি ও নীতির বিরোধী কোন নির্দেশ দেন তাহলে সে নির্দেশ পালনীয় নয়। কেননা হাদীসে রয়েছে — لا طاعة إلا في معروف

www.pathagar.com

أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

খলীফার প্রয়োজনীয় গুণাবলী

যেহেতু ওহীয়ে ইলাহী ছাড়াই খলীফাকে নবুওতের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই তাঁকে ঐ সমস্ত আত্মিক, দৈহিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হওয়া উচিত যেগুলোর দ্বারা একজন নবী গুণান্বিত হয়ে থাকেন। তবে একজন খলীফার গুণাবলীর সাথে একজন নবীর গুণাবলীর হুবহু মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই; কেননা মূল মূলই, আর শাখা শাখাই। তবে নবীর ঐ সমস্ত গুণাবলীর প্রতিবিম্ব খলীফার মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বাস্তবতার এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আলিমগণ নিজেদের স্বীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী খিলাফত ও ইমামতের শর্ত নির্ধারিত করেছেন। আল্লামা ইবনে খালদুন এজন্য ৪টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যেমন —

১. ইল্‌ম ¦ যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েল এবং এগুলোর উৎস সম্পর্কে একজন খলীফা জ্ঞান অর্জন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার আহকাম ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। আর আল্লামা ইবনে খালদুন-এর মতে শুধু জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয় বরং খলীফাকে মুজতাহিদও হতে হবে। কেননা অনুকরণ বা অনুসরণ জ্ঞানের অপরিপূর্ণতার পরিচায়ক। আর একজন ইমাম বা খলীফার মধ্যে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২. ন্যায়পরায়ণতা ¦ যেহেতু খিলাফত একটি ধর্মীয় পদমর্যাদা। তাই খলীফার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা অর্থাৎ সত্যবাদিতা ও নেককাজের প্রতি আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। যদি খলীফা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুর সাথে জড়িত হয়ে পড়েন তা হলে তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা মোটেই অবশিষ্ট রইলো না। অবশ্য বিশ্বাসগতভাবে কোন বিদ'আতের সাথে জড়িত হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকল, কি থাকল না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

৩. যথাযোগ্যতা ¦ এর অর্থ হলো, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি কলা-কৌশল, দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজনী তা খলীফার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে।

৪. ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা ¦ একজন খলীফার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকতে হবে যাতে তাঁর কোন মতামত ও কার্যাবলীর উপর অসুস্থতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে। অর্থাৎ, একজন খলীফার চোখ, নাক, কান, হাত, পা — মোটকথা দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম সুস্থ ও সবল হতে হবে। এমনিভাবে

www.pathagar.com

তাকে হতে হবে অদৃশ্য শক্তিসমূহ অর্থাৎ, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উত্তম কলা-কৌশল এবং শান্তশিষ্ট মেজাজের অধিকারী।[১]

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী (মৃত্যু ৪৫০ হিঃ) উপরোক্ত গুণাবলী ও শর্তসমূহকে আরো একটু বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। অবশ্য তিনি এ থেকে 'বংশ'কে বাদ দিয়ে গুণাবলীর মোট সংখ্যা 'ছয়'-এ নির্ধারণ করেছেন।[২] বংশের আলোচনা আগামীতে আসবে।

উপরোল্লিখিত গুণাবলী ও শর্ত সম্পর্কে সবাই একমত। তবে খলীফা হওয়ার জন্য বংশ কি একটি শর্ত হিসাবে গণ্য? যদি তাই হয় তা হলে কি তাকে নবী (সা)-এর বংশধর হতে হবে, না শুধু কুরাইশী হলেই চলবে ?

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তখন থেকেই এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় তা মূলতঃ খুবই সহজ এবং স্পষ্ট।

খিলাফতের জন্য রাসূল (সা)-এর আত্মীয়তার শর্ত

ইসলাম ও আঁ-হযরত (সা)-এর জীবনী যে ব্যক্তি অধ্যায়ন করেছেন তিনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, হুযূর (সা) তাঁর বংশধরদের সাথে পর্থিব সম্মান, মর্যাদা, আরাম-শান্তি অথবা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কখনো কোন স্বাতন্ত্র্য বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নি।

আহ্‌লে বাইত বা হুযূর (সা)-এর পরিবারবর্গের মধ্যে হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা)-কে হুযূর (সা) সবচেয়ে বেশী স্নেহ ও আদর করতেন। আর হযরত আলী (রা) একদিকে ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই, অপরদিকে আপন ঔরষজাত কন্যার স্বামী। দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ যদি ইচ্ছা করতেন তা হলে তাদের জন্য কি না করতে পারতেন। কিন্তু যে পবিত্র সত্তা দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহী লাভ করা সত্ত্বেও দারিদ্র্যকে নিজের জন্য গৌরব বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর নিকট থেকে এর চেয়ে অধিক আর কি আশা করা যায় যে, যখন তাঁর কলিজার টুকরা (হযরত ফতিমা(রা)) অভিযোগ করলেন, 'চাক্কী চালাতে চালাতে আমার হাতে গ্রন্থি পড়ে গিয়েছে' তখন তার জন্য কোন দাসী-বাঁদীর ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তিনি তাঁকে একটি তাসবীহ শিখিয়ে দিলেন।

অতঃপর ইসলাম যেহেতু পৃথিবীতে

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ -

---

১. তারীখে ইবনে খালদুন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১।
২. আল আহ্‌কামুস সুলতানিয়া পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

(নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু) নীতি বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাই বর্ণ, বংশ ও আভিজাত্যের পার্থক্য সমাজে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। হুযূর (সা) স্বীয় ফুফাতো বোন হযরত যয়নব (রা)-কে একজন ক্রীতদাস হযরত যায়েদ ইবন হারিসার সাথে বিবাহ দেন এবং হযরত যায়েদ (রা) তাকে তালাক দিলে পরে নিজেই তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে ইসলামের ঐ উদার শিক্ষার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। অতঃপর এটা কি করে কল্পনা করা যেতে পারে যে, আঁ-হযরত (সা) খিলাফতের বিষয়ে স্বীয় বংশধরদের জন্য কোন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

শুধু এটাই নয় যে, আঁ-হযরত (সা) এ বিষয় কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি বরং বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা)-এর এ ব্যাপারে আশংকা ছিল যে, যদি আঁ-হযরত (সা)-কে নবী পরিবারের খিলাফতের অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তা হলে তিনি 'না' সূচক উত্তরই দেবেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হুযূর (সা)-এর মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় একদা হযরত আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, বিভিন্ন নিদর্শনের দ্বারা আমার মনে হচ্ছে, রাসূল (সা) এই রোগ হতে আর মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। তাই আঁ-হযরত (সা)-এর কাছে গিয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, তাঁর পর খিলাফত আমাদেরকে অর্থাৎ, বনু হাশিমকে প্রদান করা হবে কি? যদি তাই হয় তাহলে হুযূর (সা)-কে তা ঘোষণা করে দিতে বল। হযরত আলী (রা) উত্তরে বললেন, আমি কখনো হুযূর (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব না। কেননা যদি হুযূর (সা) এ ব্যাপারে আমাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেন তাহলে আমরা আর কখনো খিলাফতের আশা করতে পারব না।[১]

এ ছাড়া খিলাফত যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পদমর্যাদা, তাই খলীফাকে আধ্যাত্মিক, দৈহিক এবং চরিত্রগত পূর্ণতা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় সবার শীর্ষে থাকতে হবে। অতএব এটা কি করে সম্ভব যে, খিলাফতকে কোন একটি মাত্র বংশের সাথে ¦ চাই তারা যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, সম্পৃক্ত করে দেয়া হবে। এরূপ করা হলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল স্পিরিট 'গণতন্ত্র'-এর বিপরীত কাজ করা হবে এবং ইসলামী মযহাবও নিঃসন্দেহে পোপতন্ত্রের আকার ধারণ করবে।

আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবারের মধ্যে) হতে যদি হুযূর (সা) খিলাফতের জন্য কারো নাম উল্লেখ করতেন তা হলে তিনি হযরত আলী মুর্তাজা (রা) ব্যতিত আর কে হতেন? খিলাফতের পদ খায়বার বিজেতার জন্যই উপযোগী ও সঠিক হত। তিনি হতেন এর সুযোগ্য অধিকারী। কিন্তু হুযূর (সা) তা করেন নি। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলী (রা) এবং বনু হাশিমও অবগত ছিলেন। কিন্তু কেন? এর পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে।

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭।

www.pathagar.com

১. আঁ-হযরত (সা) এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদিও হযরত আলী (রা) তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার কারণে খিলাফতের সম্পূর্ণ যোগ্য, কিন্তু এ ব্যাপারে আগাম কোন নির্দেশ প্রদান করা হলে মুসলমানদের মধ্যে এই সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, 'খিলাফত পদ' শুধুমাত্র নবী বংশের জন্যই নির্দিষ্ট আর এটা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের প্রকৃত রূপ এবং শিক্ষার পরিপন্থী। তা ছাড়া এ ব্যাপারে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, নবী বংশে সর্বদা আসাদুল্লাহ্ আল-গালিবের মত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করতে থাকবেন।

২. আঁ-হযরত (সা) তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর (সা) ইন্তিকালের পর ঝগড়া-বিবাদ, বিশৃংখলা এবং কুফরী ও ধর্ম ত্যাগের এক বিরাট ঝড় বয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য শুধু ফারূকী শৌর্যবীর্য কিংবা হায়দরী বীরত্বই যথেষ্ট নয় বরং এজন্য দরকার সাহসিকতার সাথে প্রচণ্ডতা, আবেগের সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং কোমলতার সাথে পরাক্রম ও দৃঢ়তা। হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ্যের কথা কে অস্বীকার করতে পারবে? কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) সাকীফায়ে বনী সায়েদায় যখন খিলাফতের জন্য হযরত ওমর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং বলেন, তুমি ওমর' আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী তখন হযরত ওমর (রা) কী সুন্দর ভঙ্গিতে এর উত্তর দেন,

إن قوتي لك مع فضلك [১]

অর্থাৎ আমার সমগ্র শক্তি তো আপনার জন্য উৎসর্গীত এবং আপনার মধ্যে তো মঙ্গলও নিহিত রয়েছে।

খিলাফতের জন্য কুরাইশী হওয়ার শর্ত

এ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল এই যে, খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়াই কি শর্ত? এই বিষয়টি মূলতঃ ইলমে ফিকাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। ইলমে কালামের নয়, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যেহেতু এই বিষয়টির

---

১. ইবনে সা'দ বরাত الصواعق المحرقة পৃঃ ৭। হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতার অবস্থা ছিল এই যে, যখন হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর বাড়ীতে বসে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তাঁর স্নেহ-মমতার কথা উল্লেখ করে আবূ বকরের কাছে নিজের মনোবেদনা ও বিষণ্ণতার কথা প্রকাশ করেন তখন তিনি (হযরত আবূ বকর (রা)) সজোরে ক্রন্দন করে উঠেন, এমনকি তাঁর হেঁচকী শুরু হয়ে যায়। হযরত আলী (রা) তাঁর প্রতি নিজের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করলে তিনি (হযরত আবূ বকর (রা) কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করে পুনঃপুনঃ এ ব্যাপারে ওজর পেশ করতে থাকেন। সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর সাথে যখন হযরত ওমর (রা)-এর তিক্ত কথা কাটাকাটি হয় তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দেন। কিন্তু সাথে সাথে আবূ বকরের ক্রোধের অবস্থা ছিল এই যে, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে হযরত ফারূকে আযম (রা) কিছুটা ইতস্ততঃ করলে তিনি (হযরত আবূ বকর (রা)) তাঁকে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠেন أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام। অর্থাৎ আপনি ইসলামের পূর্বে তো অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কিন্তু ইসলামের যুগে এসে এত দুর্বল হয়ে গেলেন ?

www.pathagar.com

উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাই এটা একটা সাধারণ মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং এ কারণে দার্শনিকগণ এটাকে ফিকহের সীমা থেকে বের করে ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন।

মাওয়ারদী খিলাফতের জন্য যে সকর শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর কুরাইশী হওয়াটা সপ্তম শর্ত, তিনি এটাকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১] আল্লামা ইবনে খালদুনও এই শর্তের উল্লেখ করেছেন। তবে এতে মতভেদ রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

واختلف في شرط خامس وهو النسب القريشي [২]

এবং পঞ্চম শর্ত অর্থাৎ কুরাইশী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।"

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত মাওঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরি (র) مواهب الرحمن হতে বর্ণনা করেছেন,

إنها ليست بشرط عند إمامنا —

"আমাদের ইমাম সাহেবের মতে খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত নয়।" এরপর-

تحرير المختار في المناقضات على رد المحتار —

এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মত।[৩]

ইবনে খালদূনের অভিমত এবং তার প্রমাণাদি

ইবনে খালদূন, এতে মতভেদ রয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তিনি নিজের এই শর্ত সমর্থন করেছেন এবং খিলাফত ও ইমামতের জন্য এটাকে আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে খালদূন এ প্রসঙ্গে যে দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন ক্রমানুসারে তা নিম্নে পেশ হলঃ

১. আঁ-হযরত (সা) ইরশাদ করেছেন, الأئمة من قريش।

২. সাকীফায়ে বনী সা'য়েদায় আনসারগণ যখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-কে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হন তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁদেরকে হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত বাণী স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে তারা নীরব হয়ে যান এবং নিজেদের সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করেন। ঐ সময় কেউ হযরত আবূ বকর (রা)-এর উক্তি খণ্ডন করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশী হওয়ার ব্যাপারে

১. আল-আহ্‌কামুস সুলতানিয়া, পৃঃ ৪।
২. তারীখে ইবনে খালদুন ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।
৩. ফায়দুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৮।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরামদের ইজমা হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা সবাই হুযূর (সা)-এর বাণী الأئمة من قريش সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

৩। সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এ বিষয় অর্থাৎ খিলাফত সর্বদা কুরাইশদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে। এরপর ইবনে খালদুন বলেন, এ ধরনের দলীল প্রচুর রয়েছে। কিন্তু যখন কুরাইশদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আরামপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাওয়ার ফলে তাঁদের বংশ মর্যাদা ও ঐতিহ্য ধূলি-ধূসরিত হয়ে পড়ল তখন খিলাফতের দায়িত্বও তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। তাদের উপর অনারবরা বিজয়ী হল এবং নেতৃত্বের আসন অধিকার করে বসল। এমতাবস্থায় অধিকাংশ চিন্তাবিদের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হল এবং তারা প্রথম হতেই কুরাইশী হওয়ার শর্তকে অস্বীকার করে[১] বসলেন।

আল্লামা ইবনে খালদূনের প্রমাণাদির উপর আলোচনা

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হবে যে, ইবনে খালদূনের তিনটি দলীলের মধ্যে একটিও এমন নেই যা সমালোচনার উর্ধ্বে। সবচেয়ে শক্তিশালী হল তাঁর প্রথম দলিল। কিন্তু (ক) الأئمة من قريش -এর অর্থ কি? অর্থাৎ এটা কি ইন্‌শা إنشاء না খবর خبر বাক্য যদি খবর خبر হয় এবং এর অর্থ এই হয় যে, আঁ-হযরত (সা) এই ঘোষণা দিচ্ছেন, উম্মতের মধ্যে যিনি খলীফা হবেন তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবেন তা হলে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে এই খবর সত্য নয়। কেননা ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক খলীফার আগমন ঘটেছে যিনি দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইমামতের প্রায় সব শর্তই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তিনি কুরাইশী ছিলেন না।

আর যদি ইন্‌শা إنشاء হয় এবং অর্থ এই হয় যে, হুযূর (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা হবে তার জন্য কুরাইশী হওয়া জরুরী, তাহালে ঐ সব রিওয়ায়েতের কি জবাব দেয়া হবে যাতে বলা হয়েছে যে, যদি একজন হাবসী গোলামও তোমাদের উপর নেতৃত্ব করে তবু তোমরা তার আনুগত্য করবে।

عن أنس بن مالك (رض) قال قال رسول الله ﷺ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة –[২]

---

১. তারিখে ইবনে খালদুন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২।

২. সহীহ্ বুখারীর ২য় খণ্ড ঃ কিতাবুল আহ্‌কাম। কারো এই সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, হাদীসে استعمل শব্দ রয়েছে কিন্তু "استخلف" নয়। কেননা ইমাম বুখারী (র) এই রিওয়ায়েতকে যে অধ্যায়ের অধীনে বর্ণনা

www.pathagar.com

"হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে হুযূর (সা) বলেছেন, তোমরা (তার কথা) শ্রবণ কর এবং তার আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের ইমাম বা নেতা এমন একজন হাবশী গোলামও হয় যার মাথা দেখতে কিশমিশের বীজের মত অর্থাৎ কুৎসিত।

যদি কুরাইশী ব্যতীত অন্য কারো ইমামত বা নেতৃত্ব অবৈধ না হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপ নির্দেশ দিলেন কেন?

প্রকাশ থাকে যে ইমাম বুখারী (র) এই বর্ণনাটি كتاب الصلواة এর باب إمامة العبد والمـولى আওতাধীনে বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, যখন একজন গোলামকে ইমামতে কুব্‌রা বা উঁচুস্তরের নেতৃত্বের মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারে তখন তিনি ইমামতে সুগ্‌রা বা ক্ষুদ্রতর নেতৃত্ব অর্থাৎ নামাযে ইমামতী করার যোগ্য হবেন না কেন?

এ ছাড়া সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে,

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين–[২]

'যতক্ষণ পর্যন্ত কুরাইশগণ দীন প্রতিষ্ঠা করবে ততক্ষণ এই বিষয় (খিলাফত) তাদের কাছে বিদ্যমান থাকবে। যে কেউ এ বিষয়ে তাদের সাথে ঝগড়া করবে আল্লাহ্ তাদেরকে অপমানিত করবেন।

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী যদি ধরে নেয়া যায় (ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে) যে, এমন একটি সময় এসেছে যখন কুরাইশদের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা নেই, আর অন্য ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা আছে তবে তিনি কুরাইশী নন। এই অবস্থায় ইমাম নির্বাচন কিভাবে হবে ? যিনি কুরাইশী তিনি দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অযোগ্য এবং যিনি দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যোগ্য দুর্ভাগ্যবশত তিনি কুরাইশী নন। এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করা হবে ? যদি কুরাইশীকে করা হয় তা হলে ما اقاموا الدين এর অর্থ কি হবে ? আর যদি কুরাইশী ব্যতীত অন্য কাউকে করা হয় তাহলে الأئمة من قريش এর অর্থ কি এই যে ইমাম ও খলীফার জন্য কুরাইশ বংশ হওয়া আবশ্যক নয়।

হযরত সালিম (রা) হযরত আবু হুযায়ফা (রা)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুমিষ্টসুরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন তখন লোকেরা বলতে থাকেন[১] ذهب ربع القرآن

করেছেন (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, استعمال এর অর্থ এখানে استخلاف।

১. কিতাবুল আহকাম : বাবুল উমারা মিন কুরাইশ।

www.pathagar.com

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একদিন বলেন لو كان سالم حيا لوليته যদি হযরত সালিম (রা) জীবিত থাকতেন তা হলে আমি তাঁকে আমীর নির্বাচন করতাম। হযরত ওমর (রা) স্বয়ং নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের মধ্যে ছিলেন। যখন সাকীফায়ে বনী সা'আদায় হযরত আবু বকর (রা) الأئمة من قريش এই হাদীসটি পাঠ করেন তখন হযরত ওমর (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতএব তাঁর (হযরত ওমর ফারুক)-এর একজন গোলাম সম্পর্কে অনুরূপ ঘোষণা একথাই প্রমাণ করে যে, হযরত ওমর (রা) আলোচ্য হাদীসের অর্থ কখনো এই মনে করেন নি যে, ইমামের জন্য কুরাইশী হওয়া আবশ্যক এবং অন্য কোন গোত্রের হতে পারবেন না।

এখন প্রশ্ন الأئمة من قريش যখন ইন্‌শা إنشاء ও নয় আবার খবর خبر ও নয় তখন এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক বংশেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট থাকে এবং সাধারণ কথাবার্তায়ও ঐ বৈশিষ্ট্যকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন; আমরা বলে থাকি, উলামা তো দেওবন্দে অথবা ফিরিঙ্গি মহলে হয়ে থাকে, এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, দেওবন্দ অথবা ফিরিঙ্গি মহল ছাড়া অন্য কোথাও উলামা জন্ম গ্রহণ করেন না। এমনিভাবে আঁ-হযরত (সা)-এর বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইমামত এর জন্য যে সমস্ত গুণাবলী ও উৎকর্ষতার প্রয়োজন (যেমন কৌশল, বীরত্ব, সাহসিকতা ইত্যাদি) তার সবই কুরাইশদের মধ্যে আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এ সমস্ত গুণাবলী কুরাইশ ব্যতীত অন্য কোন গোত্র বা বংশের মধ্যে নেই। মোটকথা, ইমামতের পরিধি ঐ সমস্ত গুণাবলী ও উৎকর্ষতা দ্বারা নির্ধারিত হয় যা কুরাইশদের সাধারণ বৈশিষ্ট ছিল, তবে এগুলো পাওয়ার জন্য কুরাইশ বংশধর হওয়া জরুরী।

আল্লামা ইবনে খালদূনের বর্ণনায় পরস্পর বিরোধিতা

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইবনে খালদূন, যিনি কুরাইশী হওয়ার শর্তের জোর সমর্থক তিনি এই আলোচনায় এমন বক্তব্য পেশ করেছেন যার দ্বারা মনে হয় যে, তিনি কুরাইশী হওয়ার শর্তের বিরোধী এবং তার বক্তব্যের সারমর্ম তাই; যা আমরা উক্ত হাদীসের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন,

"এখন আমরা ইমামত ও খিলাফতের জন্য বংশ (কুরাইশ) হওয়ার শর্তের মধ্যে কি হিকমত ও কৌশল রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব, ফলে যা সত্য ও সঠিক তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমাদের কথা হল শরীয়তের সব আহ্‌কামেরই একটি উদ্দেশ্য এবং হিকমত থাকে। কুরাইশ বংশ হওয়ার শর্তের মধ্যে হিকমত শুধু এই নয় যে, হুযূর (সা)-এর সম্পর্কের দ্বারা বরকত ও সৌভাগ্য লাভ করা যাবে যদিও এই বরকত লাভ করা যায় বরং এর মধ্যে এই হিকমতও রয়েছে যে, এর দ্বারা উম্মতের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান থাকবে এবং তাদের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি

১. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

www.pathagar.com

হবে না, কেননা 'কুরাইশ মুদার' গোত্র হতে অধিক প্রভাবশালী ছিল এবং সমগ্র আরব তাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদাকে মেনে নিয়েছেন। অপর পক্ষে মুদার مضر গোত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট ছিল না, তাই তখন খিলাফত যদি কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্রের হাতে চলে যেত তা হলে রাষ্ট্রে বিশৃংখলার সৃষ্টি হ'ত। ইবনে ইসহাক কিতাবুস সিয়ারে এ কথাই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হ'ল যে, তখন কুরাইশী হওয়ার শর্ত আরোপ কতটা বিরোধ মিটানো এবং এক কলিমার স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে ছিল। অতএব শরীয়তের কোন হুকুম কোন দল, যুগ বা জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তিই মুসলমানদের নেতা বা ইমাম হবেন তার জন্য আমরা এ শর্ত আরোপ করব যে, তিনি এমন দল বা বংশের মধ্যে থেকে হবেন যাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত যেমন তখনকার যুগে আরবে কুরাইশদের ছিল।[১]

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা হ'ল, আঁ-হযরত (সা) কুরাইশকে উদাহরণস্বরূপ পেশ করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, একজন ইমাম তার যুগের এমন একটি প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্য হবেন যেমন ¦ কুরাইশ নবুওত ও খিলাফতের যুগে ছিল, যাদের মধ্যে ইমামতের গুণাবলী ও উৎকর্ষতা পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আবূ বকর (রা) সাকীফায়ে বনী সায়েদায় الأئمة من قريش এর দ্বারা যে যুক্তি পেশ করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম যা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন তার অর্থ শুধু এই ছিল যে, ঐ যুগের সামাজিক অবস্থায় ইমামতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও মর্যাদা শুধু কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কুরাইশ ব্যতীত অন্য কেউ ইমাম হলে ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে শক্তি ও ঐক্যের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হ'ত না। এ কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) ঐ সময় তাঁর ভাষণে বলেন অন্য কারো কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের সম্পর্কে আরববাসী পরিচিত নয়।[২]

আর এটা কে না বুঝে যে, যখন কুরাইশদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন সেখানে অন্য কারো ইমামত বা খিলাফতের প্রশ্নই উঠে না।

এখন বাকী থাকল আঁ-হযরত (সা)-এর ঘোষণা ¦ খিলাফত সর্বদা কুরাইশদের মধ্যে থাকবে। প্রথমত এই ঘোষণা একচ্ছত্র ছিল না বরং তা ما عدلوا অথবা ما أقاموا الدين - এর সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া প্রত্যেক বস্তুরই স্থায়িত্ব তার গুণাবলী ও বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। অতএব নবী (সা)-এর হাদীসের প্রকৃত অর্থ হ'ল যতক্ষণ কুরাইশগণ কুরাইশ থাকবে অর্থাৎ স্বীয় গুণাবলী ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ তাদের

---

১. তারিখে ইবনে খালদূন : ১ম খালদূন, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

২. ইবনে জারীর তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬। উপরোক্ত বাক্যের সাথে সাথে এই বাক্যও রয়েছে যে, যদি 'আওস' গোত্রে কোন খলীফা হ'ত তাহলে খাযরাজ গোত্র তা মেনে নিত না। আর যদি খাযরাজ গোত্রের কেউ খলীফা হত তা হলে 'আউস' গোত্র তা মেনে নিত না।

www.pathagar.com

মধ্যে খিলাফতও বাকী থাকবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কুরাইশদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব সর্বদা জন্ম গ্রহণ করতেন তাহলে কার এ সাহস ছিল যে, তাদের হাত থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নেয় ?

খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি

এই ক্রমধারায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল খলীফা নির্বাচন। এজন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, কুরআন অথবা হাদীসে তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। কিছু ইঙ্গিত অবশ্য তেমন রয়েছে যার দ্বারা খুলাফায়ে রাশেদীন এর চিন্তার আলোকে কয়েকটি নীতি উদ্ভাবন করা যেতে পারে। যেমন ¦ পবিত্র কুরআনে রয়েছে أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ "মুসলমানদের যাবতীয় বিষয় পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান করা হবে।"

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে ব্যক্তি স্বার্থ এবং স্বৈরতন্ত্রের কোন অবকাশ নেই। যখন খোদ হুযূর (সা)-কে وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ এর দ্বারা অন্যের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন অন্যদের ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই।

এখন বাকী রইল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি। বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে (যেটাকে Adult franchlise বলা হয়) অথবা গ্রহণ করা যেতে পারে বর্তমানে প্রচলিত পরিষদের প্রতিনিধি বা পার্লামেন্টের সদস্যদের সমমর্যাদা-সম্পন্ন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। পবিত্র কুরআন প্রথম প্রকার অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কদের পাইকারীভাবে ভোটদানের যথার্থতা স্বীকার করে নি বরং দ্বিতীয় প্রকারকে সমর্থন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা উভয়ে কি সমান ?"

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"যদি তোমরা অবগত না হও তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর।"

ইসলাম একটি সততা ও বিশ্বস্ততার ধর্ম। এটা প্রত্যেক বস্তুকেই তার মূল প্রকৃতির কষ্টি-পাথরে বিচার করে এবং শঠতাপূর্ণ বাক্য ও পরিভাষার ভোজবাজিকে মোটেই সমর্থন করে না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, একজন অজ্ঞ, নির্বোধ, দুর্বৃত্ত এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীর ভোটদানের সেই অধিকার থাকতে পারে না, যা একজন জ্ঞানী-গুণী এবং আল্লাহ্-ভীরু ও সৎ-লোকের রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কিভাবে চিহ্নিত করা হবে ? আমাদের যুগে যে সমস্ত লোক জনগণের সাথে সত্য-মিথ্যা অঙ্গীকার করে এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে ভোট যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে তথা এসেম্বলি, কাউন্সিল

www.pathagar.com

অথবা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়, ইসলাম তাদেরকে ঢালাওভাবে চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী বলে আখ্যায়িত করে না বরং ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবী যারা তাদের চিন্তা, গবেষণা, সৎকাজ এবং উন্নত চরিত্রের কারণে জনগণের ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে এবং তারা জাতির কাছে কিছু কামনা করে না। ভোট লাভের জন্য নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী অথবা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কোন দীর্ঘ কর্মসূচী তারা পেশ করে না; এতদসত্ত্বেও ইসলামী মিল্লাত তথা সর্বসাধারণ তাঁদের মেধা ও উন্নত আমলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদেরকে ইমাম ও নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। বস্তুত এরাই হলো সেই লোক কুরআন মজীদ যাদের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

ঐ সমস্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান ছাড়া খলীফার নির্বাচন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। সম্ভবত এই কারণেই হযরত ওমর (রা) তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করে বলতেন, যদি আঁ-হযরত (সা) এগুলোর মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে যেতেন তা হলে তা আমার নিকট পৃথিবী ও এর যাবতীয় বস্তু হতে অধিক প্রিয় হ'ত। আর এই তিনটির একটি হ'ল খিলাফত। এমনিভাবে একদা যখন লোকজন তাঁর নিকট তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করল তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'কারো নাম উল্লেখ করব অথবা করব না ; এ উভয় পথই আমার জন্য উন্মুক্ত। কেননা আঁ-হযরত (সা) কারো নাম উল্লেখ করেন নি, তবে হযরত আবূ বকর (রা) আমার নাম উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এবিষয়ে তাঁর কাছে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি এ বিষয়টি সাধারণ মুসলমান এবং তাদের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন, যেন স্থান ও কাল ভেদে সে পদ্ধতি উত্তম ও পছন্দনীয় হয় তারা তাই গ্রহণ করতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে চার খলীফার প্রত্যেকেরই নির্বাচন পৃথক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন ঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্বাচন এমন একটি নির্বাচনী পরামর্শ সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সকল আনসার ও নেতৃস্থানীয় মুহাজির উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন বক্তৃতার মাধ্যমে আনসারদেরকে আশ্বস্ত করলেন এবং তাদেরকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করলেন যে, কুরাইশদের মধ্যে থেকেই খলীফা নির্বাচিত করতে হবে, তখনই তিনি খলীফা পদের জন্য হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আবূ উবায়দা বিন জারাহ্ এর নাম পেশ করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) বায়'আত করার জন্য তাৎক্ষণাতই হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-কে অনুরূপ করতে দেখে আনসার ও মুহাজিরগণও দ্রুত এগিয়ে এসে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর উক্ত নির্বাচন সাধারণভাবে অথবা কমপক্ষে অধিকাংশের মতানুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা সত্য যে, তা ছিল একটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। এর দ্বারা কোন কোন লোকের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে,

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছে করে হযরত ওমর (রা)-এর মত হঠাৎ কারো হাতে খিলাফতের জন্য বায়'আত করে তখন তা সঠিক এবং বৈধ। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের যুগে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, 'আমিরুল মু'মেনীন (হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর মৃত্যু হয়ে গেল আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত করব। যেহেতু কোন পরামর্শ ব্যতীত ব্যক্তিগত পছন্দের দ্বারা কাউকে খলীফা মেনে নেওয়া ইসলামী শিক্ষার বিরোধী তাই যখন ঐ ব্যক্তির উক্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা)-কে অবহিত করা হ'ল তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়'আতকে একটি বিশেষ উদাহরণ হিসেবে ঘোষণা করে বলেনঃ

فلا يغترن امرئ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت أ لا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى من شرها

"কোন ব্যক্তি ধোঁকায় পড়ে এটা যেন না বলে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত হঠাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা বৈধ হয়েছে। সাবধান! তা অবশ্য হঠাৎ হয়েছিল, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে দ্রুততার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেছেন।

এরপর ফারূকে আযম (রা) বলেন, উপরোক্ত বায়'আত হঠাৎ দ্রুত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা হয়েছিল কার হাতে? তা হয়েছিল নিঃসন্দেহে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর হাতে, যার চাইতে খলীফা পদের অধিক যোগ্য কোন ব্যক্তি ছিল না। হযরত ওমর (রা)-এর প্রকৃত বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر

"এবং তোমাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যার কাছে দূর-দূরান্ত হতে লোকজন আসত।"

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়'আতের উক্ত ঘটনা একটি বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। যদি এই ঘটনা না ঘটত তা হলে স্বয়ং হযরত ওমর (রা)-এর মতে, খলীফা নির্বাচনে একটা বিরাট বিশৃংখলার সৃষ্টি হত। তিনি এটাই মূলনীতি ধরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন, মুসলামানদের সকলের পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو

"যদি কেউ মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তির হাতে বায়'আত করে তাহলে সে ব্যক্তি খলীফা হয়ে যায় না।

প্রথম দিন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন একটি বিশেষ সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল যদিও তা হঠাৎ ও দ্রুত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় সব দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় দিন মসজিদে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন

www.pathagar.com

না যিনি ঐ দিন বায়'আত করেন নি, অথবা কমপক্ষে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা নির্বাচনের পর বায়'আতের দ্বারা সে নির্বাচনের প্রতি সমগ্র মুসলমানের সম্মতি প্রকাশ করা আবশ্যক।

২. রাসূল (সা)-এর খলীফার পর দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচন এইভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, যদিও হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশ্বাস ছিল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য হযরত ওমর (রা)-এর চেয়ে অধিক যোগ্য কেউ নেই। তবুও তিনি এ ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তিনি হযরত ওমর (রা)-এর পক্ষে খিলাফতের অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নেন এবং সাধারণ সভায় তা পাঠ করে শুনাবার জন্য নিজের ভৃত্যকে প্রেরণ করেন। অতঃপর স্বয়ং উচ্চাসনে আরোহণ করে উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি খলীফা হিসেবে হযরত ওমর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করছি, তোমরা কি তাকে পছন্দ কর? সবাই বলল سمعنا واطعنا অর্থাৎ "আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য প্রকাশ করলাম।"

৩. তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা)-এর নির্বাচন এভাবে হয় যে, আহত হওয়ার পর যখন হযরত ওমর (রা) নিজের মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান তখন হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-সহ কুরাইশের ছয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন এবং ওসীয়ত করেন, উপরোক্ত ছয় ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে হতে যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচন করে নেবে। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ইন্তিকালের পর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন পর্যন্ত আলোচনা চলে কিন্তু কোন সমাধান হয় নি। অবশেষে তৃতীয় দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী তিন ব্যক্তি তাঁদের নাম খিলাফতের দাবী থেকে প্রত্যাহার করে নেন। এবার খিলাফতের দাবী ছয় জনের পরিবর্তে তিন জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) ছিলেন অন্যতম। কিন্তু পরে তিনিও আপন নাম প্রত্যাহার করে নেন। অতঃপর মাত্র দু'জনের নাম বাকী থাকে। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং অন্যজন হযরত ওসমান (রা)। এই দু'জন আবার হযরত রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে বিচারক হিসেবে মেনে নেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) নিজেদের এবং সাহাবা কিরাম (রা)-কে নিয়ে মসজিদে সমবেত হন। প্রথমে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) একটি আকর্ষণীয় ভাষণ দেন। অতঃপর বায়'আত করার জন্য হযরত ওসমান (রা)-এর দিকে আপন হাত বাড়িয়ে দেন। সংগে সংগে হযরত আলী (রা) উসমানের হাতে বায়'আত করেন এবং তাঁর বায়'আতের সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরামও বায়'আতের জন্য এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা) সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

৪. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর নির্বাচন অত্যন্ত উত্তেজনাময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের সাথে সাথে ফিত্না-ফাসাদের পথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় বিশৃংখলার ঝড় বইতে থাকে। যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঐ সময় জীবিত ছিলেন তাঁরা ছিলেন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন। অনেকেই মদীনার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছিলেন। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের ছিল জয়-জয়কার। তারা বুক ফুলিয়ে মদীনার অলীতে গলিতে ঘোরাফেরা করছিল। তারাই হযরত আলী (রা)-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু হযরত আলী (রা) প্রথমে তা অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে যখন কঠোরভাবে তার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন ইসলামী ঐক্যকে বিশৃংখলার হাত হতে রক্ষা করার খাতিরেই তিনি তাতে সম্মত হন। কাজে কাজেই তাঁর খিলাফতের ঘোষণা দেয়া হয়। তখন সাধারণ মুসলমান ছাড়াও হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা), যাদের পক্ষ হতে খিলাফতের দাবী উত্থাপনের সম্ভাবনা ছিল, হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। কিন্তু অনেক লোক বায়'আত করে নি। তারা মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। যেহেতু এটা ছিল একটা বিশৃংখলা-যুক্ত নির্বাচন এবং হযরত আলী (রা) শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্য রক্ষার খাতিরে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাই এই নির্বাচনকে শরীয়তের নীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য প্রথম তিনজন খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি হতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

(ক) খলীফার নির্বাচন সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) কয়েকজন বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করার পর খলীফা তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন এবং সঠিক ও সাধারণ মতামতের জন্য তা সর্বস্তরের মুসলমানদের সামনে তা পেশ করা হয়।

(গ) খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সাধারণ মুসলমানদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

(ঘ) কোন খলীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিজের পুত্রের নাম উল্লেখ করা তো দূরের কথা, নিজের কোন আত্মীয়ের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, হযরত আলী (রা) হযরত ওমর (রা)-এর দক্ষিণ-হস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা) ছয় ব্যক্তির সমন্বয়ে যে কমিটি গঠন করেন তাতে হযরত আলী (রা)-এর নাম ছিল বটে, কিন্তু খলীফা পদের জন্য তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু যদি নাম উল্লেখের প্রয়োজন হ'ত তা হলে ওমর (রা)-এর কাছে হযরত আলী (রা) থেকে বেশী উপযুক্ত আর কে ছিল?

www.pathagar.com

(ঙ) মোটকথা, এ ক্ষেত্রে শেষ সিদ্ধান্ত জমহুরই (সংখ্যাগরিষ্ঠ) নিতে পারে। অতএব সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি খলীফা হতে পারবেন না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের যোগ্যতা

সাহাবী মাত্রই ছিলেন ইসলাম ও ঈমানের ব্যাপারে এক একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। তবে ঐ সময়ে বিরাজমান অবস্থায় একটি রাষ্ট্রকে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার জন্য মন ও মানসিকতায় যে পূর্ণতা ও নিপুণতা থাকা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে সব সাহাবী সব পর্যায়ের ছিলেন না, তবে হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত সা'দ (রা) ব্যতীত আরো অনেকেই যে খিলাফতের যোগ্য ছিলেন সে সম্পর্কে খোদ কুরআনই সাক্ষ্য প্রদান করছে ঃ

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

"সমস্ত লোকদেরকে যদি আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি তা হলে তারা নামায প্রতিষ্টা করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করবে। (হজ্জ ঃ ৪১)

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন সাহাবীর সংখ্যা অল্প ছিল না বরং তারা সংখ্যায় অনেক বেশীই ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, উপরোক্ত অবস্থা সত্ত্বেও সর্বশেষ নবী (সা)-এর খিলাফতের দায়িত্ব কেন সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর ন্যস্ত করা হল? এটা শুধু তাঁর সৌভাগ্যের ফল। না এর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কেই বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন ¦

১.সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অধিক সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং উক্ত আয়াতের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর কিরূপ প্রভাব পড়েছিল?

২.আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে কার বন্ধুত্ব সবচেয়ে গাঢ় ছিল ?

৩.নবীর চরিত্রের সাথে কার চরিত্রের সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্য ছিল ?

৪.কার প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর অধিক আস্থা ছিল ?

৫.আঁ-হযরত (সা) কি তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা কারো খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন?

৬.সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন ?

৭.কে আপন কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনিই খিলাফত পদের সর্বাধিক যোগ্য?

নিম্নে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করছি।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ

বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী দ্বারা ইসলামের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। তাঁর জীবনের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এজন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে নবুওতের পূর্বেও যে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল পবিত্র কুরআনে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (الأحقاف)

"ক্রমে সে যোগ্য বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উপরোক্ত আয়াত হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ আঁ-হযরত (সা) বিশ বছর এবং হযরত আবূ বকর (রা) আঠার বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে একসাথে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। তাঁরা পথিমধ্যে একটি মনযিলে অবতরণ করেন। সেখানে একটি কুল গাছ ছিল। হুযূর (সা) ঐ কুল গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। অদূরে একজন পাদ্রী বাস করতেন। ধর্ম সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা) তার কাছে গিয়ে বসলেন। তখন হুযূর (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে পাদ্রী হযরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন "গাছের নীচে উপবিষ্ট ঐ যুবক কে? তিনি উত্তরে বলেন, তিনি হলেন, "মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল মুত্তালিব।" পাদ্রী বললেন, "আল্লাহ্র শপথ তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন। কেননা হযরত ঈসা বিন মার্ইয়াম-এর পর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্য কেউ এই বৃক্ষের নীচে বসতে পারবেন না।" পাদ্রীর এই ভবিষ্যত বাণী হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তরে এমনিভাবে রেখাপাত করে যে অতঃপর তিনি ভ্রমণে কিংবা বাড়ী অবস্থান কালে, মোটকথা কোন অবস্থায়ই হুযূর (সা)-এর সঙ্গত্যাগ করেন নি। পরবর্তীকালে হুযূর (সা) যখন নবুওতের কথা ঘোষণা করেন তখন সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। অর্থাৎ তিনি আঁ-হযরত (সা)-থেকে দু'বছরের ছোট ছিলেন। যখন আবূ বকর (রা)-এর বয়স চল্লিশ বছর তখন তিনি যে প্রার্থনা করেছিলেন তা নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الآية [১]

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ধন-দৌলত অত্যন্ত ঔদার্যের সাথে আল্লাহ্র পথে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। এর সাক্ষী খোদ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

---

১. আসবাবুন নুযূল লিল ওয়াহেদী, পৃঃ ২৮৪।

www.pathagar.com

لا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ -

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (ইসলামের জন্য) অর্থ ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নন; তারা মর্যাদায় ওদের চাইতে শ্রেষ্ঠ যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করছে।" (সূরা আল্ হাদীদ ঃ ১০)

মুহাম্মদ ইবনে ফুদাইল কালবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াত হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথম আল্লাহ্র পথে অত্যন্ত উদার হস্তে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেন।[১] ইমাম আবুল হাসান ওয়াহেদী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা) হতে একটি রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর তা হল একদা হযরত আবূ বকর (রা) একটি আ'বা পরিধান করে আঁ-হযরত (সা-এর নিকট বসেছিলেন। আ'বাটি বুকের উপর দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। তিনি হুযূর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন এটা কেমন ব্যাপার যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর আ'বা বুকের উপর দিক থেকে ছিঁড়ে যাচ্ছে? হুযূর (সা) উত্তরে বলেন, হে জিবরাঈল (আ) ! মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার জন্য ব্যয় করে ফেলেছেন।" তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বলেন, "আপনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন তিনি তাঁর এই দারিদ্রের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট ? হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে তা জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করেন, আমি কি আমার প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব? তা হতে পারে না। আমি আমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার প্রভুর প্রতি সন্তুট।"[২]

উপরোক্ত আয়াতে শুধু ধন-সম্পদ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে তবে অন্য এক আয়াতে অন্যান্য গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - (والليل)

"সুতরাং কেউ দান করলে সাবধানী (পরহিযগার) হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুখদ পরিণামের পথ সহজ করে দেব। (সূরা আল-লাইল ঃ ৫-৭)

আল ওয়াহেদী উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াত নাযিলের কারণ হ'ল হযরত আবূ বকর (রা) গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ওদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল ও অসহায়। একদিন তাঁর পিতা আবূ কুহাফা বললেন, "বৎস যদি তোমার

১. ইযালাতুল খাফা, পৃঃ ৪৮।
২. আসবাবুন নুযূল, পৃঃ ৩০৩।

www.pathagar.com

গোলাম আযাদ করার উৎসাহ থাকে তাহলে সুস্থ সবল এবং যুব বয়সের গোলাম ক্রয় করে আযাদ কর, তা হলে তারা যে কোন সময় তোমার কাজে আসবে।" হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বললেন, "বাবা, সব গোলাম আযাদ করার পিছনে আমার অন্য-উদ্দেশ্য রয়েছে।"[১]

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত বিলাল হাবশী (রা)-কে ক্রয় করে যখন আযাদ করে দেন তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগল আবূ বকরের উপর বিলালের নিশ্চয়ই কোন অবদান ছিল যার প্রতিদানে তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছেন। তখন পবিত্র কুরআন মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘোষণা করে ;

وَ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ - إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ - وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
(الليل : ٢١ــ ١٩)

"এবং কারো প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয় কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ; সেতো সন্তোষ লাভ করবেই।"

রাত জেগে হযরত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার যে ইবাদত করতেন পবিত্র কুরআনে তাঁর উল্লেখ[২] রয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ــ (الزمر : ٩)

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে ও দাড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।

হযরত আবূ বকর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আঁ-হযরত (সা) এর সত্যতা স্বীকার করেন, তখন হযরত ওসমান (রা) হযরত তালহা (রা) হযরত যুবায়ের (রা)-এর অন্যান্যরা তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ঈমান এনেছেন? হযরত আবূ বকর (রা) তখন হাঁ বাচক জবাব দিলে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন, পবিত্র কুরআন এই ঘটনাকেও যে ভাবে বর্ণনা করেছে তাতেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রশংসার ইঙ্গিত রয়েছে।[৩] যেমন ঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ (الزمر: ١٧ــ ١٨)

"অতঃপর (হে মোহাম্মদ সা) সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে যারা মনযোগ সহকারে কথা শুনে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে।" (সূরা আয্‌যুমার)

রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাওর গুহায় সাথী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (التوبة ٩ : ٤٠)

"সে (আবূ বকর) ছিল দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল"। (৯ ঃ ৪০)

---

১. আসবাবুন নুযূল. পৃঃ ৩০৩।
২. আসবাবুন নুযূল, পৃঃ ২৭৬।
৩. আসবাবুন নুযূল, পৃঃ ২৭৬।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াত হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদার একটি বিরাট প্রমাণ। এটা শুধু হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা)-এরই বৈশিষ্ট। অন্য কোন সাহাবী এ মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আঁ-হযরত (সা)-কে যেভাবে সতর্ক করা হয়েছে যেমন¦ একদিন অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম (রা) হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন কিন্তু হুযূর (সা) তাঁর দিকে বেশী মনোযোগ দিলেন না, ফলে

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى

এই আয়াত নাযিল হয়, ঠিক এমনি ঘটনা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ইফ্‌ক (অপবাদ)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা) মিসতাহ্ ইবন আমাসাহ্ (রা)-কে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার শপথ নিলে তাকে সতর্ক করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ والْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا -

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করছে তাদেরকে কিছু দেবে না, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে।" (সূরা নূর ঃ ২২)

হযরত আবূ বকর (রা) এ আয়াত শুনে বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ আমার একান্ত কামনা, আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে সর্বদাই মিস্‌তাহ্‌র যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে যাবেন। যদিও এটা তার জন্য সতর্কতা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল আরবের ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ। পবিত্র কুরআনে এরও উল্লেখ রয়েছে। শুধু হযরত আবূ বকর (রা) নয় বরং যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকেও তার প্রিয় বান্দাহ্‌দের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ঘটনার আরম্ভ ও সমাপ্তি হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নেতৃত্বে হয়েছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখানকারীদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর্ পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ঃ মায়িদা ঃ ৫৪)

ইমাম বায়হাকী (র) হযরত হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াত হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যখন আরববাসী ধর্ম ত্যাগ করে তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সাথীদের নিয়ে উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। ইউনুস ইবনে বুকাইর হযরত কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, আয়াত হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কেননা তিনিই আরবের ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।[১]

আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব

আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে কার বন্ধুত্ব সবচেয়ে গাঢ় ছিল? সমাবেশ ও নির্জনতায় কে সবচেয়ে বেশী হুযূরের সঙ্গী ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই স্পষ্ট। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলামের পূর্বেও তিনি হুযূরের অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও হযরত আবূ বকর (রা) একদিনের জন্য হুযূর থেকে পৃথক হননি। মক্কা অবস্থানকালে অন্যান্য লোক হাবশায় হিজরত করেছিল, কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হুযূর (সা)-এর সাথে মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন। যখন মদীনায় হিজরতের সময় আসে তখন হযরত ওমর (রা)-সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় চলে যান। কিন্তু হযতর আবূ বকর (রা) যান নি। তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর সাথেই মদীনায় হিজরত করেন। এমনিভাবে ভ্রমণ ও অবস্থানকালে তিনি হুযূর (সা)-এর সাথী ছিলেন। যে সমস্ত জিহাদে হুযূর (সা) অংশ গ্রহণ করতেন হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাঁর সাথে থাকতেন। কোন কোন জিহাদে সাহাবিগণ হযরত আবূ বকর (রা)-কে প্রেরণ করার কথা বললে হুযূর (সা) বলতেন "না, তিনি আমার সাথে থাকবেন তাঁকে আমার প্রয়োজন।" হুযূরের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য থেকে হযরত আবূ বকর যে মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলেন তা পাওয়ার সুযোগ অন্য কোন সাহাবীর হয় নি।

---

১. আস্ সাওয়ায়েকিল মাহ্‌রিকাহ্, পৃঃ ৯।

www.pathagar.com

হুযূর (সা)-এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য

দীর্ঘদিনের নৈকট্য ও সান্নিধ্য, সর্বোপরি নিজের স্বাভাবিক যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কারণে হযরত আবূ বকর (রা) যে পরিমাণ নবুওতী জ্ঞান ও স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন অন্য কেউ সেরূপ হতে পারেন নি। হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত (সা)-এর স্বভাব-চরিত্রের যেন একই ধাঁচে গড়ে উঠেছিল। অভ্যাস, স্বভাব এবং কোমলতার দিক দিয়ে হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) পরস্পরের অতি নিকটবর্তী ছিলেন। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এখানে স্বভাব-চরিত্রের সাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, শরীয়তের মূল আহ্কাম ও মাসায়েল সম্পর্কে নয়।

বিখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য তাঁর জামা দান করার অনুরোধ জানালে হুযূর (সা) সে অনুরোধ রক্ষা করে আপন জামা প্রদান করেন। এর পর আবদুল্লাহ্ (রা) জানাযার নামায পড়াবার জন্য হুযূর (সা)-কে অনুরোধ জানালে শান্তির দূত মহানবী (সা) সে অনুরোধও রক্ষা করেন। কিন্তু হুযূর (সা) যখন জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন হযরত ওমর (রা) তাঁর জামা টেনে ধরে আরয করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল; আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ছেন অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। হুযূর (সা) তখন বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

বলে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "যদি তুমি সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আমি ওদেরকে ক্ষমা করব না।" তা'হলে আমি এখন থেকে তাদের জন্য সত্তরবারের বেশী ক্ষমা প্রাথনা করব।" হযরত ওমর (রা) তখন বলেন, 'সে তো মুনাফিক ছিল; কিন্তু আপনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়!"

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّ لاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [১]

"(হে রাসূল (সা)) ওদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো ওর জানাযার নামায ও প্রার্থনা করবার জন্য ওর কবর পার্শ্বে দাঁড়াবেন না।" (সূরা তওবা ঃ ৮৪)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ওমর (রা)-এর অভিপ্রায় অনুযায়ী এই আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এটা হযরত ওমর (রা)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) যা করেছিলেন তা সৃষ্টির প্রতি তার অপরিসীম করুণার কারণেই করেছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন 'রাহ্‌মাতুললিল আলামিন'। এটা ছিল তার উত্তম স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। যেহেতু এই গুণের মধ্যে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে হযরত ওমর (রা)-এর খুব একটা সাদৃশ্য ছিল না, তাই আঁ-হযরত (সা)-এর

---

১. সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭৩।

www.pathagar.com

উপরোক্ত কাজে তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সাথে এক্ষেত্রে হুযূরের সামঞ্জস্য ছিল বলে তিনি (আবূবকর) তাতে মোটেই বিস্ময়বোধ করেন নি।

এই ধরনের একটি ঘটনা হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও ঘটেছিলো। হযরত আবূ জান্‌দাল (রা) কাফিরদের দ্বারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহৃত ও আহত হয়ে যখন সাহাবায়ে কিরামদের সামনে এসে তার ক্ষতস্থান দেখিয়ে বলেন, "আপনারা কি এ অবস্থায়ও আমাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেবেন, তখন উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হন। হযরত ওমর (রা) তো আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সোজা প্রশ্ন করেন, আপনি কি সত্যি সত্যি নবী নন? ওমর (রা)-এ ধরনের আরো কিছু প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত সেখানে কোন সান্ত্বনা না পেয়ে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসেও ঐ ধরনের কথাবার্তা বলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق —

"হে লোক সকল নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি তার প্রভুর নাফরমানী করেন না। আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী। সুতরাং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

তখন হযরত ওমর (রা) বলেন, তিনি (আঁ হযরত সা) কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ আসব এবং তা তাওয়াফ করব? হযরত আবূ বকর (রা) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ কেন নয়! কিন্তু হুযূর (সা) কি এটা বলেছেন যে, তোমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ্ পৌঁছবে।[১]

আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের মর্মান্তিক খবর শুনে হযরত ওমর (রা)-এর কি অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তখন হযরত আবূ বকর (রা) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ পাঠ করলে পর হযরত ওমর (রা) চোখ যেন খুলে যায়, এমনকি তার মনে হয় যেন, তিনি ইতিপূর্বে এই আয়াত আর কখানো শুনেন নি।

এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) আঁ হযরত (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষার পরশে নিজেকে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রকৃতিতে যেন তিনি হুযূরের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

কার প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর অধিক আস্থা ছিল

হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতিই হুযূর (সা)-এর সর্বাধিক আস্থা ছিল। একদিন হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে সম্বোধন করে

১. সহীহ্ বুখারী ঃ কিতাবুল শুরুত ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৩৮০।

www.pathagar.com

বলেন, "তোমরা উভয়ে যদি পরামর্শের ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ কর তা হলে আমি এর বিরোধিতা করব না।" একবার হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر[১]

"আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে এটা অপছন্দ করেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) কোন ভুল করবেন।"

এই বিশ্বস্ততা ও আস্থার কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর সবচেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমি হুযূর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করি আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? হযরত (সা) তখন বলেন, হযরত আয়েশা (রা)। এরপর জিজ্ঞেস করি, 'পুরুষের মধ্যে কে ? হুযূর (সা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর পিতা।[২]

একদিন হুযূর (সা)-এর খিদমতে একজন মহিলা এসেছিলেন। হুযূর (সা) (তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে) বলেন, পুনরায় আসবেন। মহিলা তখন বলেন, যদি আমি আসি এবং আপনাকে না পাই তখন কি করব? আঁ-হযরত (সা) উত্তরে বলেন ঃ

إن لم تجد ني فأت أبا بكر[৩]

"যদি আমাকে না পান তাহলে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসবেন।" একদিন হুযূর (সা) বলেন ঃ

لا يبقين في المسجد باب الأسد إلا باب أبي بكر[৪]

"মসজিদের ভেতর যতগুলো দরজা আছে, তা বন্ধ করে দেয়া হোক তবে হাঁ হযরত আবূ বকর (রা)-এর দরজা খোলা থাক।"

একবার হুযূর (সা) বলেন,

لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي -[৫]

"যদি আমি উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তা'হলে হযরত আবূ বকর (রা)-কেই বন্ধু গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই আমার সাথী।"

হযরত আবূ বকর (রা) বদর যুদ্ধের মাঠে হুযূর (সা)-এর সাথেই ছিলেন। যখন তিনি যুদ্ধ করার জন্য আবদুর রহমানের এর সঙ্গে যেতে চান তখন আঁ-হযরত (সা) তাঁকে বাঁধা প্রদান করে বলেন, "তুমি এখানে অবস্থান করলেই আমাকে অধিক উপকার পৌছাতে পারবে। (অর্থাৎ পরামর্শ ইত্যাদি দ্বারা)

---

১. আসাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩২।
২. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।
৩. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।
৪. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।
৫. তিরমিযী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৪, আবওয়াবুল মুনাফিক।

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা) তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা কার খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন?

হুযূর (সা) স্পষ্টভাবে খিলাফতের জন্য কারো নাম উল্লেখ করেন নি সত্য, তবে তাঁর কথা ও কাজের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি পরোক্ষভাবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। ধর্মীয় পদমর্যাদার মধ্যে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাকে ইমামতে সুগ্‌রাও বলা হয়। আঁ-হযরত (সা) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি এই পদ হযরত আবূ বকর (রা) কেই প্রদান করেন। তখন হযরত হাফসা (রা)-এর ইঙ্গিতে হযরত হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোমল হৃদয়ের প্রেক্ষিতে আপন পিতার পরিবর্তে ইমামতির জন্য হযরত ওমর (রা) নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হুযূর তা মানেন নি এবং এ ব্যাপারে কারো আপত্তি শুনেন নি। তিনি জবরদস্তির সাথেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেন। উপরন্তু তিনি বলেন,

لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره -

"যে জাতির মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রয়েছেন, সে জাতির ইমামতি হযরত আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সঙ্গত নয়।"

সাহাবায়ে কিরামের জন্য হুযূরের এই বাণীই ছিল যথেষ্ট। তাই দেখা যায়, হযরত আলী (রা) ও হযরত ওমর (রা) যখন আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন তখন তারা প্রথমে তাঁর সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করতেন। অতঃপর উল্লেখ করতেন যে, হুযূর (সা) তাকে নামাযে ইমামতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

হজ্জ-এর আমীর হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদমর্যাদা, হুযূর (সা)-এর জীবদ্দশায়ই এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মর্যাদা একমাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) লাভ করছিলেন।

একদা হুযূর (সা) বলেছিলেন "যদি তোমরা আবূ বকর (রা)-কে আমীর বা নেতা নির্বাচন কর তা'হলে তাঁকে আমানতদার হিসেবেই[১] পাবে।"

জৈনিক ব্যক্তি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করল, 'যদি হুযূর (সা) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করতেন তাহলে কার নাম উল্লেখ করতেন? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম।[২]

মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় হুযূর (সা) একবার বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র এক বান্দা রয়েছে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া অথবা ঐ সমস্ত নিয়ামত যা তার নিকট রয়েছে, যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিলে সে আল্লাহ্‌র নিয়ামতকেই গ্রহণ করে। হযরত আবূ বকর (রা) বুঝে নিলেন যে, এই বান্দাহ্‌র দ্বারা খোদ আঁ-হযরত

---

১. ইযালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪।

২. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩ ঃ অধ্যায়-ফাযায়েলে আবি বকর (রা)।

www.pathagar.com

(সা)-কেই-বুঝান হয়েছে। তাই তিনি হঠাৎ কেঁদে উঠলেন এবং নিবেদন করলেন, "আমাদের সকলের জীবন এবং সন্তান-সন্ততি আপনার জন্য উৎসর্গ হোক।" আঁ-হযরত (সা) বললেন, "হে আবূ বকর (রা), একটু থামো। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন, "এই মসজিদের যে কয়টি দরজা আছে সবগুলো বন্ধ করে দাও তবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দরজা খোলা রাখো। কেননা আমার সহচরদের মধ্যে তাঁর চাইতে উত্তম কেউ আছে একথা আমি জানি না।[১]

আঁ-হযরত (সা) তাঁর মৃত্যু-শয্যায় একবার এতটুকু ইচ্ছা করেছিলেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ওসীয়ত লিখে দেবেন কিন্তু হুযূর (সা) শেষ পর্যন্ত তার এই ইচ্ছাকে এই জন্য বাস্তবায়ন করেননি, যাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা চালু হয়ে না যায়। কেননা এরূপ হলে সর্বসাধারণ নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

قال لي رسول الله (ص) في مرضه أدعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر -[২]

হুযূর (সা) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বললেন, "তোমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা) এবং তোমার ভাইকে আমার নিকট ডেকে আন। আমি একটি ওসীয়ত লিখে দেব। কেননা আমার ভয় হয় যে, কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে এবং কোন সময় একথা বলে বসবে যে, আমি শ্রেষ্ঠ অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের নিকট হযরত আবূ বকর (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, বৃহস্পতিবার দিন (অর্থাৎ ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে) আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। হুযূর (সা) তখন বলেন, "আমার কাছে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেব যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ না কর। লোকজন হতবাক হয়ে গেল যে, আজ হুযূর (সা)-এ কিরূপ কথা বলছেন। তারা দ্বিতীয়বার হাযির হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, হুযূর (সা)-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। তখন হুযূর (সা) বললেন, আচ্ছা ! তোমরা আমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর হুযূর (সা) তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করলেন। এক ঃ মুশরিকদের জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। দুই ঃ বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে যেরূপ ব্যবহার করতে এখনও সেরূপ ব্যবহার কর। তৃতীয় ওসীয়তের কথা হুযূর (সা) হয়ত ইচ্ছাকৃত ভাবেই বলেন নি অথবা বর্ণনাকারী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি হল, আমিই তা ভুলে গেছি।[৩]

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড ৪০৪।

২. সহীহ মুসলিম,২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩, অধ্যায়-ফাযায়েলে আবি বকর (রা)।

৩. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৩৮। অধ্যায় হুযূর (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি ও ইনতিকাল।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এই বর্ণনা অন্যত্র যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো।

"যখন হুযূর (সা)-এর ব্যাথার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে কাগজ নিয়ে এস, আমি কিছু ওসীয়ত লিখে দেব। ফলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। হযরত ওমর (রা) বললেন হুযূর (সা)-এর ব্যথা খুবই বেড়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের নিকট তো আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে এটাই আমাদের যথেষ্ট। এর উপর বিরাট মতানৈক্য ও গন্ডগোল দেখা দেয়। তখন হুযূর (সা) বলে উঠলেন 'আচ্ছা, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমার সামনে ঝগড়া করো না। ঐ সময় হুযূর (সা)-এর ওসীয়ত লিখতে না পারার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর খুবই আক্ষেপ হয়। পরবর্তী সময়ে যখনই তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করতেন তখনই তিনি এই আক্ষেপ প্রকাশ করতেন।[১]

উপরোক্ত রিওয়ায়েত থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মতানৈক্যের কারণেই সেদিন হুযূরে (সা)-এর পক্ষে কিছু লিখা বা লিখিয়ে দেয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কি ছিল যা হুযূর (সা) লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কোন কোন মুহাদ্দিসের ধারণা, কিতাবুল আহকামেরই কোন বিষয় হবে। কারো কারো মতে আঁ হযরত (সা) সেদিন খিলাফত সম্পর্কে কিছু ওসীয়ত করতে তথা খলীফাদের নাম লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[২]

আমাদের কাছে দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত আঁ-হযরত (সা) ঐ সময় আবূ বকর (রা) এর খিলাফত সম্পর্কে ওসীয়ত করতে চেয়েছিলেন। সহীহ্ মুসলিম-এর বরাতে হযরত আয়েশা (রা)থেকে যে রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। রিওয়ায়েতটি সহীহ্ বুখারী শরীফেও আছে।[৩] কিন্তু যেহেতু বাক্যের মধ্যে সন্দেহ খোদ বর্ণনকারীর হয়েছে তাই তিনি এই সাথে নিজের সন্দেহের কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাহোক প্রারম্ভিক কথা, যা হুযূর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তা হল ঃ

لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد -

"আমি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছি যে, আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পুত্রকে ডেকে এনে খিলাফতের জিম্মাদারী তাঁদের হাতে সোপর্দ করবো।"

মোটকথা বুখারী ও মুসলিমের উপরোক্ত রিওয়ায়েতের আলোকে এ ধারণা করা সঙ্গত যে, আঁ-হযরত (সা) মৃত্যু শয্যা থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের ওসীয়ত লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, হুযূর (সা) যখন

---

১. কিতাবুল ইলম, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২।
২. ফাতুহুল বারী ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮৬।
৩. বুখারী শরিফ ঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৪৬ কিতাবুল মরিদ।

www.pathagar.com

এত শক্ত ব্যথায় ভুগছেন তখন তাকে কিছু লিখা বা লিখিয়ে দেয়ার জন্য কষ্ট দেয়া উচিত হবে কি না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, ব্যথার এত তীব্র কষ্ট আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি।[1]

হাদীসে কিরতাস-এর উপর আলোচনা

উপরে বর্ণিত সহীহ্ বুখারীর হাদীসটিকে হাদীসে কিরতাস (حديث قرطاس) বলা হয়। মাওলানা শিবলী (র) আল-ফারূক নামক গ্রন্থে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এই রিওয়ায়েত সঠিক নয়। কিন্তু আফসোসের কথা এই যে, মাওলানার দলীলসমূহ অত্যন্ত দুর্বল। সেগুলো দ্বারা তাঁর দাবী প্রমাণিত হয় না।

মাওলানা শিবলী (র)-এর দলীলসমূহ হলঃ

১. আঁ-হযরত (সা) কম বেশী ১৩ দিন রুগ্ন ছিলেন।

২. কাগজ কলম চাওয়ার ঘটনা ছিল বৃহস্পতিবারের, যেমন-সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু আঁ-হযরত (সা) সোমবার ইনতিকাল করেন। তাই উক্ত ঘটনার পর হুযূর (সা) চার দিন জীবিত ছিলেন।

৩. ঐ অসুস্থ অবস্থায় হুযূর (সা) অজ্ঞান বা চেতনাহীন হয়ে পড়েছিলেন এমন কথা অন্য রিওয়ায়েতে নেই।

৪. এই ঘটনার সময় বহু সংখ্যক সাহাবী বর্তমান ছিলেন এবং এই হাদীস বিভিন্নভাবে তাদের দ্বারা বর্ণিতও হয়েছে। কিন্তু একমাত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী ঘুণাক্ষরেও অনুরূপ কোন ঘটনা বর্ণনা করেন নি।

৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বয়স ছিল তখন ১৩ বা ১৪ বছর।

৬. সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, এই ঘটনা যে সময়ের তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, আর তিনি এ ঘটনা কার কাছ থেকে শুনেছেন তাও জানা যায়নি।

৭. সব রিওয়ায়েতেই উল্লেখ আছে যে, যেমন আঁ-হযরত (সা) কাগজ কলম চাইলেন তখন লোকেরা বললেন, হুযূর (সা) প্রলাপ বকছেন।[2]

এবার উপরোক্ত দলীলসমূহের বাস্তবতা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১. ক্রমিক নম্বর এক থেকে তিন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিশীল যে, মাওলানা শিবলী (র) "هجر" -এর অর্থ "هذيان" বলেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত এখানে هجر এর অর্থ অস্বাভাবিক কথা বলা। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আঁ-হযরত (সা)-তার অসুস্থতার মধ্যে যখন কাগজ কলম নিয়ে আসার নির্দেশ দেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম দুটি কারণে আশ্চার্যান্বিত হন। প্রথমত তাঁদের এই ধারণা হয় যে, আল্লাহ্ না করুন! হুযূর (সা) তো আমাদেরকে এখনই ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না। দ্বিতীয় যখন

---

১. সহীহ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৮৪৩।
২. আল ফারূকঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯-৫০।

www.pathagar.com

কুরআন মজীদ ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্ তাঁদের কাছেই রয়েছে তখন হুযূরের পর পথভ্রষ্ট হওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? যাহোক হযরত ওমর (রা) অথবা অন্য যে কেউ উপরোক্ত অবস্থাকে هجر বলুন না কেন, তিনি এর দ্বারা হুযূরের ঐ আশ্চর্যজনক অবস্থায় কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং আমরা উপরে হাদীসের যে অনুবাদ করেছি তাতে هجر এর অর্থ বলেছি, হুযূর যেন কেমন কেমন কথা বলছেন।

২. ক্রমিক নং চার-এর কোন মৌলিকত্ব নেই। একটি ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা হাযার হাযার হয়ে থাকে; এতদ্বসত্ত্বেও ঘটনার বর্ণনায় প্রত্যক্ষদর্শীর স্পষ্ট উদ্ধৃতি দেয়া হয়। তাছাড়া ঘটনার জন্য একটি দিকও রয়েছে। যেহেতু মাওলানা শিবলী (র)-এর উক্তি অনুযায়ী, ঐ সময় বহূ সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা বাস্তব বিরোধী হলে অন্যান্য সাহাবিগণ নিশ্চয়ই এর বিরোধীতা করতেন। কিন্তু তারা চুপ ছিলেন এবং তাদের চুপ থাকাটা একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা ঐ রিওয়ায়েতকে সঠিক বলেই মানতেন।

৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বয়স তখন ১৩ বা ১৪ বছর ছিল বটে, তবে তিনি বুদ্ধিমান ও বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ

قبض رسول الله (ص) وأنا ختين —

"হাফিয ইবনে হাজার লিখেছেন, কোন ব্যক্তি নিজেকে "ختين" ঐ সময় বলতে পারে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।[১]

৪. মাওলানা শিবলী (র)-এর এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) স্বয়ং ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না, এর প্রমাণ হিসেবে ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি শুধু এতটুকু লিখেছেন, মুহাদ্দিসগণ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস) উপস্থিত ছিলেন না। এখানে মাওলানার একটি মারাত্মক ভুল হয়েছে যেটাকে তিনি "দালায়েলে কেতী'আহ্ (دلائل قطعية) বলেছেন। এর বাস্তবতা শুধু এতটুকু যে, হাদীসের একটি অংশ

فخرج ابن عباس (رض) يقول أن الرزية كل الرزية

এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) উপরোক্ত ঘটনার পর আঁ-হযরত (সা)-এর বাড়ী হতে বের হন তখন أن الرزية كل الرزية বলে বের হন। যদি এটাকে সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ যিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তিনি ঐ ঘটনার সময় জন্মগ্রহণই করেন নি। তা হলে তিনি কিভাবে দেখলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এটা বলে বের হয়েছিলেন। এর উত্তরে হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এই হাদীস বাহ্যিক অর্থের

১. আল ইসাবা ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৩২২।

www.pathagar.com

উপর প্রযোজ্য নয়। এর প্রকৃত অর্থ হল, আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের বেশ কিছু দিন পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) যখন উবায়দুল্লাহ্ এর নিকট এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্তরে নতুনভাবে ঐ বেদনা উপস্থিত হয়। যার ফলে তিনি " أن الرزية كل الرزية " বলে চলে যান।[১] কথা এই পর্যন্তই। এর দ্বারা মাওলানা সাহেব কি বুঝেছেন? হাফিয ইবনে হাজার-এর বর্ণনার দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ঘটনার সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) উপস্থিত ছিলেন না।

যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না তবুও তো এর দ্বারা রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া পড়ে না। কেননা এ অবস্থায় রিওয়ায়েতটি মুরসাল (مرسل) হবে এবং মুহাদ্দিসদের মতে, সাহাবীদের مرسل রিওয়ায়েত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

মাওলানা সাহেব এই রেওয়ায়েতকে হযরত ওমর (রা)-এর মর্যাদা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন যে, এই হাদীস হযরত ওমর (রা)-এর কিতাবে ফাযায়েল كتاب فضائل এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুযূর (সা) যা কিছু লিখে দিতে চেয়েছিলেন তা নবুওত সম্পর্কিত কিছু ছিল না। এই ঘটনার পরও হুযূর (সা) তিনদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যদি তা নবুওত সম্পর্কিত কোন বিষয় হতো তাহলে নিশ্চয় তিনি তা লিখিয়ে দিতেন। يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ এই নির্দেশ অনুযায়ী আঁ-হযরত (সা)-এজন্য আদিষ্টও ছিলেন। হযরত ওমর (রা) এটা উপলব্ধ করেছিলেন। তাছাড়া হুযূর (সা)-এর সাথে চূড়ান্ত মহব্বত এবং পবিত্র কুরআন ও হুযূর (সা)-এর হাদীস বর্তমান থাকা অবস্থায় নিজের ও অন্যান্য সাহাবীদের উপর তার এ ভরসা ছিল যে, কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। অতএব ব্যথার এ তীব্রতার সময় হুযূর কে কষ্ট দিয়ে কিছু লিখানোর কোন প্রয়োজন নেই।

এখানে হাদীসে কিরতাসের (حديث قرطاس) আলোচনা পরোক্ষভাবে এসেছে। মোটকথা উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদিও হুযূর (সা) আপন কোন স্থলাভিষিক্তের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি, তবে তার মনের ঝোঁক যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আবূ বকর (রা) স্বয়ং এ রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। নতুবা তিনি যে মিযাজের লোক ছিলেন তাতে এ পদের জন্য তাকে রাযী করানোই সম্ভব হত না। একদা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যুবায়ের নামক এক দূতের মাধ্যম হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করছিলেন। হুযূর (সা) কি খিলাফতের

---

১. ফাতহুল বারী : ১ম খণ্ড : পৃঃ ১৮৭।

www.pathagar.com

জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম ঘোষণা করেছিলেন ? হযরত হাসান বসরী (রা) প্রশ্নটি শুনেই সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্র শপথ! হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে স্বীয় খলীফা নির্ধারণ করেছিলেন। নতুবা তিনি যে ধরনের আল্লাহ্ভীরু ও বিজ্ঞলোক ছিলেন, তাতে তিনি কখনো খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না।[১]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা

এ পর্যায়ে তেমন বেশী কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। সাহাবী মাত্রই হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তদনুযায়ী তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা হুযূর (সা)-এর যুগে একে অপরের মর্যাদা সম্পর্কে যখন আলোচনা করতাম তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে সবচেয়ে উত্তম বিবেচনা করা হত।[২] আঁ-হযরত (সা) একদা ইঙ্গিতে স্বীয় মৃত্যুর কথা প্রকাশ করলেন, যা সাহাবীদের কেউই বুঝতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) সহজেই তা উপলব্ধি করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এতে তো ক্রন্দনের কিছু নেই। অবশেষে যখন সবাই প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অবগত হলেন তখন স্পষ্টভাষায় সবাই স্বীকার করলেন,

كان أبو بكر هو أعلمنا [৩]

হুযূর (সা)-এর পবিত্র দরবারে বিশিষ্ট কবি হযরত হাসান ইবনে ছাবিত (রা) বলেন ঃ

وهو ثاني اثنين في الغار المنيف وقد — طاف العدو به إذ صعد الجبلا –

"এবং তিনি ছিলেন পবিত্র গুহার সাথী, যখন তিনি পাহাড়ের (ওহোদ পাহাড়) উপর আরোহণ করেন তখন শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলে।"

وكان حب رسول قد علموا — من البرية لم يعدل به رجلا –

"এবং তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর প্রিয় পাত্র। সকলেই জানে যে, সমগ্র বিশ্বে তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তি নেই।"

হুযূর (সা) এ কবিতা শুনে মুচকি হাসেন, যার ফলে তার পবিত্র দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, "হে হাসান, তুমি সত্য বলেছ। তিনি (হযরত আবূ বকর (রা) এরূপই।[৪]

---

১. আল-আমামাতু ওয়াসসিয়াসাতু ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২।
২. সহীহ বুখারী ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৫১৬ ঃ অধ্যায়-ফাযলে আবি বকর বা'আদান নবী (সা)।
৩. সহীহ বুখারী ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৫১৬।
৪. ইবনে সা'দ ঃ তাযকিরায়ে আবি বকর (রা)।

www.pathagar.com

খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

হযরত আবূ বকর (রা) যে সময় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সে সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সংকটময়। তখন সবচেয়ে বড় যে ক্ষতটি তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল হুযূর (সা)-এর ইন্তিকাল। পৃথিবীকে এই আকস্মিক ঘটনাটি তাদের অন্ধকার করে দিয়েছিল। মদীনায় মুনাফিকদের একটি দল বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার এবং ধর্মত্যাগীদের বিশৃংখলা হুযূর(সা)-এর জীবদ্দশায়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এবার তারা ঐ জ্বলন্ত কয়লা থেকে জাহান্নাম তৈরীর সপ্ন দেখতে লাগল। মদীনার নেতৃত্ব যে সমস্ত গোত্রের কোন মতেই পছন্দ হচ্ছিল না তারা এবার উঠেপড়ে লাগল। মোটকথা তখন সংকটের পাহাড় যেন রাসূল (সা)-এর খলীফার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুসলমানদের এমনি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে আমাদের উপর করুণা না করতেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।[১] হযরত আয়েশা (রা) বলেন ;

হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমার পিতার উপর এমন সব আকস্মিক বিপদ আপতিত হয় যে, যদি তা কোন বিরাট পাহাড়ের উপর নাযিল হত তাহলে সে পাহাড়ও টুকরা টুকরা হয়ে যেত। একদিকে মদীনায় মুনাফিকদের উৎপত্তি অন্য দিকে আরবের প্রায় সর্বত্র ধর্ম ত্যাগের হিড়িক।[২]

এ সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদ ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হযরত আবূ বকরের সামনে ছিল। হুযূর (সা) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সে বাহিনী 'জাফর' নামক স্থানে পৌঁছার পর হুযূর (সা)-এর চরম অসুস্থতার খবর শুনে সেখানে থেমে যায়। যাহোক হুযূর (সা) শেষ পযর্ন্ত ইন্তিকাল করেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আলোচনা

এখন প্রশ্ন হল, ঐ দলকে যে মহৎকাজে প্রেরণ করা হয়েছিল এখন সে কাজে তাদেরকে প্রেরণ করা হবে, না প্রথমে ধর্মত্যাগীদের দমন করা হবে? তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সাহাবায়ে কিরাম হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে আপনার সামনে যারা রয়েছে তারাই মুসলমান। অপর দিকে আরবের চতুর্দিক থেকে শত্রুরা আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অতএব এসময়ে মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা ঠিক

---

১. ফাতূহুল বুলদান ঃ পৃঃ ১০১।
২. ফাতূহুল বুলদান ঃ পৃঃ ১০২।

www.pathagar.com

হবে না।[১] কিন্তু যিনি খোদ রাসূল (সা)-এর খলীফা ছিলেন, সংকটের এই সমুদ্র কি তাঁকে বাধা প্রদান করতে পারে? তাঁর সামনে সর্বপ্রথম জরুরী যে দায়িত্ব ছিল তাহ'ল হুযূর (সা) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে যে মহৎ কাজে হাত দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করা এবং কোন মতেই তা অর্ধ সমাপ্ত না রাখা। হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে সাহাবীদেরকে বলেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমাদের জীবন, মদীনা যদি লোক শূণ্যও হয়ে যায় এবং আমি একাকী হয়ে পড়ি, আর কুকুরগুলো আমাকে ছিড়ে কেড়ে খেতে থাকে, তবুও হযরত উসামা (রা)-কে হুযূর (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি এই মহৎ কাজে প্রেরণ করিবই।[২]

রাসূল (সা)-এর খলীফার এই অলংঘনীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) আনসারদের পক্ষ থেকে আরয করলেন, যেহেতু এই সেনাদলে অনেক প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সাহাবী রয়েছেন এবং হযরত উসামা (রা) একজন যুবক মাত্র, তাই কোন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই দলের নেতা নির্ধারণ করা উচিৎ। হযরত আবূ বকর (রা) এটা শুনে ক্রোধে একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, আশ্চর্যের কথা যে, খোদ রাসূল (সা) হযরত উসামা (রা)-কে দলের নেতা নির্বাচিত করেছেন, অথচ তোমরা বলছ এখন আমি তাঁকে সে পদ থেকে অপসারণ করি।" হযরত ওমর (রা) এ কথা শুনে ফিরে যান এবং লোকদের বলেন যে, তাদের কারণেই তাকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছ থেকে অপ্রিয় কথা শুনতে হল।[৩]

হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী রওয়ানা

মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা) সাধারণ্যে ঘোষণা দিলেন, হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনীতে যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল তাদের কেহই যেন পিছনে পড়ে না থাকে, সকলেই যেন "জরফ" নামক স্থানে গিয়ে পৌছে। তিনি নিজেও সেখানে পৌছে বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। বাহিনী রওয়ানা হলে পর তিনি বিদায় জানাতে গিয়ে তাদের সাথে সাথে হাটতে থাকেন। হযরত উসামা (রা) তখন ঘোড়ার উপর থেকে বলেন, হয় আপনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করুন নয়ত আমিও পদব্রজে চলি। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ তুমি অবতরণ কর না এবং আমিও কখনো আরোহণ করব না। আল্লাহ্র পথে কিছু সময়ের জন্য আমার পা না হয় ধূলি-যুক্ত হচ্ছে তো তাতে কি হয়েছে? গাযীদের প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে তো সাত্ শত পূণ্য লিখা হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি হযরত উসামা (রা)-কে বলেন, "তুমি যদি অসুবিধা মনে না কর

---

১. ইবনে জারীর তিবরী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬১।
২. তাবারী : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬১।
৩. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬২।

www.pathagar.com

তাহলে হযরত ওমর (রা)-কে আমার কাছে ছেড়ে যাও, আমার, তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন আছে। হযরত উসামা (রা) সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বাহিনীকে একটু থামিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান হিদায়াত প্রদান করলেন। (যথাস্থানে এর উল্লেখ করা হবে) বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল।[১]

বাহিনী প্রেরণের গুরুত্ব

এই বাহিনী প্রেরণের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক, যেমন গাযওয়ারে মূতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আরব সিরিয়ার সীমান্তের এক সরদার শারাহবিল ইবনে আমর আঁ-হযরত (সা)-এর এক দূত হযরত হারিস ইবনে উমাইর (রা)-কে হত্যা করে ছিল। আঁ-হযরত (সা) তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত সবাই একের পর এক ঐ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন এবং বাহিনী কোনমতে মদীনায় ফিরে আসে, মুসলিম বাহিনীর এই পরাজয়ে আরব ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার নেতৃস্থানীয় খৃস্টান গোত্রসমূহের দুঃসাহস এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তারা মদীনা পর্যন্ত আক্রমণের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এমনকি মদীনায় তাদের আক্রমণের আশংকা এরূপ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল যে, একদিন (ইলার ঘটনায়) উতবান ইবনে মালিক হযরত ওমর (রা)-এর নিকট হঠাৎ এসে বলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রা) শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি বলো? খৃস্টান বাহিনী কি এসে গেছে? খোদ আঁ-হযরত (সা)-এর নেতৃত্বে গাযওয়ায়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল তা ইসলামের শত্রুদেরকে দমন এবং যায়েদ ইবনে হারিসা ও অন্যান্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল। কিন্তু অবস্থা এরূপ প্রতিকূল হয়ে পড়ে ছিল যে, তিনি তাবুক থেকেই ফিরে আসেন। মোটকথা তখন এ সমস্ত গোত্রের ক্ষমতা ও দম্ভ খর্ব করার প্রয়োজন ছিল, হুযূর (সা) এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এতে যত বিলম্ব হবে ততই ঐ সমস্ত লোকদের সাহস বেড়ে যাবে। তাই তিনি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) উসামা-বাহিনীর গুরুত্ব এবং এর পিছনে আঁ-হযরত (সা)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞাত ছিলেন তাই তিনি যখন ঐ বাহিনীকে বিদায় প্রদান করেন তখন অন্যান্য কথার সাথে বাহিনী প্রধানকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাসূল (সা) তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন হুবহু তাই পালন করিবে। দেখ, এর মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়।

এক্ষেত্রে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ কি ছিল ? তাঁর নির্দেশ ছিল যে,

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৬২।

www.pathagar.com

أن يوطي الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين

"ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বালকা ও দারুম নামে যে অঞ্চল রয়েছে মুসলিম বাহিনী সেগুলিকে পর্যুদস্ত করে আসবে।"

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ

وأمره أن يوطي من أبل الزيت من مشارف الشام الأرض بالأردن —

"জর্দান ভূখণ্ড যা সিরিয়ার সীমান্তের আবিল আয যায়ত এলাকায় অবস্থিত তা পর্যুদস্ত করবে।

যাহোক এক হাযার অশ্বারোহীসহ আনসার ও মুহাজিরদের তিন হাযার সৈন্যের এক বাহিনী রওয়ানা হয় হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের ১৯ দিন পর) তারা মদীনার উত্তর দিকে সেখানে কাযাআ' গোত্র বাস করত সেখানে পৌঁছে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যখন তারা "ওয়াদিউল কুরা" নামক স্থানে পৌঁছে তখন হযরত উসামা (রা) পূর্বাহ্নেই দু'জন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। গুপ্তচরগণ অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে ওয়াদিউল কুরা থেকে দু'দিনের দূরত্বে, আবনা নামক স্থানে পৌঁছেন ইতিমধ্যে হযরত উসামা (রা)ও বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছে যান। গুপ্তচর অবস্থা সন্তোষজনক বলে উসামাকে অবহিত করেন। তখন হযরত উসামা (রা) হঠাৎ আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় তিনি বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

বাহিনীর উদ্দেশ্যে হযরত উসামা (রা)-এর ভাষণ

"হে ইসলামের মুজাহিদবৃন্দ! আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে যাও। শত্রুরা যদি পলায়ন করে তবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আস্তে কথা বলবে, আল্লাহ্কে অন্তরে স্মরণ রাখবে যখন তলোয়ার খাপ থেকে বের করবে তখন যে শত্রুরা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তরবারী উঠাবে তাদেরকে পরাভূত না করা পর্যন্ত ঐ তরবারী খাপের মধ্যে পুনরায় ঢুকাবে না।

এই ভাষণের পর আক্রমণ শুরু হয়। শত্রুগণ মুকাবিলা করেনি তাই মুসলমানদের বিজয় ঘোষিত হয়। ঐ সময় হযরত উসামা (রা) 'সাবহা' নামক একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন যার উপরই তাঁর পিতা হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা শাহাদত বরণ করেছিলেন। স্থানীয় লোকজন হযরত যায়েদের হত্যাকারীর চিহ্নাদি (হযরত উসামার (রা)-এর কাছে) বর্ণনা করলে তাকে পাকড়াও করে বাহিনী-প্রধানের সামনে আনা হয় এবং তাঁর নির্দেশেই তার শিরচ্ছেদ করা হয়। এভাবে গাযওয়ারে মৃতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছিল। আবনা নামক স্থানে একদিন অবস্থান করে হযরত উসামা (রা) বাহিনীর লোকদের মধ্যে শরীয়ত অনুযায়ী গনীমতের মাল বণ্টন করে দেন এবং পরদিন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ওয়াদিউল কুরা হয়ে নিরাপদে মদীনায় উপনীত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে একজন মুসলমানেরও প্রাণহানি হয়নি। হযরত উসামা (রা) ওয়াদিউল কুরা পৌঁছে যুদ্ধের সাফল্য ও নিজের

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তনের সংবাদ খলীফার দরবারে প্রেরণ করলেন। এই সংবাদে মদীনায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। যখন উসামার বাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে তখন দেখা যায় হযরত আবূ বকর (রা) ও অন্যান্য সাহাবী ছাড়াও মহিলারা তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। হযরত উসামা (রা) তাঁর পিতার ঘোড়ায় আরোহণ করে অতি মর্যাদার সাথে মদীনায় প্রবেশ করেন। তাঁর সামনে হযরত বারীদাহ্ (রা) পতাকা উত্তোলন করে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্মরণ থাকে যে, এটা ছিল ঐ পতাকা যা হুযূর (সা) তাঁর ইন্তিকালের কয়েকদিন পূর্বে হযরত উসামা (রা)-কে প্রদান করেছিলেন। আর উসামা-বাহিনী প্রেরণের বিরোধিতাকারীদের উত্তর দিয়ে এই পতাকা সম্পর্কেই হযরত আবূ বকর (রা) বলেছিলেন, 'যে পতাকা হুযূর (সা) নিজ হাতে খুলেছেন আমি তা কিভাবে লেপটিয়ে রাখি ?

এই দৃশ্য সবাইকে আত্মহারা করে ফেলে। আর কে বলতে পারে, ঐ সময় নিজ হাতে প্রাণ-প্রিয় নেতার সর্বশেষ বাসনা পরিপূর্ণ হতে দেখে খোদ হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর অন্তরে কি ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল ? আনন্দের আতিশয্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই অবস্থা হয়েছিল যে, তিন বার তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় لا إله إلا هو যদি আবূ বকর (রা) খলীফা না হতেন তা হলে আল্লাহ্র ইবাদত হ'ত না।[১]

যুদ্ধের ফলাফল ও উপকারিতা

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ যুদ্ধের বিরাট উপকারিতা ছিল এই যে, ঐ সময় হিমস্ নামক স্থানে অবস্থানরত রোম সম্রাটের উপর এর এইরূপ প্রভাব পড়ে যে, তিনি রাজ্যের বাতারিকা (বিশফ পাদ্রীদের)-কে একত্রে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, 'দেখুন এরা ঐ সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু আপনারা তা মানেন নি। আপনারা এই আরবদের সাহস বীরত্ব দেখলেন তো?' এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে এরা আপনাদের উপর আক্রমণ করে আবার নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে।[২] এছাড়াও আরব ও সিরিয়ার সীমান্তে তখন যে সমস্ত গোত্র বাস করত এবং হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে যারা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো তাঁদের অন্তরেও এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, যদি মদীনায় ঐক্য অত্যন্ত দৃঢ় না হ'ত তা হলে এই অবস্থায় মদীনা হতে এত দূরে তারা সেনাবাহিনী প্রেরণ করত না। তাদের অন্তরে মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে এক বিরাট ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তারা মুসলমানদের সম্পর্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধকার ডব্লিউ. টি. মন্টেগোমারী এক নিবন্ধে লিখেছেন :

---

১. আংশিকভাবে এই ঘটনার উল্লেখ সকল ইতিহাসেই আছে। আমরা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তারিখে ইবনে আসাকির : ১ম খণ্ড : ১২৩-১২৪ থেকে নিয়েছি।

২. ইবনে আসাকীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

www.pathagar.com

"ইসলামের নবী এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আরব গোত্র পরিপূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে না। হযরত আবূ বকর (রা) এ বিষয়টির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই এর কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।[১]

একটি আলোচনা

সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যেই ঐ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ইবনে আসাকির তো পঁয়ত্রিশ দিনের কথা বলেছেন। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেছে যে, ঐ দু'টি তারিখই ভুল। কারণ ঃ

১. হযরত উসামা (রা) আক্রমণের যে সীমা নির্ধারণ করেন তা সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাল্‌কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মদীনা হতে এর দূরত্ব কোন মতেই ৬০০ হতে ৫৫০ মাইলের কম ছিল না।

২. যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট) ঐ যুদ্ধের সংবাদ শুনে বাতারিকাকে বলেছিলেন; "দেখুন এই সমস্ত লোক (আরব) এক মাসের দূরত্বে এসে আক্রমণ করে আবার ফিরে যাচ্ছে।" হিরাক্লিয়াসের ঐ উক্তি অনুযায়ী মুসলমানদের যাতায়াতে কমপক্ষে দু'মাস ব্যয় হয়েছিল।

৩. এটা প্রমাণিত যে, হযরত আবূ বকর (রা) ঐ বাহিনীকে একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে প্রেরণ করেছিলেন।[২]

৪. এটাও প্রমাণিত যে, তুলায়হার উসকানির কারণেই কয়েকটি গোত্র যাদের বিবরণ পরবর্তীতে আসছে, মদীনা অবরোধ করে সেখানে লুটতরাজ চালিয়েছিল। এটা জমাদিউল আখির মাসে সংঘঠিত হয়েছিল এবং ঐ সময় পর্যন্ত হযরত উসামা (রা) ফিরে আসেন নি। ঐ সমস্ত আক্রমণকারীরা মদীনা আক্রমণের দুঃসাহস করেছিল এই পটভূমিতে যে, তাদের গুপ্তচর দল মদীনা থেকে ফিরে এসে তাদেরকে এই সংবাদ প্রেরণ করেছিল যে, মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা অল্প এবং তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতাও দুর্বল। এ ছাড়া হাফিয ইমাজুদ্দীন ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসামা (রা) ঐ ঘটনার পরই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৩]

ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال

"এই ঘটনার (আরব) কয়েকদিন পর হযরত উসামা (রা) ফিরে আসেন।"

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ নতুন সংস্করণ ঃ ১ম খণ্ড পৃঃ ১১০।

২. আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ পৃঃ ৩০৫।

৩. আল বিদায়া ওয়াননিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।

www.pathagar.com

'আল বিদায়া ওয়াননিহায়া' গ্রন্থে জমাদিউল আখির-এর যে কথা উল্লেখ আছে তা থেকে যদি ঐ মাসের শুরু ধরা হয় তাহলেও তো রবিউস্ সানী এবং জমাদিউল আউয়াল মিলে পূর্ণ দু'মাস হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর চল্লিশ দিনের একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করে সত্তর দিনের অপর একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।[১] আমাদের কাছে এই বর্ণনা খুবই সঠিক এবং গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়। তাবারীর নিম্ন লিখিত বর্ণনায়ও এর সমর্থন মিলে।

وكان فراغه في أربعين يوما سوي مقامه ومنقلبه راجعا -[২]

হযরত উসামা (রা) চল্লিশ দিনের মধ্যেই তার মিশন শেষ করেন এবং তাঁদের অবস্থান ও প্রত্যাবর্তনের দিন ছিল এই চল্লিশ দিনের বাইরে।"

কাজে কাজেই ইসলামিয়াতের বিশেষজ্ঞ ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ এই বাহিনীর ফিরে আসার সময় (সত্তর দিন) লিখেছেন।[৩]

ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ এবং কারণসমূহ

আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর পর মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের এমন হিড়িক পড়ে গিয়েছিল যে, তাতে ইসলামের ভিত্তি প্রায় ধ্বসে পড়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম অবরুদ্ধ হয় পড়েছিলেন। একজন বর্ণনাকারীর মতে, ঐ সময় মুসলমানদের অবস্থা শীতকালের বৃষ্টি মুখর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা বকরীর মতই ছিল।[৪]

কোন কোন ইউরোপীয় লেখক আরবে উদ্ভূত এই বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চান যে, ইসলাম তরবারীর জোরেই প্রচারিত হয়েছিল। ফলে আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী শক্তির মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় এবং আরবের লোকেরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে[৫]। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে তরবারির জোরেই ইসলামে ফিরে আনেন। এই সমলোচনার দিকে দৃষ্টি না দিলেও ইতিহাসের একজন ছাত্রের এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, ইসলাম এমন কি একটা সত্য ধর্ম ছিল যার নেশা যেমন দ্রুত চড়ল, তেমনি দ্রুত নেমে গেল! এ ধারণার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের ঐতিহাসিকরা এই ফিত্নাকে সাধারণভাবে ফিত্নায়ে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগীদের ফিত্না) নামে আখ্যায়িত করেছেন। আমরাও তাদের অনুসরণ করে এখানে "ইরতিদাদ" শব্দ ব্যবহার করেছি।

---

১. আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পৃঃ ২০৪।
২. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৬৩।
৩. বিশ্বনবী রাজনৈতিক জীবন পৃঃ নং-৭৯, মুদ্রণে ইদারায়ে ইসলামিয়া, লাহোর।
৪. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৬।
৫. তারীখুল ইসলাম আস-সিয়াসী : পৃঃ ২৬৯।

www.pathagar.com

কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) ছিল না। সেদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যারা প্রস্তুত হয়ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ঐ সমস্ত লোক যারা ইসলামকে কোন লোভ বা চাপের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করেছিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ইসলাম তাদের গলদেশের নীচে প্রবেশ করে নি, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন কোন বিধর্মীও সমস্ত লোকদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করেন না এবং তাদের বিদ্রোহকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলে মনে করেন।

বিধর্মীদের অভিমত

প্রফেসর ফিলিপ হিট্টি বলেন ; প্রকৃত বিষয় এই যে, যাতায়াতের অসুবিধা, প্রচারকারীদের নিয়ম-শৃংখলার ত্রুটি এবং সময়ের স্বল্পতা (আঁ-হযরত এবং সাহাবায়ে কিরাম ৯ম হিজরী পর্যন্ত গাযওয়া এবং অভ্যন্তরীণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। তাই মদীনার বাইরে প্রচারকারী প্রেরণের সময় খুব কমই মিলেছে) প্রভৃতি কারণে হুযূর (সা)-এর জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের এক তৃতীয়াংশের বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করতে পারে নি। মূল হিজাযের,যা ছিল নবীর প্রচারের প্রধান কেন্দ্র অবস্থা ছিল এই যে, নবীর ইন্তিকালের মাত্র এক বা দু'বছর পূর্বেই সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। বাইরে থেকে যে সকল প্রতিনিধি হুযূর (সা)-এর দরবারে আগমন করত তাদেরকে সমগ্র আরবের মুখপাত্র বলা যেত না এবং কোন প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণের বাস্তবতা এর চেয়ে বেশী ছিল না যে, সে গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন।"[১]

ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে মিঃ জে, ওয়েলহাসেন (Z, wellhausen) এবং প্রফেসার জে কিতানী (Z, caitani)-এর মতে তখন যা কিছু ঘটেছিল তা ছিল স্রেফ রাজনৈতিক বিদ্রোহ, ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।[২]

নবী (সা)-এর ইন্তিকালের সময় আরব গোত্রসমূহ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত

প্রকৃত বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের সময় দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমানরা ছাড়াও তায়েফে বসবাসকারী গোত্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।[৩] তাদের ইতিহাস নিম্নরূপ।

---

১. হিস্টরী অফ দি এরাবস ঃ ১৪১

২. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ নতুন সংস্করণ ঃ ১ম খণ্ড ঃ ১১০।

৩. ঐ সময় কুরাইশ ব্যতীত মক্কা, মদীনা এবং তায়েফের যে সমস্ত গোত্র ইসলামে দৃঢ় ছিল তাদের নাম হলো- মুযিনা, গিফার, জুহায়নাহ, বালা, আশজা, আসলাম এবং খুযা'আ তায়েফের সাকীফ গোত্রও সন্দেহের মধ্যে ছিল কিন্তু সেখানে আঁ হযরত (সা)-এর নিয়োজিত কর্মকর্তা হযরত উসমান ইবনে আস (রা) ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ করেন এবং তাদেরকে বলেন যে, হে সাকীফ বংশধরগণ! তোমরা সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ তাই সর্ব প্রথমে তা ত্যাগ করো না। হযরত উসমান ইবনে আস (রা)-এর কৌশল কাজে লেগে ছিল তাই সমস্ত লোক ইসলাম ত্যাগ থেকে বিরত থাকে (আস সিদ্দীক আবূ বকর মুহাম্মাদ হুসেন ঃ হাইকল ঃ পৃঃ ৮২ মিসরে মুদ্রিত)।

www.pathagar.com

আরব

এক ভাগ হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা মদীনার পার্শ্ববর্তী 'এলাকায় বসবাস করত। যেমন ¦ আ'বস, যাবইয়ান, বনু কিনানাহ্, গাতফান এবং ফাযারাহ্। এ সমস্ত লোকদের নিকট যদিও ইসলামের সুসংবাদ পৌঁছেছিল কিন্তু আঁ-হযরত (সা) যেহেতু ইন্তিকালের দেড় বা দু'বছর পূর্বে একটি পদ্ধতি ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী হিজাযের বাইরে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও প্রচারকারীও নিয়োগ করে ছিলেন। ফলে মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রসমূহ সুসংবাদ শ্রবণ করে ইসলাম গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। হুযূরের খিদমতে থাকার তেমনি সুযোগ তাদের মিলে নি। তাই ইসলামের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা খুব একটা জানতে সক্ষম হয় নি। ফলে তাদের ঈমানও দৃঢ় হয় নি।

পবিত্র কুরআনে ঐ সমস্ত লোকদেরকে আরাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তাদের ঈমান দৃঢ় নয়। সূরাহ্ হুজুরাত-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا - قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ - وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا - إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

'আরবরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম" বলো তোমরা ঈমান আন নি বরং বল, বাহ্যিকভাবে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায় নি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)

এ সমস্ত আরব ও দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলমানদের মধ্যে কি পার্থক্য অতঃপর পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছে, যাতে কারো পক্ষে আরবদেরকে জেনে নিতে কোন অসুবিধা না হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ —

"মু'মিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৫)

এ সমস্ত আরবই পরবর্তীতে যাকাত প্রদানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআন অতি সুন্দরভাবে আরব এবং মু'মিনদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ সমস্ত আরব ইসলামের বাহ্যিক প্রভাব

www.pathagar.com

প্রতিপত্তি এবং এর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করেই নিজেদেরকে মুসলমান বলতে আরম্ভ করেছে, ঈমান এখনো তাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি এবং যেহেতু তারা এখনো বিশ্বাসী হতে পারে নি তাই এখানো তাদের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত নয়।

পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ - قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا - بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا -

"যে সমস্ত আরব জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে রয়ে গিয়েছে তারা তোমাকে বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ওদেরকে বলো, আল্লাহ্ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।" (সূরা ফাত্‌হঃ ১১)

এটাকে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, কুরআনে এ সমস্ত আরবদের ঈমানী দুর্বলতাকেই শুধু উন্মুক্ত করেনি বরং এ বিষয়েরও ভবিষ্যৎ বাণী করেছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে এরা খাঁটি মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইরান ও রোমের মত শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ - فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا - وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا

"যে সব মরুবাসী ঘরে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলো, 'তোমারা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।" (সূরা ফাতাহ ঃ ১৬)

আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, মদীনার নিকটবর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত গোত্র বসবাস করত এদেরকেই পবিত্র কুরআনে আবার বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ -

" মদীনাবাসী এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত আরবদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাবে।"

(সূরা তাওবা ঃ ১২০)

www.pathagar.com

তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যারা সুসভ্য মন-মানসিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের অধিকারী হতে পারে নি। দুষ্ট প্রকৃতির লোক হওয়ার কারণে সাধারণভাবে তাদের মন-মস্তিষ্ক খাঁটি ও সত্য বিষয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তারা ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ ছিল তারাই যারা মনে প্রাণে মু'মিন হয়েছিল এবং অন্য ভাগ ছিল তারা, একাধারে জাহিলী ও ইসলামী আকর্ষণ-বিকর্ষণে ছিল অস্থির। তারা নিজেদের জন্য কোন সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারছিল না। পবিত্র কুরআনে আরবদের ঐ দু'টি শ্রেণী সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণনা রয়েছে ঃ

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ أَجْدَرُ اَلاَّ يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهٖ - وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ - وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"সত্য প্রত্যাখান ও কপটতা আরবরা কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখার জ্ঞানলাভ না করার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আরবদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতিক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদেরই হোক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা তাওবা ঃ ৯৭-৯৮)

وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ - أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"আরবদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে (কিয়ামতের দিন) বিশ্বাস করে, যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও রাসূল (সা)-এর আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই তা ওদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন; আল্লাহ্ ওদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।"

(সূরা তাওবা ঃ ৯৯)

একটু লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হবে যে, প্রথম শ্রেণীর আরবদের চরিত্র এই বর্ণনা করা হয়েছ যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে নিজেদের উপর জরিমানা বলে মনে করে। এতে বুঝা যায়, তারা চরিত্রগতভাবে কৃপণ ছিল অথবা কমপক্ষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার গুরুত্ব তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে পারে নি। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে সত্য, তবে তাদের ইসলাম শুধু বাহ্যিক নামায-রোযারই নাম। তাদের জীবনের মূলনীতি ছিল শুধু স্বার্থলাভ।[১]

১. এ ধরনের একজন আরব ছিলেন তিনি একবার হুযূর (সা)-এর খিদমতে আগমন করেন এবং ইসলাম এর উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি হুযূর (সা)-এর নিকট

www.pathagar.com

এছাড়া আরো একটি বিষয় রয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীর শেষ দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে যাকাত প্রদানের নির্দেশ নাযিল হয়। আঁ-হযরত (সা) ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে এই নির্দেশ প্রচার করেন এবং যাকাত আদায় করার জন্য আদায়কারী দূতদেরকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। ফলে যাকাত সম্পর্কে ঐ সমস্ত আরবদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে নি। এতে সন্দেহ নেই যে, এদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও ছিল কিন্তু এটাও মেনে নিতে হবে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশ এরূপ ছিল, যারা আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর এটা মনে করেছে যে, যাকাত আদায়ের নির্দেশ ছিল শুধু মাত্র হুযূর (সা)-এর জীবিত কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা ঐ নির্দেশ এখনো বলবৎ থাকলেও এটা জরুরী নয় যে, আমরা আমাদের যাকাত মদীনায় প্রেরণ করব। ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করে আমরা নিজেরাই তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করতে পারি। এই মনোবৃত্তির কারণেই তারা নিজেদের যাকাত একত্র করে মদীনায় প্রেরণ করাকে নিজেদের উপর জবরদস্তি মনে করতেন। একবার হযরত আমর ইবনে আস (রা) আম্মান থেকে ফিরে আসার পথে বনু আমেরের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কুররা ইবনে হুরায়রা-এর কাছে তিনি অবস্থান করেন। কুররা তাঁকে অত্যন্ত আদর-যত্ন ও সম্মান প্রদর্শন করেন। আমর ইবনে আস (রা) রওয়ানা হবেন এমন সময় কুররা তাঁকে একাকী ডেকে নিয়ে বলেন, যদি আপনারা (মদীনাবাসী) আমাদের থেকে মাল গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা সব আরববাসী আপনাদের বাধ্যগত হয়ে থাকব। নতুবা আমরা এই ক্ষতি গ্রহণ করব না এবং আপনাদের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করব না। হযরত আমর ইবনে আস (রা) কুরাইশদের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। কুররার এই ধমকানির উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি কি কাফির হয়ে গিয়েছ এবং আমাদেরকে আরবদের ধমকানি দিচ্ছ? আমি তোমাদেরকে ঘোড়া-দ্বারা পদদলিত করে দেব" এই বলে তিনি রওয়ানা হয়ে যান।[১]

আরবদের যে সমস্ত গোত্র মুসলমান হত আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে স্বাধীনতা—বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করতেন। বাযান বা বাধান (বর্ণনার মতভেদ অনুযায়ী) যিনি ইরান সম্রাটের পক্ষ থেকে ইয়ামনের গভর্নর ছিলেন, যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আঁ-হযরত (সা) তাঁর কর্তৃত্ব পূর্ণ বহাল রাখেন। বাহ্‌রাইন ও হাযরামউতের নেতারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন হুযূর (সা) তাদের সাথে ঐ একই ব্যবহার করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, ঐ

বলেন, "আমার বায়'আতকে রহিত করে দিন।" হুযূর (সা) তা অস্বীকার করেন। আরব দ্বিতীয় বার ঐ আবেদন করেন। হুযূর (সা) পুনরায় তা অস্বীকার করেন। তখন আরব ঐ অবস্থায় মদীনা ত্যাগ করে চলে যান। রসূল (সা) তখন বলেন, মদীনা এমন একটি ভাট্টিরমত, যা আসল ও নকলকে পৃথক করে দেয়। (সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ড, ১ পৃঃ ০৭০ অধ্যায়, বায়'আতুল আরাব)।

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৮।

www.pathagar.com

এলাকার সম্পদশালীদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে তা সেখানকার গরীবদের জন্য ব্যয় করা হবে।[১] এই সমস্ত কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত আঁ-হযরত (সা) জীবিত ছিলেন ততক্ষণ এ সমস্ত লোকেরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার ইন্তিকালের পর তারা অনুআবন করে যে, এখন মদীনায় যাকাত প্রেরণ, মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারেরই নামান্তর অতএব নিজেদের গোত্রীয় আভিজাত্যের কারণে তারা এ ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে এই শ্রেণীকে আমাদের ঐতিহাসিকগণ মুরতাদ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুরতাদ হয় নি বরং মুসলমানই ছিলেন। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কারণেই তারা নিজেদের যাকাত মদীনা রাষ্ট্রকে প্রদান করতে সম্মত ছিল না। সম্ভবত একারণেই (যা আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করব) হযরত ওমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পক্ষে ছিলেন না।

অবাধ্য ও বিদ্রোহী গোত্রসমূহ

এ সমস্ত আরবদের ছাড়া অন্যান্য গোত্র ছিল, যারা মদীনা থেকে দূরে আউস এর দক্ষিণে ইয়ামন ও আউসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং উত্তর পূর্ব দিকে আরব ও সিরিয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাস করত। ঐতিহাসিকরা তাদেরকে মুরতাদ বলে উল্লেখ করেন। এর কারণ হল একটি সাধারণ ভুল ধারণা। আর তা হল এই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর পৃথিবী হতে বিদায়ের মুহূর্তে সমগ্র আরববাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাবারী সুদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের সময় আঁ-হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে বায়'আতের ঘোষণার পর সাধারণভাবে কাফিররা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ঝড় শুরু হলে এটাকে ইরতেদাদ ব্যতীত আর কি বলা যাবে? কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, এই গোত্র প্রথম হতে ইসলামের মূল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র কুরাইশ মুসলমান হয়ে যায় এবং মদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আরবদের ঐ সমস্ত গোত্র হুযুর (সা)-এর খিদমতে এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ শুরু করে যে, ৯ম হিজরীর নামই আ'মুল ওয়াকুদ হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত প্রতিনিধি আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট এসে যেভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যদিও প্রত্যেক গোত্রের দু'চারজন জ্ঞানী লোক খাঁটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গোত্রের

---

১. হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা) এবং হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে যখন হুযুর (সা) ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য ইয়ামন প্রেরণ করেন তখন হুযূর (সা) অন্যান্য বিষয়ের সাথে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে এ নির্দেশও প্রদান করেন যে,

أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ -

(সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৩, অধ্যায় আবূ মূসা (রা) ও মা'আয (রা)-কে ইয়ামনে প্রেরণ)।

www.pathagar.com

সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল এই যে, তারা একটি রাজনৈতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং একজন বিজেতার সাথে নিজেদের বিষয়সমূহ সমাধান করে জীবিকা ও রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছে। একারণেই তাদের কথাবার্তায় ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াদির চাইতে পার্থিব বিষয়াদিও ছিল বেশী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ঐ সব গোত্র যদিও ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছিল, কিন্তু আন্তরিকভাবে মুসলমান হতে পারে নি। বরং তারা এই অপেক্ষায় ছিল যে, যখনই সুযোগ মিলবে তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করবে। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পরই তাদের সে সুযোগ আসে এবং শীঘ্রই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আমাদের উপরোক্ত দাবী প্রমাণ করার জন্য নিম্নে আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে ঐ সমস্ত গোত্রের প্রতিনিধিদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করছি যাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করে দেখতে পারেন, আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে তাদের আলোচনার যে পদ্ধতি ছিল তাতে তাদেরকে সত্যি সত্যি মুসলমান বলা যায় কি-না মোটকথা যখন তারা মুসলমানই নয় তখন ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) আবার কিসের?

বনু তামীম

এই বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের মধ্যে যে সমস্ত গোত্র অংশ গ্রহণ করেছিল এদের মধ্যে অগ্রগামী ছিল বনু তামীম ও বনু হানীফা। ৯ম হিজরীতে বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল[১] হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হলে হুযূর (সা) তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেন। তখন তারা বলে উঠে "قد بشرتنا فاعطنا" অর্থাৎ আপনি যখন আমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন তখন কিছু দান করুন। তাদের এই কথায় হুযূর (সা) অত্যন্ত ব্যাথা পান, এমন কি তাতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং বদলে যায়। অতঃপর ইয়ামনের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আগমন করে। হুযূর (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন 'বনু তামীম এই সুসংবাদ গ্রহণ করে নি, কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ কর। তারা বলে উঠলেন "قبلنا يا رسول الله" অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমরা গ্রহণ করলাম।

বনু হানীফা

প্রথম থেকেই ইসলাম ও আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে এই গোত্রের শত্রুতা ছিল। হিজরতের পূর্বে একদা ওকাযের মেলায় হুযূর (সা) অন্যান্য গোত্রের লোক ছাড়াও বনু হানীফা গোত্রের লোকদের কাছে গমন করেন। কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত

১. বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৬, অধ্যায়-বনী তামীমের প্রতিনিধি দল।

www.pathagar.com

অভদ্র আচরণ করে।[১] মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যে ইমামাহ নামক একটি স্থান রয়েছে। বনু হানীফা গোত্র সেখানেই বাস করত। মুসায়লামা কায্যাব ছিল ঐ গোত্রেরই লোক। সে পরবর্তীকালে নবুওতের দাবী করে। ঐ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল একদা হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। মুসায়লামাও তাদের সাথে ছিল। সে বলেছিল, যদি "মুহাম্মদ (সা) আমার সাথে এই অঙ্গীকার করেন যে, তাঁর পর আমি নেতা হ'ব তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব।" হুযূর (সা)-এর হাতে তখন খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি তা নিয়ে মুসায়লামা ও তার সাথীদের কাছে যান এবং বলেন, "যদি তোমরা আমার কাছে এই ডাল খানাও চাও তবু তা আমি তোমাদেরকে দেব না।"[২]

সামামা ইবনে উছাল ছিলেন এই গোত্রেরই একজন নেতা। হিজরতের পূর্বে যদিও তিনি মক্কায় হুযূর (সা)-এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ[৩] করেছিলেন এবং ৪র্থ হিজরীতে তারই এলাকায় আমের ইব্‌নে তুফায়েল মুসলিম প্রচারক ও অতিথিদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছিল, তবু ৯ম হিজরীতে তাকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসা হলে আঁ-হযরত (সা) তাকে মাফ করে দেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন বনু হানীফার জনৈক ব্যক্তি নিজস্ব ধর্ম ত্যাগের কারণে তাঁকে তিরস্কার করে, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামের উপর অটল থাকেন এবং প্রখ্যাত সাহাবীদের মধ্যেই পরিগণিত হ'ন।[৪]

মুদার

মুদার হচ্ছে ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এরা কুফরীর কাজে এত কঠোর ছিল যে, যারাই হুযূর (সা)-এর খিদমতে আসার চেষ্টা করত তারা তাদের পথেই বাধার সৃষ্টি করত। একদা আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর (সা) এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করে, হুযূর আমরা "রাবিয়া" গোত্রের লোক আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের কাফিররা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫] তাদের এই কঠোর সত্যদ্রোহিতার কারণেই হুযূর (সা) একদা তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন।[৬]

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।
২. সহীহ্ বুখারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬২৮।
৩. ইসাবা তাযকিরায়ে সামামা।
৪. বুখারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৮। যদিও তাবারী ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়ে সামামা ইবনে উছাল-এর নাম মুরতাদীন-এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন (দ্রষ্টব্য তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩২) কিন্তু আমরা তো বুখারীর মুকাবিলায় ওয়াকিদীর বর্ণনাকে সহীহ হিসেবে মেনে নিতে পারি না।
৫. বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৭।
৬. আল্ ইকদুল ফরীদ ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৭ (নতুন সংস্করণ)।

www.pathagar.com

দূস

দূস হচ্ছে ইয়ামের একটি গোত্র। ৯ম হিজরীতে তোফায়েল ইবনে আমর আসদূসী হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন, হুযূর, দূস গোত্রের লোকেরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করে না, বরং তারা বিশৃংখলা সৃষ্টিতে তৎপর। আপনি তাদের জন্য বদ দো'আ করুন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) তখন দু'আ করলেন "হে আল্লাহ" তুমি দূস গোত্রকে পথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দাও।"[১]

নাজরানবাসী

নাজরান মক্কা হতে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটা খৃস্টানদের একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। এই শহরের দু'জন নেতা আকিব এবং সাইয়িদ হুযূর (সা)-এর সাথে 'মুবাহালা' করার জন্য মদীনায় আগমন করে। কিন্তু পরে তাদের মত পরিবর্তিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামও গ্রহণ করে নি এবং মুবাহালাও করে নি, বরং এমনিতেই দেশে ফিরে যায়।[২]

হাযরামাউত বাসী

এই বিশৃংখলা ও বিদ্রোহে হাযরামাউত বাসীরাও অংশ গ্রহণ করে। শুধু ইসলাম নয় বরং খোদ হুযূর-এর প্রতিও এই হতভাগারা এত কঠোর শত্রুতা পোষণ করত যে, যখন বনু আমের ইবন আউফ-এর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তারা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ পায় তখন তাদের নেতৃস্থানীয় মহিলারা দস্তরমত উল্লাসে মেতে উঠে। তারা হাতে মেহেন্দী লাগায় এবং দফ বাজাতে থাকে। ঐ মহিলারা পূর্ব হতেই হুযূর (সা)-এর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করত, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাবীব (মৃত্যু ২২৫ হিঃ) ঐ সব মহিলার সংখ্যা প্রায় ৩০ জন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ও বংশ উল্লেখ করেছেন। ওরা হাযরামাউতের বাতরীম মাশ্রাহ্, আল-বুখাইর, তানআ প্রভৃতি এলাকায় ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অর্থাৎ তারা ঐ সমস্ত এলাকার প্রতিনিধিত্ব করত।[৩] ঐ গোত্রের মহিলাদেরই যখন এই অবস্থা তখন পুরুষ তথা সমস্ত গোত্রের লোকেরা হুযূরের বিরুদ্ধে কিরূপ শত্রুতা করত তা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

বনু আমের

ঘটনা শুধু শত্রুতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কোন কোন গোত্রে ধোঁকা দিয়ে হুযূর (সা)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। দশম হিজরীতে আমর ইবনে

---

১. বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬৩০।
২. বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯।
৩. কিতাবুল মিযবাস, পৃঃ ১৮৪-১৮৫। দায়েরাতুল মা'আরিফ মুদ্রণ দক্ষিণ হায়দরাবাদ।

www.pathagar.com

তুফায়েল আরবাদ ইবনে কায়েস এবং হায়ার ইবনে সালমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। আমের ইবনে তুফায়েল এবং আরবাদের মধ্যে এই চুক্তি হয় যে, আমের ইবনে তুফায়েল হুযূর (সা)-কে কথাবার্তার মধ্যে মগ্ন করে রাখবে, আর আরবাদ সুযোগ বুঝে হুযূর (সা)-কে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু মদীনায় পৌঁছে আরবাদ-এর অন্তরে এরূপ ভীতির সঞ্চার হয় যে, আমের ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও আরবাদ খাপ থেকে তরবারী বের করতে পারে নি। অবশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দেশে ফিরে যায়।[১]

এই আমের ইবনে তুফায়েলকে কোন কোন লোক ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলে সে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, "আমি সপথ গ্রহণ করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র আরব আমার অধীনে না আসবে ততক্ষণ আমি বিশ্রাম নেব না। এমতাবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, আমি কুরাইশ-এর একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করে নেব?[২]

বনু আমেরের ঐ প্রতিনিধি দল যখন মদীনা থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন আমের ইবনে তোফায়েল রাস্তায়ই কোন এক স্থানে মহামারী বা প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং বনু সালুল গোত্রের একজন মহিলার গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। আরবাদ যখন আপন গোত্রের নিকট ফিরে যায় তখন তারা হুযূরের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জবাব দেয়, 'মুহাম্মদ কিছুই নয়। সে (হুযূর (সা) আমাদেরকে কোন একটি বস্তুর ইবাদতের দাওয়াত দেয় মাত্র। কাছে পেলে আমি তার উপর তীর নিক্ষেপ করব।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা আরবাদের এই অভদ্রতা ও উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এভাবে যে, এই ঘটনার এক বা দু'দিন পর সে তার একটি উট বিক্রয় করার জন্য বাজারে যাচ্ছিল এমতাবস্থায় পথিমধ্যে হঠাৎ তার ও তার উটের উপর বজ্রপাত পড়ে তাতে সে সেখানেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।[৪]

উপরে যা বর্ণিত হল তা ছিল দক্ষিণ আরবের অবস্থা। উত্তর-পূর্বে, আরব ও সিরিয়া সীমান্তে গাসসান, কুদাআ প্রভৃতি যেসব গোত্র বাস করত তাদের সৃষ্ট বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ সম্পর্কে গাযওয়ায়ে মূতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য হুযূর (সা) হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু সেই বাহিনী "জরফ" নামক স্থানে থাকতেই হুযূর (সা) ইন্তিকাল করেন। মোটকথা আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ঐ গোত্র জাহেলিয়াত বা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা গোত্রসমূহের সাধারণ অবস্থার উপর যে ভাবে আলোকপাত করেছি তাতে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ঐ সমস্ত গোত্রকে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই বলা যেতে পারে না। অতএব যখন তারা মুসলমান ছিল না তখন

---

১. ইবনে জারীর তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮।
২. ইবনে জারীর তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮।
৩. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।
৪. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।

www.pathagar.com

সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, এমন কথা বলা কি ঠিক হবে?

এখন আমরা এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব যারা বিভিন্ন গাযওয়ায় অংশ করেছিল, অথচ পরবর্তীকালে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব প্রদান করে। এখন প্রশ্ন, তারা কি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয় নি?

উয়াইনাহ্ ইবনে হাসান আল ফাযারী

হাফিয ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন যে, উয়াইনাহ্ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয় ব্যতীত গাযওয়ায়ে হুনাইন ও তায়েফ অবরোধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর হুযূর (সা) তাকে বনু তামীম-এর একটি শাখা বনু আম্বর-এর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে তিনি মুরতাদ হয়ে যান।[১]

হাফিয ইবনে হাজার তাকে মুসলমান বলার পর মুরতাদ বলেছেন, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হয় যে, তিনি হুযূর (সা)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, সাধারণ মুসলমান ব্যতীত কিছু লোক এরূপও ছিল যাদেরকে "মুয়াল্লাফাতুল কুলূব" (مؤلفة القلوب) বলা হত, হুযূর (সা) তাদেরকে গনীমতের মাল থেকে অংশ দিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। এই সব কিছু করা হত তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য। আশা ছিল, এরা একদিন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হবে, অথবা সেই গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে মুসলমানরা তার এবং তার গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে।

'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' ব্যক্তিরা একদিন খাঁটি মুসলমান হবে এই আশা ছিল। তারা কোন কোন গাযওয়ায়ও অংশ গ্রহণ করত কিন্তু ইসলাম বা দীন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণার সাথে তাদের অনেকেরই সম্পর্ক ছিল না। তারা সাথে থাকার ফলে অবশ্য মুসলমানদের সংখ্যা অধিক পরিলক্ষিত হ'ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরূপ প্রয়োজনও ছিল।[২]

---

১. আল ইসাবা, তাযকিরায়ে ওয়াইনা ইবনে হাসান : ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫।

২. তাবারীর রিওয়ায়েতে আছে যে, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব তার পুত্র আমীর মুয়াবিয়া এবং হাকীম ইবনে হাযামকে মুয়াল্লাফাতুল কুলূব হিসেবে হুযূর (সা) গনীমত থেকে কিছু বেশী অংশ প্রদান করতেন। এরা নিঃসন্দেহে মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামের উপর অধিষ্ঠিতও ছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুয়াল্লাফাতুল কুলূব মুসলমানও ছিলেন এবং তালীফ কালবের প্রয়োজনীয়তা শুধু রাজনৈতিক এবং দীনী দিক থেকেও ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, শুধু গাযওয়ায় অংশ গ্রহণের ফলে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান আখ্যায়িত করা যায় না। এ জন্য তার জীবনের সাধারণ অবস্থাও প্রত্যক্ষ করতে হবে। কেননা সম্ভবত তারা এমন মুয়াল্লাফাতুল কুলূবও হতে পারে যাদের অন্তরে তালীফে কালব কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি বরং তারা মুনাফিকই রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

যাহোক উ'য়াইনা ইবনে হাসান তার গোত্রের নেতা[১] ছিলেন এবং মু'য়াল্লাফাতুল কুলূবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২]

গাযওয়ায়ে হুনাইনে হুযূর (সা) যে সব মুয়াল্লাফাতুল কুলূবকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দান করেছিলেন তাবারী তাদের তালিকা দিয়েছেন। ঐ তালিকায় উ'য়াইনা-এর নামও রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওরা অভিজাত ও উচ্চশ্রেণী লোক ছিলেন। হুযূর (সা) তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে উট প্রদান করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও উয়াইনার অবস্থা কি ছিল?। তিনি কি প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন? যদি হয়ে থাকেন তাহলে তার ইসলাম কি ধরনের ছিল? এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য।

কোন এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা)-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি উ'য়াইনা এবং আকরা ইবনে হাবিসকে একশ'টি উট প্রদান করেন। কিন্তু জুয়া'ইল ইবনে সুরাকাকে কিছুই দেন নি। তখন আঁ-হযরত (সা) বলেন ঃ

أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة الضمري خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى الإسلام -[৩]

"যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জুয়া'ইল, উ'য়াইনা এবং আকরা' সমগ্র বিশ্বের আক্রমণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি এদের দু'জনের (উয়া'ইনা ও আকরা') মনতুষ্টির চেষ্টা করছি যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়। অবশিষ্ট রইল জুয়া'ইল। তাকে তো আমি ইসলামের প্রতি সমর্পণ করেছি।"

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, হুযূর (সা)-এর ليسلما বলাটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঐ সময় পর্যন্ত ঐ দু'জন হুযূর (সা) দৃষ্টিতে মুসলমান ছিলেন না। এমনিভাবে একদা কয়েকজন আনসারদের মনোভাব সম্পর্কে হুযূর (সা) এই মর্মে অবগত হলেন যে, তারা গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছেন

---

১. হাফিয ইবনে হাজার তার সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা সে হুযুর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। ঐ সময় হযরত আয়েশা (রা) হুযূর (সা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। উয়াইনা হযরত আয়েশা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করেন,"এই মহিলা কে?" হুযূর (সা) উত্তর দেন আয়েশা (রা) তখন উয়াইনা বলে, আপনি আমার স্ত্রী উম্মুল বানীনকে গ্রহণ করুন, সে আয়েশা (রা) হতেও উত্তম।" এটা শুনে হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তখন হুযূর (সা) বলেন এই ব্যক্তি আহম্মক, অথচ সে তার গোত্রের নেতা।

২. আল ইসাবা ঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫।

৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৯।

www.pathagar.com

যে, আঁ-হযরত (সা) মুয়াল্লাফাতুল কুলূবদেরকে তাদের থেকে অধিক দান করছেন এবং আনসারদেরকে বঞ্চিত করছেন। তখন হুযূর (সা) প্রায় সাথে সাথেই সকল আনসারকে এক করে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ

تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى الإسلام -[১]

"আমি এ দানের দ্বারা একটি দলকে আকৃষ্ট করতে চাই যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়। হে আনসারগণ আমি তো তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি সমর্পণ করেছি।"

কিন্তু উ'য়াইনা ছিল স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ। আঁ-হযরত (সা)-এর ঐ অফুরন্ত সাহায্য লাভ করা সত্ত্বেও সে হুযূর (সা)-এর ঐ নির্দেশই পালন করত যা ছিল তার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল। গাযওয়ায়ে হুনাইনে আউসদের একশটি উট তাকে দেয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও হুযূর (সা) গ্রেফতারকৃত এক বৃদ্ধাকে বাঁদী বানাবার ব্যাপারে তাকে নিষেধ করলে উ'য়াইনা তা মানে নি বরং বিনিময় ; অর্থের লোভে তাকেও আপন কজায় রাখে। হুযূর (সা)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও সে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে।[২]

উয়া'ইনা তার জাহেলিয়াতের অভ্যাসও ত্যাগ করতে পারে নি। ফলে হুযূর (সা)-এর সাথে কখনো কখনো সে বেয়াদবি করে বসত। আল্লামা তাবারী ৯ম হিজরীর ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর (রা)হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন বনু তামিম এর একটি প্রতিনিধি দল মদীনা আগমন করেন। উ'য়াইনা ইবনে হাসান আল ফাযারী এবং আকরা' ইবনে হাবেস তাদের সাথে ছিল।

আঁ-হযরত (সা) তখন অন্দর মহলে ছিলেন। তার অত্যন্ত বেয়াদবীর সাথে চিৎকার করে হুযূর (সা)-কে বাইরে আসতে বলে। আঁ-হযরত (সা) বাইরে আসলে তারা বলে, "আমরা আমাদের বংশ গৌরব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছি, আঁ-হযরত (সা) তাদের সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তিনি তাদের খতিবের বিরুদ্ধে আপন খতিব সাবিত ইবনে কায়েস এবং তাদের কবি জবরকান ইবনে বদরের বিরুদ্ধে আপন কবি হাসান ইবনে সাবিতকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য নিয়োগ করেন। তাবারী এই ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং উভয় দিকের খুৎবা ও কাব্যসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, কোন কোন গাযওয়ায় অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও উ'য়াইনা এবং তার দু'জন সাথী আকরা ইবনে হাবিস ও আতারুদ ইবনে হাজিব জাহেলী যুগের রীতিনীতি ও চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে পারে নি। কেননা তাদের জীবনে ইসলামী শিক্ষার প্রভাব পরে নি।[৩] ফলে দেখা যায় যখন তুলায়হা নবুওতের দাবী করে তখন উ'য়াইনা সংগে

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৭।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৭।
৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৭৮।

www.pathagar.com

সংগেই তার শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয়। সে বলতে থাকে আল্লাহ্র শপথ মিত্র সম্প্রদায়ের যে কোন একজন নবীর (তুলাইহার) আনুগত্য করা আমাদের কাছে কুরাইশী নবীর আনুগত্যের চাইতে অধিকতর প্রিয়।[১]

খোদ উ'য়াইনার স্বীকারোক্তি যে, সে মুসলমান ছিল না

উ'য়াইনা তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বেকার ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে কোন সন্দেহের মধ্যে রাখে নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যখন তাকে গ্রেফতার করে মদীনায় আনা হয় তখন তার উভয় হাত গর্দানের সাথে বাঁধা ছিল। মদীনায় শিশু কিশোরেরা খেজুরের এক ডাল দিয়ে তাকে হাকাতে হাকাতে বলতে থাকে "হে আল্লাহ্র দুশমন, ঈমান আনার পর অবশেষে কোন বুদ্ধিতে তুমি কাফির হয়ে গেলে? উ'য়াইনা উত্তরে বলে, "আল্লাহ্র শপথ! আমি তো কখনোও ঈমান আনিনি (বিশ্বাস স্থাপন করি নি)।[২]

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন উ'য়াইনার গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি তাকে হত্যা না করে ক্ষমা দেন।[৩] এর স্পষ্ট অর্থ ছিল এই যে, উ'য়াইনা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতে মুরতাদ ছিল না বরং একজন বিদ্রোহী মাত্র ছিল।

অন্যান্য লোক

আব্বাস ইবনে মিরদাস আস্সালমী এবং আকরা ইবনে হাবিস ও মুয়াল্লাফাতুল-কুলূব এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা বিভিন্ন গাযওয়ায়ও অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে, গাযওয়ায়ে হুনাইনে আব্বাস ইব্নে মিরদাসকে অন্যান্য মুয়াল্লাফাতুল কুলূব থেকে কিছুটা কম দেয়া হলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে কয়েকটি কবিতা আবৃতি করে, সেগুলোর মধ্যে হতে হাফিয ইবনে হাজার নিম্নের দু'টি চরণ উদ্ধৃত করেছেন।

أتجعل نهبي ونهب العبيد + بين عيينة والأقرع

وما كان حصن ولا حابس + يفوقان مرداس في مجمع

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৭।

২. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৯, তায়েফ অবরোধের সময় উ'য়াইনাও মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিল। কোন এক ব্যক্তি তখন উ'য়াইনাকে মুশরিকদের প্রশংসা করতে দেখে বললেন আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি এসেছ মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করতে অথচ মুশরিকদের প্রশংসা করছ। উ'য়াইনা উত্তরে বলে,"আল্লাহর শপথ আমি মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে সাকীফদের সাথে যুদ্ধ করতে আসি নি। বরং আমার উদ্দেশ্য এই যে, মুহাম্মদ (সা) যদি তায়েফ জয় করেন তাহলে সাকীফ গোত্রের একটি মেয়ে আমি পাব। তার সাথে আমি আনন্দ উল্লাস করব এবং তার থেকে সন্তানও পাব। তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৫।

৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৯।

www.pathagar.com

"হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি আমার এবং আমার ঘোড়া উবায়দ-এর লুণ্ঠিত মাল উ'য়াইনা এবং আকরা এর মধ্যে বণ্টন করেছেন, অথচ হাসান ও হাবিস উভয় মিলেও কোন জনসমাবেশে মিরদাসের উপর জয়ী হতে পারবে না।[১]

আঁ-হযরত (সা) এই কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সাহাবা কিরামকে নির্দেশ দেন এর জিহ্বা কেটে ফেল। সাহাবা কিরাম হুযূরের সে নির্দেশ পালন করলেন এভাবে যে, আরো কিছু মাল দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন।[২] হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে উ'য়াইনা এবং আকরা তাঁর কাছে এসে বলে হুযূর (সা) মুয়ালাফাতুল কুলূব হিসেবে আমাদেরকে দান-দক্ষিণা করতেন, আপনিও তাই করুন। তারা একটি ভূখণ্ডের জন্য তার কছে আবেদন করে। হযরত আবূ বকর (রা) যিনি হুযূর (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন, তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু খলীফার নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্য যখন তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে যায় তখন তিনি এর কঠোর বিরোধিতা করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ইসলাম যখন দুর্বল ছিল তখন হুযূর (সা) তোমাদের মন তুষ্ট রাখার জন্য এ সমস্ত করতেন। কিন্তু ইসলাম এখন ঢের শক্তিশালী তাই তোমাদের ব্যাপারে আমাদের আর কোন উৎকণ্ঠা নেই। ইসলামের অনিষ্ট করার জন্য তোমরা এখন যা ইচ্ছা করতে পার।[৩] চিন্তা করুন, ইরতিদাদ হতে ফিরে আসা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা)-এর নিকট ওদের মর্যাদা এরূপ ছিল।

বনু সালিম গোত্রের আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্'দ ইয়ালাইল যে আলফাজয়া উপাধিতে ভূষিত ছিল, মুরতাদদের নেতা ছিল।[৪] ইরতাদ হতে ফিরে আসার পরও তার ইসলামের অবস্থা কিরূপ ছিল নিম্নের একটি ঘটনা হতে তা প্রমাণ পাওয়া যায়। সে একদা হযরত আবূ বকর (রা) কাছে এসে নিবেদন করে আমি মুসলমান, তাই যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। হযরত আবূ বকর (রা) তখন তাকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেন, কিন্তু ঐ পাপিষ্ট ঐ অস্ত্র দ্বারাই মুসলমানদেরকে হত্যা করতে থাকে। হযরত আবূ বকর (রা) এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। গ্রেফতার হয়ে আসার পর হযরত আবূ বকর (রা) চরম বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ তাকে জীবন্ত অগ্নি দগ্ধ করে বধ করে।[৫]

---

১. আল ইসাবা : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৬৩।

২. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৯।

৩. আল ইসাবারঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৯, এই ঘটনা তাবারীও উল্লেখ করেছেন (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০০) তবে তাতে শব্দগত কিছু পরিবর্তন আছে।

৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩১২, হাফিয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর, এর নাম আনাস লিখেছেন, কিন্তু সঠিক হল আয়াস তাবারী ও অন্যান্যরা আয়াস লিখেছেন।

৫. তাবারীঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯৩।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যাদেরকে মুরতাদ বলা হয় তারা মূলতঃ ইসলামই গ্রহণ করে নি। তাদের ইরতিদাদ আসলে ঈমানী ইরতিদাদ ছিল না বরং ছিল রাজনৈতিক ইরতিদাদ। অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে শুধু আঁ-হযরত (সা)-এর রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং তা ছিল ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্য। তারা সব সময়ই গোপনে হুযূরের শত্রুতায় লিপ্ত থাকে। আর যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূলে আসে তখন প্রকাশ্য বিদ্রোহে নেমে পড়ে।

কারণসমূহ

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, এর পিছনে এমনকি কারণ ছিল যে, ঐ সমস্ত লোক সত্য দীনকে গ্রহণ করতে পারল না?

এর উত্তর এই যে, নবুওতের প্রথম তেরটি বছর হুযূর (সা) মক্কায় অতিবাহিত করেন। সেখানে প্রথমদিকে হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন এলাকা এবং বিভিন্ন গোত্রের লোক মক্কায় এলে হুযূর (সা) তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছাতেন। প্রথমে ঐ পয়গাম মাত্র কয়েকজন লোকের কাছে পৌঁছে। আর যাদের কাছে পৌঁছে তারাও ছিল বিভিন্ন স্বভাবের লোক। তাদের কেউ কেউ এটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করত এবং খাঁটি মুসলমানে পরিণত হত। তবে কেউ কেউ এরূপও ছিল যাদের অন্তরে প্রভাব পড়ত বটে, তবে যখন তারা আপন গোত্রের কাছে যেত তখন সে প্রভাব দূর হয়ে যেত। কেউ কেউ এরূপ ছিল, যাদের অন্তর কখনো তা গ্রহণ করে নি। তাছাড়া কুরাইশদের কঠোর শত্রুতার কারণে তখন আঁ-হযরত (সা) এবং তার সাথীদেরকে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তাবলীগে ইসলামের ক্ষেত্রে তখন একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

অতঃপর আঁ-হযরত (সা) হিজরত করে যখন মদীনায় আসেন তখন তার আটটি বছর বিভিন্ন গাযওয়া সারিয়ায় অতিবাহিত হয়। যদিও এর ফলে হিজাযের একটি বিরাট অংশের লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুনাফিকদের একটি দল এর মধ্যে ছিল গোপনে কর্মতৎপর। তাছাড়া ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা ছিল, যারা কিছুতেই ইসলামের উত্থান ও উন্নতিতে খুশী ছিল না। এটা ছিল স্বয়ং হিজাজের অবস্থা বাকি রইল ঐ সমস্ত গোত্র যারা মদীনা হতে দূর-দূরান্তে বাস করত। যদিও হুযূর (সা) নবুওতের শেষ দিকে ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন, কিন্তু তাদের অনেকেই যখন তখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের জন্য নিজেদেরকে তৈরী করে নিতে পারে নি। কারণ —

১. আরবে আ'রিবা এবং মুসতা'রিবা (عرب عاربة وعرب مستعربة) অর্থাৎ-দক্ষিণ ও উত্তর আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই কঠোর শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এমনকি দক্ষিণ আরবের লোকেরা সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ্ বললে উত্তর

www.pathagar.com

আরবের লোকরা বলত রাহমান। মুসায়লামা যখন নবুওতের দাবী করে তখন তার কোন সাথী স্পষ্টভাবে বলে, 'আমরা জানি মুসায়লামা মিথ্যাবাদী এবং মুহাম্মদ (সা) সত্যাবাদী, কিন্তু রাবীয়া

كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر

গোত্রের মিথ্যাবাদী আমাদের কাছে মুযার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে উত্তম।

২. ইয়াহূদী, খৃস্টান, অগ্নি উপাসক এবং মুনাফিকরা ছিল ইসলামের কট্টর শত্রু। যখন তারা আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অনৈক্য ও অস্থিরতা লক্ষ্য করল তখন তারা কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের মধ্যে আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। এ কারণেই নবুওতের দাবীদার সাজাহ্ বিন্ত হারিসের অনুসারীদের মধ্যে তাগলাব গোত্রের খৃস্টানদেরও একটি বিরাট দল ছিল।[১]

এমনিভাবে বাহ্‌রাইনে হাতাম-এর নেতৃত্বে অগ্নি উপাসকরাও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে।

৩. দীর্ঘদিন থেকে রোমীয় ও ইরানীদের মধ্যে তরবারি যুদ্ধ চলে আসছিল। অপরদিকে আরবের যাযাবর গোত্রের লোকেরা সুযোগমত ঐ দু'রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করত। সেগুলোকে বাধা দেয়ার জন্য উভয় দেশ নিজ নিজ সীমান্তে আরবদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যেগুলোকে বর্তমান প্রচলিত ভাষায় সেটাকে মধ্যরাষ্ট্র (Baffes states) বলা হয়। ইরানীরা হিরায় (বর্তমান কুফায়) এবং রোমীরা দামেশকে অনুরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইরানী ও রোমীয়দের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলত তখন হিরা এবং দামেশকের আরবরা নিজ নিজ মুরব্বীদের সাথে থাকত। ফলে এক আরবকে অন্য আরবের বিরুদ্ধে লড়তে হত ইরানী ও রোমীয় রাজ্যের দান, উপহার এবং প্রতিপালনের এই প্রতিক্রিয়া শুধু রাজনৈতিক নয় বরং ধর্মীয়ও ছিল। আরবের গাস্‌সান গ্রোত্র সিরিয়ার সীমান্তে এসে বসতী স্থাপন করেছিল। তারা খৃস্টান ধর্মও গ্রহণ করে ছিল। বাহ্‌রাইনে বিদ্রোহীরা যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে তখন ইরানের সাসানী রাষ্ট্র তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং তাদের সাহায্যে সৈন্যও প্রেরণ করে।[২]

ইবনে আরদে রাব্বি "ওয়াফুদুল আরব আলা কিস্‌রা" শিরোনামে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিভাবে আরবের প্রতিনিধি দল ইরানের সম্রাটের দরবারে যেত এবং প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসত।[৩] এমনিভাবে রোম সম্রাটের নিকট থেকেও তাদের সমর্থক আরবরা বড় ধরনের বাৎসরিক সম্মানী লাভ করত।

---

১. মুহাদারাতে তারীখুল উমামিল ইসলামীয়াহ ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ১৭৭।
২. ফাতুহ্ আছামুলকুফী
৩. আল-ইফদুল ফরীদ ১ম খণ্ড।

www.pathagar.com

আরববাসীদের উপর ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের প্রভাব কত গভীর ছিল নিম্নের ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কায় অবস্থানের সময় হজ্জের মৌসুমে একবার হুযূর (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে বনু জাহল ইবনে শাইবান গোত্রের নিকট গমন করেন এবং

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِهِ

এর থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান। গোত্রের নেতা মাফরুক, মুসান্না এবং হানী ইবনে রাবীয়া এ সমস্ত আয়াত দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়। তবে তারা এও বলে যে, প্রথমতঃ দীর্ঘ দিনের গোত্রীয় ধর্ম ত্যাগ করা বিশ্বাসের উপর একটি বড় আঘাত। দ্বিতীয় আমরা ইরানী সাম্রাজ্যের আওতাধীন এবং আমাদের মধ্যে এই মর্মে পরস্পর চুক্তি হয়েছে যে, আমরা অন্য কারো আওতাধীন যাব না।

যখন ইসলামের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিজয়ের ফলে হিজাযে এর ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং মদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন ইরানী ও রোমীয় সাম্রাজ্য চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারা তাদের অধীনস্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত আরব গোত্রদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করে। ঐ সমস্ত লোকদের দমন করার জন্যই হুযূর (সা) গাযওয়ায়ে মূতা পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে না হতেই হুযূর (সা) ইনতিকাল করেন এবং এই সুযোগে ইসলাম বিরোধীদের অন্তরে জ্বালা বিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

নবূওতের দাবিদারগণ

প্রকাশ থাকে যে, এত বিরাট ও বিস্তৃত বিদ্রোহের জন্য কোন নেতার প্রয়োজন ছিল। আর সে প্রয়োজন পূরণের জন্য ইয়ামনে আসওয়াদ আনসী, ইয়ামামায় বনু হানীফা গোত্রের মুসায়লামা, আসাদ ও গাতফান গোত্রের তুলায়হা এবং বনু তামীম গোত্রের সাজাদ এগিয়ে আসে এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন। এটা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন। ধর্মের এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে ঐ নেতারা জানত যে, ধর্মীয় রং বা ছত্রছায়া ছাড়া এ ধরনের আন্দোলনে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাদের সম্মুখে হুযূর (সা)-এর উদাহরণও বিদ্যমান ছিল। তাই তারা ধর্মের নামেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করে।

নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে নবূওতের দাবীদারদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

আসওয়াদ আনসী

ঐতিহাসিকদের মতে ইসলাম হতে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন আসওয়াদ আনসী ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম।[১] তার নাম ছিল আবহালাল ইবনে কা'ব। মুযজাহ গোত্রের শাখা আনাস-এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। জ্যোতিষ এবং যাদুবিদ্যায় তার খুবই পারদর্শিতা ছিল। তার একটি গাধা ছিল। সেটাকে সে একটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। গাধাকে যখন বলা হত 'তুমি কি তোমার প্রভুর সামনে সিজদা করবে না? তখন সে হাঁটু পেতে সংগে সংগে সিজদার ভংগিতে বসে পড়ত। এই অবাক কান্ড দেখে লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিল যুল হিমার। এটা ছিল বালা[২] যুরির বর্ণনা কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক হল, শব্দটি যুল হিমার নয় বরং যুল খিমার। খিমার দোপাট্টা বা উড়নীকে বলা হয়। যেহেতু সে সর্বদা পাগড়ী বেধেঁ সেটাকে চাঁদর দ্বারা আবৃত্তি করে রাখত তাই তাকে বলা হত যুল খিমার।[৩]

আসওয়াদ আনসীর ধর্মত্যাগের সময় ইয়ামনের অবস্থা

রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইয়ামন ইরান সম্রাটের অধীনে ছিল। যখন হুযূর (সা) অন্যান্য সম্রাট ও আমীরদের মত ইরানের সম্রাটকেও ইসলামেরর দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেন তখন ইরান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাযান বা বাদহান (বর্ণনার মতভেদ অনুযায়ী) ইয়ামনের গভর্নর ছিলেন। কিস্‌রা (ইরানের সম্রাট) হুযূর (সা)-এর পত্র খানা আগুনে জ্বালিয়ে ফেলে এবং বাযানকে নির্দেশ দেয়, যেন হিজাযের এই ব্যক্তির (মুহাম্মদ (সা) মাথা তার নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাযানের অন্তর পূর্ব হতেই ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, তাই কিস্‌রা-এর নির্দেশ সে পালন করে নি, বরং হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার সাথে সাথে তা গ্রহণ করে। এর পূর্বেই ইয়ামনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই হুযূর (সা) বাযানকে নিজের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর যখন বাযান ইন্‌তিকাল করে তখন হুযূর (সা) ইয়ামনের শাসন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তিনি আমর ইবনে হাযামকে নাজরানের খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসাকে সাজরান ও জুবাইদের মধ্যবর্তী এলাকার, আমের ইবনে শাহ্‌রকে হামদানের, শাহ্‌র ইবনে বাযানকে সান'আর, তাহির ইবনে আবি হালাকে ও আশয়ারীনের, আবূ মূসাকে মায়ারিবের এবং ইয়ালা ইবনে উমাইয়াকে জুনদের শাসক কর্তা নিয়োগ করেন। ঐ সমস্ত শাসকদের ছাড়াও আঁ-হযরত (সা) কয়েকজন মু'আল্লিম প্রেরণ করেন, যারা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যেই অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামী আহ্‌কাম ও মাসআলা শিক্ষা

১. কামিল ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৫৫।
২. ফুতহুল বুলদান ঃ পৃঃ ১১১।
৩. তারীখুল কামিল ঃ ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৫৪।

www.pathagar.com

দিতেন। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) ছিলেন মু'আল্লিমদের নেতা। তার জন্য কোন অঞ্চল নির্ধারিত ছিল না। তিনি বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শিক্ষা ও প্রচারের কাজ করতেন। এছাড়াও হাযরামাউত অঞ্চলে যিয়াদ ইবনে লাবীদকে, সাকাসিক ও সাকুন এলাকায় আকাশা ইবনে সাওরকে এবং বনু মুয়াবিয়া ইবনে কুলদাহ্ গোত্রের উপর আবদুল্লাহ্ অথবা মুহাজিরকে শাসক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হুযূরের অসুস্থতার কারণে মুহাজির সেখানে রওয়ানা হতে পারেন নি। যখন হুযূর (সা) ইন্‌তিকাল করেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন।

আসওয়াদ আন্‌সীর নবূওতের দাবী

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুযূর (সা)-এর স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ হয়ে পড়েছিল। আসওয়াদ আনসীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে আশা-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং নিজেই নবূওতের দাবী করে বসে। সে যাদুকর ছিল বিদায় মুদ্‌হাজ গোত্র তার সমর্থক হয়ে পড়ে। আসওয়াদ সর্বপ্রথম নাজরান আক্রমণ করে এবং হুযূর (সা)-এর পক্ষ হতে সেখানে যে সব শাসক ও মুবাল্লিগ নিযুক্ত ছিলেন (অর্থাৎ আমর ইবনে হাজাম ও খালিদ ইবনে সায়িদ) তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে সান'আর দিকে অগ্রসর হয়। বাযানের পুত্র শাহ্‌র তাকে বাধা প্রদানের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি শাহ্‌দাত বরণ করেন। (এই ঘটনা আসওয়াদ আনসীর আবির্ভাবের পঁচিশ দিন পর সংঘটিত হয়েছিল।) সান'আর শাসক শাহ্‌র অত্যন্ত ভক্তিভাজন লোক ছিলেন। তাই-তাঁর শাহ্‌দাতের কারণে মুসলমানদের মধ্যে একটি ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। প্রতিকূল অবস্থা লক্ষ্য করে তারা সাধারণভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর-এর বর্ণনা অনুযায়ী আসওয়াদ আনসীর প্রভাব চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সে ইয়ামনের সর্বশক্তিমান ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শাহ্‌র ইবনে বাযানের শাহাদাতের পর আসওয়াদ তার বিধবা স্ত্রী-কে বিবাহ্ করে। তার নাম ছিল। আযাদ। ঐ স্ত্রীর হাতেই আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেন।

আসওয়াদ আনসীর পরিণাম

আঁ-হযরত (সা) যখন এর এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন সেখানকার যে সমস্ত লোক ইসলামের উপর অটল ছিল তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে অথবা চাতুর্যের সাথে আসওয়াদ আনসীর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন[১] রাজবংশের যে সমস্ত আমীর ও সম্মানীত ব্যক্তি ইয়ামনে অবস্থান করেছিলেন, আসওয়াদ আনসী তাদের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করায় তারাও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমতাবস্থায় ওমর ইবনে ইয়াহ্‌নুস আয্‌দী হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত নির্দেশ নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। হুযূর (সা) কাসিম ইবনে হুবায়রাহ্ ইবনে মাকসুহ্‌কেও একদল সৈন্যসহ আসওয়াদ

১. এ পর্যন্ত বর্ণনা তারীখে কামিল : ইবনে আসীর-এর ২য় খণ্ডের ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

আনসীর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। এরা ইরানী আমীর ফিরোয ও দাযভীদ এবং শাহ্‌র ইবনে বাযানের বিধবা স্ত্রী (যিনি তখন আসওয়াদের স্ত্রী হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন) নিয়ে আসওয়াদকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করার একটি সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরি করেন। এক রাতে আমাদের ইঙ্গিত অনুযায়ী একটি গোপন পথে এরা সবাই আসওয়াদ আনসীর বাড়ীতে প্রবেশ করেন। ভোরবেলা আসওয়াদ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শায়িত ছিল। তখন ফিরোয অগ্রসর হয়ে তাকে এতজোরে আঘাত করেন যে সে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং যবেহকৃত গরুর মত ছটফট করতে থাকে। আসওয়াদের প্রহরীরা তার চীৎকার শুনে দৌড়ে আসে এবং জিজ্ঞেস করে 'কি ঘটেছে।' তখন আসাদ ঠাট্টা করে বলেন, "তোমাদের পয়গাম্বরের উপর ওহী নাযিল হয়েছে।" ইতিমধ্যে দাযভীদ ও কায়েস এবং অন্যান্য মুসলমানরা এগিয়ে এসে আসওয়াদের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর তারা শহরের উঁচু দেয়ালের উপর দাড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র সত্য নবী এবং আসওয়াদ আনসী মিথ্যাবাদী।' আসওয়াদ আনসীর মৃত্যুর পর তার সাথীরা দুর্বল হয়ে পড়েন। তাদের অনেকেই পলায়ন করে আর যারা বিরোধীতা করে তাদেরকে হত্যা করা হয়।[১]

এই ঘটনা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পাঁচ দিন পূর্বে সংঘঠিত হয়েছিল এবং হুযূর (সা) ওহীর মাধ্যমে এতথ্য প্রকাশও করে যান। তবে তাঁর ইন্তেকালের দশদিন পর মদীনায় সংবাদ পৌছে।[২] যেহেতু এটা খিলাফতে সিদ্দিকীর প্রথম সুসংবাদ ছিল তাই স্বাভাবিকভাবে হযরত আবূ বকর (রা) এতে খুবই আনন্দিত হন।[৩]

আসওয়াদ আনসীর হত্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে তাকে হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে হত্যা করা হয়েছিল, না পরে? যাহোক উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম।

তুলাইহা আসাদী

তুলাইহার পিতার নাম ছিল খুভাইলাহ বনী আসাদ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় তাকে আসাদী বলা হ'ত। সেও হুযূর (সা)-এর জীবিত অবস্থায় নবূওতের দাবী করেন। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হুযূর (সা) দারার ইবনে আযূরকে বনু আসাদের শাসক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তুলাইহা ও তার সাথীদেরকে (যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল) দমন করার নির্দেশ দেন। দারার মুসলমানদের সাথে 'ওয়ারদাত' নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন সেখানে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরপক্ষে তুলাইহা তার অনুসারীদের সাথে সামীরায় অবস্থান

১. ইবনে আসীর ও ফুতুহুল বুলদান : বালাযুরী পৃঃ ১১২-১১৩।
২. বালাযুরী পৃঃ ১১৩।
৩. ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮।

www.pathagar.com

করেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। অবশেষে দারার-এর একজন সাথী তুলাইহাকে তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রোপাগান্ডা করার একটি অপূর্ব সুযোগ পেয়ে যায়। সে বলতে থাকে যে, তরবারীও তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। এতে দুর্বল ঈমানের কিছু লোক তার দলে যোগদান করে। ইতিপূর্বে হুযূর (সা) ইন্তেকাল করেন। তুলাইহা দাবী করে যে, তার নিকট হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আগমন করেন। সে নতুন নতুন কিছু আয়াত তৈরি করে ঐশি বাণী হিসেবে লোকদেরকে শুনাত এবং বলত, নামাযে রুকু-সিজদার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এটা পছন্দ করেন না যে, তোমাদের কোমর ঝুকবে এবং তোমাদের কপাল ধূলিময় হবে। সে আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালকেও প্রোপাগাণ্ডার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[১] উয়াইনা ইবনে হাসান ফাযারী, যে তুলাইহার প্রধান সাথী ছিল, বলতে থাকে, 'দেখ' মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্‌তিকাল হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের পয়গম্বর জীবিত আছেন।[২] মোটকথা আসাদ, গাতফান এবং তাই গোত্রের উপর তুলায়হার বিরাট প্রভাব পড়ে। সে এই সমস্ত লোকদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে এক দলকে 'আবরাক' নামক স্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দেয় এবং অন্য দলকে যুলকিস্‌সার দিকে প্রেরণ করে। এটা মদীনা-নাজদ রাস্তার অদূরে অবস্থিত।

সাজাহ্ বিনতে হারিস

এই সময় মিথ্যা নবূওত দাবীর প্রবণতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, পুরুষ ছাড়া মহিলারাও এক্ষেত্রে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। বনু তাগ্‌লাব গোত্রের সাজাহ্ নাম্নী একজন মহিলাও হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর নবূওয়তের দাবী করে বসে। বনু তাগ্‌লাব ও বনু তামীম গোত্রের কিছু লোক তার অনুসারী হয়ে পড়ে। খৃস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত হুযায়ল গোত্রও তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। ধর্মত্যাগী নবীরা তার দক্ষিণ হস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত সাজাহ্ ও মুসায়লামার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] ফলে তার নবূওত স্বাভাবিকভাবেই মুসায়লামার নবুওতের মধ্যে মিলে যায়। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

মুসায়লামা কায্‌যাব

মুসায়লামার পিতার নাম ছিল হাবিব। উপনাম ছিল আবূ সামামাহ্ কিংবা আবূসামালাহ্[৪] সে বনু হানীফা গোত্রের সংগে সম্পর্কিত ছিল। নবম হিজরীতে বনু

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৬১।

২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ ৪৮৭।

৩. এই সম্পর্কের সূচনা কিভাবে হয় এবং তা কি প্রকার ছিল ইবনে জারীর তাবারীর ২য় খণ্ডের ৪৯৭ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৪. ফুতুহুল বুলদান ঃ পৃঃ ৯৭ঃ বালাযুরী লিখেছেন যে, সে ছিল বেঁটে, হলুদ মুখাকৃতি এবং চেপ্টা নাকবিশিষ্ট। বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী, হাবীব মুসায়লামার পিতার নাম ছিল না, দাদার নাম ছিল। তার পিতার নাম ছিল কবীর। কিন্তু তাবারী ও অন্যান্যরা মুসায়লামার পিতার নাম হাবীব লিখেছেন।

www.pathagar.com

হানীফার যে প্রতিনিধি দলটি হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় সেও ছিল সে দলের অন্তর্ভুক্ত। তখন সে হুযূর (সা)-কে বলেছিল, যদি আপনি আমাকে আপনার পর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করার অঙ্গীকার করেন তাহলে আমি আপনার হাতে বায়'আত করব। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) তাঁর হাতে স্থিত একটি খেজুর শাখার প্রতি ইঙ্গিত করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'যদি তুমি খেজুরের এই ডালটিও চাও, আমি তোমাকে তা দেব না।'[১] ঐ গোত্রের হুজাহ্ ইবনে আলী নামক এক ব্যক্তিও হুযূর (সা)-এর নিকট একই ধরনের পত্র লিখেছিল। হুযূর (সা) তাকেও ঐ একই মর্মের উত্তর দিয়েছিলেন। সাথে সাথে এই দু'আও করেছিলেন 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।' সুতরাং দেখা যায়, ঘটনার কয়েকদিন পরই সে মৃত্যুবরণ করেছে। (বালাযুরী, পৃঃ ৯৪)

মুসায়লামা বনু হানীফার প্রতিনিধি দলের সাথে নিজের গোত্রে ফিরে এসে নবুওতের দাবী করে এবং তার সাথীরা এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচার করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসায়লামাকে তার অংশীদার হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। বনু হানীফা এবং যে সমস্ত লোক তাদের সমর্থক ছিল তারা সবাই মুসায়লামার অনুসারী হয়ে পড়ে। তখন মুসায়লামার সাহস এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, সে নিম্নলিখিত শিরোনামে হুযূর (সা)-এর নিকট একটি পত্র লিখে।

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله

অতঃপর সে লিখে অর্ধেক ভূখণ্ড আমার এবং অর্ধেক ভূখণ্ড কুরাইশদের কিন্তু কুরাইশরা ন্যায় বিচার করবে না।

এই পত্রটি আমর ইবনে জারুদ আল হানাফী মুসায়লামার পক্ষ থেকে লিখেছিল নবী (সা) উবাই ইবনে কা'ব এর মাধ্যমে এর যে উত্তর দেন তার প্রথম বাক্যটি ছিল ঃ

محمد النبي (ص) إلى مسيلمة الكذاب

অতঃপর তিনি লিখেন, 'ভূখণ্ডের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন।

মুসায়লামার সাথীদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা তাকে মিথ্যা মনে করত। এবং দুশ্চরিত্র ও অসৎকার্যকলাপের কারণে তাকে ঘৃণাও করত। তবু শুধু মাত্র গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে তারা তার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হুজায়রাহ্ নামক মুসায়লামার মুয়াযযিন তো তার আযানের মধ্যেই প্রকাশ্যে উচ্চারণ করত।

أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله

"অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলে ধারণা করেন। মজার ব্যাপার এই যে, মুসায়লামাও এটা শুনে বলত[২] أفصح حجير এর

---

১. সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৮।
২. ফুতুহুল বুলদান ঃ বালাযুরী ঃ পৃঃ ৯৭।

www.pathagar.com

দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুসায়লামা নিজেও নিজের সম্পর্কে ভ্রান্তির মধ্যে ছিল এবং শুধুমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নবূওতের দাবী করেছিল।

নবূওতের দাবীদারদের ক্রমধারায় আরো দু'তিন জনের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তারা তেমন প্রসার লাভ করতে পারে নি, তাই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। আরবে একই সময়ে ধর্ম ত্যাগ ও বিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল উপরোক্ত তিন জন পুরুষ ও একজন মহিলাই তার নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। উয়াইনা ইবনে হাসান ফাযারী এবং মালিক ইবনে নাভীরাহ্ প্রমুখ এদের কারো না কারো সাহায্যকারী ছিল। এই চারজনের একজন অর্থাৎ, আসওয়াদ আনসী হুযূর (সা)-এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ইন্‌তিকালের পর পরই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার সাথীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে।[১] অবশিষ্ট থাকে তুলায়হা সাজাহ এবং মুসায়লামা। হযরত আবূ বকর (রা) কিভাবে এদেরকে দমন করেন এবং তাদের বিদ্রোহের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন পরবর্তীতে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামরিক উদ্যোগ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে হযরত আবূ বকর (রা) একটি সেনাবাহিনী সিরিয়ার দিকে পাঠাতে মনস্থ করেন তখন আরবে বিরাজিত সাধারণ বিদ্রোহ ও বিশৃংখলার কারণে আনসার ও নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ তার সে উদ্যোগের বিরোধীতা করেন। তাদের আশংকা ছিল মদীনা সেনাশূন্য হয়ে গেলে বিদ্রোহীরা মদীনার উপর আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু রাসূল (সা)-এর খলীফা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। কেননা হুযূর (সা)-এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। যাহোক শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে সবাই একমত হন।

মদীনায় যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতিনিধি দল

আব্‌স ও যুবাইয়ান, বুন কিনানাহ্, গাতফান এবং বনু ফাযারা গোত্র যারা মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করত, স্বীকার করত যে, তারা নামায পড়বে কিন্তু যাকাত দেবে না। তাদের মধ্যে আবার দু'প্রকারের লোক ছিল। একদল কৃপণতার কারণে পূর্ব হতেই যাকাত প্রদানের বিরোধী ছিল। অপর একদল বলত আমরা যাকাত সংগ্রহ করব কিন্তু মদীনায় তা পাঠাব না। তাদের দলীল হ'ল, পবিত্র কুরআনে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে;

---

১. ফিরোয দায়লামী যিনি আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করেছিলেন তার সম্পর্কে হুযূর (সা) বলেন,

" قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين "

www.pathagar.com

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

"ওদের সম্পদ হতে 'সাদকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে পরিশোধিত করবে। তুমি ওদেরকে আশির্বাদ করবে। তোমার আশির্বাদ ওদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

তাদের কথা হলো হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর এখন কেউ আর এমন নেই যার সালাত (আশির্বাদ) আমাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর হবে। তাই আমরা কাউকে যাকাত দেব না। তাদের আরও একটি দলীল এই ছিল যে, যাকাত সম্পর্কে হুযূর (সা) বলেছেন ¦

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِ هِمْ

"(যাকাত) তাদের ধনী ও সম্পদশালীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে তারা বলতেন, 'আমরা যাকাত সংগ্রহ করব কিন্তু তা মদীনায় প্রেরণ করব না বরং তা আমাদের নিজের গোত্রের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। তারা এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মদীনায় তাদের প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দল প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে মদীনায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের নিকট আবেদন করে যে, তারাও এব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে সুপারিশ করেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আলোচনা

ঐ সময়ে আরবের যে সাধারণ অবস্থা ছিল তার প্রেক্ষিতে এবং ঐ সমস্ত প্রতিনিধি দলের দলীল প্রমাণ এবং যুক্তির প্রভাবে সাহাবায়ে কিরাম কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে বলেন, ঐ সমস্ত আরবদের মধ্যে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদেরকে ঐ ব্যাপারে অধিক চাপ প্রয়োগ উচিৎ হবে না। সাহাবায়ে কেরামের ধারণা ছিল, ঐ সমস্ত আরব ঈমানদার হিসেবে এখনও নতুন। যখন ঈমান তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হবে তখন তারা আপনা থেকেই যাকাত প্রদান করবে।[১]

কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবা কিরামের ঐ পরামর্শ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ, যদি এ সমস্ত লোক একটি উটের রশি প্রদান করতেও অস্বীকার করে যা তারা হুযূর (সা)-এর যুগে দিত তাহলেও আমি তাদের

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩১১ঃ আল্লামা ইবনে হাযাম একারণেই তাদের সম্পর্কে লিখেছেন

وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا " نقيم الصلاة وشرائع الإسلام إلا أنا لا نـودي الزكوة أبا بكر (رض) ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول الله (ص) الملل والنحل ـــ

(আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬)।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' তিনি আরো বলেন, "যাকাত মালের হক (অর্থাৎ ইবাদত)। যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।"

হযরত ওমর (রা) যিনি আপন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন, বলেন, "আপনি কিসের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন? হুযূর (সা) তো বলেছেন, 'আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, লোকদের সাথে আমি ততক্ষণ যুদ্ধ করব যতক্ষণ لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله না বলবে।" কিন্তু যখন তারা এই কালিমা পাঠ করবে তখন তাদের জীবন ও ধনসম্পদ নিরাপদ হয়ে গেল, তবে হাঁ যদি তাদের উপর কারো হক থাকে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুক্তি ছিল এই যে, ফরয হিসেবে নামায ও যাকাতের কোন পার্থক্য নেই। একারণেই পবিত্র কুরআনের বেশীর ভাগ স্থানে নামায যাকাতের কথা একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে এও বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

"অতঃপর যদি ঐ সমস্ত লোক তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদেরকে কিছু বল না।"

তাছাড়া এ ঘটনা সম্পর্কেও সকলেই অবগত আছেন যে, 'তায়েফ হতে বনু সাকীফ এর একটি প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেছিল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি, তবে নামায থেকে আমাদের ক্ষান্ত দিন। তখন হুযূর (সা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের সে আবেদন প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, "এটা আবার কেমন দীন যাতে নামায নেই?

إنه لا خَيْرَ فِي دِيْنٍ لاَ صَلاَةَ فِيْه

অতএব নামায ব্যতীত যেমন দীন বাকি থাকে না তেমনি যাকাত ব্যতীতও তা বহাল থাকে না।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত যেহেতু সম্পূর্ণ সঠিক ও বাস্তবমুখী ছিল শেষ পর্যন্ত হযরত ওমর (রা) ও তা সমর্থন করেন। তিনি বলেন ঃ

فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"

প্রতিনিধি দলের বিফল প্রত্যাবর্তন ও মদীনা হিফাযতের ব্যবস্থা

খলীফার দরবার থেকে নিরাশ হয়ে প্রতিনিধি-দলের সদস্যরাও তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যায়। তারা মদীনায় দেখে যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় যাচ্ছেন এবং মদীনায় স্বল্প-সংখ্যক সাহাবী রয়েছেন। ঐ সমস্ত লোক নিজ নিজ গোত্রকে উৎসাহ প্রদান করে বলে,

www.pathagar.com

এখনই মদীনার উপর আক্রমণ পরিচালনার সুবর্ণ সুযোগ। এদিকে হযরত আবূ বকর (রা) মুহূর্তটিকে সংকটপূর্ণ বিবেচনা করে মদীনার নিরাপত্তা ও প্রহরার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে এই ব্যবস্থা নেন যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবা (রা) অর্থাৎ আলী (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে মদীনায় বিভিন্ন রাস্তায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেন এবং মদীনায় অবস্থানকারী সকল মুসলমানের উপর মসজিদে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক করে দেন, যাতে হঠাৎ কোন গন্ডগোল দেখা দিলে সাথে সাথে তারা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। তিনি এক ভাষণে বলেন, হে মুসলিমগণ! উক্ত প্রতিনিধি দল তোমাদের সংখ্যাল্পতা প্রত্যক্ষ করে গিয়েছে তাই তোমরা জান না যে, তারা সকালে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, না সন্ধ্যায়। তারা তোমাদের অতি নিকটবর্তী। ঐ সমস্ত লোক আমাদের নিকট তাদের অনেক চাহিদা ও অনেক আশা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদের সে চাহিদা প্রত্যাখান করেছি। তাই তোমরা তৈরি হয়ে যাও এবং সতর্ক থাক।[১]

মদীনা আক্রমণ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে আশংকা ছিল অবশেষে তা সঠিক প্রমাণিত হল। প্রতিনিধি-দল অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যে তুলাইহা আসদীর আওতাধীন গোত্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক ভাগ যুহাসা নামক স্থানে, যা মদীনার নিকটবর্তী নাজদের রাস্তার উপর অবস্থিত, অবস্থান নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূল বাহিনীর সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করা। অপর ভাগ মদীনা আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়। মদীনার নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের যে দল নিয়োজিত ছিল তারা এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-কে অবহিত করে। তিনি নির্দেশ দেন "তোমরা তোমাদের জায়গায়ই অবস্থান কর। এ দিকে তিনি মুসলমানদেরকে উটের উপর চড়িয়ে রওনা হন। বিদ্রোহীরা মুসলমানদের প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। বিদ্রোহীরা জুহাসা নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে যারা পূর্ব হতেই অবস্থান করছিল তারাও তাদের সাথে পলায়ন করতে থাকে। মুসলমানরা উটের উপর আরোহণ করে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে চললো। ঐ সময় জুহাসাবাসী একটি অভিনব কাজ এই করল যে, তাদের সাথে চামড়ার যেসব থলি ছিল সেগুলোতে ফুঁক দিয়ে বেলুন বা বোমার আকৃতি বানিয়ে রশিতে বেঁধে তা উটের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। মুসলমানরা উট যুদ্ধের এই ধোঁকায় অভ্যস্থ ছিল না। তাই তারা সেখান থেকে সোজা মদীনায় ফিরে আসে।[২]

---

১. আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১১-৩১৩।

২. কামিল ইবনে আমীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৬, তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮ আল বিদায়া ওয়াননিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১০১।

www.pathagar.com

মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি

আব্‌স, জুবইয়ান, বনু মুররাহ্, বনু কিনানাহ্ প্রভৃতি যেসব গোত্র ওদের হালীফ ছিল তারা মনে করল যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। অতএব তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। তারা মদীনা আক্রমণ করার জন্যও যুলকিস্‌সা-বাসীদেরকে (মদীনার নিকটবর্তী নাজদের রাস্তায় বসবাসকারী) তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানায়। তুলাইহার ভাই (হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর তাকে পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন) হাবাল ওদের নেতৃত্ব করছিলো। এদিকে হযরত আবূ বকর (রা) মদীনা পৌঁছে একটি মুহূর্তেরও অপচয় না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সৈন্যদের যথারীতি শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। সৈন্যদলের ডান দিকে নুমান ইবনে মাকরানকে এবং বাম দিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাকরানকে মোতায়েন করা হয়। পিছন দিকে মোতায়েন করা হয় তাঁর ভাই সুওয়াইদকে। রাতের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকতেই তারা রওয়ানা হন এবং প্রত্যুষেই শত্রুদের কাছে পৌঁছে যান। শত্রুরা বেখবর অবস্থায় আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল। মুসলমানরা তরবারী চালনা শুরু করেন। এ সমস্ত লোক ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাতে পালাতে যুলকিস্‌সায় গিয়ে পৌঁছে। রাসূল (সা)-এর খলীফা যুলকিস্‌সা পর্যন্ত তাদেরকে তাড়া করেন। অতঃপর হযরত নু'মান ইবনে মাকরান (রা) এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী যুলকিস্‌সায় রেখে নিজে মদীনায় ফিরে আসেন। আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর এই প্রথমবারের বিজয়ে মদীনায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের যে সমস্ত মুসলমান নেতা ছিলেন তারা নিজ নিজ যাকাত নিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সরদারগণ খাঁটি ও সৎ-মুসলমান ছিলেন।

যারা মদীনার পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন তারা বাইরে থেকে আগত যাকাত প্রদানকারী নেতাদেরকে নিয়ে মদীনায় আসতে থাকেন। তাদেরকে (রা) আসতে দেখে মুসলমানরা চীৎকার দিয়ে উঠে।[১] هذا نذير হযরত আবূ বকর (রা) সাথে সাথে বলে উঠেন না না, ওরা সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ইসলামের সাহায্যকারী। মূল বাক্য হল بل هو بشير وهو حام وليس بوان লোকজন উত্তরে হযরত আবূ বকর(রা)- কে বলে طالما بشرت بالخير "আপনি তো সর্বদাই সুসংবাদ প্রদান করে থাকেন।"

---

১. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৭৮ যেহেতু ঐ সব সাহাবী মদীনার পাহারাদার ছিলেন তাই তাদের আগমন বাহ্যিকভাবে একথার ইঙ্গিত ছিল যে, মদীনার উপর কোন বিপদ আসছে এবং এরা সংবাদ নিয়ে এসেছে। যখন আসল ঘটনা প্রকাশ পেল তখন মুসলমানরা আনন্দে ঠাট্টা করে তাদেরকে هذا نذير বলতে থাকেন। যারা সাদ্‌কা নিয়ে এসেছিলেন ইতিহাসে তাদের সবার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

www.pathagar.com

আব্স ও যুবইয়ানদের বিশ্বাসঘাতকতা

হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুলকিস্সা হতে বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর আবস্ যুবইয়ানরা আর কিছু করতে না পেরে সেখানে যে কয়েকজন মুসলমান ছিল তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করল। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর অঙ্গীকার করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই গোত্রের সমস্ত লোকদের উপর মুসলমানদের অন্যায় রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। ইতিমধ্যে হযরত উসামা (রা) তার মিশন শেষ করে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) অধিক স্বস্তি লাভ করেন। তিনি হযরত উসামা (রা)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে বলেন, "أريحوا واستريحوا তুমি এখন বিশ্রাম কর।"

যুলকিস্সার দিকে রওনা

এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করে হযরত আবূ বকর (রা) ঐ বিশ্বাসঘাতক লোকদের শাস্তি প্রদান এবং মুসলমানদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং যুলকিস্সার দিকে রওনা হওয়ার উদ্যোগ নেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁকে বলেন, হে খলীফায়ে রাসূল (সা)! আমরা আপনাকে কসম দিয়ে বলেছি যে, আপনি স্বয়ং সেখানে যাবেন না। আল্লাহ্ না করুন যদি আপনি কোনভাবে আহত হ'ন তাহলে আমাদের মধ্যে কোন শৃংখলা থাকবে না। আপনার এখানে অবস্থানই শত্রুদের জন্য অধিক ভয়ের কারণ হবে। আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে সেখানে প্রেরণ করুন। যদি তিনি সেখানে শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে আপনি তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারবেন।[১] কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাদের কথা মানেন নি।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "যখন আমার পিতা ঘোড়ায় চড়ে খাপ হতে তরবারি বের করেন এবং যুলকিস্সার দিকে রওয়ানা হন তখন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) তার অশ্বের লাগাম টেনে ধরে বলেন, হে খলীফায়ে রাসূল আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনাকে এখন ঐ কথাই বলব যা হুযূর (সা) গাযওয়ায়ে ওহোদের সময় আপনাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ আপনার তলোয়ার কোষবদ্ধ করুন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না।[২]

যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন

কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্র কসম, আমি এরূপ করব না, আমি আমার নিজের জন্য তোমাদের কোন সহানুভূতি গ্রহণ করব না। শেষ পর্যন্ত

---

১. তাবারীর ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৭৯।

২. আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫। কিন্তু হাফিয ইমাদুদীন ইবনে কাসীর বলেন, হযরত আবু বকর (রা) হযরত আলী (রা)-এর আবেদন গ্রহণ করেন এবং বাহিনীকে রওনা করে নিজে ফিরে আসেন। অথচ তাবারী ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে তিনি কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন নি এবং স্বয়ং যুদ্ধে গমন করেন।

www.pathagar.com

তিনি নিজেই সেনাবাহিনী নিয়ে যুলহাস ও যুসকিস্সার দিকে রওয়ানা হন। তিনি আবরাক নামক স্থানে রাবযাহ্বাসীদের উপর আক্রমণ করেন। হারিস ও আউফ সেখানকার নেতা ছিল। তিনি তাদেরকে পরাজিত করেন। বনু আব্স বনু বকর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। হযরত আবূ বকর (রা) আবরাকে কয়েকদিন অবস্থান করে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বনু যুবইয়ানকেও পরাজিত করে তাদের এলাকা দখল করেন। অবশেষে আবস্ ও যুবইয়ান যে সব মুসলমানকে শহীদ করেছিল তিনি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

বনু যুবইয়ান, আব্স, গাতফান, বনু বকর এবং অন্যান্য যে সব গোত্র মদীনার পাশ্ববর্তী এলাকায় বাস করত। তাছাড়া যাদেরকে এরাবে মদীনা বলা হত তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) জয়লাভ করেন। তখন তাদের উচিৎ ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর আনুগত্য স্বীকার করা এবং যাকাতের ফরযিয়াত স্বীকার করে খাঁটি মু'মিনে পরিণত হওয়া। কিন্তু শোচনীয় পরাজয় তাদেরকে উল্টো উত্তেজিত করে তুলে । ফল দাঁড়ায় এই যে, এতদিন পর্যন্ত ইসলামের যে কৃত্রিম পর্দা দ্বারা তারা তাদের চেহারা ঢেকে রেখেছিল তা দূরে ফেলে দিয়ে যারা প্রকাশ্য বিদ্রোহী ও কাফির ছিল তাদের দলে যোগ দেয়। তাই স্বাভাবিকভাবে রিদ্দা যুদ্ধের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

নবূওতের দাবীদার ও ধর্মবিমুখদের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ

হযরত উসামা (রা) এবং তাঁর সাথীরা কিছুদিন বিশ্রাম করার পর পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এবার নবূওতের দাবীদারের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য যে, বনু আব্স ও যুবইয়ান বনু বকর ও অন্যান্য গোত্র রাবযায় পরাজয়বরণ করা সত্ত্বেও সঠিক পথে না এসে বরং তুলাইহার নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সেখানে ত্বায়, গাতফান ও সুলাইম প্রভৃতি গোত্র পূর্ব হতেই ছিল। তাই এবার তুলাইহার শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা ইসলামের জন্য অত্যন্ত বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা ছিল মদীনার পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকের। দক্ষিণ দিকে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল।

মুসলিম বাহিনীর এগারটি দল

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা) দ্বিতীয়বার যুলকিস্সায় গমন করেন এবং সেখানে সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে এগারটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন পতাকাবাহী নেতা নিয়োগ করেন। নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে তার একটি বিবরণ দেয়া গেল।

---

১. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বাহিনী প্রধানের নাম	যুদ্ধের স্থান	ঐ সমস্ত গোত্র বা ব্যক্তির নাম যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রধানদের নিয়োগ করা হয়েছিল
১.	হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ সাইফুল্লাহ্	বাযাখতাহ্ ও বাতাহ্	তুলাইহা ও মালিক ইবনে নুভায়রাহ্
২.	হযরত আকরামা ইবনে আবি জেহ্‌েল	ইয়ামামাহ্	মুসায়লামা কায্যাব ও বনু হানীফা
৩.	মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া	ইয়ামন ও হাযরামাউত	পিরওয়নে আসওয়াদ আনসী এবং কায়েস ইবনে আস।
৪.	আমর ইবনে আস	আরব ও সিরিয়া সীমান্ত	কুদাআই ওয়াদীয়াহ্ ও হারিস
৫.	খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস	আল-হামকাতান (সিরিয়া সীমান্ত)	এখানে বসবাসকারী গোত্রসমূহ চরম বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল।
৬.	আলা ইবনে হাদরামী	বাহ্‌রাইন	আলহাতাম ইবনে দাবীআহ্।
৭.	সূতায়দ ইবনে মাকরান	ইয়ামনের নিম্নাঞ্চল	
৮.	আরফাজাহ্ ইবনে হারছামাহ	মাহ্‌রাহ্	
৯.	হুযায়ফাহ্ ইবনে মুহসিন	আমমান	লাকীত ইবনে মালিক আল আয্দী।
১০.	তুরায়ফাহ্ ইবনে হাজিয সালামী[১]	আরবের উত্তরাঞ্চল	বনু সালীম ও হাওয়াযিন।
১১.	শারাহ্‌জিল ইবনে হাসনাহ্	ইয়ামামাহ্ (হযরত ইকরামাহ্ এর সাথে)	মুসায়লামা ও বুন হানীফ।[২]

সমসাময়িক রাজনীতি ও পরিস্থিতি চাহিদা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা)-এর মদীনায় অবস্থানই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে

১. তাবারী (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)-এর নাম তুরায়ফাহ্। লিখেছেন; কিন্তু ইবনে আসীর এবং অন্যান্য ইতিহাসে মাআন ইবনে হাজিয লিখা হয়েছে। কামিল ইবনে আসীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২৬৩ দ্রঃ।

২. তাবারী ইবনে আসীর।

www.pathagar.com

রাজধানীতেই অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই সৈন্যদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের জন্য নির্দেশাবলী প্রেরণ করতে থাকেন।

পাছে কোন অভিযোগ না উঠে,তাই হযরত আবূ বকর (রা) সেনাবাহিনীকে রওয়ানা করার সময় একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে তা প্রত্যেকটি সেনাদলকে পৃথক পৃথকভাবে দেন, যাতে তারা যুদ্ধের পূর্বে বিদ্রোহী ও শত্রুদেরকে তা পড়ে শুনায়। এটা শুনে যদি তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা যুদ্ধের দ্বারাই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই লিখিত বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণা ছিল অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, যার দ্বারা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সংযুক্ত করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আমরা নিম্নে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পেশ করছি।

খলীফায়ে রাসূল (সা)-এর সাধারণ ঘোষণা

"খলীফায়ে রাসূল (সা) আবূ বকর এর পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত সাধারণ ও বিশেষ লোকদের বরাবরে যাদের নিকট আমার এই লিখিত বক্তব্য পৌঁছবে; চাই তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে নয়ত এ থেকে ফিরে গেছে। ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি সালাম—যারা হিদায়েত গ্রহণ করেছে এবং একবার তা গ্রহণের পর পুনরায় ভ্রান্তপথ ও অন্ধকারের দিকে ফিরে যায় নি। আমি তোমাদের সকলের সম্মুখে ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন অংশীদার নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল। আমরা ঐ সমস্ত বিষয় স্বীকার করেছি যা তিনি নিয়ে এসেছেন। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত জিনিস অস্বীকার করে আমরা তাঁকে কাফির বলে ঘোষণা করছি এবং আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব।

পর সমাচার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিজের পক্ষ থেকে সত্য-সহকারে সৃষ্টির প্রতি সুসংবাদদাতা, ভয়প্রদানকারী সত্যের দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল আলোকবর্তীকা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাতে যে সমস্ত লোক জীবিত তাদেরকে তিনি ভয় প্রদর্শন করেন এবং কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র দলীল পরিপূর্ণ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাওফীক দিয়েছে সে এই সঠিক ও সৎ বিষয়টি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হয়েছে হুযূর (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তার উপর এমন শাস্তি প্রয়োগ করেছেন যে, সেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইসলামের আওতায় প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে এই পৃথিবী হতে তুলে নিয়েছেন। আঁ-হযরত (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকারী করে গেছেন এবং তার যা দায়িত্ব ছিল তা পূর্ণ করে গেছেন। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা এই বিষয়টি (ওফাত নবী-সা)-কে আপন কিতাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং সকল আহ্লে ইসলামকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। তিনি বলেন ঃ [১]

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ

"নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং অন্যান্য সকলে মরণশীল"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أ فَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ –

"তোমাদের পূর্বেও আমরা কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবী হবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪)

উপরোক্ত আয়াতে কথাগুলো বিশেষভাবে হযরত (সা)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর সাধারণ মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أ فَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ –

"মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না। এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূজা করত তার জেনে নেয়া উচিত যে হযরত (সা) ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু সেই আল্লাহ্র ইবাদত করে যার কোন শরীক নেই, তার হিফাযত আল্লাহ্ই করেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তার মৃত্যু কখনো আসবে না, তার কোন নিদ্রা নেই, তন্দ্রা নেই। তিনি তার সব কাজের হিফাযতকারী। তিনি শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করেছি, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। তার নিকট থেকে হুযূর (সা) যা কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। হুযূর (সা)-এর আদর্শ গ্রহণ কর। আল্লাহ্র দীনের রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকরে ধর। কেননা যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত না করেন সে পথভ্রষ্ট এবং যাকে ক্ষমা প্রদর্শন না করেন সে বিপন্ন। আল্লাহ্ যাকে সাহায্য না করেন তার কোন অভিভাবক নেই। একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের হিদায়েতকারী।

---

১. এখানে হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই জন্য দিয়েছেন যে, উয়াইনা ইবনে হাসান ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোত্রসমূহের নিকট গিয়ে প্রোপাগাণ্ডা করছিল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছে অথচ তুলাইহা জীবিত রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তুলাইহা খাঁটি ও প্রকৃত পয়গাম্বর। চিন্তা করে দেখুন হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই বাণী নবূয়তের পদমর্যাদা ও রিসালাতের স্থান নির্ধারণে ইসলামের মূল দৃষ্টিকোণ থেকে কত উঁচু ধরনের বিশ্লেষণ ছিল। এর দ্বারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَ لِيًّا مُّرْشِدًا –

তোমাদের মধ্যে যারা ইসলামকে স্বীকার করার পর এবং এর উপর আমল করার পর আপন ধর্ম থেকে ফিরে গেছে তাদের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। এই সমস্ত লোক আল্লাহ্ সম্পর্কে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে বলেই অনুরূপ কাজ করেছে। এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ এবং তারা শয়তানের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

এখন আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে দলনেতা নিযুক্ত করে আনসার, মুহাজির ও তাবেয়ীনদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী তোমাদের দিকে প্রেরণ করেছি। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, যেন তারা ঐ সময় পর্যন্ত কারো সাথে যুদ্ধ না করে যখন পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করা না হয়। যে ব্যক্তি এই আহবানে সাড়া দেবে, এটাকে স্বীকার করবে, দুষ্টামি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি থেকে ফিরে আসবে এবং সৎ কাজ করবে, আমার এই প্রতিনিধি দল তাদেরকে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে। এর বিপরীতে যারা এই আহবানকে অস্বীকার করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর এই শত্রুতা যখন পরাজয় বরণ করবে তখন তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে, তাদেরকে হত্যা করে ধ্বংস করা হবে। তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে গ্রেফতার করা হবে। এখন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যারা আমার এই প্রতিনিধি দলের আনুগত্য করবে তারা উত্তম কাজেই করবে। আর যারা এদের আনুগত্য করবে না তারা আল্লাহ্কে সামান্যমাত্র দুর্বলও করতে পারবে না।

আমার এই লিখিত বক্তব্য তোমাদের প্রতিটি জনসমাগমে পাঠ করে শুনাবার[১] জন্য আমি আমার পত্র বাহকদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছি।

চুক্তিপত্র

সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার পর খলীফার এই লিখিত বক্তব্য নিয়ে বাহকরা অগ্রে অগ্রে যাচ্ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই ঘোষণা ঐ সমস্ত ধর্মত্যাগীদের উদ্দেশ্যে ছিল যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী রওনা হয়েছে। এছাড়াও হযরত আবূ বকর (রা) সেনাপতিদের নামে পৃথক পৃথক পত্র লিখেছিলেন যাতে দৈনন্দিন ফরয ও ওয়াজিবসমূহ বর্ণনা করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ হিদায়েত ও নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত পত্রেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, ধর্মত্যাগীদের কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করা হবে না এবং মুসলমানদের সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করা হবে।[২]

---

১. তাবারীঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮১-৪৮২।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮২।

www.pathagar.com

বুযাখার যুদ্ধ

আব্‌স ও যুবইয়ানের পরাজয় মুহূর্তে তুলাইহা সামীরা কোন এক স্থানে অবস্থান করছিল। এবার সে বুযাখায় উপনীত হয়ে চতুর্দিকের গোত্রসমূহকে একত্র করে একটি বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে মুসায়লামার মুকাবিলা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান

যখন হযরত খালিদ (রা) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ন তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে যে কতগুলো নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা দ্বারা খলীফায়ে রাসূল (সা)-এর সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কিত দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, তোমরা সর্বাগ্রে 'বনু ' ত্বায় গোত্র থেকে অভিযান শুরু[১] করবে। এরপর বুযাখার দিকে অগ্রসর হবে। সেখানকার কাজ শেষ হওয়ার পর বাতাহ্-এর দিকে যাবে। সাথে সাথে তিনি এই নির্দেশও প্রদান করেছিলেন যে, যখন তোমরা একটি যুদ্ধ শেষ করবে তখন আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেই এলাকায়ই অবস্থান করবে। শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে কৌশল হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা) নিজের সম্পর্কে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি একদল সৈন্য নিয়ে খায়বার অভিমুখে যাচ্ছি। সেখানে হযরত খালিদ (রা)-এর সৈনদের সাথে মিলে তাদেরকে সাহায্য করবো।

বনু ত্বায়ের ইসলাম গ্রহণ

বনু ত্বায় গোত্র 'আজা' নামক স্থানে বসবাস করত। খলীফায়ে রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা) প্রথমে সেদিকে অগ্রসর হন। ঐ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা)। তিনি ইসলামের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে বনু ত্বায়-এর নিকট গিয়ে বলেন, 'দেখ, হযরত খালিদ (রা) একটি দুরন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে আসছেন। অপরদিকে হযরত আবূ বকর (রা) নিজেই একটি সেনাবাহিনী নিয়ে খায়বর গমন করছেন। এই প্রেক্ষিতে তুলাইহার দল ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। অন্যথায় মুসলিম বাহিনী তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। ঐ সমস্ত লোকেরা হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) কথা শুনে প্রথমে রসিকতা করতে থাকে, এমনকি তারা ঠাট্টারছলে হযরত আবূ বকর (রা)-কে আবুল ফুসায়ল (বাচ্চার

---

১. হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এটা জানতেন যে, যদিও এ সময় বনু ত্বায় তুলাইহার সাথে মিশে গেছে। কিন্তু তারা এত কঠোর বিদ্রোহী নয়। কিছু আলোচনা এবং কিছু আশা ও ভয় এর দ্বারা তাদেরকে বাধ্য করা যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বনু ত্বায় সম্পর্কে অনুরূপ পরামর্শ দিয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

পিতা) বলে সম্বোধন করে। কিন্তু হযরত আদী (রা) যখন পুনরায় জোর দিয়ে বলেন 'তোমরা কিরূপ কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছ যে, একটি সেনাবাহিনী বিপুল বিদ্রূপে তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে অথচ তোমরা তার নেতাকে বাচ্চার পিতা (আবুল ফুসায়ল) বলে সম্বোধন করছ। তিনি আবুল ফুসায়ল নন বরং ফহলে আকবর (এক বড় ষাঁড়)। এবার তোমাদের চিন্তা তোমরাই কর। একথা শুনে তারা একটু নরম হয় এবং হযরত আদী (রা)-কে বলে, আচ্ছা! আপনি গিয়ে ঐ বাহিনীকে আমাদের থেকে একটু থামিয়ে রাখুন। আমাদের যে সমস্ত ভাই বন্ধু বুযাকায় তুলাইহার নিকট চলে গেছে আমরা তাদেরকে সুকৌশলে ফিরিয়ে নিয়ে আসি, নতুবা তুলাইহা তাদেরকে হত্যা করবে। আদী (রা) তাদের কথা মেনে নিলেন। হযরত খালীদ (রা) এই সময় 'সুখ' নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আদী (রা) সেখানে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি তিন দিন এখানে অবস্থান করুন। এর মধ্যে পাঁচশত বীর যোদ্ধা আপনার সাথে এসে মিলবে। ফলে আপনার শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।' হযরত খালিদ (রা) তার ঐ কথা মেনে নেন। অবশেষে দেখা গেল, হযরত আদী (রা) বুযাখা থেকে আগত বনু ত্বায় এর লোকদেরকে নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর খিদমতে আসছেন। তারা হযরত খালিদের কাছে এসে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে।[১]

ইবনে কাসীর (রা) বর্ণনা করেন যে, এভাবে হযরত খালিদ (রা)-এর সেনা বাহিনীতে এক হাজার অশ্বরোহী সৈন্য বৃদ্ধি পায়।

বনু জুদায়লাহ্-এর ইসলাম গ্রহণ

এবার হযরত খালিদ (রা) বনু জুদায়লার আবাসভূমি আন্নসর এর দিকে অগ্রসর হ'ল। হযরত আদী (রা) পুনরায় সেখানে যান এবং খালিদ (রা)-কে বলেন, 'বনু ত্বায় গোত্র হ'ল একটি পাখী, আর বনু জাদীলা হ'ল তার একটি পাখা। পাখীর এক পাখা অর্থাৎ বনু ত্বায় সঠিক পথে এসে গেছে। এবার আমাকে একটু সময় দিন, আমি দ্বিতীয় পাখা (বনু জাদীলা)-কেও সঠিক পথে নিয়ে আসি। হযরত খালিদ (রা) তার ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন। হযরত আদি (রা) বনু জুদায়লার কাছে গিয়ে ঐ কথাই বললেন যা বনু ত্বায়কে বলেছিলেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা সাথে সাথে তার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং হযরত আদী (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। বনু জুদায়লা মুসলমান হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা)-এর বাহিনীতে আরো এক হাযার সৈন্য বৃদ্ধি পায়।[২]

---

১. তিন দিন সময়ের কথা তাবারী উল্লেখ করেছেন। ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৩। কিন্তু কামিল ইবনে আসীর (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩) সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত এটাই সঠিক। কেননা বাহ্যিক সৃষ্টিতে তিন দিনের মধ্যে এ সমস্ত বিষয়ের সমাধান কষ্টকরই বটে।

২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৩; ইবনে আসীরঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৬৩।

www.pathagar.com

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা)-এর এই ঘটনা এত দীপ্তিপূর্ণ ও মঙ্গলময় ছিল যে, ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, “বনু ত্বায় গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা)।”

যখন সমগ্র আরবে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া শুধু একজন লোকের প্রচার ও প্রেরণায় দু'টি গোত্রের মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং তাদের দু'হাযার সৈন্যের ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করা ইসলামের একটি বিরাট মু'জিযাই বটে। এতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থিরবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় মিলে।

এবার হযরত খালিদ (রা) মূল লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ ¦ বুযাখার দিকে অগ্রসর হন। সৈন্যদের অগ্রগামী দল হিসেবে হযরত আকাশাহ্ ইবনে মুহসিন এবং হযরত সাবিত ইবনে আকরাম আনসারীকে ইতিপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল। পথিমধ্যে কোথাও তাঁরা তুলাইহার ভাই হিবালকে পেয়ে সাথে সাথেই হত্যা করেন। তুলাইহা এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আপন ভাই সালমাহকে নিয়ে বের হয় এবং তুলাইহা হযরত আকাশাহ্কে এবং সালমাহ্ হযরত সাবিত (রা)-কে হত্যা করে। অতঃপর তারা প্রত্যাবর্তন করে। হযরত খালিদ (রা) স্বীয় বাহিনীর নিয়ে সেখানে পৌঁছে হযরত আকাশাহ্ (রা) ও হযরত সাবিত (রা)-কে নিহিত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। বুযাখার যুদ্ধ ক্ষেত্র সামনেই ছিল। তুলাইহার সাথে সেখানে উয়াইনা ইবনে হাসান ফাযারী আপন গোত্রের সাতশত বীর যোদ্ধা নিয়ে অবস্থান করছিল। এ ছাড়া কায়েস ও বনু আসাদ গোত্রও তাদের সাহায্যে সদা প্রস্তুত ছিল। যেহেতু বনু আসাদ এবং বনু ত্বায় পরস্পরের পরস্পর হালীফ ছিল তাই বনু ত্বায়-এর সে সমস্ত সৈন্য হযরত খালিদ (রা)-এর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা বলল, 'আমরা শুধু কায়েস গোত্রের সাথেই যুদ্ধ করব। এতে হযরত আদী (রা) কিভাবে চুপ থাকতে পারেন? তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার বংশের অতি নিকটবর্তী কেউও এই দীন পরিত্যাগ করে তা হলে আমি তার সাথেও যুদ্ধ করব। এটা কিরূপ কথা যে, বনু আসাদ ও বনু ত্বায় একে অপরের হালীফ বলে বনু ত্বায় বনু আসাদের সাথে যুদ্ধ করবে না? হযরত খালিদ (রা) বলেন, “এই কায়েস গোত্রও কম নয়। যদি বনু ত্বায় তাদের সাথেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে তাহলে তাদেরকে তাই করতে দাও। এব্যাপারে তাদের বিরোধীতা করো না।”

তুলাইহার সাথে যুদ্ধ

এবার মুসলিম বাহিনী এমনভাবে অগ্রসর হয় যে, বনু ত্বায়-এর বীর যোদ্ধারা কায়েস গোত্রের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয় এবং অন্যান্য মুসলিম মুজাহিদরা অবশিষ্ট গোত্রের যোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। উয়াইনা তার যোদ্ধাদের নিয়ে খুব গর্ব করত। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যোদ্ধাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে

www.pathagar.com

দেয়। তুলাইহা গায়ে একটি চাদর লেপটিয়ে বালির একটি দুর্গে অবস্থান করছিল। উয়াইনা তার বাহিনীকে পিছু হইতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তুলাইহার দুর্গে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে; কোন ওহী এসেছে কি? তুলাইহা বলে, না। পুনরায় সে একই প্রশ্ন করলে তুলাইহা না সূচক জবাব দেয়। অবশেষে তৃতীয়বার যখন উয়াইনা তুলাইহার কাছে এসে একই প্রশ্ন করল তখন সে জবাব দিল হাঁ, ওহী এসেছে। আর তাহলো,

إنّ لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه

উয়াইনা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, 'আল্লাহ্ জানেন তোমার উপর এমন কি ঘটনা আপাতত হবে যা তুমি ভুলতে পারবে না। অতঃপর সে (উয়াইনা) বনু ফাযারকে সম্বোধন করে বলে, হে লোক সকল। এই ব্যক্তি হ'ল মিথ্যাবাদী। তাই তোমরা যুদ্ধ হতে ফিরে যাও। তুলাইহার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এই বনু ফাযারাহ্। যুদ্ধের মাঠ থেকে এদের ফিরে যাওয়ার কারণেই তুলাইহার সৈন্যদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তুলাইহা নিজের জন্য এবং নিজের স্ত্রী নওয়ারার জন্য ঘোড়া তৈরি করে রেখেছিল। তারা উভয়ে নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করে যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করে। তুলাইহা পালিয়ে যাবার সময় বলে, 'হে বনু ফাযারাহ্! তোমাদের যে কেউ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে চাও এখনই পালাও।

তুলাইহার পলায়ন ও ইসলাম গ্রহণ

তুলাইহা এখান থেকে পলায়ন করে সোজা সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। কিছুদিন পর যখন সে অবগত হয় যে, আসাদ ও গাতফান উভয় গোত্রের লোকজন মুসলমান হয়ে গেছে তখন বনু কাল্‌ব গোত্রের কাছে এসে সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়। একবার ওমরাহ্ আদায় করার ইচ্ছা নিয়ে সে মক্কায় পথ ধরে মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় কোন এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে সে সম্পর্কে অভিহিত করলে, তিনি বলেন, 'আমি এখন কি করব? সে তো মুসলমান হয়ে গেছে'। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তুলাইহা বনু কালবের মধ্যেই অবস্থান করে। যখন সে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের জন্য আসে তখন হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি ঐ ব্যক্তি যে আকাশাহ্ ও সাবিত (রা)-কে হত্যা করেছিল? আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও তোমাকে পছন্দ করব না। তুলায়হা উত্তরে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইসলাম তো পূর্ববর্তী সবকিছু মিটিয়ে দেয়। তাই এখন আর এর উল্লেখ করার কি প্রয়োজন। এছাড়া এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার চিন্তার কি কারণ আছে যাদের আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা সম্মান (শাহাদাত) প্রদান করেছেন এবং তাঁদের উভয়ের হাত আমাকে লাঞ্ছিত করেনি।' একথা শুনে হযরত ওমর (রা) আর কোন আপত্তি না করে তুলাইহার বায়'আত গ্রহণ করেন।[১]

---

১. আল-কামিলঃ ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৬৪; তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৯।

www.pathagar.com

আরব উপদ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে যেসব ধর্মত্যাগী গোত্র ছিল তাদের সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর এটাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। এই পরাজিত গোত্রসমূহ অর্থাৎ বনু আসাদ, বনু কায়েস এবং বনু ফাযারাহ পরাজয় বরণের সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে। তাই এদের কাউকে গোলাম বা দাসী করা হয় নি। হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেন।[১]

বনু আমেরের ইসলাম গ্রহণ

বনু আমের বিদ্রোহে কোন পক্ষ নেয় নি। তারা দ্বিধা সংকোচের মধ্যে ছিল। যুদ্ধে কোন দল জয়লাভ করে সেদিকেই ছিল তাদের নযর। খালিদ (রা)-এর জয়লাভ করার পর এবং বনু ত্বায়, জাদীলা, আসাদ, কায়েস ও গাতফানের ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বাকি থাকে নি। তারা সম্মিলিতভাবে হযরত খালিদ (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার করে, 'আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলাম। এখন থেকে আমরা নামায পড়বো এবং যাকাত দেব। হযরত খালিদ (রা) তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দেন।

যালিমদেরকে কঠোর শাস্তি দেন

উপরে বর্ণিত ইসলাম গ্রহণকারী গোত্রসমূহের কিছু কিছু দুশ্চরিত্র স্বভাবের দলপতি তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপর অকথ্য যুলুম অত্যাচার করেছিল। সুতরাং হযরত খালিদ ঐ সমস্ত গোত্রকে বাধ্য করেন যেন তারা তাদের ঐ সমস্ত অত্যাচারীকে মুসলমানদের সামনে হাযির করে। ওদেরকে হাযির করা হলে তিনি তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। ওদের মধ্যে ছিল উয়াইনা ইবনে হাসান ফাযারি কুররা ইবনে হুবায়রা, আল-ফাজাআতুস সালমী এবং আলকামা ইবনে আলাছাহ্ ওরা ব্যতীত বাকী অপরাধীকে তিনি নিজেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা)-কে ঐ সমস্ত লোকের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেন এবং যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারও অনুমোদন করেন।[২]

উম্মে জামাল-এর বিদ্রোহ দমন

উপরোক্ত অভিযান শেষ করার পর হযরত খালিদ (রা) বুযাখায় এক মাস অবস্থান করেন। কেননা সেখানে তখনো এমন কিছু দুষ্কৃতিকারী অবশিষ্ট ছিল যারা পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও এবং তাদের গোত্র মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিশৃংখলা সৃষ্টির

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ২৬৫।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯১।

www.pathagar.com

কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ধরনেরই কিছু লোক উম্মে জামাল নামক জনৈকা মহিলার কাছে একত্র হতে থাকে। উম্মে জামাল ছিল উম্মে কারফার কন্যা। হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে বনু ফাযারাহ্‌র দিকে যে সারিয়া প্রেরিত হয়ে ছিল তাদের হাতে উম্মে কারফাহ্ গ্রেফতার হয়েছিল যেহেতু সে মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা ও দুশমনী প্রদর্শন করেছিল তাই তাকে হত্যা করা হয়। উম্মে জামালের অন্তরে এখনও সেই বিদ্বেষ বাকী ছিল। অথচ তার সাথে এরূপ সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল যখন সে গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসে এবং গনীমত হিসেবে হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাগে পড়ে তখন হযরত আয়েশা (রা) তাকে আযাদ করে দেন। সে তখন তার গোত্রের কাছে চলে যান। হযরত আয়েশা (রা)-এর এই করুণা সত্ত্বেও সে তার মায়ের হত্যার কথা ভুলতে পারে নি। যাহোক গাতফান, ত্বায়, সালীম এবং হাওয়াযিন গোত্রের ছোট বড় বিদ্রোহীরা উম্মে জামালের নিকট একত্র হয় এবং তার নির্দেশে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উম্মে জামাল তার মায়ের পরিত্যক্ত উটের উপর আরোহণ করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধে রওনা হয়। হযরত খালিদ (রা) যখন এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন এর মোকাবিলা করার জন্য এগোতে থাকে। মুসলিম মুজাহিদরা উম্মে জামালের উটকে ঘিরে ধরে প্রথমে তার পায়ের গিরা কেটে ফেলে। এরপর উম্মে জামালকেও হত্যা করে। ইবনে কাসীর-এর বর্ণনা মতে ঐ উটের আশেপাশে একশ বিদ্রোহী অশ্বারোহীও নিহত হয়। এই বিজয়ের সংবাদ সাথে সাথেই হযরত আবূ বকর (রা)-কে জানানো হয়।[১]

হযরত খালিদ (রা) বুযাখার আশে-পাশে সৃষ্ট আরো দু'তিনটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং এখানে তার একমাস অবস্থানকালে উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়।

বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার

এই যুদ্ধে যে সমস্ত নেতাদেরকে বন্দী করা হয় হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে মদীনায় প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাদের সাথে কিরূপ ভদ্র ও কোমল আচরণ করেছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। উপরোক্ত বিদ্রোহের নেতা ছিল তুলাইহা। কিন্তু যখন সে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন নি। উয়াইনার শক্তি ছিল তুলাইহার প্রধান সহায়। কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে তখন প্রাণদন্ড হতে তাকেও মুক্তি দেয়া হয়। বনু আমেরের নেতা কুররাহ্ ইবনে হুবায়রাকে গ্রেফতার করে যখন মদীনায় আনা হয় তখন সে বলে আমি কখনও মুরতাদ হই নি। আমার গোত্র যাকাত জরিমানা মনে করত এবং তারা শুধু তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবী করেছিল। হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার এই ঈমানের কোন সাক্ষী আছে?' কুররাহ্ হযরত আমর ইবনে আস (রা)-

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৩৬৫।

www.pathagar.com

কে এর সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। তিনি আম্মানে জীফার এর নিকট দিয়ে মদীনায় যাওয়ার সময় এক রাত্রের জন্য বনু আমের গোত্রে কুররা ইবনে হুবায়রার মেহমান হয়েছিলেন। ঐ সময় কুররা এবং হযরত আমর ইবনে আস (রা)-এর মধ্যে যাকাত সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছিল। তখন হযরত আমর ইবনে আস (রা)-এর ঐ আলোচনার বিষয় উল্লেখ করেন এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুররাহ্ প্রকৃতপক্ষে মুরতাদ হয় নি। তখন হযরত আবূ বকর (রা) কুররাকে মুক্তি দান করেন। শুধু আল্-ফাজাআতুস্সালমীকে তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও অসদাচরণের কারণে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

সাজাহ্ এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্

বনু তামীম-এর গুরুত্ব

বনু তামীম গোত্রের আবাসভূমি ছিল দক্ষিণ দিকে বনু আমের থেকে কিছুটা দূরত্বে মদীনার পূর্বদিকে ইরান পর্যন্ত এবং উত্তর পূর্বদিকে ফুরাত নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্বরযুগে অতঃপর হুযূর (সা)-এর যুগেও এই গোত্রটি অত্যন্ত সম্মানিত বলে পরিগণিত হ'ত। তারা বীরত্ব ও বদান্যতা গুণেও ছিল গুণান্বিত। এই গোত্রে অনেক প্রখ্যাত কবি, বীর এবং উদারচেতা লোক জন্মগ্রহণ করেন। এই গোত্রের শাখা বনু হানযালাহ দারিম, বনু মালিক এবং বনু ইয়ারবু এর বর্ণনায় আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস ভরপুর।

যেহেতু এই গোত্র পারস্য উপসাগর ও ফোরাত নদীর মোহনায় বসবাস করত তাই ইরাক ভূখণ্ড ও আরব উপদ্বীপের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ইরানেও তাদের যাতায়াত ছিল। তাই তাদের অধিকাংশ লোক খৃস্টানদের প্রভাবে ছিল প্রভাবান্বিত। এ সমস্ত কারণে আরবে যখন বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের ঝড় উঠে তখন বনু তামীমও তাতে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করে।

মালিক ইবনে নুভায়রার বিদ্রোহ

যখন আঁ-হযরত (সা) ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর প্রেরিত কয়েকজন কর্মকর্তা বনু তামিল গোত্রে অবস্থান করেছিলেন। ওদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[১] ওদের মধ্যে বনু ইয়ারবু গোত্রের মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ও ছিলেন।

---

১. তাবারী ঐ সমস্ত কর্মকর্তাদের নাম এবং যে সমস্ত গোত্রের উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেগুলোর নামও উল্লেখ করেছেন। ঐ সমস্ত কর্মকর্তা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমত যারা ইসলামের সত্য ও খাঁটি সাহায্যকারী ছিলেন এবং নিজেদের জমাকৃত যাকাতও মদীনায় প্রেরণ করেন। যেমন সাফওয়ান ইবনে সাফওয়ান, দ্বিতীয়, যারা সন্দিগ্ধ ও আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলো। যেমন জবরকান ইবনে বদর, তৃতীয়ত, যারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করেন। যেমন মালিক ইবনে নুভায়রাহ, ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯৫।

www.pathagar.com

হুযূর (সা) ইন্‌তিকালের সংবাদ পাওয়ার পর.ঐ সমস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য হয় যে, এ যাবত যে সমস্ত যাকাত ও সদ্‌কা আদায় করা হয়েছে তা কি করা হবে? তা কি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হবে, না স্থানীয় লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে? যারা মদীনায় যাকাত প্রেরণের বিরোধী ছিলেন, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ছিলেন তাদের অন্যতম। এ ভাবেই তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যান এবং ইসলামের শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

সাজাহ্-এর আগমন

কর্মকর্তারা পরস্পর মতানৈক্যের মধ্যে ছিলেন, এমন সময়ে সাজাহ্ বিন্‌তে হারিস ইরাকের আল্ জাযিরাহ্ হতে এমন জাঁকজমকের সাথে সেখানে এসে পৌছল যে, বনু তাগলাবের লোক তাকে বেষ্টন করেছিল এবং সে এক বিরাট সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ঐ বাহিনীতে ছিল রাবীয়া, নামর, আয়াদ এবং শায়বান গোত্রের অভিজ্ঞ লোকেরা। সাজাহ্ বনু তামীম-এর শাখা বনু ইয়ারবু' এর সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ইরাকের খৃস্টানধর্ম গ্রহণকারী বনু তাগলাব গোত্রের সাথে তার মাতামহের সম্পর্ক ছিল। প্রথমত সেও খৃস্টান ছিল। তাই ইসলামের সাথে সেও সেরূপ শত্রুতা পোষণ করত ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা। সে যাদুকর ছিল, তার যোগ্যতা, মেধা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ এই যে, সেই যুগেও মহিলা হয়ে সে আরবের বিখ্যাত গোত্রসমূহের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সে এতদিন সুযোগের সন্ধানে ছিল। তাই আঁ-হযরত (সা) ইন্‌তিকালের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সে একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এবং সম্ভবত এটাই সঠিক যে ইরান ও ইরাকে তার নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্ররোচনা ও অনুপ্রেরণার ফলেই সাজাহ্ এই আক্রমণ পরিচালনার দুঃসাহস পেয়েছিল। নতুবা তার নিজস্ব শক্তির দ্বারা মদীনা আক্রমণের চিন্তা সে করতে পারত না।

সাজাহ-এর গোত্রের যুদ্ধ

উত্তর ইরাক অতিক্রম করে সাজাহ্ যখন আরব উপদ্বীপে উপনীত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রথম সে তার আপন গোত্র বনু তামীম-এর কাছে আসে। সেখানে পৌছেই সে প্রত্যক্ষ করে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে সাদকাহ্ আদায়কারীদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। এটাকেও সে সাদকা হিসেবে গ্রহণ করে। সে মালিক ইবনে নুভায়রাহকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপন সহযোগী করে নিতে সক্ষম হয়। তবে মালিক ইবনে নুভায়রাহ ঐ মুহূর্তে সাজাহকে মদীনা আক্রমণ না করার পরামর্শ দেয়। বরং বনু তামীমের যে সমস্ত গোত্র তখনও সাজাহ্-এর পয়গম্বরী স্বীকার করেনি এবং তার বিরোধীতা করছিল প্রথমে সে তাদের সাথেই যুদ্ধ

www.pathagar.com

করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সাজাহ্ সাথে সাথে তার সঙ্গে পরামর্শ করে। দু'ব্যক্তিই ছিল তার প্রধান শক্তি। তন্মধ্যে একজন মালিক ইবনে নুভায়রাহ এবং অন্যজন ওয়াকী, যে বনু তামীমের এক শাখা বনু হানযালাহ্‌র সর্দার ছিল। এই দু'জনের পরামর্শে এবার সাজাহ্ বনু তামীমের বিভিন্ন শাখার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। এতে অনেক লোক হতাহত হয় এবং উভয় পক্ষেরই লোক বন্দী হয়। গ্রেফতারকৃত লোকদেরকে দাস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সন্ধির মাধ্যমে বন্দীদের বিনিময় করা হয়।

ইয়ামামাহ্‌র উপর আক্রমণের প্রস্তুতি

এখানকার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সাজাহ্‌র অন্তরে পুনরায় মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কিন্তু বিপদ ছিল এই যে, মালিক ইবনে নুভায়রাহ এবং ওয়াকী' উভয়েই নিজ নিজ গোত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সাজাহ্ মদীনা যাওয়ার পথে তাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করবে না।[১] এই প্রেক্ষিতে জাযিরাবাসী সেনাধ্যক্ষরা যখন সাজাহ্-এর নিকট এসে বলল, এখন আমরা কি করব? মালিক ইবনে নুভায়রাহ এবং ওয়াকী তো আমাদের কোনই সাহায্য করবে না, এমনকি আমরা তাদের এলাকা দিয়েও যেতে পারবো না। তখন সাজাহ্ পয়গাম্বর সুলভ ভঙ্গিতে বললে, ইয়ামামাহ্-এর দিকে অগ্রসর হও। তারা বলল, ইয়ামামাহ্‌র অবস্থা অত্যন্ত বিপদজ্জনক। সেখানে মুসায়লামা অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু সাজাহ্ উত্তরে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। ইয়ামামাহ্‌র উপর অবশ্যই আক্রমণ করতে হবে।[২]

মুসায়লামা ও সাজাহ্‌র বিবাহ

সাজাহ্-এর সংবাদ পেয়ে মুসায়লামা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ল। তার আশংকা ছিল এই যে, যদি সে সাজাহ্‌র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তা হলে ছামামাহ্ ইবনে আছাল কিংবা শারাহ ইবনে হাসমার নেতৃত্বে মুসলমানদের যে বাহিনী এগিয়ে আসছে তারাই জয়লাভ করবে অথবা যে সমস্ত গোত্র তার আশে-পাশে রয়েছে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বা বিদ্রোহ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এসব কথা ভেবে সে চাতুর্যের সাথে সাজাহ্‌র নিকট একটি উপহার প্রেরণ করে এবং তার জীবনে নিরাপত্তা চেয়ে তার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাজাহ্ তার আবেদনে সাড়া দেয়।

---

১. প্রকৃতপক্ষে ঐ গোত্রসমূহের মদীনা বা হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, সাজাহ্‌র সাথে যেহেতু আল-জাযীরা ও ইরাকের লোক রয়েছে, তাই এরা ওদের গোত্রের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করলে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

২. পয়গাম্বসুলভ ভঙ্গিতে, যেমন এই মাত্র নাযিল হয়েছে, সাজাহ যে বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল তা হলো,

عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لايلحقكم بعدها ملامة —

www.pathagar.com

তখন মুসায়লামা বনু হানীফার চল্লিশ ব্যক্তি সাথে নিয়ে সাজাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে। সেখানে উভয়ের সাথে নির্জনে ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ আলোচনা হয়। উভয়েই ছিল যাদুকর ও পয়গাম্বরীর দাবীদার। উভয়ের উপরই ওহী নাযিল হত। কিন্তু মুসায়লামা যেহেতু পুরুষ ছিল তাই শেষ পর্যন্ত সাজাহ্‌কে ভাগে আনতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ[১] হয়ে একটি সম্মলিত শক্তিতে পরিণত হয়।

বিবাহের পর মুসায়লামা সাজাহ্‌কে নিজের কাছে নিয়ে আসে। সাজাহ্ তিন দিন সেখানে অবস্থান করে। অতঃপর নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যায়। মুসায়লামা এবং সাজাহ্‌র মধ্যে যে সমস্ত ব্যাপারে আপোষ হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, ইয়ামামাহ্‌র উৎপন্ন দ্রব্য হতে যা আমদানি হবে তার অর্ধেক সাজাহ্‌কে প্রদান করা হবে। সাজাহ্ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আপন কর্মকর্তা হুযায়ল, আক্কাহ্ এবং যিয়াদকে এখানে রেখে নিজে আল জাযীরাহ্ ফিরে যায়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের শেষ মুহূর্তে এটা ছিল সাজাহ্‌র নাটকের সর্বশেষ দৃশ্য। কেননা অতঃপর সে আর ইরাক থেকে বের হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর রাজত্বকালে সাজাহ্ ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

বাতাহ্-এ হযরত খালিদ (রা)-এর অবতরণ

সাজাহ্ জাযীরায় ফিরে যাওয়ার পর বনু তামীমের কোন কোন আমীর যেমন ; ওয়াকী' ও সামাআই নিজেদের কার্যক্রমের জন্য অনুতপ্ত হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, যখন হযরত খালিদ (রা) বাযাখার যুদ্ধ শেষ করে বাতাহ্-এ পৌছেন তখন ওয়াকী' ইবনে মালিক, সামায়াহ্ এবং জবরকান তাদের যাকাত নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করে, অবশ্য মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস তার ছিল না তাই সে নিজের সকল সাথী ও গোত্রের লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা) সেখানে আগমনের পর অবস্থা বিপদমুক্ত দেখতে পান। তিনি সেখান থেকে মুসলমানদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের নির্দেশ প্রদান করেন, "তোমরা প্রথমে দাওয়াত পেশ করবে এবং আযান দিবে। যারা তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, আযান দেবে, নামায আদায় করবে এবং যাকাত প্রদানেরও অঙ্গীকার করবে — তোমরা তাদেরকে কিছু বলো না। কিন্তু যারা এইরূপ না করবে তাদেরকে শাস্তি দেবে।"

---

১. তাবারী ও অন্যান্য গ্রন্থে মুসায়লামা ও সাজাহ্‌র পরস্পর আলোচনার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের একজন দার্শনিক ও গবেষকের জন্য তা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। কেননা তাতে অত্যন্ত অশ্লীল ও অপবিত্র কথাবার্তা রয়েছে।

২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫০০।

www.pathagar.com

মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌কে হত্যা

মুসলিম বাহিনীর একটি গ্রুপ মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ এবং আরো কিছু লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবূ কাতাদাহ্ও ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন সে কয়েদীরা আযান দিয়েছিল এবং নামাযও পড়েছিল। কিন্তু দলের কোন কোন সদস্য তার কথার বিরোধীতা করেন। এই মতানৈক্যের কারণে হযরত খালিদ (রা) কয়েদীদের সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ঐ রাতেই মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ও তার সাথীদেরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র স্ত্রী উম্মে তামীমকে বিবাহ করেন। আবূ কাতাদাহ্ (রা) এতে অত্যন্ত মর্মাহত ও অসন্তুষ্ট হন। হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে এ বিষয়ে তার বাক বিতণ্ডাও হয়। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হন নি বরং মদীনায় পৌঁছে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র ভাই মুতাম্মিম ইবনে নুভায়রাহ্‌কে নিয়ে প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা) অতঃপর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট যান এবং হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ঘটনা শ্রবণ করে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরব থাকেন। কিন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে হযরত খালিদ (র)-কে পদচ্যুত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একজন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহ্ করার অপরাধে হযরত খালিদকে 'রজম' বা শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের জন্যও তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে সুপারিশ করেন। হযরত ওমর (রা)-এর রাগ যখন চরমে গিয়ে পৌঁছল তখন হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে মদীনায় ডেকে পাঠান এবং তার সাথে আলাপ আলোচনার পর যখন তিনি নিশ্চিত হন যে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র হত্যা ইসলামের অবস্থায় হলেও ইচ্ছাকৃত (قتل عمد) ছিল না বরং ভুলবশত (قتل خطا) ছিল তখন তিনি খালিদ (রা)-এর পক্ষ থেকে রক্তমূল্য প্রদান করেন এবং হযরত খালিদ (রা)-এর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের মাঠে (বাতাহ্) যেহেতু অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাই অতি দ্রুত তাঁকে সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

মালিক ইবনে নুভায়রাহ-এর হত্যার উপর একটি পর্যালোচনা

ইসলাম ত্যাগের পর পুনরায় তাতে ফিরে আসা সত্ত্বেও মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌কে হত্যা এবং সাথে সাথেই তার স্ত্রীকে বিবাহ্ করা এ দুটো বিষয় খালিদ (রা)-চরিত্র সম্পর্কে একটি অবাঞ্ছিত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে, এর দ্বারা বাহিক্য দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরও অন্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তাই আমরা এর উপর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

www.pathagar.com

ঘটনার বিভিন্ন অবস্থা

সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করা উচিৎ, ঘটনার প্রকৃত অবস্থা কি ছিল?

১. এ প্রসঙ্গে তাবারী যে রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তা হল, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ও তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে যখন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) আরো ভেবে চিন্তে পরবর্তী দিন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে কয়েদীদেরকে আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে ঐ রাতে অত্যধিক ঠাণ্ডা পরেছিল। তাই হযরত খালিদ (রা) কয়েকদীদের সম্পর্কে নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন " "ادفئوا أسراركم" সাধারণ অর্থ অনুযায়ী এই বাক্যের দ্বারা হযরত খালিদ (রা)-এর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, কয়েদীদের উপর কিছু ছড়িয়ে দাও যাতে তারা ঠাণ্ডা হতে রক্ষা পায়। কিন্তু পাহাড়ারত লোকরা এই শব্দের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই তারা বনু কিনানার অভিধান অনুযায়ী ইদফা' (ادفاء) এর অর্থ হত্যা করা মনে করে এবং সমস্ত কয়েদীদেরকে হত্যা করে ফেলে। যখন আর্তচীৎকার শুনা গেল তখন হযরত খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের শব্দ? যখন তিনি জানলেন যে কয়েদীদেরকে হত্যা হয়েছে তখন তিনি অনুতাপ করলেন। তবে একথাও বললেন, যা ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল তাই হয়ে গেছে।[১]

২. তাবারীর অন্য একটি রিওয়ায়েত হল এই যে, হযরত খালিদ (রা) এটা অবগত হওয়ার জন্য যে, কোন শাহাদাত সত্য মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র ইসলামের, না ইরতেদাদের তিনি খোদ মালিক ইবনে নুভায়রাকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার মধ্যে একবার মালিক বলল, আমার ধারণা এই যে, তোমাদের সাথী (صاحبكم) এই বলেছেন। 'তোমাদের সাথী' (صاحبكم) শব্দ দ্বারা সে আঁ-হযরত (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করেছিল। তখন হযরত খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তাঁকে (আঁ-হযরত (সা)-কে) তোমাদের সাথী মনে কর না? অতঃপর তিনি তাকে এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করে[২] ফেলেন।

৩. তৃতীয় রিওয়ায়েত ইবনে খালফান-এর, যার সারমর্ম হল, হযরত খালিদ (রা) এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। প্রসঙ্গত মালিক বলে, আমি নামায পড়ি কিন্তু যাকাত প্রদান করি না। হযরত খালিদ (রা) বলেন, "তুমি কি অবগত নও যে, নামায ও যাকাত উভয়ই ফরয, একটি ব্যতীত অন্যটি গ্রহণযোগ্য[৩] নয়? উত্তরে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ হুযূর (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, قد كان صاحبكم يقول ذلك "তোমাদের সাথী এরূপ বলছেন।" এতে হযরত

---

১. তাবারীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০২।

২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৩।

৩. অর্থ এই যে নামায হোক অথবা যাকাত উভয়ই ফরয। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এ দু'টোকে ফরয বলে স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন একটিও চাই তা নামায হোক অথবা যাকাত, গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

খালিদ (রা)-এর নিশ্চিত ধারণা হয় যে, এই ব্যক্তি এখনো মুসলমানই হয় নি। সুতরাং তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন, أو ما تراه لك صاحبا صاحبك তুমি কি তাঁকে (আঁ-হযরত (সা)) তোমাদের সাথী বা নেতা মনে কর না? তাহলে হত্যাই তোমার প্রাপ্য। এতে উভয়ের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ তার কথায় মধ্যে صاحبك শব্দটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকে। তাই হযরত খালিদ (রা)-এর নির্দেশে তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়।[১]

৪. চতুর্থ রিওয়ায়েত ইয়াকূবীর। আর তা হল এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালেদ (রা)-কে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানে পৌঁছেন এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌কে ডেকে পাঠান। সে তার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে আসে এবং হযরত খালিদ (রা)-এর উপর তার স্ত্রীর কিছুটা প্রভাব পড়ে। তিনি বলে উঠেন,

والله لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে হত্যা না করব ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ঠিকানা পাবে না।"

অতঃপর মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর কথা কাটাকাটি হয়[২] এবং তাকে হত্যা করা হয়। অবশেষে খালিদ (রা) নুভায়রার স্ত্রীকে বিয়ে করেন।[৩]

৫. পঞ্চম রিওয়ায়েত ইয়াকুত হামভীর। যার সারমর্ম হলো হযরত দারার ইবনে আযুরের নেতৃত্বে হযরত খালিদ (রা)-এর যে খণ্ড বাহিনী ছিল তাদের সাথে নুভায়রাহ্‌র বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং দারার (রা) মালিককে হত্যা করেন।[৪]

যদিও কিতাবুল 'আগানী লি আবিল ফারাহ আল ইসফাহানী' এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থে এই ঘটনাকে একটি সুন্দর প্রেম কাহিনী হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে যথেষ্ট কল্প-কথা সংযোজন করা হয়েছে কিন্তু আসলে তা সম্পূর্ণ অমূলক। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল ঘটনার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রকৃত ঘটনা

ঘটনা সম্পর্কিত প্রথম বর্ণনাকে তেমন একটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ ইদ্‌ফা (ادفاء)-এর সাধারণ অর্থ ঢাকা, গোপন করা এবং গরম পৌঁছানো। কুরআন ও হাদীসে এই শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হত্যা করার অর্থে এই

---

১. ইবনে খালকান ঃ ৫ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৬৬।

২. মূল গ্রন্থে قنظر مالكا ছাপা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এটা ব্যাকরণের ভুলেই হয়েছে। মূল শব্দ হল فناظر তাবারী ও অন্যান্য কিতাবের বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. তারিখে ইয়াকুবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।

৪. মুজমাউল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬১।

www.pathagar.com

শব্দের ব্যবহার বা হত্যার দিকে এর দ্বারা ইঙ্গিত করা অনেক দূরের অনুমান। তাছাড়া যখন নিরাপত্তা বাহিনী এই শব্দের অর্থ করতে গিয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে তখন হযরত খালিদ (রা)-কে এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিল। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করা তাও কোন সাধারণ ব্যক্তি নয় বরং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। আর যদি ঐ সমস্ত লোকদের দ্বারা তাড়াহুড়ার মধ্যে ঐ ঘটনাটি ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে হযরত খালিদ (রা)-এর উচিত ছিল তাদেরকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা। তার পক্ষে শুধু এটা বলে দেয়া যে, 'যা কিছু হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়েছে' মোটেই যথেষ্ট নয়। যদি প্রকৃত ঘটনা এই হয়ে থাকে তাহলে হযরত খালিদ (রা) স্পষ্টভাবে অভিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা)-এর ক্রোধান্বিত হওয়া এবং তার উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা)-এর একথা বলা যে, تاول فاخطا অর্থাৎ হযরত খালিদ (রা)-এর ব্যাখ্যা ভুল হয়ে গেছে, মোটেই সঙ্গত হয় না। তাছাড়া উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন না কোনভাবে একটা ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হলেও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা) যে মালিকের স্ত্রীকে সাথে সাথে বিয়ে করলেন, এর কি ব্যাখ্যা দেয়া হবে? অবশিষ্ট থাকল পরবর্তী তিনটি ব্যাখ্যা। এগুলো একই বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বলেই মনে হচ্ছে। তবে দুই ও চার নং ক্রমিক ততটা স্পষ্ট নয় যতটা স্পষ্ট তিন নং ক্রমিক, অর্থাৎ ইবনে খালকান-এর (রিওয়ায়েত) অতএব আমাদের মতে এটাকেই আসল মনে করা উচিৎ।

মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র প্রকৃত অবস্থা

এবার মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র অবস্থা সম্পর্কে শুনুন। মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ বনু তামীম এর শাখা বনু ইয়ারবু' এর নেতা ছিল। তার উপ নাম ছিল আবূ হানযালাহ্ সে ছিল আরবের প্রসিদ্ধ কবি এবং অশ্বারোহীর মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত সে অষ্টম বা নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে, যখন বনু তামীম এর একটি দল হুযূর (সা)-এর খিদমতে এসেছিল। এতটুকু অবগত হওয়া যায় যে, হুযূর (সা) তাকে তার গোত্রের সাদকাহ্ ও যাকাত আদায় করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন, হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে সে যাকাত আটকিয়ে রাখে এবং তা মদীনায় প্রেরণের পরিবর্তে স্বীয় গোত্রের মধ্যে বন্টন করে দেয়। অতঃপর সে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

فقلت خذوا أموالكم غير خائف + ولا ناظر فيها يجئ من الغد

فإن قلّم بالدّين المخوف قائم + أطعنا وقلنا الدين دين محمد[১]

১. আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬, মূল কিতাবে المخوف ছাপা হয়েছে কিন্তু এটা সঠিক নয়।

www.pathagar.com

এ সময় থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ যে সমস্ত কান্ডকারখানা করেছিল, যেমন ¦ তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা ছিল নিম্নরূপ।

১. মালিক ইব্‌নে নুভায়রাহ্ শুধু যাকাত দেয়াকে অস্বীকার করেনি বরং সাজাহ্ যখন মদীনার উদ্দেশ্যে ইরাক থেকে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছে তখন মালিক ইব্‌নে নুভায়রাহ্ তার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, এমনকি সে সাজাহ্-এর প্রধান সহযোগিতে পরিণত হয়।

২. সে সাজাহ্‌কে অনুপ্রাণিত করে যাতে সে (সাজাহ্) বনু তামীম-এর যে সব শাখা গোত্র এখনো ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদেরকে আক্রমণ করে। সাজাহ্ তাই করেছিল এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ তাকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

৩. সাজাহ্ ইরাকে চলে যাওয়ার পর জবরকান, ওয়াকী' ইবনে মালিক এবং সামাআহ্ যারা হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের সংবাদ শুনে সন্দিগ্ধ-চিত্ত বা বিরোধী হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয় এবং হযরত খালিদ (রা) বুযাখা থেকে বাতাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলে তারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নিজেদের জমাকৃত সাদকাহ্ তাঁর নিকট সোপর্দ করে, কিন্তু মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ তখনও তার চেতনা ফিরে পায় নি এবং নিজের লোকদের নিয়ে আপন গোত্রের কাছে চলে যায়।[১]

৪. হযরত খালিদ (রা) সেনাবাহিনীর যে উপ-দলটি ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, যদি ঐ সমস্ত লোক নামাযের সাথে যাকাতকেও স্বীকার করে তাহ্‌লে তাদেরকে আক্রমণ করবে না।[২]

হযরত খালিদ (রা)-এর এই সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ঐ উপদলের মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌কে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা একথার প্রমাণ যে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ওদের কাছে যাকাতের গুরুত্ব স্বীকার করে নি।

৫. মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র হত্যা সম্পর্কে তাবারী ও ইব্‌নে খালকান-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে, দু'টি রিওয়ায়েত উপরে বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত খালিদ (রা)ও মালিক ইব্‌নে নুভায়রাহ্‌র মধ্যে যে আলোচনা হয় তাতে মালিক ইব্‌নে নুভায়রাহ্ যাকাতের ফরযিয়াতের কথা স্বীকার করে নি, বরং অস্বীকারের উপরই অটল থাকে তাছাড়া সে হুযূর (সা) সম্পর্কে صاحبكم শব্দও ব্যবহার করে।

---

১. ইবনে আসীর এর বর্ণনা হলো এই-

وعرف وكيع سماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعا حسنا ولم يتجبرا وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالدا
وسار خالد يريد البطاح بها مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره — التاريخ الكامل

(তারীখে কামিল ২য় খণ্ড) পৃঃ ২৭২।

২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০২।

www.pathagar.com

এখন ভেবে দেখুন ঃ উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা কি করে প্রমাণিত হয় যে, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ধর্ম বিমুখতা ত্যাগ করে পুনরায় মুসলমান হয়েছিল?

মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র কর্তৃক ইসলামের সাক্ষ্য

এই ছিল খোদ মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র অবস্থা। এখন আমরা তার ঐ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর আলোচনা করব যা, সে ইসলাম সম্পর্কে দিয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, মালিক ইব্‌নে নুভায়রাহ্‌কে গ্রেফতারকারী দলের মধ্যে শুধু দু'চারজন নয় বরং যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান ছিলেন কিন্তু মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ -এর ইসলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য পাওয়া যায় মাত্র দু'জন মুসলমানের। তার মধ্যে একজন হলেন মুতাম্মিম ইব্‌নে নুভায়রাহ্ যিনি মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র সহোদর আর এই সহোদরের প্রতি মালিক-এর কিরূপ মহব্বত ছিল তা তার ঐ বিলাপের দ্বারা প্রকাশ পায় যা খান্‌সার বিলাপের মত আরবের শোকগাঁথার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রা)। এতে সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ও আনসারী। তবে এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দু'টি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে।

১. মালেক ইবনে নুভায়রাহ্ এবং তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে আবূ কাতাদাহ্ (রা) যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে ঐ সম্প্রদায়ের যাকাত আদায় সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির কোন উল্লেখ নেই বরং শুধু এতটুকু হয়েছে انهم اقاموا الصلاة অর্থাৎ তারা নামায কায়েম করেছিল।[১]

২. হাফিয ইবনে হাজার নামায আদায় ছাড়া আযানের কথাও উল্লেখ করেছেন, তবে যাকাতের কথা উল্লেখ করেন নি।[২]

হযরত খালিদ (রা) যখন বুযাখার যুদ্ধ শেষ করে বাতাহ্-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন আনসাররা তার সাথে যেতে অস্বীকার করে এবং বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কাছে খলীফার কোন নির্দেশ নেই'। হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং বললেন, 'আমার কাছে খলীফার নির্দেশ রয়েছে তাছাড়া আমি দলের আমীরও বটে। তবু তারা তাঁর কথা মানলো না। অবশেষে হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে ছেড়ে কিছু দূর চলে গেলেন তখন তারা চিন্তা করল, ' যদি মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে তাহলে তো আমরা গনীমতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকব আর যদি পরাজয় বরণ করে এবং মুসলমানদের ক্ষতি হয় তাহলে লোকজন আমাদের দোষারূপ করবে এবং মন্দ বলবে, যাহোক শেষ পর্যন্ত তারা অনুতপ্ত হয় এবং হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।[৩]

---

১. আল-বিদায় ওয়াননিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২২।
২. আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।
৩. কামিল ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা যদিও আমাদের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা) যেহেতু আনসারী ছিলেন, তাই হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল এবং তিনি সেখানে (বাতাহ্) যেতেও তৈরি ছিলেন না ; তবুও এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, এ ধরনের ঘটনাকে সাক্ষী প্রমাণের নীতির দিক থেকে কোন ঘটনার মূল বিষয়কে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এই ঘটনায় যদিও হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ এর ওযর কবূল করেছেন এবং মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে ঐ পদে অধিষ্ঠিতও করেছেন কিন্তু হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা)-এর অন্তরে হযরত খালিদ (রা) সম্পর্কে যে বিষাদের জন্ম হয়েছিল তা পরবর্তী সময়েও দূরীভূত হয় নি, বরং তিনি এই মর্মে শপথ নেন যে, অতঃপর তিনি আর কখনো হযরত খালিদ (রা)-এর পতাকার নীচে চলবেন না। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না।[১]

এবার মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, হযরত আবূ কাতাদাহ্ (রা)-এর এই চিন্তা কোন্ বিষয়ের ইঙ্গিত করছে।

যাহোক মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ নিহত হওয়ার পূর্বে যদি ইরতিদাদ থেকে ফিরে গিয়ে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে পরকালে এর প্রতিদান সে লাভ করবে। তবে এ বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঘটনার ক্রমধারা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে বিষয়টির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে হযরত খালিদ (রা)-এর উপর একজন মুসলমানের ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা যায় না। হযরত খালিদ (রা)-এর মতে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ স্বীয় ধর্ম ত্যাগের উপর অটল ছিল এবং পুনরায় মুসলমান হয় নি। তাইতো হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট তিনি বলেছিলেন, মালিক যখন আলাপ-আলোচনার মধ্যে হুযুর (সা)-এর উল্লেখ করত তখন শব্দ صاحبكم ব্যবহার করত।[২] হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-এর এই ওযর গ্রহণ করেন। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও মালিক ইবনে নুভায়রাহ্-এর মুসলমান না হওয়ার এবং ধর্মত্যাগের উপর তার অটল থাকার ব্যাপারটি মেনে নিয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি تأول فأخطأ এই বাক্য উচ্চারণ করতেন না। এটাই যদি প্রকৃত ঘটনা হয় যে, হযরত খালিদ (রা)-এর ধারণা ভুল হয়েছিল, ফলে তিনি একজন মুসলমানকে ধর্মত্যাগের উপর অটল মনে করেছেন তাহলে তিনি একজন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন তবে মালিকের স্ত্রীর সাথে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তো তার জন্য জায়েয বা সঠিক হয় নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মহিলার সাথে প্রথমত

---

১. তারীখে ইয়াকুব ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।
২. আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ (রা)-এর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত ছিল। আর তিনি নিজে না করলেও কমপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ সম্পর্কে তাকে নির্দেশ প্রদান করা উচিত ছিল।

হাফিয ইবনে হাজার যুবায়ের ইবনে বকর-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে মালিক এর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ[১] দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই রিওয়ায়েতটি সঠিক এবং হযরত আবূ বকর (রা) প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ (রা)-কে এরূপ নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত খালিদ (রা) উম্মে তামীম-এর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। তাই বনু হানীফার সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে উম্মে তামীম হযরত খালিদ (রা)-এর সাথেই ছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) একটি দুর্গে তার নিরাপত্তার জন্য মুজায়া নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত[২] করেছিলেন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উম্মে তামীম এর সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর বিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ ছিল। ফলে হযরত খালিদ (রা) তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি এবং এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোন নির্দেশ বা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর

এখানে কোন কোন ঐতিহাসিকদের পক্ষ হতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, আচ্ছা; আমরা না হয় মেনে নিলাম, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) হতে ফিরে আসে নি। কিন্তু এর কি কারণ ছিল যে, বুযাখার যুদ্ধের সময় প্রত্যেক শত্রু গোত্রের প্রধান প্রধান নেতা যেমন কুররাহ্ ইবনে উবায়রাহ্, আল-ফাজা'আতুস সালমী আবূ শাজরাহ্ এবং উয়াইনাহ্ ইবনে হাসান ফাজারীকে গ্রেফতার করে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হযরত খালিদ (রা) সোজা মদীনায় পাঠিয়ে দেন, কিন্তু মালিককে পাঠালেন না। অথচ অপরাধ প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সে তো ঐ সমস্ত লোকদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না।[৩]

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যাপারে স্বীয় বাহিনী প্রধান ও আমীরদের উপর পূর্ণ নির্ভর করতেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রদান করতেন। তিনি একদা কা'কা ইবনে আমরকে একটি বাহিনী নেতা করে আলকুমাহ ইবনে আলাছাহ্‌কে তার ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরণ করার সময় বলেন, আলকুমাহ্, যদি তোমাদের হাতে গ্রেফতার হয় তাহলে তোমাদের অধিকার রয়েছে তাকে আমার নিকট প্রেরণ করবে অথবা তোমরা

১. আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।
২. কামিল ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬ এই যুদ্ধের আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।
৩.আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল মিসরে মুদ্রিত ঃ পৃঃ ১৫৬।

www.pathagar.com

নিজেরাই হত্যা করবে। এরপর তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এই ব্যাখ্যাটি উচ্চারণ করেন।[১]

واعلم أن شفاء النفس الخوض فاصنع ما عندك

'জেনে রেখ, কোন কাজকে সুন্দরভাবে সমাধা করার মধ্যে আত্মার নিরাময়। তাই তোমরা যা উত্তম মনে করবে তাই করবে।"

উপরোক্ত সাধারণ নীতির আওতাধীন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে প্রদান করেছিলেন। তাই কোন অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনিও যে ধরনের শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করতেন তাই প্রয়োগ করেতেন।

হযরত খালিদ (রা)-এর নামে প্রেরিত একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جد في أمر الله ولا تنين ولا تظفرن بأحد مثل مسلمين إلا قتلته ونكلت به غيره ومن أحسست ممن حاد الله أو ضاده ممن ترى أن في ذلك صلاحا فاقتله -[২]

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে সব উত্তম বস্তু প্রদান করেছেন তার আরো প্রবৃদ্ধি হোক। তুমি তোমার সব কাজ-কর্মে সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। কেননা আল্লাহ্ তাদের সাথেই রয়েছেন যারা তাঁকে ভয় করে এবং যারা পুণ্যবান। তোমরা আল্লাহ্র কাজে পরিপূর্ণ চেষ্টা কর, অলস্য প্রদর্শন কর না। যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে তাদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের হাতে গ্রেফতার হয় তাহলে তাকে হত্যা কর যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাছাড়া যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে অথবা বিদ্রোহ করেছে, যদি তোমাদের মতে তাদেরকে হত্যা করা সঠিক মনে হয় তাহলে হত্যাই কর।"

বরং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়েতে এও রয়েছে যে,স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে কসম দিয়ে বলেন, যদি মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ধরা পড়ে তাহলে তাকে কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ ছাড়াই হত্যা করে ফেলবে। মূল বাক্যটি ছিল।[৩]

وعزم عليه ليقتلن مالكا أن آخذه -

---

১. তাবারী ঃ খণ্ড, পৃঃ ৪১০।

২. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪১১।

৩. আবূ রিয়াস আহমদ ইবনে আবি হাশিম আল কায়েস হযরত খালিদ (রা) এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহর ঘটনার উপর একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষ আবদুল কাদীর ইবনে উমর আল বাগদাদী স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "খাজানাতুল আদব আলা শাওয়াহেদে শরহিল কাফিয়ায়" উক্ত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ সংকলন করেছেন। এই বাক্যটি ঐ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। খাজানাতুল আদব ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ হত্যার সময় মুরতাদ ছিল সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নি। হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই হযরত খালিদ (রা) মালিককে হত্যা করেন এবং তিনি এ বিষয়ে ন্যায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মালিক এর ভাই মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্র ঘটনা হ'ল এই যে, একদা তিনি হযরত ওমর (রা)-এর কাছে এসে, আপন ভাই এর উদ্দেশ্যে যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন তা তাকে পড়ে শুনান। এতে হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত প্রভাবিত হ'ন এবং বলেন, যদি আমি কবি হতাম। তাহলে আমার ভাই যায়েদ এর শোকগাথা রচনা করতাম। মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্ তখন বলেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন, উভয় ঘটনা সমান নয়। যদি আমার ভাই আপনার ভাই এর মত নিহত হ'ত তাহলে আমি কখনো তার শোকগাথা রচনা করতাম না।' হযরত ওমর (রা) এটা শুনে বলেন, মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্ আজ আমার প্রতি যেরূপ সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন। অন্য কেউ আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নি।

আল্লামা ইবনে শাকির (মৃত্যু ৭৬৪ হিঃ) উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ স্বয়ং তার ভাই মুতমিম-এর মতেও মুরতাদ হিসেবে নিহত হয়েছে। হযরত ওমর (রা)-এর নিকট তিনি যা বলেছিলেন এর অর্থ এই যে, আমি তো আমার ভাইয়ের ব্যাপারে এই জন্য কাঁদি যে, সে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু বরণ করে নি। তার পরিণতি খারাপ হয়েছে। কিন্তু আপনার ভাই যায়েদ ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছে। সত্যের পথে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ্র নিকট তার মর্যাদা অতি-উচ্চে। অতএব তাঁর জন্য শোক করার কি প্রয়োজন?[১]

উম্মে তামীম-এর সাথে বিয়ে

উপরোক্ত ঘটনায় হযরত খালিদ (রা) শুধু মালিক ইবনে নুভায়রাহ্কেই হত্যা করেন নি বরং তার সকল সাথীকেও হত্যা করেছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র হত্যাই ছিল তার প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে অন্য কোন নিহতের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হলো, হযরত খালিদ (রা) ঐদিনই মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র স্ত্রী উম্মে তামীম বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেন। ফলে বাহ্যত জনসাধারণ এই বিয়েকেই মালিক হত্যার কারণ বলে ঘোষণা করে।[২] দ্বিতীয় কারণ হলো, মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্ তার রচিত শোকগাথার দ্বারা এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন যে, তার সে শোকগাথা ঐ সময়

---

১. ফাওয়াতুল ওয়াফয়াত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

২. আগামী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে ঐ মহিলার বর্বর যুগ হতেই প্রণয় ছিল। অথচ যে ব্যক্তি আরবদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছেন তিনি জানেন যে, কোন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার জন্য তার স্বামীকে হত্যা করাটা সেখানে অত্যন্ত কাপুরুষতা ও অভদ্রতার লক্ষণ বলে মনে করা হত। অতএব একাধারে আরব ও প্রখ্যাত বীরযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর এমন কাপুরুষতার কাজ করবেন কল্পনা করতেও দ্বিধা লাগে।

www.pathagar.com

শিশুদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, এমন কি হযরত আয়েশা (রা)ও আপন ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা)-এর শাহাদাত উপলক্ষে শোকগাথা হিসেবে ঐ কবিতাই পাঠ করেন।

দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা হলো নিছক কাব্যের (শোকগাথার) যাদু। এ ধরনের রচনাশৈলীতে তো সাহিত্যের ইতিহাসপূর্ণ হয়েছে অতএব হযরত খালিদ (রা)-এর উপর এর জিম্মাদারী করে ন্যস্ত করা যেতে পারে? অবশিষ্ট থাকল প্রথম কারণ। আমাদের মতে মূল ঘটনা ছিল এই যে, হযরত খালিদ (রা) প্রথম উম্মে তামীমকে দাসী বানিয়েছিলেন। এটা প্রমাণিত যে, গ্রেফতারকৃত লোকদেরকে সাবায়া (দাস-দাসী) বানানো হয়েছিল— যাদেরকে পরে মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্র আবেদনে এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে আযাদ করে দেয়া হয়। উম্মে তামীম সম্ভবত সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই হযরত খালিদ (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, হযরত খালিদ (রা) তাকে দেখার পর তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করেন। এটা সত্য হতে পারে, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যখন বিয়ে সঠিক হয়েছে এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্ ইরতাদের (ধর্ম ত্যাগের) কারণে নিহত হয়েছে তখন এতে দোষের কী কারণ থাকতে পারে? এটাও হতে পারে যে, উম্মে তামীম যেহেতু একজন উচ্চমর্যাদা ও সম্মানীত ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন এবং এখনই তিনি বিধবা হয়েছেন তাই হযরত খালিদ (রা) তাকে সান্ত্বনাদান এবং তার মনতুষ্টির জন্যই তাকে বিয়ে করেন। এবার বাকী থাকল সাথে সাথে বিয়ে করার বিষয়টি আমাদের ধারণা মতে, বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে। কেননা তাবারীর বর্ণনা হল,

وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال وتركها ليقضي طهرها — (ج ٢ ص — ٥٠٢)

"হযরত খালিদ (রা) উম্মে তামীমকে বিয়ে করেন। অতঃপর তার পবিত্রতার নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেয়। (তাবারী ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০২)

মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র হত্যার পর সম্ভবত হযরত খালিদ (রা) উম্মে তামীমকে দাসী হিসেবে আপন দুর্গে নিয়ে যান। অতঃপর তার ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পর তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু বর্ণনাকারী বিষয়টিকে উপরোক্ত ভাবেই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এটা শুধু আমাদের অনুমান নয় বরং এর একটি মূলও রয়েছে।

আবূ যায়েদ ওয়াসীমাহ্ ইবনে আল ওয়াশা (মৃত্যু ২৩৭ হিঃ) ছিলেন তৃতীয় শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ফিত্নায়ে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)-এর যে ঝড় উঠেছিল সে সম্পর্কে "কিতাবুর রিদ্দাহ্" নামে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এটা যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ছিল তার প্রমাণ হলো, হাফিয ইবনে হাজার তার 'ইসাবা' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এর বিভিন্ন

www.pathagar.com

ঘটনাবলী রচনারও উল্লেখ করেছেন। ইসাবার ঐ সমস্ত রচনাবলীই জার্মানের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি একত্র করে তা' কিতাবুর রিদ্দাহ্' নামে প্রকাশ করেছেন। আবূ যায়েদ ওয়াসীমার উল্লেখ ওয়াকিয়াতুল আয়ান এবং ফাওয়াতুল ওয়াকিইয়াত উভয়ের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-ওয়াকেদীও এ বিষয়ের উপর এবং এই নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যার একটি প্রথম খন্ড পাটনায় রক্ষিত আছে। ইবনে শাকির মুতমিম বিন নুভায়রাহ্র বর্ণনায় ওয়াসীমাহ্ এবং ওয়াকেদীর উপরোল্লিখিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত খালিদ (রা) এবং মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে খালিদ (রা) এবং উম্মে তামীম এর বিয়ের উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

قيل أنه اشتراها من الفيء وتزوج بها وقيل أنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته [১]

"বলা হয়ে থাকে যে, হযরত খালিদ (রা) উম্মে তামীমকে গনীমতের মাল দ্বারা ক্রয় করেন, অতঃপর তাকে বিয়ে করেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, উম্মে তামীম তিনটি হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত খালিদ (রা) তার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং উম্মে তামীম সেটা গ্রহণ করেন।"

প্রশ্ন হতে পারে, 'আচ্ছা ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে হযরত ওমর (রা) উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত খালিদ (রা)-কে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি প্রদান) করার পক্ষে কেন মত প্রকাশ করেছেন। এর উত্তরে আমরা একটি রিওয়ায়েত পেশ করব যার দ্বারা এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যাবে। হাফিয ইবনে হাজার দারার ইবনে আজদর আল আসাদী প্রসঙ্গে 'ইসাবা' নামক গ্রন্থে এই মর্মে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে একবার হযরত খালিদ (রা) দারার ইবনে আজদার-এর নেতৃত্বে বনু আসাদ এর দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীটি বনু আসাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজন মহিলাকে গ্রেফতার করে দারার, যিনি বাহিনীর আমীর ছিলেন, মুসলমানদের অনুমতি নিয়ে ঐ মহিলাকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট আবেদন করেন, যেন তিনি হযরত ওমর (রা)-এর নিকট এই ঘটনা পেশ করে তার পক্ষে খলীফার দরবার থেকে নিয়মানুযায়ী অনুমোদন নিয়ে আসেন। হযরত খালিদ (রা)-এর মতে যেহেতু এর কোন প্রয়োজন ছিল না তাই তিনি দারারকে বলেন, 'এর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু দারার তা মানেন নি। অবশেষে হযরত খালিদ (রা) হযরত ওমর (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে সাথে সাথে হযরত খালিদ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন দারারকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

১. ফাওয়াতুল ওয়াফইয়াত ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ৬২৫-৬২৮।

www.pathagar.com

ঘটনাক্রমে ঐ নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই দারার মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) এই নির্দেশ পেয়ে বলেন, "আল্লাহ্ দারারকে লাঞ্ছিত করতে চান নি।"

উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা) মনে করতেন খলীফার অনুমতি ব্যতীত গনীমতের মাল ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম। ফলে উম্মে তামীমের সাথে মিলন (সহবাস)-কে হারাম মনে করেই তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে রজমের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। অপরপক্ষে হযরত খালিদ (রা) মুসলমানদের পরস্পর সম্মতিক্রমে গনীমতের মাল ব্যবহার করাকে বৈধ মনে করতেন। অতঃপর এটাও অসম্ভব যে, হযরত খালিদ (রা) ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের অধিকার বা ক্ষমতার জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। ফলে হযরত খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

একটি আনুষঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রা) মদীনা এসে প্রথমেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এটা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁর উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। অবশেষে হযরত কাতাদাহ্ (রা) হযরত ওমর (রা)-এর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তখনই হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, 'খালিদ (রা)-এর তরবারীতে গোলযোগ ও বিশৃংখলা রয়েছে, আপনি এখনই তাঁকে পদচ্যুত করে যুদ্ধের মাঠ হতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।' এছাড়াও তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "যে তরবারীকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন শত্রুর উপর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমি তাকে কোষের ভেতর আবদ্ধ করতে পারি না। এতে হযরত খালিদ (রা)-এর 'সায়ফুল্লাহ্' হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-এর তাগীদ বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা হযরত খালিদ (রা)-কে মদীনায় ডাকা হ'ল, হযরত খালিদ (রা) মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববী (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে হযরত ওমর (রা) তাকে দেখে অত্যন্ত কটু কথা বলেন, কিন্তু তিনি এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হন। আলাপ আলোচনার পর স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা) বায়তুল মাল থেকে মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্কে তার ভাইয়ের শোণিতপণ আদায় করেন। এবং হযরত খালিদ (রা)-কে বাতাহ্ নামক স্থানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এটা পাঠ করার পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে ঃ

১. যদি হযরত খালিদ (রা) রাসূল (সা)-এর খলীফার দৃষ্টিতে নির্দোষই ছিলেন তাহলে তিনি খালিদ (রা)-পক্ষে থেকে শোণিতপণ আদায় করলেন কেন?

www.pathagar.com

২. হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে এ ধরনের কঠোর মতানৈক্যের কারণ কি?

আমরা নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে ক্রমানুযায়ী প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পেশ করছি।

হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক শোণিতপণ পরিশোধ

হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে আলাপ আলোচনা এবং অন্যান্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যদি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদাঘাটিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত খালিদ (রা) দ্রুততা ও অসাবধানতার মধ্যে এ কাজটি করেছিলেন। যদি তিনি মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌কে নিজে হত্যা না করে মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন তাহলে যখন মালিক মদীনায় এসে দেখতে পেত যে, বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইসালাম গ্রহণ করেছে তখন সেও হয়ত ইসলাম গ্রহণ করত। তা ছাড়া উম্মে তামীমের সাথে তার বিয়ে বৈধ হলেও তাতেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নি। ঐ দুটো কারণেই প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা) অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।[১] এরপর মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্‌র মনস্তুষ্টির এবং হযরত ওমর (রা)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য তিনি বায়তুলমাল থেকে শোণিতপণ পরিশোধ করে দেন। অপূর্ব পরিণামদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কারণেই তিনি এরূপ করেছিলেন। নতুবা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতেই হযরত খালিদ (রা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়েও অভিযুক্ত ছিলেন না। ইরাক বিজয়ের ঘটনায়ও মুসীখ নামক স্থানে হযরত খালিদ (রা) আবদুল উয্যা (পরবর্তী নাম আবদুল্লাহ্) এবং লাবীদ ইবনে জারীরকে শত্রুদের দুর্গে পেয়ে হত্যা করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের পর দেখা যায় তারা উভয়েই মুসলমান ছিলেন এবং এই সংক্রান্ত হযরত আবূ বকর (রা) একটি নির্দেশ পত্রও তার নিকট রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) এটা অবগত হওয়ার পর তাদের শোণিতপণ পরিশোধ করে দেন এবং সাথে সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে বলেন, 'আমি তো শোণিতপণ পরিশোধ করলাম কিন্তু মূলত এটা আমার উপর ওয়াজিব ছিল না। কেননা এ দু'জন নিহত ব্যক্তি মেহমান হিসেবে শত্রুদের দুর্গেই অবস্থান করছিলো।

(তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১)

---

১. হাফিয ইবনে হাজার যুবায়ের ইবনে বাকার এর রিওয়ায়েতের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট গনীমতের মাল আসত তখন তিনি তা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে তার হিসেব দিতেন না। কোন কোন সময় এমন কাজও করতেন যা হযরত আবূ বকর (রা) সমীচীন মনে করতেন না। মালিক ইবনে নুভায়রার হত্যা এবং তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারটিও হযরত আবূ বকর (রা) অপছন্দ করেছেন। (আল ইসাবা : ১ম খণ্ড: পৃঃ ৪১৪: তাযকিরায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)।

www.pathagar.com

আসল কথা হল অন্যান্য ঘটনার মত এই ঘটনায়ও রাসূল (সা)-এর খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ঠিক সে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যেরূপ ব্যবস্থা হুযূর (সা) (যখন হযরত খালিদ (রা)-এর হাতে বনু জাযীমার লোকজন নিহত হয়েছিল) গ্রহণ করেছিলেন। হুযূর (সা) ঐ ঘটনার কথা শুনে একদিকে উভয় হাত উঠিয়ে দু'বার বলেন ঃ[১]

اللهم إني أبرء إليك مما صنع خالد

"হে আল্লাহ্ হযরত খালিদ (রা) যা কিছু করেছেন আমি তোমার দরবারে সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" এবং অপর দিকে বনু জাযীমার নিহতদের প্রত্যেকের অর্ধেক শোনিতপণ আদায় করেন। আমাদের ওস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, 'আমার মতে এই শোণিতপণ শুধু পরিণাম দর্শিতার উদ্দেশ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যথায় নিহতদের আত্মীয়-স্বজন তো তা দাবী করেন নি, তবে রহমতে আলম (সা) এটা পছন্দ করেন নি যে, তাদের রক্ত নিষ্ফল[২] যাক। এখানে লক্ষণীয় যে, এতদসত্ত্বেও হুযূর (সা) হযরত খালিদ (রা)-কে পদচ্যুত করেন নি। এ ঘটনার পরও হুযূর (সা)-এর জীবদ্দশায় তিনি সর্বদাই সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য

এখানে একটি বিষয় বাকী রইল, তা হল এই যে, অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে এত কঠোর মতানৈক্য হওয়ার কারণ কি ?

যে ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর যুগ এবং পরবর্তী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার মধ্যে এই মতানৈক্য প্রথমবারের মত ছিল না। নবী (সা)-এর যুগেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনুরূপ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী প্রেরণ এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃত জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা সম্পর্কে অনুরূপ মতানৈক্য দেখা গেছে কিন্তু যেখানে অবশেষে হযরত ফারূকে আযম (রা) স্বীকার করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভিমতই ছিল সঠিক। সুতরাং বর্তমান বিষয়টিও সে দৃষ্টিতে বিচার করা যেতে পারে। হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন ঃ

رحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال

"আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর রহমত করুন। তিনি লোকদের সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখতেন।"

---

১. সহীহ বুখারী ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৬২২, অধ্যায় হুযূর (সা)-এর আবির্ভাব, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ।
২. ফয়েজুলবারী আলা সহীহ বুখারীর ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ ১১৭।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা)-এর যুগে একবার মুতমিম ইবনে নুভায়রাহ্ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর উপর আপন ভাইয়ের বদলে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) দাবী করেন। তখন হযরত ওমর (রা) বলেন لا أرد شيئا صنعه أبو بكر অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) যা কিছু করেছেন তা আমি বাতিল করব না।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত ওমর (রা) যার সম্পর্কে বলা হয়েছে عمر أشدهم في أمر الله তিনি হযরত আবূ বকর কাতাদাহ্ (রা)-এর নিকট থেকে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্র ঘটনা শুনেন। তাছাড়া বনু জাযীরার সাথেও খালিদ কর্তৃক যেহেতু এ ধরনের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল তাই তিনি খালিদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ক্রোধান্বিত হন। কেননা حسنات الأبرار سيئات المقربين এর নীতি অনুযায়ী বার বার একজন সাহাবীর দ্বারা অনুরূপ ঘটনা সংঘঠিত হওয়াকে তিনি অবাঞ্ছিত মনে করতেন। অপর পক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্বভাব ছিল প্রতিটি কাজে হুযূর (সা)-এর আদর্শের অনুসরণ করা। তিনি মানব চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। অপর দিকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতে হযরত খালিদ (রা) কোন না কোন ত্রুটির কারণে অভিযুক্ত হয়েছেন বটে, তবে এমন বিরাট কোন অন্যায় করেন নি যার কারণে তার মত একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও বীর যোদ্ধা সোনবাহিনীর নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত করা হবে এবং এর পরিমাণ স্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকেও বিপদে ফেলা হবে তাছাড়া মদীনায় আগমন করে খলীফায়ে রাসূল (সা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাটাই ছিল হযরত খালিদ (রা)-এর অপরাধ মার্জনা করার জন্য যথেষ্ট। বর্তমান সভ্য জগতে কি না হচ্ছে? কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা কোন অন্যায় প্রকাশিত হলে শুধু একটি শব্দ "আফসোস বা দুঃখিত" (Regret বা Sorr) বলে দেওয়াটাই তার ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা)-এর মিযাজ এমনিতেই ছিল কঠোর, তাছাড়া তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের পূর্ণ দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয় নি। ইন্তিকালের সময় হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত ওমর ফারূক(রা)-এর নাম সুপারিশ করলে তাঁর কঠোরতার কারণেই কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন আবূ বকর (রা) ভবিষ্যতবাণী করেছেন, যখন হযরত ওমর (রা) রাষ্ট্র ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তখন এমনিতেই তাঁর কঠোরতা হ্রাস পেয়ে যাবে। পরবর্তীকালে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।[১]

---

১. খাযানাতুল আদব ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ২৩৮।

www.pathagar.com

মুসায়লামা এবং ইয়ামামাহ্-বাসীদের সাথে যুদ্ধ

বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগী গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা) এগারোটি বাহিনী বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। হযরত ইকরামা ইবনে আবূ জেহেল (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুসায়লামার দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরে হযরত আবূ বকর (রা) যখন মনে করেন শুধু এই বাহিনী যথেষ্ট নয় তখন তিনি সারাহবীল ইবনে হাসানের নেতৃত্বে অপর একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন। হযরত ইকরামা (রা) ইয়ামামাহ্ পৌঁছেই হযরত সারাহবীল (রা)-এর অপেক্ষা না করেই আক্রমণ পরিচালনা করেন কিন্তু তাতে তাকে পিছু হট্‌তে হয়। এদিকে হযরত সারাহবীল (রা) উপরোক্ত সংবাদ শুনে রাস্তায়ই থেমে যান। হযরত ইকরামা (রা) প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-কে অবহিত করলে তিনি তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং হযরত ইকরামা (রা)-কে লিখে পাঠান, 'ভবিষ্যতে তুমি আমার চেহারা দেখবে না এবং আমি তোমার চেহারা দেখব না।' সাথে সাথে তিনি তাকে এই নির্দেশও দেন, তুমি হুযায়ফাহ্ ও আরফাজার নিকট পৌঁছে আম্মান ও মোহ্‌রার-এর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং সেখানকার কাজ শেষ করে ইয়ামন ও হাযরামাউত-এর দিকে অগ্রসর হও। আর হযরত সারাহবীল (রা)-কে নির্দেশ দেন, 'হযরত খালিদ (রা) না পৌঁছা পর্যন্ত যেখানে আছ সেখানেই থাক।'

হযরত খালিদ (রা)-এর নাম ঘোষণা

সম্ভবত মুসায়লামার শক্তি সম্পর্কে প্রথম প্রথম হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঠিক ধারণা ছিল না। তাই তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান নি। কিন্তু যখন ইকরামা (রা) পরাজিত হন এবং আবূ বকর (রা) অবগত হন যে, মুসায়লামার সাথে আরবের চল্লিশ হাযার নির্বাচিত অভিজ্ঞ যোদ্ধা রয়েছে তখন তিনি আসল পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, এত বিরাট যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য সায়ফুল্লাহ্ সেনাপতি হিসেবে কারো নাম উঠতে পারে না। সুতরাং হযরত খালিদ (রা)-কে খলীফার দরবারে ডাকা হয়। তিনি বাতাহ্ হতে মদীনায় ফিরে আসেন। এখানে মালিক ইবনে নুভায়রাহ্‌র হত্যাকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-এর বর্ণনা শুনার পর তার অবসান ঘটে এবং তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর উপর ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্বও অর্পণ করেন।

নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের অংশ গ্রহণ

গাযওয়ায়ে বদরের পর ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর উপরেই নির্ভর করছিলো ইসলামের উন্নতি, অগ্রগতি, এমনকি স্থিতিও। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবূ বকর (রা) শুধু হযরত খালিদ (রা)-কে সেনাপতিই করেন নি,

www.pathagar.com

তার সাথে প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসার, যাঁরা বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত হাফিয ও কারী ছিলেন তাঁদেরকে পাঠান। হযরত হুযায়ফাহ (রা) এবং হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা) মুহাজিরদের দলের নেতা ছিলেন এবং সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস ছিলেন আনসারদের দলের নেতা।[১]

মোটকথা অত্যন্ত জাঁকজমক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে হযরত খালিদ (রা) মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামামাহ্‌র দিকে যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে বাতাহ্ যান। সেখানে যে সমস্ত সৈন্য পূর্ব থেকে তৈরি ছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে ইয়ামামাহ্ অভিমুখে রওনা হন। পিছন দিক থেকে যাতে কেউ মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-এর পিছনে হযরত সালিত (রা)-এর নেতৃত্বে অন্য আর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।

মাজাআহ্ বন্দি হ'ল

হযরত খালিদ (রা) ইয়ামামাহ্ হতে এক রাতের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি একটি বাহিনীর সাক্ষাৎ পান যাদের সর্দার ছিল মাজাআহ্ ইবনে মারারাহ্। সে ছিল বনু হানীফার সম্মানিত লোকদের অন্যতম। এই বাহিনী বনু তামিম ও বনু আমেরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে ফিরে আসছিল। হযরত খালিদ (রা)-এর নির্দেশে এই দলের সবাইকে হত্যা করা হয়, এবং মাজাআহ্‌কে গ্রেফতার করা হয়। বাহিনী পুনরায় অগ্রসর হতে থাকল এবং আকরাবায় (ইয়ামামাহ্‌র একটি স্থানে) গিয়ে পৌছল। সেখানে মুসায়লামা তার অসংখ্য সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ওদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ষাট হাযার।[২]

সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ

দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ (রা) তাঁর সৈন্যদের বিন্যস্ত করেন। ডান দিকের নেতা ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা)। বাম দিকের নেতৃত্বে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর উপর সোপর্দ করা হয়। হযরত খালিদ (রা) নিজে একদল সৈন্য নিয়ে মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসায়লামাও তার সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজান। উভয় বাহিনীই একটি চূড়ান্ত জয়ের আশায় যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

---

১. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি তাদেরকে এত বরকতপূর্ণ মনে করতেন যে, অন্য কোন যুদ্ধে তাদেরকে পাঠানো পছন্দ করতেন না। (তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫)। ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধের গুরুত্ব এতেই অনুমান করা যায় যে, হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার বিরুদ্ধেই ঐ সময় বদরী সাহাবাদেরকে প্রেরণ করতে হয়েছিল।

২. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫।

www.pathagar.com

যুদ্ধ শুরু

এবার মুসায়লামার পক্ষ হতে সারাহ্বীল ইবনে মুসায়লামা বনু হানীফাকে উচ্চস্বরে সম্বোধন করে বলে,' হে লোক সকল! আজ হলো মর্যাদা রক্ষার দিন। যদি তোমরা পরাজয় বরণ কর তাহলে তোমাদের মহিলাদেরকে দাসী বানানো হবে এবং বিয়ে ছাড়াই তাদের সাথে সহবাস করা হবে। তাই তোমরা নিজেদের বংশ মর্যাদা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে শত্রুদেরকে প্রতিহত কর এবং নিজেদের মহিলাদের সম্মান রক্ষা কর। এদিকে মুজাহিদীনই ইসলামের আন্তরিক উৎসাহ ও আবেগের অবস্থা ছিল এই যে,

جوہر شمسیر سے باھر تھا دم شمشیر کا

মুজাহিদদের উৎসাহ-উদ্দীপনা

মুহাজিরদের পতাকা হযরত হুযায়ফাহ (রা)-এর গোলাম হযরত সালিম (রা)-এর হাতে ছিল। কোন এক ব্যক্তি বললেন, যদি আপনি শাহাদাত বরণ করেন তাহলে তো একজন কুরআন-বহনকারী বিদায় গ্রহণ করবে, তিনি জবাবে বললেন, 'যদি আমি এইরূপ আশংকা করি তাহলে আমার চেয়ে খারাপ কুরআন বহনকারী আর কেই নেই।' 'নাহার রিজাল' নামক এক ব্যক্তি প্রচার করে দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) স্বীয় নবূওতের অর্ধেক অংশ মুসায়লামাকে দান করে গেছেন। সে মুসায়লামার ডান হস্ত ছিল। সে সারি থেকে বের হয়ে আহবান করতে লাগল, هل من مبارز আমার সাথে কি কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত আছে? প্রত্যুত্তরে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা) অগ্রসর হন এবং তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, সে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে চরম উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুসায়লামার প্রতিটি সৈন্য পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে থাকে। কেননা এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, যদি এই যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় তাহলে দক্ষিণ আরবের হাতে হিজাযের নেতৃত্ব চিরদিনের মত চলে যাবে। আর গোত্রীয় কঠোর বন্ধনের কারণে এটা ছিল তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য। ঘটনাক্রমে মুসলমানদের জন্য এটা ছিল প্রথম বারের মত অতি ভয়ানক ও কঠিন যুদ্ধ। তাই তারা প্রথমে কিছুটা থমকে যায়। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসায়লামার বাহিনীর সাহস এত বৃদ্ধি পায় যে, তারা হযরত খালিদ (রা)-এর তাঁবুতে আক্রমণ করে বসে। এখানে হযরত খালিদ (রা)-এর নতুন স্ত্রী উম্মে তামীম অবস্থান করছিলেন। আক্রমণকারীরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু সাজাআহ্ নামক যে ব্যক্তিকে হযরত খালিদ (রা) উম্মে তামীমের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন তিনি বাধা প্রদান করে বলেন, আমি এই মহিলার প্রতিবেশী। তাই তারা উম্মে তামীমের কোন অনিষ্ট করল না, তবে তাঁবুকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

www.pathagar.com

মুসলমানদের দ্বিতীয় হামলা

কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমানরা নিজেদের সামলে নিল। তারা একে অপরকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলো। হযরত সাবিত ইবনে কায়েস বলে উঠেন, 'আক্ষেপ' হে মুসলমানগণ, অবশেষে তোমাদের কি হল? হে আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট।' হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা) বলতে থাকেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলব না যতক্ষণ না শত্রুদেরকে পরাজিত করি। অথবা নিজে শাহাদাত বরণ করি। হযরত আবূ হুযায়ফা (রা) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "হে আহ্লে কুরআন! তোমরা তোমাদের কাজের দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর।" ইসলামের এই মুজাহিদরা নিজ নিজ জায়গায় বাঘের মত হুংকার ছাড়ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রা) এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে তারা আবার পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ফলে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাজির, আনসার, নগরবাসী, মরুবাসী তথা প্রতিটি মুজাহিদ দলবদ্ধ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। প্রত্যেকটি সেনাদলকে পৃথক হওয়ার জন্য হযরত খালিদ (রা) নির্দেশ প্রদান করেন। এবার তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে, মুহাজির, আনসার এবং নগরবাসীর তুলনায় মরুবাসীরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা) হযরত সালিম (রা) এবং তাঁর মালিক হযরত আবূ হুযায়ফাহ (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত খালিদ (রা) শত্রু বুহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করলেন, যে মুসায়লামা তাঁর স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সহযোগীরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এবার হযরত খালিদ (রা) উপলব্ধি করলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়লামার বিশেষ দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের বুহ্যভেদ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং তিনি হুংকার ছেড়ে মুসায়লামার দলের উপর আক্রমণ চালান। এবার যুদ্ধের ভয়াবহতা এত বৃদ্ধি পেল যে, শত্রু সৈন্যরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। মুসায়লামা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অগ্রসর হ'ল। কিন্তু ভীতি ও দুর্ভাবনার কারণে কিছুটা অগ্রসর হয়ে পুনরায় পিছনে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা) স্বীয় দলের মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে হঠাৎ এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, মুসায়লামার জন্য তখন পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। মুসায়লামার জীবন উৎসর্গকারী সৈন্যরা তাকে বারবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাদের সাথে বিজয়ের যে অঙ্গীকার করেছিলে তার কি হলো? কিন্তু তখন এসব কথার উত্তর দেয়ার সময় তার ছিল না। পলায়নকালে লোকদেরকে সে বলে যাচ্ছিল, "বংশের মর্যাদার দিক লক্ষ্য করে প্রতিরোধ কর।" কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ অবস্থায় তার কথার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে? ফল হ'ল এই যে, তার সৈন্যদের

www.pathagar.com

সাহস ভেঙ্গে পড়ল এবং তারাও যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগল। কিছু দূরে একটি বাগান ছিল। বাগানের সীমান্ত প্রাচীর ছিল খুবই শক্ত ও নিরাপদ। মুহ্কাম ইবনে তুফায়েল চীৎকার করে বলল, হে বনু হানীফা বাগান! বাগান! অর্থাৎ বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। এই বাগানটি মূলত মুসায়লামার দুর্গ ছিল। মুসায়লামা যেহেতু নিজকে "রাহ্মানুল ইয়ামামাহ" বলত। তাই এই বাগানের নাম হাদীকাতুর রহমান হয়ে গিয়েছিল। যাহোক তার লোকেরা দুর্গে প্রবেশ করে তার দ্বার বন্ধ করে দেয়।

মুসায়লামার হত্যা

মুসলিম বাহিনী এবার মুসায়লামার দুর্গ অবরোধ করল। ভেতরে প্রবেশের কোন পথ ছিল না। তাই হযরত বারা ইবনে মালিক (রা) মুসলমানদেরকে অনুরোধ করলেন যেন তারা তাকে উপরে উঠিয়ে দুর্গের ভেতরে নিক্ষেপ করে। কাজটি ছিল নিছক আত্মঘাতি। তাই মুজাহিদরা তা করতে অস্বীকার করে। কিন্তু বারা ইবনে মালিক (রা) পুনঃ পুনঃ একই অনুরোধ কারতে থাকলেন। তখন মুসলমানরা বাধ্য হয়ে তাকে বাগানের দেয়ালের উপর উঠিয়ে দিল। তিনি সংগে সংগে ভেতরে প্রবেশ করে একাকী যুদ্ধ করে অবশেষে দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হন। এবার মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে। উভয় দিকের অসংখ্য লোক হতাহত হয়। তবে বনু হানীফার হতাহতের সংখ্যা ছিল অধিক। এই যুদ্ধে যুবায়ের ইবনে মুতীম এর গোলাম ওয়াহ্শীর হাতে মুসায়লামা নিহত হয়। ফলে বনু হানীফার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। তারা পিছু হটে পলায়ন করতে লাগল।

হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট এই সুসংবাদ পৌছলে তিনি মাজাআকে নিয়ে বনু হানীফার নিহতদের কাছে পৌছলেন। একদিকে মুহ্কাম এর মৃত্যুদেহ পড়েছিল। ঐ ব্যক্তি খুব সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ছিল। হযরত খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইনি কি তোমাদের নেতা (মুসায়লামা)? মাজাআহ্ উত্তরে বলে, "না আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যক্তি তার চেয়েও বেশী উত্তম ও মর্যাদাশীল ছিল। এই ব্যক্তি হ'ল মুহ্কামুল ইয়ামামাহ্ সে যখন বাগানের প্রাচীর থেকে নিজের সাথীদেরকে পাহারা দিচ্ছিল তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা) তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। হযরত খালিদ (রা) দুর্গে প্রবেশ করলেন। সেখানে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করে মাজাআহ্ বলল, এটা হ'ল মুসায়লামার মৃতদেহ। আজ থেকে এই বাগানের নাম 'হাদীকাতুল মাওত' অর্থাৎ মৃত্যুর বাগান হয়ে গেল। ইতিহাসে এই নামে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাবারী বর্ণনা করেন যে, বাগানের ভেতর ও বাইরে মুসায়লামার দশ হাযার লোক নিহত হয় এবং এক হাযার দু'শো মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।[১]

---

১. এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৪-৫১৯ এবং ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২-২৮০ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অন্যান্য দুর্গ অধিকার

এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, যে সমস্ত দুর্গে মুসায়লামার লোকজন অবরুদ্ধ ছিল সেগুলোকে আক্রমণ করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে পরামর্শ দেন।

এদিকে মাজাআহ্ যার উপর হযরত খালিদ (রা) অধিক নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন, এসে বলল মুসায়লামার সাথে যে সমস্ত লোক এসেছিল তারা ছিল দ্রুতগামী নতুবা প্রচুর সংখ্যক এখনো দুর্গে অবরুদ্ধ থাকত। মাজাআহ্র একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত খালিদ (রা) যেন বনু হানীফার অবশিষ্ট লোকদের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদের সাথে যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল আচরণ করেন। মাজাআহ্ একদিকে হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট একথা বললেন, অপর দিকে আপন গোত্রের মহিলাদের বললেন, 'তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হও এবং দুর্গের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যাও। 'মহিলারা সাথে সাথে তা করল। এবার হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছে লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গের উপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সৈন্যরাও দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে মুসায়লামার সাথে যেহেতু মুসলমান যোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। তাই তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। ফলে মাজাআহ্ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাতে সাফল্য অর্জন করেন এবং হযরত খালিদ (রা) সামান্য শর্তের উপর শত্রুর সাথে সন্ধি করেন। পরে যখন মাজাআহ্র এই ধোঁকার রহস্য প্রকাশিত হয়, তখন হযরত খালিদ (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। কিন্তু মাজাআহ্ প্রকাশ্যভাবে বললো, "এরা (বনু হানীফা) হ'ল আমার গোত্রের লোক, তাই তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি না দেখানো আমার জন্য ছিল অসম্ভব।

সন্ধি হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা) অবশিষ্ট সকলের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা) তাদের থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তার সবই ফেরত দেন।[১]

ইয়ামামার যুদ্ধ কখন হয়েছিল

ইয়ামামাহ্র যুদ্ধ কখন হয়েছিল তাতে মতভেদ রয়েছে। কেউ একাদশ হিজরী, আবার কেউ দ্বাদশ হিজরী বলেছেন। হাফেয ইমাদুদ্দীন ইব্নে কাসীর উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে যে, এর শুরু হয় একাদশ হিজরীতে কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বাদশ হিজরীতে।[২] والله أعلم

১. আল বিদায়া ওয়াননিহায়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩২৫।
২. আল-বিদায় ওয়াননিহায়া : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩২৬।

www.pathagar.com

হাদীকাতুল মাওত-এর অবস্থান

আমরা যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই যুদ্ধ ইয়ামামায় সংঘটিত হয়েছিল। হাদীকাতুল মাওত নামক যে স্থানে মুসায়লামা নিহত হয়েছিল সে সম্পর্কে এটাই সর্বজন স্বীকৃত যে, তা ইয়ামামাহ্‌র সীমান্তে অথবা সন্নিকটে ছিল। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ ইস্‌প্রেঙ্গার,[১] যিনি আবূ ইসমাঈল আযাদীর গ্রন্থ "ফুতুহুশ শাম" ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে সম্পাদনা করেন, ১৮৬৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ক্যাপ্টেন লিস্‌কে যে পত্র লিখেছেন, (পত্রটি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর কার্যবিবরণির (Proceedings) রিপোর্ট হিসেবে ১৮৬৫ সালে ১০৩ হতে ১০৭ পৃষ্টায় ছাপা হয়েছে) তাতে ডঃ ইসপ্রেঙ্গার প্রমাণ করেন যে, মুসায়লামার বাগান ইয়ামামার নয় বরং হিজর নামক স্থানে ছিল।

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ধর্মত্যাগী এবং বিদ্রোহী গোত্রসমূহের সাথে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মুসায়লামার সাথে যে বাহিনী ছিল অনেকে তার সংখ্যা চল্লিশ হাজার এবং কেউ কেউ ষাট হাজার উল্লেখ করেছেন। এরা সবাই পতঙ্গের মত মুসায়লামার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ছিল। এর কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে হযরত আবূ বকর (রা) যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় মুহাজির আনসারকে বাহিরে প্রেরণ করা অপছন্দ করতেন তাদেরকেও এই যুদ্ধে প্রেরণ করেন। যদিও এই যুদ্ধে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল, নেতৃস্থানীয় বহু সাহাবা ও হাফিযে[২] কুরআন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তবু এটা ছিল ইসলামের প্রধান শত্রুর উপর সর্বশেষ ও সমাধান যোগ্য বিজয়। এই যুদ্ধ জাজিরাতুল আরবে ইসলামের শক্তি ও অবস্থান দৃঢ় করে এবং ইসলামের বিরোধীতার চির অবসান ঘটায়। ফলে মুসলিম বাহিনী যখন বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে মদীনায় প্রবেশ করে তখন মদীনার প্রান্তে প্রান্তে মারহাবা ও হামদ-সালাতের গুঞ্জরণ উঠে। যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম্‌ এই যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন তাদের জন্য মর্মাহত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্যের প্রশংসাসূচক গানের আওয়ায এর মধ্যে শোকগাথার ঐ আওয়ায নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

এই বিজয়ের উপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর চাইতে বেশী সন্তুষ্ট আর কে হতে পারেন? কিন্তু বার'শো সাহাবার শাহাদাত বরণের শোকও তার কাছে নিতান্ত কম ছিল না। সুতরাং যখন তিনি অবগত হন যে, হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধের পর

---

১. ডঃ ইস্‌প্রেঙ্গার ও স্যার উইলিয়াম লিনসান লিস্‌ এ দু'জন কলকাতা মাদ্রাসা (যেটা মুসলমানদের নিকট কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা নামে খ্যাত)-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। (প্রথমোক্ত ব্যক্তি ১৮৫০ খৃস্টাব্দে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে অধ্যক্ষ ছিলেন।

২. ইবনে আসীর ও বালাজুরী নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের নামের তালিকা প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

মাজাআহ্র কন্যাকে বিয়ে করেছেন, তখন স্বভাবত তিনি অত্যন্ত সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত খালিদ (রা)-কে পত্র লিখেন। পত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ "হে উম্মে খালিদের পুত্র এটা প্রতীয়মান হয়েছে, তোমার অন্তরে বিন্দুমাত্র মায়া দরদ নেই। তুমি সেই মুহূর্তে বৈবাহিক সূত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ যখন তোমার ঘরের আঙ্গিনায় বার'শো মুসলমানের রক্ত এখনও শুকায়নি।"[১]

বাহ্রাইন

হযরত খালিদ (রা) যখন ইয়ামামার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তখন অন্যান্য মুসলিম সেনাপতিগণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল মরু প্রদেশে বাহ্রাইন মদীনা হতে বহুদূরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরের তীরে বাহ্রাইনের অবস্থান এই অঞ্চলটি ছিল ইরানি শাসনকর্তার অধীনে। সেখানে বনু আব্দুল কায়েস, বকর ইবনে ওয়ায়েল তামীম প্রভৃতি আরবগোত্র বসবাস করত তাদের নেতা ইরানের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হত। আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে নিয়োজিত ঐ নেতার নাম ছিল মানযার ইবনে সাদী যার নামে লিখিত হুযূর (সা)-এর নয়টি পত্র ডাঃ হামিদুল্লাহ্ তার বিখ্যাত গ্রন্থ ("আল ওসায়েকুস সিয়াসিয়াহ্তে" উদ্ধৃত করেছেন। আঁ-হযরত (সা)-এর দাওয়াতে মানযার এবং বাহ্রাইনের রাজধানী হিজর এর গভর্নর (মিরযবান) উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের সাথে যতগুলো আরব গোত্র সেখানে বাস করত তাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এটা হ'ল ৮ম হিজরীর ঘটনা।[২]

কোন কোন ঐতিহাসিক এটাকে ৯ম হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথম উক্তিই সঠিক বলে মনে হয়।

হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের কিছুদনি পর মানযার ইব্নে সাদীও ইন্তিকাল করেন। তখন আল্ হাতাম নামক জনৈক নেতার সাথে বনু আবদুল কায়েস ও বনু বকর মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু জারুদ, বাশার ইব্নে আমর ওলী ওবায়দী, যারা হুযূর (সা)-এর সাহচার্য লাভ করেছিলেন, তাদের প্রচেষ্টায় শীঘ্রই বনু আবদুল কায়েস ইসলামে ফিরে আসে[৩] কিন্তু বনু বকর তাদের ধর্ম ত্যাগের উপরই স্থায়ী থাকে। তারা নু'মান ইবনে মানযার, ইবনে মাউস সামা-এর পুত্র, যার নামও মানযার ছিল, নিজেদের নেতা নির্বাচন করে। আল হাতাম ইবনে দারিয়া, বনু বকর ও অন্যান্য অনারব লোক, যারা বাহ্রাইনে বসবাস করত এবং আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদেরকে সাথে নিয়ে জাওয়াসা নামক স্থানে হযরত জারুদ এর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ

---

১. তাবারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১৯।
২. ফাতুহুল বুলদান বালাজুরী, পৃঃ ৮৫।
১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৯।

www.pathagar.com

হয়। তারা মুসলমানদেরকে অবরোধ করে তাদের রসদ-পত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবতীয় কঠোরতা সত্ত্বেও ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকে।

এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) আলা-ইবনে হাযরামীকে বাহ্‌রাইন ফ্রন্টে প্রেরণ করেন। আলা-ইবনে হাযরামী তখনই বাহ্‌রাইনে পৌঁছেন, যখন হযরত খালিদ (রা) মুসায়লামার বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের ইতি টেনেছেন। এই প্রেক্ষিতে বনু হানীফার যুবক বৃদ্ধ যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারাও হযরত আলা'(রা)-এর সহযোগী হয়ে যান। তাছাড়া সামামাহ্ ইবনে আছাল এবং কায়েস ইবনে আসিম মিনকারীও নিজ নিজ লোকদের নিয়ে এ বাহিনীতে যোগদান করেন। হযরত আলা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে দাহনা নামক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তাই জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন। যখন তারা তাঁবু স্থাপন করেন তখন ঘটনাক্রমে খাদ্যদ্রব্য বহনকারী উটগুলো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পলায়ন করে। ফলে খাদ্য ও পানীয় কিছু অবশিষ্ট রইলো না। এতে মুসলমানরা অন্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, এমনকি তারা নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারেও পরস্পর পরস্পরকে ওসীয়ত করতে থাকেন। কিন্তু হযরত আলা ইবনে হাযরামী তাদেরকে সাহস প্রদান করে বলেন, লোক সকল, তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী এবং তার পথে জিহাদকারী নও? তোমরা নিশ্চিত থাক যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না।

মুসলিম বাহিনী যখন ফজরের নামায সমাপ্ত করে তখন বেশ কিছু দূরে মরীচিকার মত দেখতে পায়। বাহিনীর সম্মুখভাগের সৈন্যরা সেখানে গিয়ে দেখে মরীচিকা নয় বরং পানি। এতে তারা খবই আনন্দিত হয়। তারা পানি পান করে, গোসল করে এবং নিজ নিজ মশক পানিতে ভর্তি করে নেয়। ভালভাবে সূর্য উঠার পর তারা এদিক ওদিক ঘুরে আসে। তখন তাদের খুশির সীমা ছিলনা। তারা এবার নতুন উদ্দম নিয়ে বাহ্‌রাইনে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে জারুদ স্থানীয় মুসলমানদের নিয়ে হাতাম ইবনে দবিয়া এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী জারুদকে তাঁর আপন জায়গায় দৃঢ় থাকার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু হাতামের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যাধিক এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল প্রচুর। হযরত আলা এবং হাতাম উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিখা খনন করেছিল। দিবাভাগে তারা পরিখা হতে বের হয়ে যুদ্ধ করত এবং রাত্রে পরিখায় ফিরে যেত। একমাস এভাবেই অতিবাহিত হয়। অবশেষে একরাত্রে শত্রুদের মধ্যে হঠাৎ গণ্ডগোল ও মারামারির শব্দ শুনা যায়। হযরত আলা' (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে হজফ্‌কে সংবাদ জেনে আসার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ফিরে এসে বর্ণনা করেন যে, শত্রুসৈন্য মদ্য পান করে মাতাল হয়ে আনন্দ উল্লাস করছে। হযরত আলা' (রা) এটা শুনেই স্বীয় বাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়ে তরবারী চালনা শুরু করেন। ফলে এই সমস্ত

www.pathagar.com

লোক ব্যাকুল এবং দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে কিছু নিহত হয়, কিছু গ্রেফতার হয়, কিছু এদিক ওদিক সুযোগ মত লুকিয়ে পড়ে। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। এই হাঙ্গামায় হাতামও নিহত হয়।

যে সমস্ত লোক এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তারা নৌকায় চড়ে[১] দারায়ন নামক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। হযরত আলা' (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, মুসলিমদের নিকট সমুদ্র অতিক্রম করার মত কোন নৌকা ছিল না। অবশেষে হযরত আলা' (রা) মুসলমানদেরকে একত্র করে বললেন, 'কোন ভয় নেই। যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শুষ্কস্থানে (বিজন বন বা মরুভূমি) সাহায্য করেছেন তিনি সমুদ্রেও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।' অতঃপর সমস্ত মুসলমান সমবেতভাবে অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন। দু'আ করার পর তাদের মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে, ঘোড়া, উট, গাধা এবং খচ্চর মোটকথা যার যে বাহন ছিল তা-ই সমুদ্রে নামিয়ে দেয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

"অন্ধকার সমুদ্রেও আমরা ঘোড়া দৌড়িয়েছি।"

যাহোক মুসলমানরা সমুদ্র অতিক্রম করে দারায়ন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে পলায়নকারীদের যেহেতু এখন আর পলায়নের কোন সুযোগ ছিল না, তাই তারা মরণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু মুসলমানরাই যুদ্ধে জয় লাভ করে এবং শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐ যুদ্ধে এত অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল অর্জিত হয় যে, প্রত্যেক অশ্বারোহীর ভাগে ছয় হাযার এবং প্রত্যেক পদাতিকের ভাগে দু'হাযার করে পড়ে। হযরত আলা' (রা) ঐ দিনই বাহ্রাইনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পৌঁছে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন এবং প্রথম থেকে শেষ প্রর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। সেখানে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের শক্তি সমূলে ধ্বংস হয় এবং যারা রক্ষা পায় তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। কেউ এ সংবাদ প্রচার করে দেয় যে, বনু শায়বান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওটা আসলে গুজব ছাড়া কিছু ছিল না।[২]

বাহ্রাইন যুদ্ধের গুরুত্ব

গুরুত্বের দিক থেকে যদিও বাহ্রাইনের যুদ্ধকে ইয়ামামার যুদ্ধের পর স্থান দেয়া হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ইয়ামামাহ্র যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ামামাহ্র যুদ্ধ শুধু একটি গোত্র বা দলের সাথে সংঘটিত হয়েছিল ; কিন্তু বাহ্রাইন

১. দারায়ন পারস্য উপসাগরের দ্বীপগুলোর অন্যতম। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খৃস্টান।
২. এই বিবরণ তাবারীর ঃ ২য় খণ্ড, ৫১৯-৫২৮ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

যেহেতু পারস্য উপসাগরে অবস্থিত, ইরানী শাসনকর্তার অধীন, ভারতবর্ষ ও ইরানী ব্যবসায়ীরা সেখানে বাস করেন এবং ফুরাতের মোহনা থেকে আদন পর্যন্ত তাদের বসতি, তাই এই যুদ্ধ শুধু কোন একটি গোত্রের সাথে ছিল না বরং ছিল আন্তর্জাতিক। তা ছাড়া ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে যেহেতু খৃস্টান, ইয়াহূদী, অগ্নিপূজক, দেব-দেবীর পূজারী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল তাই ঐ যুদ্ধকে আন্তঃধর্মীয় যুদ্ধ বলা যেতে পারে। ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ হয় তাতে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে ইরানী শাসনকর্তা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করে রেখেছিল তা সমূলে উৎপাটিত হয়। এই সাথে মুসলমানদের জন্য ইরাক বিজয়ের পথও উন্মুক্ত হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আম্মান ও মাহ্‌রাহ্‌

আম্মান ভারত মহাসাগরের উপকূলে এবং বাহ্‌রাইনের সন্নিকটে অবস্থিত। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল আজদ গোত্রের। তাদের অন্যান্য গোত্রের লোকও ছিল। অষ্টম হিজরীতে হুযূর (সা) খাযরাজ গোত্রের আবূ যায়েদ আনসারী (রা)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। সেখানকার আমীর জীফার ও উবায়েদ এর নামে হযরত আমর বিন আস (রা)-এর মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। জীফার ও উবায়েদ উভয়ে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদের দাওয়াতে অবশিষ্ট আরববাসী ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

কিন্তু হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর সেখানকার সবলোক ধর্মত্যাগ করে, লাকীত ইবনে মালিক যুত্‌তাজ তখন সুযোগ বুঝে নবূওতের দাবী করে বসে এবং ধর্মত্যাগীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সে আম্মান অধিকার করে নেয়। ফলে জীফার[২] ও উবায়েদকে বাধ্য হয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। হযরত আবূ বকর (রা) এ অবস্থা স্বচক্ষে অবগত হওয়ার পর হুযায়ফা ইব্‌নে মুহসিন এবং আরফাজাহ্‌ ইবনে হারসামকে আম্মানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদের পিছনে হযরত ইকরামা ইবনে আবূ জেহেলকে প্রেরণ করা হয়। ইকরামা ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন। হুযায়ফাহ ও আরফাজা আম্মান পৌঁছার পূর্বেই হযরত ইকরামা (রা) তাদের সাথে মিলিত হন। আম্মানের নিকট পৌঁছেই তাঁরা জীফার ও উবায়েদকে তাদের আগমনের সংবাদ প্রদান করেন। তাই তারাও ইসলামী সৈন্যদের সাথে এসে মিলিত হয়। এবার মুসলিম বাহিনী আম্মানের রাজধানী সুহার নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে। এদিকে লাকিত ইব্‌নে মালিক তার সৈন্যদের নিয়ে দাবা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। অবশেষে মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে লাকীত-এর উপর আক্রমণ

---

১. ফুতুহুল বুলদান বালাজুরী পৃঃ ৮৩।
২. ইবনে আমীর উবাইদ-এর নাম আয়ায লিখেছেন (২য় খণ্ড পৃঃ ২৮৫)।

www.pathagar.com

পরিচালনা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় শত্রুদের সংখ্যা অধিক মনে হচ্ছিল। তাই মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা দুর্ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে খারীত ইবনে রাশিদ, বনু নাজীযার একটি বাহিনী এবং সাইহান ইব্‌নে ছুহান বনু আবদুল কায়েসের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে। এই অদৃশ্য সাহায্য প্রত্যক্ষ করে মুসলমানদের অন্তরে যারপর নেই সাহসের সঞ্চার হয়। এবার তারা দিক পরিবর্তন করে শত্রুর উপর এত প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, তাদের যাবতীয় গর্ব খর্ব হয়ে যায়। ইব্‌নে আসীর বর্ণনা করেন যে, এই যুদ্ধে শত্রুদের দশ হাযার সৈন্য নিহত হয় এবং প্রচুর গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। এর পঞ্চমাংশ হযরত আরফাজার মাধ্যমে মদীনায় প্রেরণ করা হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করার জন্য আম্মানেই অবস্থান করেন।[১]

অতঃপর হযরত ইকরামা (রা) একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মাহ্‌রাহ চলে যান। মাহ্‌রাহর মধ্যে দু'টি দল ছিল। তারা পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। একদলের নেতার নাম ছিল সাখরীত এবং অন্য দলের নেতার নাম নুসহাত। দু'দলের মধ্যে নুসহাত দল তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী ছিল। এবার হযরত ইকরামা (রা) রাজনৈতিক চাতুর্যের মাধ্যমে দুর্বল দলটিকে নিজের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে সাখরীতের সাথে আলোচনা করেন। সাখরীত অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ইকরামার আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবার ইকরামা নুসহাতকেও ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সে তার শক্তির উপর গর্বিত ছিল বলে সে দাওয়াত গ্রহণ করে নি। হযরত ইকরামা (রা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর নুসহাত পরাজয় বরণ করে এবং নিহত হয়। যারা মুসলিম বাহিনীর তরবারী থেকে প্রাণে রক্ষা পায় তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

---

১. ইবনে আসীর; ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।
২. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৮৬।

www.pathagar.com

ইয়ামন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর জীবদ্দশায়ই আসওয়াদ আন্‌সী ইয়ামনে নবুওতের দাবী করে ফিত্‌না ফাসাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন। কয়েক দিন পর তাকে হত্যা করা হয়। আসওয়াদ আন্‌সী নিহত হওয়ার পর ইয়ামনে এমন সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় যে, সেখানে মুসলমানদের জীবন ও মান-সম্মান রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। আসওয়াদ আন্‌সীর বাহিনীর সেনানায়করা সান্‌আ ও আদনের মধ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে দৌড়াতে থাকে এবং যা ইচ্ছে করতে থাকে। আসওয়াদ আন্‌সীর সাথীদের ছাড়াও আরবের প্রখ্যাত বীর ও অশ্বারোহী আমর ইবনে মা'দিকার ও কায়েস ইবনে আবদ ইয়াগুস উভয়ই হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের সংবাদ শুনে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে সমগ্র ইয়ামনে ফিত্‌না ফাসাদের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। এবং মদীনা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে যে সমস্ত কর্মকর্তা ও আমীর নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। ফিরূয দায়লামী যিনি আসওয়াদ আন্‌সীকে হত্যা করেছিলেন 'আব্‌নার' সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি যদিও ইরানী বংশদ্ভূত ছিলেন কিন্তু দীর্ঘ দিন থেকে ইয়ামনে বসবাস করছিলেন। এখানে তার যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। ফলে সমস্ত বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা আব্‌নার বিশেষ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ইয়ামন থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করে।

হযরত আবূ বকর (রা) এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ফিরূয দায়লামীকে ইয়ামনে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং ওমর যী মারান, সায়ীদ যী যুল যুল কালা আল হাযিরী হাওশাব যী যুলায়ম ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যারা প্রভাবশালী ছিলেন এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের সবাইকে ফিরূয দায়লামীর আনুগত্য ও সহযোগীতা করার নির্দেশ দেন। ফিরূয দায়লামী বনু আকীল ইবনে রাবিয়া, বনু আক ও অন্যান্য গোত্র, যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে সানআর বাহিরে কায়েস ইবনে আব্‌দ ইয়াগুস ইবনে মাকসুহ এর শক্তি মুকাবিলা করেন। ফলে আব্‌নাকে (যাকে কায়েস দেশ থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে দৃঢ়বদ্ধ ছিল) কায়েসের অত্যাচার থেকে মুক্তি প্রদান করেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে উত্তর দিক থেকে মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া আম্মান ও মাহ্‌বার যুদ্ধ শেষ করে হযরত ইকরামা ইবনে আবি জেহেল সেখানে এসে পৌছেন। এবার মুসলমানাদের শক্তি এত সুদৃঢ় হয় যে, তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত শক্তি কাফিরদের ছিল না। ফলে সামান্য যুদ্ধের পর কায়েস পরজয় বরণ করে এবং গ্রেফতার হয়। এদিকে আমর ইবনে মা'দিকারের সাহসও ভেঙ্গে পড়ে এবং সে নিজেকে মুসলমানদের নিকট সমর্পণ করে। মুহাজির ইবনে আবূ উমাইয়া

www.pathagar.com

উভয়কে মদীনায় প্রেরণ করেন। সেখানে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সামান্য আলোচনার পর তারা উভয়ে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধে গিয়ে যোগ দেয়। এবার মুহাজির সানআয় এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং হযরত ইকরামা দক্ষিণ ইয়ামনে। সমগ্র ইয়ামন ফিত্না ফাসাদ থেকে মুক্ত হয় এবং পুনরায় সেখানে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

ইয়ামন যুদ্ধের গুরুত্ব

ইয়ামন যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব হ'ল এই যে, ফিরূয দায়লামী, দাষভীয়া, আবনা, প্রমুখ লোকেরা ইয়ামনে বাস করলেও আসলে ইরানী বংশদ্ভূত ছিলেন। ফলে কায়েস ইবনে মাকসূহ্ যদিও মুসলমান ছিলেন এবং আসওয়াদ আন্সীর হত্যার পরামর্শেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন ফিরূয দায়লামীকে ইয়ামনে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন তখন কায়েসের আরবীয় বংশ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তিনি ধর্মত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি একটি বিরাট বাহিনী তৈরি করে ইরানী বংশদ্ভূত ইয়ামন-বাসীদেরকে ইয়ামন থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) তার এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। সম্ভবত এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম ঘটনা যখন আরবী বংশ মর্যাদাবোধের উপর আঘাত হেনে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরবদের চোখ খুলে যায় এবং অনারবদের মধ্যে ইসলামের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। হযরত আবূ বকর (রা) কায়েস ইব্নে মাকসূহ্কে একজন ইরানী বংশদ্ভূত মুসলমান দাযভীয়ার কিসাস হিসেবে হত্যা করার ইচ্ছা করেন, কিন্তু কায়েস যেহেতু গোপনে এই হত্যা করেছিলেন তাই কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যায় নি। ফলে কিসাস গ্রহণও সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইরতিদাদ থেকে তাওবা করার পর কায়েসকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[২]

কুন্দাহ্ ও হাযরামাউত

কুন্দাহ্ ও হাযরামাউত ইয়ামনের নিকটবর্তী দু'টি অঞ্চল। হযরত যিয়াদ ইব্নে লাবীদ আল আনসারী (রা) হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে এ উভয় অঞ্চলে গভর্নর নিয়োজিত হয়ে ছিলেন। তিনি সেখানে সাদাকাহ্ আদায় ছাড়াও ইসলামী আহ্কাম ও মাসআলা শিক্ষা দিতেন। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর যখন আরবের অন্যান্য গোত্র ধর্মত্যাগ করে তখন কুন্দাহ্ ও হাযরামাউতের বাসিন্দারাও গোমরাহীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আশওয়াস ইব্নে কায়েস কুন্দাহ্র একজন অত্যন্ত সম্মানিত প্রখ্যাত

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৮৭-২৮৮।
২. হাফিয ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।

www.pathagar.com

ব্যক্তি ছিলেন। দশম হিজরীতে তিনি আশিজন[১] লোক নিয়ে হুযুর (সা)-এর দরবারে এমনি জাঁকজমকের সাথে হাযির হন যে, তাদের সবার গায়েই রেশমী পোশাক ছিল। তখন আশওয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এবার কুন্দাহ্ ও হাযরামাউতে ধর্মত্যাগের যে জোয়ার প্রবহিত হচ্ছে তার নেতৃত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। যিয়াদ ইব্‌নে লাবীদ আল আনসারী তার সাথে যুদ্ধ করেন কিন্তু জয় লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে মুহাজির ইব্‌নে উমাইয়া ও ইকরামা (রা) উভয়ে ইয়ামন থেকে এখানে এসে পৌছেন। হযরত মুহাজির (রা) হযরত ইকরামা (রা)-কে এখানে রেখে স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে হযরত যিয়াদ ইব্‌নে লাবীদের সাথে মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে অগ্রসর হয়ে মাহজারুল যিরকান নামক স্থানে আশআস ইব্‌নে কায়েসকে চ্যালেঞ্জ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আশআস পরাজয় বরণ করেন। তিনি তার সাথীদের সাথে পলায়ন করে আন্‌নাজীর নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে। যখন অবরোধ কাল দীর্ঘায়িত হল এবং রসদপত্র পৌছাও বন্ধ হয়ে গেল তখন মরণপণ করে ওরা সবাই দুর্গ থেকে বের হয়ে আসল এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করল। ইতিমধ্যে হযরত ইকরামা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে আগমন করেন। আশআস ইব্‌নে কায়েস তারই মধ্যস্থতায় হযরত মুহাজির (রা)-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় কিন্তু আশআস্ এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ছিলেন যে, আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি যে নয় ব্যক্তির তালিকা পেশ করেন তাতে তার নিজের নাম লিখতে ভুলে যান। ফলে তালিকায় বর্ণিত নয় ব্যক্তিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং আশআসকে গ্রেফতার করে মদীনায় পাঠানো হয়। মদীনায় হযরত আবূ বকর (রা) এবং আশআস এর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এতে আশআস্ দ্বিতীয়বার মুসলমান হওয়া এবং ইসলামের উপর স্থায়ী থাকার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ফলে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে ক্ষমা করেন। আশআস ইবনে কায়েস যখন হুযূর (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বোন উম্মে ফারওয়াহ্‌কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় বিয়ে হয়নি। এবার পুনরায় ধর্ম গ্রহণের পর তিনি পুনরায় তার সে মনবাসনা ব্যক্ত করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং তার সাথে স্বীয় বোনের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর আশআস সঙ্গী সাথীসহ মদীনায় অবস্থান করেন এবং ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[২] কুন্দাহ্ ও হাযরামাউতের এই ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এটাই সর্বশেষ যুদ্ধ। অতঃপর বিশৃংখলার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সমগ্র আরব ইসলামের পতাকা তলে এসে যায়।

---

১. হাফিয ইবনে হাজার, ইবনে সাদের বর্ণনার বরাতে এদের সংখ্যা সত্তর বলেছেন। (আল ইসাবায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬)।
২. আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধে অনেক লোককে দাস-দাসী করা হয়েছিল, কিন্তু হযরত ওমর ফারূক (রা) ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করে তাদের সবাইকে মুক্তি প্রদান করে বলেন, এটা আরবদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে, তারা একজন অন্যজনের গোলাম হবে। ইসলামের যুগে যাদেরকে দাস-দাসী করা হয়েছিল শুধু তাদেরকে নয় বরং হযরত ওমর (রা) জাহেলীয়াতের যুগের দাস-দাসীদেরকেও মুক্তি প্রদান করেন।[১]

ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের যুদ্ধের উপর একটি পর্যালোচনা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগ এবং বিদ্রোহের ঝড় বইতে থাকে। তখন মদীনার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল তা মোটামুটি অনুমান করা যায়।

হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তখন মদীনায় মুসলমানদের অবস্থা ঐ বকরীর মত ছিল যা শীতল রাতে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মোটকথা, ইসলাম তথা দীনে মুহাম্মদী (সা)-এর বিরুদ্ধে এমন এক দাবানলের সূচনা হয়েছিল, যার শিখা উত্তরে সিরিয়া থেকে আলজাজিরা পর্যন্ত, দক্ষিণে ভারত সাগরের উপকূল পর্যন্ত, পূর্বে ইরাক ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকুল এবং বাবুল মুনদের পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দুনিয়াবাসী বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করেছে যে, মাত্র এক বছরের মধ্যে মুসলিম মুজাহিদরা নিজেদের সংখাল্পতা আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের সল্পতা সত্ত্বেও সমগ্র বিদ্রোহ ও বিশৃংঙ্খলার মূলৎপাটন করে সঠিক ও সত্য দীনের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে এবং পুনরায় সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসে। এটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা যে, মদীনা থেকে মানব জাতির সভ্যতা, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এমন প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি হয় যার মূল-মন্ত্র ছিল ইসলাম। আল্লাহ্ না করুন যদি ইসলাম তখন নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত তাহলে বাইরের দুনিয়ায় এর কোন প্রভাব পড়ত? এই সংস্কার বিপ্লবের নেতা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) যিনি এরূপ কোমল হৃদয় ছিলেন যে, হুযূর (সা) এর স্থানে নামাযে ইমামতি করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই কোমল মনের মানুষই রক্তের আখরে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধারা বিবরণী লিখলেন। কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও স্নেহের এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ঘটেছিল মানুষ আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে, যার রাজনৈতিক দর্শন ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরিপূর্ণ অনুকরণ।

এই বিশৃংখলার উৎখাত এরূপ তীব্রতা ও দ্রুততার সাথে হয়েছিল যা প্রত্যক্ষ করে প্রাচ্যবিদরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিতানীর মতে এ সব যুদ্ধ এক বছরে নয় বরং

---

১. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

www.pathagar.com

দু'বছরে শেষ হয়ে থাকবে।[১] প্রকৃতপক্ষে এটা তার মনের কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই লিখেছেন, দ্বাদশ হিজরীর প্রারম্ভেই হযরত আবূ বকর (রা) সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধ শুরু করেন। আর অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন ব্যতীত আরবের বাইরে এরূপ অভিযান পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধের এক দীর্ঘ ক্রমধারা অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বোপরি সম্মিলিত আরব গোত্রসমূহের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এ সমস্ত কারণে কিতানী[২] ও তার সহযোগী প্রাচ্যবিদদের বোধগম্যই হচ্ছে না এই যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাধান এক বছরের কম সময়ে কি করে সম্ভব হল। এখন বিবেচ্য বিষয় হল ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের ক্রমধারাও দীর্ঘ ছিল। সেখানেও একসাথে দু'টি বিরাট সাম্রাজ্য রোম ও ইরানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। অতএব ধর্মত্যাগীদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে যদি দু'বছর ব্যয় হয়ে থাকে তাহলে এই হিসেবে ইরাক ও সিরিয়া বিজয়েও কম পক্ষে দু'বছর ব্যয় হওয়ার কথা। অথচ হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের মোট সময় কাল সোয়া দু'বছর। আর আমরা যেমন উপরে উল্লেখ করেছি যে, এটা সম্পূর্ণ ধারণা বহির্ভূত যে, ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইরাক এবং সিরিয়ায়ও যুদ্ধ চলছিলো।

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রফেসার ফিলিপ হিট্টির মতে মাত্র ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যেই এ সমস্ত অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।[৩]

বিজয়সমূহ

তৃতীয় শতাব্দীতে আরবের উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিরিয়ার উপরও ছিল তার আধিপত্য। পূর্ব সীমান্তে ইরাক সংলগ্ন এলাকায় ইরান সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীন ছিল। সিরিয়ার বিস্তির্ণ এলাকা এ দুটো সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ছিল। উভয় সাম্রাজ্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল এবং সর্বদা তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে থাকত। ইরাক ও সিরিয়া এ দুটো রাজ্যের সীমান্ত আরবের সাথে সংযুক্ত ছিল। তাই সময় সময় আরবের যাযাবর ঐ সমস্ত রাজ্যে প্রবেশ করে লুটতরাজ চালাত। যার ফলে এদের প্রতি উভয় সাম্রাজ্যই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত দুটি সাম্রাজ্যই কুটনৈতিক চালের অধীন বাফার স্টেট (Bufer State) হিসেবে আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সীমান্তে একটি করে মিত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়। আর এভাবেই তারা আরবদের লুটতরাজ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। যখন ইরানী এবং বাইজেন্টাইনী রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হত তখন আরব রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রকে সাহায্য করত। সামানী রাজ্যের অধীন যে আরব রাষ্ট্র

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০ (নতুন সংস্করণ)।
২. ANNALS OF ISLAM ঃ জনৈক বিখ্যাত ইটালীয় প্রাচ্যবিদ।
৩. হিস্ট্রি অফ দি আরবস ঃ পৃঃ ১৪১ (সংস্করণ-১৯৪৯ইং)

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল হিরা বা লাখ্মী রাজ্য। আর সিরিয়ার সীমান্তে কায়সার রোমের অধীনে যে আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল গাস্‌মাসিনাহ্।

হিরা রাজ্যের প্রথম বাদশাহ্ ছিল মালিক ইবনে ফাহম আয্‌দী। তার ইন্‌তিকালের পর তার পুত্র জাযিমাতুল আরবাশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। সে অত্যন্ত জাঁকজমক প্রিয় বাদশাহ ছিল, আরবী ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। 'জাযীমা' যাবা নামক একজন মহিলার হাতে নিহত হয়। তখন তার ভাগ্নে আমর ইবনে আদী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে 'যাবা' থেকে তার মামার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং কুফা সংলগ্ন হিরাতে তার রাজধানী স্থাপন করে। সে নিজেকে ইরাকের বাদশাহ্ বলে অভিহিত করে। কিন্তু ঐ সময় ইরানে আরদেশীবিনবাবুকে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমর ইবনে আদীকে তার মিত্র ও অধীনস্থ করে নেন। এই অবস্থা ঐ বংশের সর্বশেষ বাদশাহ্ মানযার যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৬৩২ খৃস্টাব্দে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শাপুর ইবনে আরদেশীর হিজায ও ইয়ামনকেও তার করদ রাজ্যে পরিণত করে এবং ইমরাউল কায়েস কান্দিকে তার গভর্নর নিয়োগ করে।

কিন্তু কারো অধীনস্থ বা প্রজা হয়ে থাকা এই আরবদের স্বভাববিরোধী কাজ ছিল। উপরন্তু তাদের সাথে সাসানী রাষ্ট্রের ব্যবহারও সম্মানজনক ছিল না। তাই বাফার রাষ্ট্রের এই আরবরা যখনই কোন সুযোগ পেত, সাসানী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করত। সুতরাং সাবুর যিল আফতাফ যখন ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করে তখন সমগ্র আরবে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং ইরাকের বিভিন্ন প্রদেশও অন্যরা অধিকার করে বসে। সাবুর ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল। যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন আরবদের থেকে এভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে, হিজর নামক স্থানে পৌঁছে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তখন যে আরবই গ্রেফতার হয়ে আসত সে তার বাহু দেহ থেকে পৃথক করে ফেলত। এ কারণেই তার উপাধী হয়েছিল যুল।[১] আফতাফ বা দেহ থেকে বাহু পৃথককারী।

ইরানে মুযদাক-এর প্রভাবে লজ্জাহীনতা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুযদাকী প্রভাবের ফলেই খসরু পারভেজ হিরার বাদশাহ তৃতীয় নু'মান আবূ কাবুস-এর কাছে তার গোত্রের সুন্দরী মহিলাদেরকে চেয়ে বসে। যখন নু'মান এই নির্দেশ পালনে অস্বীকার করে তখন তাকে মাদায়েনে ডেকে পাঠিয়ে জেলখানায় আটক করা হয়। সেখানে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। নু'মান তার মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র আমানত হিসেবে বনু বকরের হানি ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। নু'মানের গ্রেফতারের পর খসরু পারভেজ হিরার শাসক হিসেবে বনু

১. আল-আখবাবুত তাওয়াল, পৃঃ ৪৯।

www.pathagar.com

ত্বায় গোত্রের আয়াস ইবনে কাবিসা নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। খসরু পারভেজের নির্দেশে আয়াস হানি ইবনে মাসউদের কাছে ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেবার দাবী করে। কিন্তু হানী তার কাছে রক্ষিত আমানত খিয়ানত করতে পরিষ্কার অস্বীকার করে। তখন কিস্‌রা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়। সে বনু বকরকে নিশ্চিন্ন করে দেয়ার জন্য যীকার নামক স্থানে একটি অভিজ্ঞ ও সাহসী সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। বনু বকর তাদের হটকারিতার উপর সুদৃঢ় ছিল। ফলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং ইরানিরা পরাজয় বরণ করে। হুযূর (সা)-এ সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ইরানীদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে বলেন।[১]

اليوم انتصف العرب من العجم

"আজ আরবরা অনারাবদের উপর তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করল।"

আরবের ইতিহাসে 'যীকার দিবস' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিরা অত্যন্ত গর্ব ও উদ্দীপনা নিয়ে এ দিবস সম্পর্কে কাব্য রচনা করেছেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুযূর (সা) যখন বিভিন্ন রাজা বাদশাহ্‌দের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পত্রাদি লিখেন তখন ইরানের বাদশাহ্‌র নামেও একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইরানের বাদশাহ্ ঐ পবিত্র পত্রের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। সে তা পাঠ না করে ছিঁড়ে ফেলে এবং পত্র-বাহককে তার দরবার হইতে বহিষ্কার করে দেয়। এ ছাড়াও সে ইয়ামনের গভর্নর বাযানকে নির্দেশ দেয়, যেন সে হুযূর (সা)-কে গ্রেফতার করে ইরানের রাজধানী মাদায়েনে প্রেরণ করে। হুযূর (সা) এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর বলেন,

هلك كسرى ولا كسرى بعده

"কিস্‌রা ধ্বংস হলো। অতঃপর আর কোন কিস্‌রা হবে না।"

শেষ পর্যন্ত তেমনটিই হলো। শিরভিয়া তার পিতা খসরু পারভেজকে হত্যা করে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে বাযান নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

উপরে উল্লেখ করা হয় যে, হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর ইরানী রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে সাজাহ্ মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি দুর্দান্ত সেনা বাহিনী নিয়ে এসেছিল।

ঐ সমস্ত ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আরব ও ইরানের সম্পর্ক অনেক পুরাতন এবং ইরানী সাম্রাজ্য সর্বদা আরবদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। দুনিয়ার অন্যান্য বাদশাহ্‌দের মত কূটনৈতিক চালের অধীন তারা আরবের এক গোত্র যেমন বনু আবদুল কায়েসকে অন্য গোত্র যেমন বনু বকর-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করত ফলে আরবদের মধ্যেও কখনোও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতো না।

---

১. তারীখে ইবনে খালদুন, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৮।
২. এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামের সাথে ইরানি সাম্রাজ্যের বিশেষ শত্রুতা বা হিংসা ছিল এই মনোবৃত্তির কারণে যে, তারা মনে করত, ইসলামের সাথে সংযোগ বা সংযুক্ত হয়ে আরব একটি সুশৃংখল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। আর এটা তাদের সাম্রাজ্যের জন্য একটা খোলা চ্যালেঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। অতএব আরব উপদ্বীপের পূর্ব সীমান্ত ঐ সময় পর্যন্ত নিরাপদ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইরাকের আরবদেরকে ইরান সাম্রাজ্যের অধীনতা ও অধীকার থেকে মুক্ত করা না হয়। আর ইরানের সাথে যুদ্ধ ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। স্যার উইলিয়াম ম্যূর ঠিকই লিখেছেন-

"সীমান্ত এলাকায় যে সব মুসলিম বাহিনী ছিল ইরাক ও সিরিয়ার লোকদের সাথে যখন তাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তখন কায়সারই রোম ও কিসরাহ্ ইবান উভয়েই নিজ নিজ এলাকার লোকদের সাহায্য করেন। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে বাধ্য হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়।[১]

একদিকে ইরানের সাথে ছিল আরবের এই সম্পর্ক অপরদিকে সিরিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল এই যে, প্রথমতঃ বনু কাযাআর কয়েকটি গোত্র সেখানে বসতি স্থপন করে। সিরিয়া তখন ছিল রোমদের শাসনাধীন। তারা আরবদেরই মধ্যে থেকে একজনকে তাদের হাকীম বা শাসক নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একদিকে এরা যাযাবর আরব গোত্রের লুটতরাজ থেকে দেশকে নিরাপদ রাখবে এবং অন্যদিকে তাদের এলাকা ইরান ও রোমের মধ্যে একটি বাফার স্টেট হিসেবে কাজ করবে। এ সমস্ত নেতাদেরকে 'মালিক' উপাধি দেয়া হয়েছিল। সঙ্গে মাআরি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে গাস্সানী গোত্র ইয়ামন হতে হিজরত করতে এখানে পৌছে এবং বসতি স্থাপন করে। কিছুদিন পর গাস্সানীরা[২] এমন শক্তি অর্জন করে যে, তারা বনু কাযাআর উপর প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তখন রোমীয়রা তাদেরকেই মালিক হিসেবে অনুমোদন করে। তাদের শাসনকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আবুল ফেদা লিখেছেন যে, তাদের শাসনকাল ছিল চারশো' বছর এবং এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা গাসসানীরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে সিরিয়ায় পৌছে। এই বংশের সর্বশেষ বাদশাহ ছিলেন জাবাল্লাহ্ ইবনে আয়হাম যিনি হযরত ওমর (রা)-এর যুগে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মুরতাদ হয়ে কনস্টেনটিনোপোলে পলায়ন করেন। জুর্জী যায়েদান-এর 'ফাতাতু গাসসান' শীর্ষ উপন্যাস জাবাল্লার উল্লেখ রয়েছে।

ইরাকে হিরা রাজদের মতই গাস্সান রাজদের অবস্থা ছিল। বাহ্যত তারা নিজেদেরকে স্বাধীন বললেও প্রকৃতপক্ষে রোমীয়দের করের জিঞ্জির ছিল তাদের

---

১ The Khilafat, its Rise, Decline and fall, Page 46

২. এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, বনু গাসসান ছিল আমর ইবনে আমিরুল মুযায়ফিয়ার বংশধর। আমর ইবনে আমের এর এক পুত্রের নাম ছিল জাফনা। এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে আলে জাফনাও বলা হত। প্রকৃতপক্ষে গাসসান ছিল একটি কূপের নাম। এরা এক যুগ পর্যন্ত সেই কূপের ধারে অবস্থান করছিল। তাদের নাম আলে গাসসান বা বনু গাসসান হয়ে যায়।

www.pathagar.com

গলায়। রোম সাম্রাজ্য তাদের সাথে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করত। স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখেছেন,

" সিরিয়ার লোকদের বাইজেন্টাইনী সাম্রাজ্যের অধীনে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি সহ্য করতে হত। ধর্মের পার্থক্যের কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত। তাদের থেকে ভারী ভারী ট্যাক্স আদায় করা হত। এ সমস্ত কারণে যখন মুসলমান আরবরা সিরিয়ার উপর আক্রমণ করে তখন সিরিয়ার ঐ আরবরা শুধু তামাসা দেখছিল। কেননা আরব আক্রমণকারীদের কাছে, যারা অধিক কোমল ব্যবহার করত এবং যাদের মধ্যে উদারতা ও সহানুভূতি পরিলক্ষিত হত, তারা অনেক কিছু আশা করছিলো।[১]

প্রখ্যাত জার্মান লেখক ভন ক্রামার (Von Kramer) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন

"যে সমস্ত আরব দীর্ঘ দিন থেকে সিরিয়া ও ইরাকে বসবাস করছিল তারা ঐ সমস্ত আরব মুসলমানদের সমগোত্রীয়, সম-জাতীয় ও সম-ভাষী ছিল। তাই তারা আক্রমণকারী আরবদেরকে শুধু গোপনেই নয় বরং প্রকাশ্যে সাহায্যও করেছে। এ সমস্ত ইরাকী এবং সিরীয় আরবরা শুধু 'মুসলমানদের গুপ্তচরের কাজই করেনি, অধিকাংশ সময় যুদ্ধের মাঠেও তাদের সাথে থাকত।[২]

যখন ইসলামের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে আরবদের মধ্যে জাতীয় শৃংখলা সুদৃঢ় হয় এবং তারা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তখন ইরানী সাম্রাজ্যের মত বাইজেন্টাইনী সাম্রাজ্যের মধ্যেও মুসলমানদের সম্পর্কে কঠোর ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তারা সিরিয়ায় সীমান্তে বসবাসকারী আরবদেরকে ব্যবহার করতে শুরু করে। সুতরাং দেখা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন হুযূর (সা) হযরত দাহ্ইয়া কালবী (রা)-এর মাধ্যমে রোমের বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন, তখন দাওয়াত পৌঁছিয়ে হযরত দাহ্ইয়া ফিরে আসার সময় জাজাম নামক স্থানে পৌঁছলে সিরিয়ার আরবরা তাকে আক্রমণ করে তাঁর সমস্ত মাল আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এমনিভাবে হুযূর (সা) যখন হযরত হারিস ইবনে উমাইর (রা)-এর মাধ্যমে বসরার হাকিম-এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন তখন রোম সম্রাটের অধীনে সিরিয়ার সীমান্তের এক ধনাঢ্য শাসনকর্তা শারাহবিল ইবনে আমর হযরত হারিস (রা)-কে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই হুযূর (সা) তিন হাযার সৈন্যের এক বাহিনী সিরিয়া প্রেরণ করেন এবং গাযওয়ায় মুতা সংঘটিত হয়। হযরত জায়েদ ইবনে হারিসা (রা) হযরত যাফর তৈয়ার (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর মত নেতৃস্থানীয় সাহাবা (রা) এই গাযওয়ায় শাহাদাত বরণ করেন। এর ফলে রোমীয়দের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং তারা মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আঁ-হযরত (সা) এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর নিজেই একটি অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী নিয়ে তাবুকের দিকে রওনা হন। যদিও এই সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি

---

১. This Caliphate its Rise, Decline and fall, Page 65.
২. This Orient under the Caliphs, Translation By Prof. Khuda Baksh, Page 92.

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলমানদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি রোমীয়দেরকে বিচলিত করে ফেলে এবং তারা প্রায়ই মুসলমানদের অনিষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইন্তিকালের পূর্বে হুযূর (সা) উপরোক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ঐ বাহিনীর গুরুত্ব এত অধিক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতের আসন গ্রহণ করার পর হাযারো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রথম এই বাহিনীকে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। স্যার উইলিয়াম ম্যূর বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর পদক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেননা তিনি এর দ্বারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের অন্তরে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে সক্ষম হন।[১]

উপরের বর্ণনা থেকে সম্ভবত এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সময় ইরান ও রোম এর মত দু'টি শক্তিশালী শত্রু দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ছিল। এরা ইসলামের জন্য পৃথক সমস্যা ছাড়াও স্বয়ং আরব জাতীয়তাবাদের ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এদু'টি সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত না করা ছাড়া ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেয়া যেত না। আরব জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হতে পারত, আর না ইরাক ও সিরিয়ার আরব সম্প্রদায়কে এ দু'টি সাম্রাজ্যের দাসত্ব, অধীনতা ও ঘৃণাসূচক ব্যবহার থেকে মুক্তি করা যেত। ইসলামী বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা) যেরূপ গুরুত্বের সাথে সিরিয়ার দিকে বাহিনী প্রেরণ করেন তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি এটা ধারণা করেছিলেন যে, আরব গোত্রের মধ্যে তাদের সীমান্ত বিস্তৃত করা ব্যতীত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।[২]

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা ইউরোপের ঐ সমস্ত লেখকদের মত আপনা আপনি খণ্ডিত হয়ে যায়, যারা ইরাক ও সিরিয়ার উপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কারণ এই বর্ণনা করে থাকেন যে, আরবরা স্বভাবগতভাবে যুদ্ধপ্রিয় ছিল, তাছাড়া ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যই ঐ সমস্ত রাজ্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যদি ঐ অভিযান শুধু মাত্র উপরোক্ত উদ্দেশ্যে হত তাহলে তাতে কোন উদ্যম থাকত না এবং মুসলমানরা কখনো একই সাথে পৃথিবীতে দু'টি বিরাট শক্তির সাথে লড়ে তাদেরকে পরাস্ত করতে পারত না।

---

১. The Caliphate, Page 42.
২. নতুন সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।

www.pathagar.com

সুবিবেচক ইউরোপীয় লেখকগণ স্বীকার করেন যে, মুসলমানদের এই বিজয় দুনিয়ার কোন লোভ লালসার ফল ছিল না, বরং তা ছিল ঐ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নির্ভীকতা, সাহসিকতা এবং শৃংখলার ফল, যা ইসলাম তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল। ভনক্রীমার লিখেন ঃ

"আমরা ভেবে আশ্চর্য হই, মদীনা হতে যে সল্প সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হ'ত তারা কী ভাবে বাইজেন্টাইনী ও ইরানী সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভ করত। আমাদের এটা ভুলে যাওয়া মোটেই উচিৎ নয় যে, ইসলাম পূর্ববর্তী বিশৃংখল লোকদের মধ্যে এমন একটি নিঃশর্ত ও সাধারণ আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল যা আরব মুসলমানদেরকে গ্রীস ও ইরানী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধে যারপর নেই উদ্যমশীল করে[১] তুলেছিল।"

আমেরিকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসার ফিলিপ হিট্টি লিখেছেন ঃ

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমানদের বিজয় সম্ভবত নিকট প্রাচ্যে তাদের প্রাচীন কর্তৃত্ব পুনরায় লাভ করার একটি প্রচেষ্টা ছিল। ইসলামের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অধীনে প্রাচ্য জাগরিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে শত বছরের চেপে থাকা পাশ্চাত্যের জবর দখল থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।"[২]

মোটকথা এ সমস্ত কারণেই হিজায ও ইয়ামান থেকে ধর্মবিমুখতা ও বিদ্রোহ দূর করার সাথে সাথে হযরত আবূ বকর (রা) ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন।

ইরাক আক্রমণ

মুসলমান ঐতিহাসিকরা ইরাককে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ইরাক আরব ও ইরাক আযম। ইরাক আরব হ'ল ঐ অঞ্চলের নাম যা আরবের সাথে সংযুক্ত। মধ্যযুগে এর রাজধানী ছিল মাদায়েন। পরে হয় বাগদাদ। কূফা, বসরা এবং ওয়াসেত এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর। এর উত্তরে জাযরা প্রদেশ, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে খুযিস্তান, পূর্বে ইরাক আযম এবং পশ্চিমে সিরিয়ার মরুপ্রান্তর।

ঐ সময় ইরানে সাসানী বংশ রাজত্ব করছিল। এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আরবদেশী ইবনে তাবাক। তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে সকল দেশকে একক (Unit) শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। এটা ছিল ২৬৬ খৃস্টাব্দের ঘটনা। এই সাথে তিনি ইরাক ও এর পার্শবর্তী আরব শহরগুলো অধিকার করেন। তার উপাধি ছিল শাহানশাহ্। আরদেশীয়ের মৃত্যুর পর ইরানে শাসন ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে তার সন্তাদের মধ্যে হস্তান্তরিত হতে থাকে। এই বংশেরই এক বাদশাহ্ ছিলেন নওশেরওয়া যার ন্যায় নীতি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁরই শাসনকালে

1. The orent under the caliphs, page 92.
2. History of the Arabs 1949 Edition, Page 143.

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা) পৃথিবীতে আগমন করেন। হরমুজ নওশেরওয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। হরমুজের পর খসরু পারভেজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইরানের এই শাহানশাহ্ এর নামেই হুযূর (সা) দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু খসরু ঐ মর্যাদাসম্পন্ন পত্রের সাথে যে অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন তার শাস্তি তার উপর এমনভাবে পতিত হয় যে, তিনি স্বীয় পুত্র শেরভিয়ার হাতে নিহত হন। শেরভিয়ার প্রায় দেড় বছর বাদশাহ্ ছিলেন। এরপর তার পুত্র আরদেশীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। একজন সেনাপতি তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেন। কিন্তু চল্লিশ দিন পর তাকেও হত্যা করা হয়। এবার শেরভিয়ার বোন বুরান ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন সমগ্র রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়। অবশেষে ইযদেগারদ এই বংশের সর্বশেষ বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ইযদেগারদ এর শাসনকালেই হযরত আবূ বকর (রা) ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করেন।

আক্রমণের সূচনা

ইরাক যুদ্ধের পটভূমি এই যে, মুসান্না ইবনে হারিসা শায়বানী একজন সাহাবী এবং বনু বকর গোত্রের একজন সরদার ছিলেন। এই গোত্র বাহ্‌রাইনে বাস করত। যখন সাধারণভাবে ধর্মবিমুখতার বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল তখন এই গোত্রও ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু হযরত মুসান্না (রা) কয়েক জন সাথীসহ ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকেন। সুতরাং হযরত আলা' ইবনে হাযরামী যিনি বাহ্‌রাইন যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন এবং বাহ্‌রাইনের ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুসান্না (রা)-কে পত্র লিখেন যেন তিনি রাস্তায় পাহারার ব্যবস্থা করেন।[১] হযরত মুসান্না (রা) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। এবং আট হাযার মুসলমানদের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। বাহ্‌রাইনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসান্না হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসে তাকে তার গোত্রের সরদার নিয়োগ করার জন্য আবেদন করেন যাতে তিনি ইরানী ও এর আশেপাশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন।[২] হযরত আবূ বকর (রা) ইতিপূর্বে মুসান্না (রা)-এর সুখ্যাতি শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই মুসান্না কে?" উত্তরে কায়েস ইবনে আসিম আল মিনকারী বলেছিলেন এই মুসান্না একজন প্রসিদ্ধ গোত্রের লোক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি।[৩] "এবার খোদ মুসান্না যখন খলীফার দরবারে আবেদন করলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) বিনা দ্বিধায় তাকে আমীরের নির্দেশ নামা লিখে দিলেন।[৪]

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬।
২. আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯।
৩. ফুতুহুল বুলদান, বালাজুরি, পৃঃ ২৫০।
৪. বালাজুরি, পৃঃ ২৫০।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ (রা)-এর নামোল্লেখ

কিন্তু হযরত মুসান্না (রা) চলে যাওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) চিন্তা করে দেখলেন, যেহেতু ইরাকের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একা মুসান্না (রা)-এর পক্ষে তাতে বিজয় লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ হতে সদ্য মদীনায় প্রত্যাবর্তনকারী হযরত খালিদ (রা)-কে তাঁর দশ হাযার সৈন্যসহ ইরাক রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।[১] এটা হল দ্বাদশ হিজরীর মুহার্‌রম মাসের ঘটনা।[২] এদিকে মুসান্না ইবনে হারিসা এবং মাযউর ইবনে আদী আল ইজলী যাদেরকে হযরত আবূ বকর (রা) তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, তাদেরকেও হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে গমন এবং পূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। এছাড়া ঐ সময় বানাজ ও হিজাযের মধ্যে অবস্থানকারী হযরত আইয়ায ইবনে গানাম (রা)-কেও হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতি নির্দেশ

এ প্রসংগে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে যে হিদায়াত ও নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তার দ্বারা খলীফায়ে রাসূল (সা)-এর সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং অস্বাভাবিক সচেতনতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

১. উঁচু ভূমি দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবে। তাবারীর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত খালিদ (রা)-কে ইরাকের নিম্নভূমি দিয়ে এবং হযরত আয়াজ (রা)-কে উঁচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অবশ্য সবাইকে উবাল্লাহ্ নামক স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ ছিল। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সৈন্যদল বিভিন্ন পথে অগ্রসর হলে চারদিকে মুসলিম সেনাদের প্রভাব পড়বে।

২. ইরাক ভূমিতে উপনীত হয়ে সেখানকার লোকদের মন জয়ের চেষ্টা করবে। তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা এটা গ্রহণ করে তা হলে খুবই উত্তম। নতুবা তাদের কাছে কর প্রদানের প্রস্তাব দিবে। যদি তারা কর প্রদান করতেও অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

৩. যে ব্যক্তি তাঁর (হযরত খালিদ (রা) সাথে যেতে রাযী নয় তাকে এজন্য বাধ্য করা যাবে না।

---

১. কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, তখন হযরত খালিদ (রা) ইয়ামামাতেই ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) সেখানেই তাকে এই নির্দেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইরাকের যুদ্ধের গুরুত্বের দিক থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা হতে দূরে ছিলেন যে, তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে এমনি প্রেরণ করতেন। তাই মদীনার রোওয়ায়েতকে আমরা গ্রহণ করেছি।

২. পৃঃ ২৫০।

www.pathagar.com

৪. যে সব লোক একবার ধর্ম ত্যাগ করেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য চাবে না।

৫. এদের ছাড়া যে মুসলমানই তোমাদের নিকট দিয়ে যাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে নেবে।[১]

উবাল্লাহ্‌র গুরুত্ব

এই সাথে হযরত আবূ বকর (রা) নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন উবাল্লাহ্[২] হতে যুদ্ধের সূচনা করা হয়।[৩] এতে সুবিধা ছিল এই যে, উবাল্লাহ্-এ ইরান-সম্রাটের সকল বাহিনীরই কিছু কিছু ইউনিট ছিল এবং এর গুরুত্ব ছিল সেনানিবাসের মত। আবহাওয়া কাজ-কারবার ও ব্যবসার দিক দিয়েও উবাল্লাহ্ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রখ্যাত অভিধান বিশেষজ্ঞ আসামায়ী এর উক্তি অনুযায়ী পৃথিবীতে তিনটি বেহেশ্‌ত রয়েছে। যথা 'গাওতায়ে দামেশ্‌ক,' 'নাহ্‌রে বলখ' 'উবাল্লাহ্'।[৪]

এ ছাড়া এটাই ছিল একমাত্র বন্দর যার দ্বারা আরবরা ভারত ও সিন্ধু প্রদেশে ব্যবসার জন্য যাতায়ত করত এবং এক দেশের পণ্য সামগ্রী অন্য দেশে প্রেরণ করত। তাই হযরত আবূ বকর (রা) এটাকে "ফারজুল হিন্দ" বা ভারতের সংযোগ খাল বলতেন।

ইরাকে হযরত খালিদ (রা) কি পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আমরা যেভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করব তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাবারী ও ইবনে আসীর এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল, আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাথে আমরা আমাদের বর্ণনায় ঐ দুই সম্মানিত ব্যক্তির বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

যাতুস্-সালাসিল এর যুদ্ধ

সাধারণ ঐতিহাসিকদের ধারণা, ইরাকে প্রথম যে যুদ্ধ হয়েছিল তা গাযওয়ায়ে হুফাইর অথবা যাতুস-সালাসিল এর নামে খ্যাত।

হুফাইর পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী কাযিমা সীমান্তে অবস্থিত। মদীনা হতে বসরা পর্যন্ত যদি একটি সোজা রেখা টানা হয় তাহলে বসরার পূর্বে এই রেখার উপরই হবে হুফাইর-এর অবস্থান। ইরান সাম্রাজ্যের আওতাধীন এই এলাকার গভর্নর ছিলেন হারমুয। ইরানীদের মধ্যে এই প্রচলন ছিল যে, যে ব্যক্তি যে ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন হতেন তার টুপীও তত মূল্যবান হতো। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হারমুয

---

১. আল বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২।

২. এই স্থানটি বসরার টাইগ্রিস নদীর তীরে পারস্য উপসাগরের কোণায় অবস্থিত এবং বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত। বসরা যেহেতু হযরত ওমর (রা)-এর যুগে বিজিত হয়েছে তাই এটা অগ্রগণ্য।

৩. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬১।

৪. মুজমাউল বুলদান ইয়াকুত হামূভী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭।

www.pathagar.com

যেহেতু এই এলাকার আমীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট ছিলেন তাই তার টুপীর মূল্যও ছিল এক লাখ টাকা। হুফাইর এর চারদিকে এবং সীমান্তে যে সমস্ত আরব গোত্র বাস করত তাদের সাথে হারমুযের ব্যবহার এত খারাপ ছিল যে, মনের কূটিলতা ও কটু বাক্যের দিক দিয়ে সে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। যেমন বলা হত, "এই ব্যক্তি হারমুযের চেয়েও অধিক দুশ্চরিত্র ও কূটিল। এই পরস্পর শত্রুতা ও ঘৃণার ফলশ্রুতিতেই আরব উপদ্বীপে বনী আ'মাম গোত্রের যে সমস্ত আরব বসবাস করত তারা যখনই সুযোগ পেত হারমুযের অঞ্চলে প্রবেশ করে লুটপাত চালাত। হারমুয তাদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ এবং ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ফলে ইরানীরা তাকে দেশের রক্ষাকারী ও পাহারাদার মনে করত।

হযরত খালিদ (রা) মদীনা হতে দশ হাযার সৈন্য নিয়ে রওনা হন। ইরাক সীমান্তে প্রবেশের পর দেখা গেল, সেখানে হযরত মুসান্না (রা) আট হাযার সৈন্যর একটি বাহিনী নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। হযরত খালিদ (রা) এবার সমস্ত সৈন্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে হুফাইর নামক স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। এই তিন দলের মধ্যে এক দলের নেতা ছিলেন হযরত মুসান্না ইব্‌নে হারিসা (রা) দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আদী ইব্‌নে হাতিম তাই এবং তৃতীয় দল খোদ হযরত খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। দুটি দল প্রথমে রওয়ানা হয়। সর্বশেষে হযরত খালিদ (রা) তার দল নিয়ে রওয়ানা হন। তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হারমুযের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ــ [১]

"তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে নিরাপদে থাকবে। নতুবা তোমাকে এবং তোমার জাতি জিম্মি হয়ে থাকতে হবে। এমতাবস্থায় জিযিরা প্রদান কর, অন্যথায় তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারূপ করবে না। আমি তোমার কাছে ঐ সমস্ত লোক নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে তেমনি ভালবাসে, যেমন তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

হারমুযের নিকট একদিকে এই পত্র পৌঁছে এবং অন্যদিকে মুসলমান সৈন্যদের পদচারণার সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইরানের সম্রাট, আরদেশীকে উপস্থিত অবস্থার বিবরণ সম্বলিত একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলা করার জন্য আপন সেনাবাহিনীসহ কাওয়াযেম নামক স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি অবগত হন যে, মুসলিম বাহিনী হুফাইর এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হুফাইরে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে একটি নদী তীরে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন। তখন হযরত খালিদ (রা) কাযিমার দিকে ফিরে এসে সেখানে তাঁবু স্থাপনের

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৪।

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন। তখন লোকজন বলাবলি করতে লাগলো শক্ররা পানি অবরোধ করে রেখেছে এবং আমাদের জন্য কোথাও পানি নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানী যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিপাত শুরু হলো এবং মাটঘাট পানিতে ভরে উঠলো।

এবার হারমুয তার সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এভাবে যে, রাজবংশের দুই যুবক কাবায ও আনুসাজানকে 'ডান' ও 'বাম' বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং যত যোদ্ধা ছিল তাদের সবাইকে পরস্পরের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় যাতে কেউ পলায়ন করতে না পারে। এই কারণে এই যুদ্ধকে যাতুস-সালাসিল এর যুদ্ধ বলা হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হল, হারমুয অগ্রসর হয়ে হযরত খালিদ (রা)-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেন। হযরত খালিদ (রা) সাথে সাথে সম্মুখে অগ্রসর হন। কিন্তু হারমুয যুদ্ধের সকল নীতি ভঙ্গ করে ধোঁকা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে পূর্বেই তারা একটি অশ্বারোহী দলকে এইমর্মে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন যে, যখনই হযরত খালিদ (রা) একাকী তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসবেন তখনি এ দলটি হঠাৎ গোপন স্থান থেকে বের হয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। কিন্তু হারমুযের অশ্বারোহী সৈন্য যে মুহূর্তে হযরত খালিদ (রা)-কে আক্রমণ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত কা'কা'[1] বিন আমর (রা) তৎক্ষণাৎ মুসলিম বাহিনীর সারি থেকে বের হয়ে এরূপ প্রচণ্ডভাবে তাদেরকে আক্রমণ করেন যে, তারা (অশ্বারোহী সৈন্য) ছত্রভঙ্গ হয়ে পলিয়ে যায়। তখন হযরত খালিদ (রা) হারমুযের ললাটে এমনি প্রচণ্ড আঘাত করেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারেন নি। যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসলিম বাহিনী উদ্দীপনার সাথে শক্রকে আক্রমণ করে এবং ইরানী বাহিনী পালাতে শুরু করে। এবার মুসলিম বাহিনী ফুরাতের দীর্ঘ সেতু পর্যন্ত তাদের পশ্চাৎদ্ধাবন করে। কাবায ও আনুসাজান কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালালেও এই যুদ্ধে অসংখ্য ইরানী সৈন্য নিহত হয়।

হযরত খালিদ (রা) গনীমতের মাল থেকে একটি হাতী ও হারমুযের একটি মূল্যবান টুপী মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনার অলিতে-গলিতে এটি ঘুরানো হয়। আরবদের কাছে এটি ছিল একটি আজব জন্তু। মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এটি দেখে একাধারে সন্তুষ্ট ও আশ্চর্যান্বিত হয়। কিন্তু এই জন্তু যেহেতু রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতিক তাই হযরত আবূ বকর (রা) সেটিকে মদীনায় না রেখে যর ইবনে কুলায়ব (যিনি এটা নিয়ে এসেছিলেন) এর সাথেই ফেরত পাঠিয়ে দেন।[2]

---

১. তাঁর বীরত্বের কাহিনী হল এই যে, মদীনা হতে হযরত খালিদ (রা) রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) ভেবে চিন্তে হযরত কা'কা' (রা)-কে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। কোন এক ব্যক্তি বললেন, 'একই ব্যক্তির দ্বারা কি হবে? হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বললেন, যে দলে হযরত কা'কা' (রা) থাকবেন সে দল কখনো পরাজিত হবে না।

২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৬ এবং ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬২।

www.pathagar.com

ফুরাতের প্রকাণ্ড সেতুর উপর পৌঁছে হযরত খালিদ (রা) হযরত মুসান্না ইব্নে হারিসা (রা)-কে ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন এবং মা'কাল ইব্নে মাকরান মুযনীকে উবাদল্লাহ্ প্রেরণ করে সেখানে তার বিজয় অভিযান পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

উবাল্লাহ্ কখন বিজিত হয়

উপরে বর্ণিত উবাল্লাহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এটা হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে অথবা হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিজিত হয়েছে। ইবনে আসীর-এর মতে, হযরত উতবাহ্ ইবনে গাযওয়ান-এর নেতৃত্বে হযরত ওমর (রা)-এর যুগে উবাল্লাহ্ বিজিত হয়। তিনি (ইবনে আসীর) ইব্নে মাকরান সম্পর্কিত বর্ণনাকে একটি স্ববিরোধী বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] কিন্তু বালাযুরি[২] ও আবূ ইসমাঈল মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ[৩] আয্দী-এর মতে, যখন হযরত খালিদ (রা) বসরা পৌঁছেন তখন সুভায়দ ইব্নে কুতবাহ্ আয যুহানী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, উবাল্লাহ্র[৪] অধিবাসীরা আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হয়েছে। আমার মতে তারা ঐ সময় পর্যন্ত এ থেকে বিরত থাকেন যতক্ষণ না আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। একথা শুনে হযরত খালিদ (রা) এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি সুভায়দকে বলেন, "আমি দিবাভাগে বসরা চলে যাব, কিন্তু রাতে সেখান থেকে ফিরে তোমার সৈন্যদের সাথে মিলিত হব। যদি ভোরে উবাল্লাহ্বাসী আক্রমণ করে তাহলে আমরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করব। এই যুক্তিমতে হযরত খালিদ (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বসরা গমন করেন। এতে উবাল্লাহ্বাসী খুবই আনন্দিত হয় এবং তারা পুরাদলে সুভায়দ ইব্নে কুত্বাহর উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পর দিন ভোরে যখন তারা আক্রমণ করে তখন (যেহেতু হযরত খালিদ (রা) রাতে ফিরে এসে সুভায়দের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছেন) মুসলমানদের সংখ্যার বিরাটত্ব প্রত্যক্ষ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত অবস্থা আঁচ করে হযরত খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীকে অবিলম্বে শত্রুর উপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়। পরিণামে উবাল্লাহ্বাসী পরাজয়বরণ করে। তাদের মধ্যে যারা পলায়ন করতে পারেনি তারা হয় নিহত হয় নয়ত সমুদ্রে ডুবে মরে। হযরত খালিদ (রা) তখন সুভায়দকে বলেন, "আমরা তোমাদের আশে পাশের ইরানীদেরকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে দিলাম যে, তারা আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।"

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩।
২. ফাতুহুল বুলদান ঃ পৃঃ ২৫০।
৩. ফতুহুশ শাম ঃ পৃঃ ৪৯ (এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত)।.
৪. ইবনে খল্লিকান এর বর্ণনা অনুযায়ী উবাল্লাহ বসরা থেকে চার ফরসঙ্গ অর্থাৎ একদিনের দূরত্বে অবস্থিত।

www.pathagar.com

বালাযুরি ও আযদীর উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উবাল্লাহ্ হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে বিজিত হয় এবং পূর্বাপর ঘটনাও তাই প্রমাণ করে, কেননা হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে সেখানে প্রেরণের সময় এই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর যোদ্ধাদেরকে নিয়ে ঐস্থান দিয়ে প্রবেশ করেন। অতএব এটা কি করে সম্ভব যে, গোটা এলাকা তাঁর দ্বারা বিজিত হয়েছে, অথচ উবাল্লাহ্-এর মত একটি স্থান জয় না করেই তিনি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তাহলে উবাল্লাহ্ হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে বিজিত হয়েছিল-এ কথার অর্থ কি? এর অর্থ সম্ভবত এই যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে প্রথমবার বিজিত হলেও পরবর্তী সময়ে ঐ এলাকার লোক বিদ্রোহ শুরু করে এবং হযরত ওমর (রা)-এর যুগে ঐ বিদ্রোহ দমন করে দ্বিতীয় বার উবাল্লাহ্ জয় করা হয়।[১]

মুযার-এর-যুদ্ধ

হযরত খালিদ (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসান্না ইবনে হারিস (রা) ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন এবং তার সংকল্প ছিল মাদায়েন পর্যন্ত পৌছার। কিন্তু হুফাইর যুদ্ধের সময় ইরান সম্রাটের নিকট হরমুযের যে আবেদন পৌছিল তার প্রভাবে এবং সেই সাথে হুফাইরে ইরানীদের পরাজয়ের খবরে ইরান সম্রাট হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলা করার জন্য একটি অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, ইরানের প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ-এর বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন। হযরত মুসান্না (রা) পথিমধ্যে এ সংবাদ শুনে তার মাদায়েন যাত্রা স্থগিত রাখেন।

হুফাইর যুদ্ধে পরাজয় বরণকারীরাও ইরানী বাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিল। দজলা ও ফুরাতের মোহনায় অবস্থিত মুযার নামক স্থানে ইরানীরা তাঁবু স্থাপন করে। হযরত খালিদ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেখানে পৌছেন। ইরানী সৈন্যদের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত বীর কারন এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত মা'কাল ইবনে আ'শী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অগ্রসর হন। যুদ্ধ শুরু হয়। কারন নিহিত হন। এভাবে পর পর নুসাজান হযরত আসিম-এর হাতে এবং কাবাজ হযরত আদী ইব্‌নে হাতিম এর হাতে

১.এখানে আরো একটি সন্দেহ এই হতে পারে যে, বালাযুরি ও আযদীর বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উবাল্লাহ, সুভায়দের হাতে বিজিত হয়েছে। কিন্তু তাবারী ও ইবনে আসীর এর মতে মা'কাল ইবনে মাকরান তা জয় করেছেন। এর উত্তর হল এই যে, প্রকৃত পক্ষে সুভায়দ ইবনে কুতবার সাথে উবাল্লাহ বাসীর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনিই এটা জয় করেছিলেন। বাকী রইল মা'কাল-এর কথা। এর জওয়াব এই যে, হুফাইর যুদ্ধের পর গনীমতের মাল জমা করা এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য হযরত খালিদ (রা) মা'কালকে উবাল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন। এতেই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হয়ত তিনিই উবাল্লাহ্ জয় করেছেন। তাবারী বলেন। (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৬)।

وأرسل معقل بن مقران المزني إلى الابلة ليجمع له ما لها والسبي فخرج معقل حتى نزل بالابلة فجمع الأموال والسبايا -

www.pathagar.com

নিহত হন। ইবনে আসীর এর বর্ণনা মতে কারন, নুসাজান এবং কাবাজ ইরানের এত প্রখ্যাত বীর ছিলেন যে, অতঃপর কখনো কোন যুদ্ধে তাদের মত এরূপ বিখ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন ইরানী মুসলমানদের হাতে নিহত হয় নি।[১] তাবারী ও ইবনে আসীর-এর বর্ণনা মতে এই যুদ্ধে ত্রিশ হাযার ইরানী নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায় তারা নৌকায় চড়ে পলায়ন করে। যদি মাঝে সমুদ্র না হত তাহলে শত্রুদের একজনও প্রাণে বাঁচত না। এই যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হয় এদের মধ্যে একজন ছিলেন, আবূল হাসান বসরী। যিনি পরে মুসলমান হয়ে মারিফাত ও তরীকত এর প্রখ্যাত ধারক ও বাহক হয়েছিলেন। দ্বাদশ হিজরীর সফর মাসে এই ঘটনা সংঠিত হয়েছিল।[২]

ওলজাহ্-এর যুদ্ধ

হযরত খালিদ (রা) পারস্য উপসাগর ও মাদায়েনের মধ্যবর্তী হিরার নিকটে অবস্থান করছিলেন। আরদেশীর যখন মুযারের যুদ্ধে ইরানীদের পরাজয়ের সংবাদ অবগত হন তখন তিনি ইরানের প্রখ্যাত অশ্বারোহী ইন্দরজগর-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনীর পিছনে ইরানের বিখ্যাত অশ্বারোহী জাদবীয়ার (আরব ঐতিহাসিকগণ যাকে জাযবীয়া লিখেছেন) নেতৃত্বে আরো একটি দল প্রেরণ করেন, এবার ইরানীরা আর একটি কৌশল এই অবলম্বন করে যে, দজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে সিরিয়ার মরুপ্রান্তর পর্যন্ত আরব গোত্রের যে সমস্ত লোক বাস করত এবং যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল খৃস্টান ধর্মাবলম্বী,[৩] তাদেরকেও স্বাধীনতার নামে নিজেদের সাথে মিলিয়ে নেয় এবং সম্মিলিত বিরাট বাহিনী নিয়ে দজলা ও ফুরাতের মোহনায় অবস্থিত ওলজাহ্ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে।

হযরত খালিদ (রা) মুযারে অবস্থান কালেই এ সংবাদ পেয়ে যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে রওয়ানা হন। এতদসত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব সহজ ছিল না। ইরানী ও আরব গোত্রের সৈন্যরা পৃথক পৃথক ছিল এবং প্রত্যেক দলের নেতা ছিল নিজেদের গোত্রেরই লোক। কিন্তু প্রধান সেনাপতি ছিলেন ইরানী। যুদ্ধ শুরু হল, উভয় দল এরূপ বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করল যে, ইবনে আসীর এর বর্ণনা মতে-

حتى ظن الفريقان الصبر قد فرغ

অর্থাৎ " উভয় দল ধারণা করল যে, এবার বুঝি ধৈর্যের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেল।"

কিন্তু হযরত খালিদ (রা) মুযার হতে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে একটি কৌশল এই অবলম্বন করেছিলেন যে, তাঁর বাহিনীর দু'জন নেতাকে দল থেকে পৃথক করে দু'টি পৃথক রাস্তা দিয়ে ইরানী বাহিনীর পিছন দিক দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌছার নির্দেশ

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭।
৩. এ সমস্ত আরবদের অধিকাংশই বনুবকর ইবনে ওয়ায়েল এর বিভিন্ন শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল?

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। এই কৌশল অত্যন্ত কার্যকর হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে হযরত খালিদ (রা) যখন তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক তখনি উপরোক্ত দু'জন সেনাপতি তাদের দল নিয়ে ইরানী সৈন্যদের পিছন দিক থেকে ধাওয়া করেন। এবার শত্রুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রইল না। তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। তাদের কিছু সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বিরাট সংখ্যক সৈন্য মৃত্যুবরণ করেন। ইন্দরজগর প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত পানির পিপাসায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) এখানেও কৃষক ও জনসাধারণের সাথে যথারীতি কোমল ব্যবহার করেন। তিনি তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মায় দিয়ে আসেন।[১]

উল্লাইসের যুদ্ধ

ওলজাহ্ এর পরাজয়ের পর ইরানীরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু ইরাকের আরব গোত্রের লোকদের উপর এর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশী। শোচনীয় পরাজয়ের কারণে যেন তাদের ক্রোধ ও হিংসার অন্ত রইল না। একই ধর্মের বরাতে আরব গোত্রের মধ্যে যে সকল খৃস্টান ছিল তারাও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। তারা সবাই ইরানের সম্রাটের কাছে পত্রাদি প্রেরণ করে বিরাট আকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ফুরাত নদীর কূলে হিরা ও উবাল্লাহ্র মধ্যবর্তী উল্লাইস নামক স্থানে একত্র হয়। এ সময় কাসীনাসা নামক স্থানে অবস্থানরত বাহ্মন জাদবীয়াকে, উল্লাইস পৌঁছে আরব খৃস্টানদেরকে সাহায্য করার জন্য আরদেশীর নির্দেশ দেন, কিন্তু বাহ্মন বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে খোদ আরদেশীর সাথে আলোচনা করার জন্য মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হন, তবে নিজের পক্ষ থেকে জাবান নামক সর্দারকে এই বলে উৎসাহ প্রদান করেন যে, যতক্ষণ আমি ফিরে না আসব তুমি যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাহ্মন যখন মাদায়েন পৌঁছেন তখন আরদেশী অসুস্থ ছিলেন, তাই সেখানে তাকে অবস্থান করতে হয়। এদিকে জাবান উল্লাইস পৌঁছে বাহ্মন এর অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছেন এবং শত্রুদেরকে কিছু চিন্তা করার সুযোগ না দিয়েই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। মালিক ইবনে কায়েস সম্মুখে অগ্রসর হ'ল কিন্তু হযরত খালিদ (রা)-এর তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের দলে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। এখানে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। আর তা এই যে, শত্রুরা তাদের তৈরি খাবার রেখে পলায়ন করেছিল। মুসলমানগণ যখন খাদ্য সামগ্রী অধিকার করে তখন তারা এর মধ্যে ময়দার সাদা রুটিও দেখতে পায়। যেটাকে আরবীতে الرقاق البيض বলা হয়। যাহোক, আরবের মুসলমানগণ তখন

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।

www.pathagar.com

পর্যন্ত এটা সম্পর্কে অপরিচিত ছিল। তাই একজন বলল, এটা কি? তখন অন্য একজন উত্তর দিল, তোমরা حفيق الحيش নিশ্চয় শুনেছ। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে الرقاق البيض বলা হয়।

উল্লাইস যুদ্ধ শেষ করে হযরত খালিদ (রা) ফুরাত ও নহর (ছোট নদী) বাদকলীর মোহনায় অবস্থিত আমগিশিযানী নামক শহর অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ হয়নি। শহরবাসীরা এমনিতেই অস্ত্র সম্বরণ করে। এরূপ বিরাট বিজয়ের সংবাদ অবগত হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "মহিলারা হযরত খালিদ (রা)-এর মত লোক জন্মদানে অপারগ।"[১]

ইবনে জাবীর তাবারী, ইবনে আসীর এবং ইবনে কাসীর এর বর্ণনা মতে উল্লাইস-এর যুদ্ধে শত্রু দলের সত্তর হাযার ব্যক্তি নিহত হয়। স্যার উইলিয়াম ম্যুর অবশ্য এটাকে বাড়াবাড়ী আখ্যা দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, সে যুগে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি বর্তমান কালের মত ছিল না। সম্ভবত এই সংখ্যা সত্তর হাযার ছিল না। বরং শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্য প্রকাশের জন্যই অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَــــرَّةً আয়াতেও এই শব্দটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এখানেও সত্তর হাযার দ্বারা সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে।

হিরা বিজয়

উপরোক্ত পরাজয়সমূহ ইরানীদের সাহস হ্রাস করে দিয়েছিল বটে, তবে উল্লাইসের যুদ্ধে ইরাকের আরব গোত্রসমূহই ছিল অগ্রভাগে। ঐ সময় এই আরবরাই ছিল ইরানীদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। তাই সৈন্য পরিচালনার সুবিধার্থে আরব গোত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে ইরাক আরবের রাজধানী হিরা জয় করার জন্য হযরত খালিদ (রা) আমগীশিয়া হতে সোজাসুজি হিরার দিকে রওয়ানা হন। এ সময় আযাদীয়া (আযাহিয়া) নামক এক ব্যক্তি ছিলেন ইরান সম্রাটের পক্ষ থেকে হিরার গভর্নর। মুসলিম বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ শুনে তিনিও তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। যেহেতু হযরত খালিদ (রা) সমুদ্র পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাই তিনি আপন পুত্রকে অগ্রে প্রেরণ করে সমুদ্রের পানি বন্ধ করে দিলেন ফলে খলিদ (রা)-এর নৌকাসমূহ এগোতে পারল না। হযরত খালিদ (রা) নিরূপায় হয়ে একটি দল নিয়ে নৌকা থেকে নেমে ফুরাত নদীর কূলেই আযাদীয়ার পুত্রের সাথে যুদ্ধ করে তাকে এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করেন। আযাদীয়ার জন্য এটা ছিল অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত। একদিকে ইরান সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ, অন্যদিকে সংগীসাথীসহ আপন পুত্রের নিহত হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছলো। এমতাবস্থায় পলায়ন ছাড়া তার অন্য কোন গতি ছিল না। হিরাবাসী এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দুর্গ বন্ধ করে ভেতরেই বসে

---

১. ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

www.pathagar.com

থাকে।[১] কয়েকটি উন্নতমানের প্রাসাদ ও গলির জন্য হিরা বিখ্যাত ছিল। খোরনক ও সাদী এর মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আরবী কাব্যে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। মুসলমানরা এগুলো অবরোধ করে রাখে এবং একদিন ও এক রাত পর একেবারে মহল্লার ভেতর প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এখন সন্ধি ছাড়া ইরানীদের অন্য কোন উপায় ছিল না। অগত্যা আবদুল মসীহ্ নামক জনৈক (তাবারীর মতে, আমর ইবনে আবদুল মসীহ) প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং আয়াস ইবনে কাবীসার মাধ্যমে আলোচনা চলে। অবশেষে এক লাখ নব্বই হাযার দিরহাম বাৎসরিক জিযিয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয়। উপরন্তু হিরাবাসীরা মুসলমানদের পক্ষে (ইরানীদের বিরুদ্ধে) গুপ্তচুরী করার দায়িত্বও গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমানরা তাদের কোন গীর্জা বা প্রাসাদ ধ্বংস করবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২] হযরত খালিদ (রা) যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে হিরা বিজয়ের খবর পাঠান এবং সেই সাথে কিছু উপঢৌকনও প্রেরণ করেন কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ঐ উপঢৌকনকেও হিরাবাসীদের জিযিয়ার মধ্যে গণ্য করেন এবং হযরত খালিদ (রা)-কে অবশিষ্ট জিযিয়া আদায় করার জন্য নির্দেশ দেন। সেটাকে তিনি হিরাবাসীদের উপঢৌকন হিসেবে গণ্য করেন।[৩] এই বিজয় দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।[৪]

বিনতে বাকীলাহ্র কাহিনী

এক্ষেত্রে তাবারী, বালাযুরী, ইবনে আসীর এবং ইবনে কাসীর এমন একটি বর্ণনা দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ও কল্প কাহিনী ছাড়া কিছু নয়। আমরা প্রথমে মূল কাহিনীটি বর্ণনা করব। এরপর মূল ঘটনাটি পর্যালোচনা করে দেখবো।

বর্ণিত আছে যে, "খুরায়ম ইবনে আউস ত্বায় একদা আঁ-হযরত (সা)-এর কাছে আবেদন করেন, 'যদি আল্লাহ্ আপনার হাতে হিরার বিজয় দান করেন তাহলে আপনি বিনতে বাকীলাহ্কে (হিরার বিখ্যাত পরিবারের একটি মেয়ে) দানস্বরূপ আমার হাতে তুলে দেবেন।" সুতরাং হযরত খালিদ (রা) যখন হিরাবাসীর সাথে চুক্তি করতে উদ্যত হন তখন খুরায়ম, বিনতে বাকীলাহ্কে চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কেননা হুযূর (সা) ইতিপূর্বেই বাকীলাহ্কে দান করে ফেলেছেন। বশীর ইবনে সা'দ ও মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাহ্ যখন তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দান করেন তখন হযরত খালিদ (রা) উক্ত মহিলাকে চুক্তি হতে বাদ দিয়ে খুরায়ম এর হাতে সোপর্দ করেন। কিন্তু মহিলাটি যেহেতু আশি বছর বয়সের বৃদ্ধা ছিলেন তাই খুরায়ম ঐ মহিলার পরিবার থেকে এক হাযার দিরহাম নিয়ে তাকে

১. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬।
২. ফুতূহুল বুলদান, বালাযুরি পৃঃ ২৫২-২৫৩।
৩. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭।
৪. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, ২৬৭।

www.pathagar.com

ফেরৎ দিয়ে দেন। যখন লোকজন খুরায়মকে জিজ্ঞেস করল, 'বিনতে বাকীলাহ্‌কে এত সস্তা দামে অর্পণ করে দিলেন কেন? তখন খুরায়ম বললেন, এক হাযারের উপরেও যে কোন সংখ্যা আছে তা আমার জানা ছিল না।[১]

উপরোক্ত রিওয়ায়েত, বর্ণনার রীতি ও বিবেক বুদ্ধির দিক দিয়ে যে ত্রুটিপূর্ণ, নিম্নে তার প্রমাণ পেশ করা হল ঃ

১. প্রথম প্রমাণ এই যে, এই ঘটনা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাতে মতবিরোধ রয়েছে। বালাযুরি এটাকে বনু ত্বায় গোত্রের খুরায়ম ইবনে আউস এর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সাথে সাথে এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এটাও বলেছেন যে, আঁ-হযরত (সা) রাবীয়া গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে বিনতে বাকীলাহ্‌কে প্রদানের অঙ্গীকার করেন।[২] হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ঐ ব্যক্তির নাম শাবীল বলে উল্লেখ করেছেন। তাবারী ও ইবনে আসীরও ঐ একই নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

২. তাবারী এই মহিলার নাম কারামাতাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার এর নাম ইয়াশমিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

৩. তাবারীতে উল্লেখ আছে যে, আঁ-হযরত (সা) এই শর্তের উপর বিনতে বাকীলাহ্‌কে প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন যে, হিরা তরবারির মাধ্যমে অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হবে।[৫] هي لك إذا فتحت عنـوة কিন্তু হিরা যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। তাই বিনতে বাকীলাহ্‌কে চাওয়ার অধিকার যেমন খুরায়ম বা শাবীলের ছিল না, তেমনি এই দাবী মঞ্জুর করার ক্ষমতাও খালিদ (রা)-এর ছিল না।

৪. বর্ণিত আছে যে, বিনতে বাকীলাহ্‌কে যখন হযরত খালিদ (রা) চুক্তির শর্ত থেকে বাদ দিয়ে তার দাবীদারের হাতে সোপার্দ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন বিনতে বাকীলাহ্‌র আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ জানান। কিন্তু বিনতে বাকীলাহ্ বললেন, 'তোমরা এতে বাধা প্রদান কর না, আমাকে যেতে দাও।' প্রকৃত বিষয় এই যে, ঐ ব্যক্তি যৌবন কালে আমাকে দেখেছেন; সম্ভবত তিনি মনে করেছেন যে, যৌবন সর্বদা বিদ্যমান থাকে। যদি তিনি এখন আমাকে দেখেন তাহলে আশি বছরের একজন বৃদ্ধা রূপেই দেখবেন এবং তখন নিজে থেকেই আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। এখন পশ্ন হল, যদি ঐ ব্যক্তি বিনতে বাকীলাহ্‌কে তার যৌবনকালে দেখে থাকেন এবং তার প্রেমেও পড়ে থাকেন তাহলে এটা নিশ্চিত যে, তিনিও ঐ সময় যুবক ছিলেন। কিন্তু এটা কি ধরনের কথা যে, বিনতে বাকীলাহ্ যৌবন কাল অতিক্রম করে অশীতিপর বৃদ্ধা হয়ে

---

১. ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ২৫৩।
২. আল বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭।
৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯ ও ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭।
৪. আল ইসাবা ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১, অনুবাদ মুহাম্মদ ইবনে বশীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।
৫. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯।

www.pathagar.com

গেলেন অথচ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি যুবকই থেকে গেলেন এবং এখন তিনি বৃদ্ধার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাকে হযরত খালিদ (রা) নিকট দাবী করেছেন। এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিনতে বাকীলাহ্ যে বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন এটা ঐ ব্যক্তি অনুমান করতেও পারেন নি, বিনতে বাকীলাহ্ তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি যৌবনকে স্থায়ী মনে করেছেন' এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? দুনিয়াতে এরূপ নির্বোধ কি কেউ আছে যে এরূপ মনে করতে পারে?

৫. বিনতে বাকীলাহ্ যে সস্তা মূল্যে বিক্রয় করায় যখন লোকজন এ ব্যক্তির সমালোচনা করতে থাকে তখন তিনি বলেন, 'এক হাযারের উপরেও কোন সংখ্যা আছে তা আমার জানা ছিল না।' ঐ উক্তি কি বিশ্বাস যোগ্য? হযরত খালিদ (রা)এর বাহিনীতে কতজন মুসলমান ছিলেন? মুসলমানদের হাতে কি পরিমাণ গনীমতের মাল ছিল? এ সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি কি অবগত ছিলেন না। যদি অবগত থাকেন তাহলে তিনি ঐ সমস্ত জিনিসের হিসেব কিভাবে করেছেন?

হিরায় হযরত খালিদ (রা)-এর দীর্ঘ অবস্থান

এখন মাদায়েন বিজয়ের ব্যাপারটি ছিল খালিদ (রা)-এর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যেহেতু নির্দেশ প্রদান করেছিলেন 'যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আয়ায তোমাদের সাথে না মিলবে এবং আমার অনুমতিও না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হবে না, তাই হযরত খালিদ (রা) হিরাকেই তাঁর হেড কোয়ার্টার করে সেখানে কম বেশী এক বছর অবস্থান করেন। এই অবস্থানের ফল দাঁড়লো এই যে, বিভিন্ন এলাকার বিরাট বিরাট জমিদার ও জায়গীরদাররা যখন প্রত্যক্ষ করল যে, হিরাবাসীদের সাথে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতির ব্যবহার খুবই উত্তম ও ন্যায় ভিত্তিক তখন তারাও খালিদের খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত জিযিরা প্রদানের চুক্তিতে তার করুণার ছায়ায় আশ্রয় নেয়।[১]

অতএব এখন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা হচ্ছে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর, উত্তরে হিরাহ, পশ্চিমে আরবদেশ এবং পূর্বে দজলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দিরার ইবনে আযদর, দিরার ইবনে খাত্তাব, কা'কা ইবনে আমর, মুসান্না ইবনে হারিসা (রা) এবং অন্যান্য প্রখ্যাত বীরদের নেতৃত্বে এক এক দিকে এক একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে হযরত খালিদ (রা) বিজিত স্থানসমূহের উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এমন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন যে, অতঃপর কেউ বিদ্রোহ বিশৃংখলা সৃষ্টির সাহসই পায় নি।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে হযরত খালিদ (রা) ইরানের সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট পৃথক পৃথকভাবে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। ইরান সম্রাট আরদেশীদের মৃত্যু হওয়ায় ঐ সময় ইরানীদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৫৭৩।

www.pathagar.com

হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম বিরোধীতা তাদেরকে পুনরায় একীভূত করে এবং তারা হিরাহ্‌র নিকটবর্তী আনবার ও আইনুত তামারে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে।

আম্বারের ঘটনা[১]

উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা) কা'কা' ইবনে আমরকে হিরায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে ফুরাত নদীর তীর ধরে আনবারের দিকে রওয়ানা হন। হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা) পূর্বগামী সৈন্যদের সাথে ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ইরানীরা দুর্গ বন্ধ করে দেয়। দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা ছিল, তাই মুসলমানরা দুর্গ পর্যন্ত পৌছতে পারছিল না। উপরন্তু দুর্গের প্রাচীর থেকে তাদের উপর তীর বর্ষিত হচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা) এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, যেন তারা শত্রুদের চোখ চিহ্নিত করে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। অভিজ্ঞ মুসলমান তীরন্দাজরা তখন এক হাযার চোখকে উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন বলে ঐ যুদ্ধকে যিতুল উয়ুন এর যুদ্ধ বলা হয়।[২]

ইরানী বাহিনীর নেতা শরীযাদ ঐ যুগের একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিরূপায় হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু সন্ধির শর্ত এরূপ ছিল যে হযরত খালিদ (রা) তা মঞ্জুর করতে পারেন নি। ফলে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এবার নির্দেশ প্রদান করা হল, মুজাহিদদের যে কয়টি দুর্বল উট রয়েছে সেগুলোকে যবেহ্ করে যেন পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে পরিখা ভর্তি হয়ে গেল এবং মুসলিম বাহিনী তা অতিক্রম করতে লাগলো। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শীরযাদ এরূপ ভীত হয়ে পড়েন যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই তিনি হযরত খালিদ (রা) এর দেয়া সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নেন। যাহোক শীরযাদ এখান থেকে নিরাপদে বাহ্‌মন জাদবিয়ায় চলে যান এবং আম্বার এলাকা মুসলমানরা অধিকার[৩] করে নেয়। শা'বী হতে বর্ণিত আছে- অর্থাৎ আম্বার বাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।[৪]

لأهل الأنبار عهد وعقد

১. এই স্থানকে আনবার বলার কারণ এই যে, সেখানে খাদ্য-দ্রব্য ও তরকারীর স্তূপ লেগে থাকত। নুমান ইবনে মানযার এর লোকদেরকে এখান থেকেই খাদ্য সরবরাহ করা হত। বালাযুরি পৃঃ ২৫৫, আনবারে আরবদের বিরাট বসতি ছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা বখতে নসর এর যুগে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এরা আরবী লিখাও জানত। তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭১।

২. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

৩. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

৪. ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ২৫৫।

www.pathagar.com

আইনুততামার বিজয়

আম্বার যুদ্ধ সমাপ্ত করে হযরত খালিদ (রা) জবরকান ইবনে বদরকে আম্বারে রেখে নিজে একটি বাহিনী নিয়ে আইনুততামার ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী মরুভূমিতে অবস্থিত। তিন দিন পথ চলার পর হযরত খালিদ (রা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। বাহরাম চুবিনের পুত্র মাহ্‌রান ইরানের পক্ষ থেকে সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। তার নিকট ইরানীদের বিরাট বাহিনী ছাড়াও বনু তামার, তাগলাব, বনু আয়াদ এবং সিরিয়ার মরু অঞ্চলের আরব গোত্রের একটি বিরাট বাহিনী ছিল। আরব গোত্রের নেতা ছিলেন আক্কাহ্ ইবনে আক্কাহ্। হযরত খালিদ (রা)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে আক্কাহ্ মাহরানকে বলেন, লোহা লোহাকে কেটে থাকে। আমরা আরবী এবং খালিদ এবং তার সাথীরাও সবাই আরবী। তাই আমাদের উভয়কে যুদ্ধ করতে দাও। মাহরান এই পরামর্শ সন্তুষ্টচিত্তে মঞ্জুর করেন। যখন তার লোকজন তাকে এজন্য দোষারূপ করে তখন তিনি বলেন, আমি এক বিরাট কৌশল অবলম্বন করেছি যা তোমাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। যদি আক্কাহ্ খালিদ এর উপর জয়লাভ করে তাহলে খুবই উত্তম। নতুবা মুসলমান আক্কাহ্ ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে যখন দুর্বল হয়ে পড়বে তখন আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে এবং তখন আমাদের জয় সুনিশ্চিত। যাহোক আক্কাহ্ তার বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর দিকে অগ্রসর হন। তার ডানে ছিল বুজায়র ইবনে পালান, বামে হুজায়ল ইবনে ইমরান। আক্কাহ্ এবং মাহ্‌রানের মধ্যে কয়েক মাইলের দূরত্ব ছিল। আক্কাহ একটি স্থানে পৌছে তার সৈন্যদের বিন্যস্ত করতে শুরু করেন। হযরত খালিদ (রা) ও তার সৈন্যদেরকে সজ্জিত করেন। উভয় পক্ষের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে পর আক্কাহ্ অগ্রসর হয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর উপর আক্রমণ করেন। একজন অপর জনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে হযরত খালিদ (রা) আক্কাহ্‌র উপর এমন আক্রমণ করেন যে, আক্কাহ্‌কে স্বীয় বাহুতে আটকিয়ে ফেলেন এবং গ্রেফতার করেন। আক্কাহ্ গ্রেফতার হওয়ার ফলে তার সৈন্যদের সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করে। এমতাবস্থায়ও বহু লোক গ্রেফতার হয়।

আক্কাহ্‌র এই পরাজয়ের খবর পেয়ে মাহ্‌রান তার বাহিনী নিয়ে দুর্গ হতে পলায়ন করেন। এবার হযরত খালিদ (রা)-এর জন্য ছিল যুদ্ধের মাঠ শূন্য। এবার তিনি দুর্গে পৌছে সেখানে অবস্থানকারী সবাইকে গ্রেফতার করে দুর্গ অধিকার করে নেন এবং আক্কাহ্ ও তার সাথীদের মধ্যে যারা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল তাদেরকে হত্যা করেন।

এখানে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। হযরত খালিদ (রা) একটি গীর্জার ভেতর দিক থেকে বন্ধ দেখতে পেয়ে সেটার দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেন এবং দেখতে পান যে, সেখানে চল্লিশ জন বালক ইঞ্জিল পাঠ করছে। তখন হযরত খালিদ

www.pathagar.com

(রা) জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কারা?" তারা উত্তরে বলে, "আমাদের এখানে বন্ধক রাখা হয়েছে।" হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে এনে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন। স্পেনের বিখ্যাত বিজেতা আবূ মূসা ইবনে নসীর এবং বসরার প্রখ্যাত ফিকাহবিদ আবূ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ছিলেন ঐ সমস্ত বালকদেরই অন্যমত।[১]

দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধ

দূমাতুল জান্দাল হিরাহ্ ও ইরাকের পথে, আইনুত্তামার হতে তিন শত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

৫ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে আঁ-হযরত (সা) সংবাদ পেলেন যে, দূমাতুল জান্দালে শত্রুদের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন হুযূর (সা) এক হাযার মুসলমানের একটি দল নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। শত্রুরা এ সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। তাই তখন কোন যুদ্ধ সংঘঠিত হয়নি। অতঃপর ৯ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুযূর (সা) হযরত খালিদ (রা)-কে কায়সারে রোমের আওতাধীন আরবী সর্দার আকীদর ইবনে আবদুল মালিক কুন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) তাকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসেন। এখানে এসে আকীদার ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর (সা) তার এবং দুমা বাসীদের জন্য নিরাপত্তা সনদ প্রদান করেন। কিন্তু হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং চুক্তিভঙ্গ করে মুরতাদ[২] হয়ে যায়।

উপরোক্ত কারণে আবূ বকর (রা) যখন খালিদ (রা)-কে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন তখন আয়ায ইবনে গনমকে দূমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, দূমা সহজেই অধিকৃত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রায় এক বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা বিজিত হল না। বনু কালব বাহ্রা এবং গাস্সান গোত্রের যারা ইরাকে হযরত খালিদ (রা)-এর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল তারও দূমাতুল জান্দালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা হযরত আযায (রা)-এর উপরই হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। সেখানে শত্রুদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হযরত আয়ায (রা) অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

আইনুততামার বিজয়ের পর খালিদ (রা) গনীমতের মালসহ ওয়ালীদ ইবনে ওকবাহ্ এর মাধ্যমে মদীনায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) ওয়ালীদ ইবনে ওকবাহ্কে আসবাব পত্রসহ সাহায্যকারী হিসেবে হযরত আয়ায (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অবস্থা

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭।
২. ফুতুহুল বুলদান ঃ বালাযুরী পৃঃ ৬৮-৬৯।

www.pathagar.com

সংকটজনক লক্ষ্য করে ওয়ালীদ হযরত আয়ায (রা)-কে হযরত খালিদ (রা)-এর সাহায্য প্রার্থনার জন্য বলেন। হযরত আয়ায (রা) সাথে সাথে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ (রা) হযরত আয়ায (রা)-এর পত্র পাওয়ার সাথে সাথে উত্তরে লিখেন, "আমি তো নিজেই তোমার নিকট আসছি। উক্ত পত্রে তিনি নিম্নের কবিতাংশটিও লিখে দেন।

لبث قليلا تأتك الحلائب - يحملن أسادا عليها القاشب - كتائب يتبعها كتائب

"একটু অপেক্ষা কর, তোমার নিকট উটের দল আসছে - যাদের উপর বাঘেরা আরোহণ করে আছে এবং তাদের হাতে তলোয়ার রয়েছে। দলে দলে সেনাবাহিনী ছুটে আসছে।"

হযরত খালিদ (রা) সিরিয়া ও নুফুদের মরুপ্রান্তরে ঘোড়া দৌড়িয়ে দশ দিনের কম সময় তিনি শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে দূমাতুল জান্দালে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে বাহরা, কালব, গাস্‌সান, তানুখ, দাজায়েন-এ সমস্ত আরব গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

দূমাতুল জান্দাল রাজ্য দু'ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিলেন আকীদর এবং অন্যজন ছিলেন জুদী ইবনে রাবীয়া। আকীদর যেহেতু হযরত খালিদ (রা)-এর বিরত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই যুদ্ধ না করার পক্ষে মত পেশ করেন কিন্তু আরব গোত্র এবং তাদের দ্বিতীয় নেতা জুদী এতে দ্বিমত পোষণ করেন। ফলে আকীদর তাদের থেকে পৃথক হয়ে নিজের পথ ধরেন। হযরত খালিদ (রা) এ সংবাদ পাওয়া মাত্র আসিম ইবনে আমরকে তার পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দেন। আসিম আকীদরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। যেহেতু সে বিদ্রোহী ও মুরতাদ ছিল। তাই হযরত খালিদ (রা) তাকে হত্যা[১] করার নির্দেশ দেন।

জুদী আরবদের একটি বাহিনী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অগ্রসর হন। তিনি একটি দলকে হযরত আয়ায (রা)-এর দিকেও প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) এবং হযরত আয়ায (রা)-এর দূমাতুল জান্দালকে মাঝে রেখে যুদ্ধ শুরু করেন। জুদী হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রেফতার হন। তার দলের লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গের দিকে পলায়ন করে, কিন্তু দুর্গে সকল লোকের স্থান সংকুলান না হওয়ায় যারা ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল তারা দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে বাহিরে অবস্থানকারী অসংখ্য লোক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। বনু কালব গোত্রের সাথে বনু তামীম এর চুক্তি থাকায় তাদের বন্দীদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। হযরত খালিদ (রা) তাদের প্রাণ রক্ষা করেন। এবার হযরত খালিদ (রা) দুর্গ আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই তা জয় করেন। আরব গোত্রের সরদার জুদীকে হত্যা করা হয় এবং তার সুন্দরী কন্যা বন্দী হয়। হযরত খালিদ (রা) প্রথমত তাকে খরিদ করেন। অতঃপর আযাদ করে দিয়ে বিয়ে[২] করেন।

---

১. আল কামিল ঃ ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০।
২. ফুতুহুল বুলদান ঃ বলাযুরী ঃ পৃঃ ৬৯।

www.pathagar.com

ইরাকে বিদ্রোহ

হযরত খালিদ (রা) দূমাতুল জান্দালে অবস্থান করছিলেন–এই সুযোগে ইরান ও ইরাকের আরব গোত্রসমূহ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বনু তাগলাব গোত্রের সরদার আক্কাহ্ এই বিদ্রোহে নেতৃত্বে দেন। হযরত খালিদ (রা) হিরায় হযরত কা'কা'কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে এসেছিলেন এবং একাকী তার পক্ষে এই সব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। তাই এই সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত খালিদ (রা) দূমা হতে রওয়ানা হন। হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা) দলের অগ্রভাগে ছিলেন। ইরান ও আরবের এই বিদ্রোহীদল তাদের বাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করেছিল। ইরানী সরদার রোজমেহের এবং রোজবাহ্ আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। অপর বাহিনী আম্বার এর নিকটবর্তী হাসীদ, খানাফেস ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করছিল। হযরত খালিদ (রা) হিরাহ্ পৌঁছে কা'কা'কে হাসীদ এলাকায় নিয়োগ করেন। এ সময় রোজমেহের ও রোজবাহ্ সেখানে অবস্থান করছিলেন, খালিদ (রা) আবূ ইয়ালাকে খানাফেস অঞ্চলে প্রেরণ করেন। হাসীদে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং কা'কা বিজয় লাভ করেন। যুদ্ধে রোজমেহের নিহত হন।[২] অপরদিকে রোজবাহ্কে আসমা ইবনে আবদুল্লাহ আদদবী হত্যা করেন। ফলে ইরানীরা পরাজয়বরণ করে।

এখানে থেকে পলায়ন করে এ সমস্ত লোকেরা খানাফেস এর মুর্চায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইরানী বাহিনী মাহ্বুজান এর নেতৃত্বে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু মাহ্বুজান আবূ ইয়ালার আগমন সংবাদ শুনেই পলায়ন করে এবং মুসায়খ নামক একটি স্থানে পৌঁছে হুজায়ল ইবনে ইমরান এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) এ সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত কা'কা, আবূ ইয়ালা, আ'বাদ এবং উরওয়াহ্কে লিখে পাঠান, যেন অমুক রাতে অমুক সময় সকল লোক মুসায়ক নামক স্থানে একত্র হয়। যখন সকল লোক সেখানে একত্র হয় তখন হুযায়লকে রাতের বেলা আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। হুযায়ল তার কয়েকজন সঙ্গীসহ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়।

ভুলক্রমে দু'জন মুসলমানকে হত্যা

মুসায়খ এর আক্রমণে যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে আবদুল উয্যা ও লাবীদ ইবনে জারীরও ছিলেন। এরা দু'জন মুসলমান হয়েছিল এবং তাদের কাছে হযরত

---

২. এই সময় কা'কা' যে কবিতা আবৃতি করেন ইয়াকুত তা মুজমাউল বুলদানে এটা উল্লেখ করেছেন, তাহলো এই—

ألا أبلغا أسماء أن خليلها — قضى وطرا من روزمهر الأعاجم غداة صبحنا في حصيد جموعهم —

هندية تقري فراخ الجماجم —

www.pathagar.com

আবূ বকর (রা)-এর দেয়া পরিচয় পত্রও ছিল। তাই হযরত আবূ বকর (রা) এ ঘটনা অবগত হওয়ার পর উভয়ের শোণিতপণ আদায় করেন এবং তাদের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। মালিক ইবনে নুভায়রার হত্যার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) যে ভাবে হযরত খালিদ (রা)-কে অপরাধী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তেমনি এই দু'ব্যক্তিকেও অন্যায়ভাবে হত্যার জন্যও তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে দায়ী করেন।[১] এ ক্ষেত্রে হযরত খালিদ (রা)-এর সবচেয়ে গ্রহণীয় ও যুক্তি সংগত জবাব ছিল এই যে, এই দু'ব্যক্তি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের ক্যাম্পে অবস্থান করছিল এবং হুযায়লেরই সাথে ছিল। সুতরাং যখন হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে হযরত খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে স্বীয় অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) স্পষ্টভাষায় জবাব দেন।[২]

كذلك يلقي من نازل أهل الشرك

"যে কেউ মুশরিকদের সাথে অবস্থান করবে তার পরিণতি এরূপ হবেই।"

কিন্তু তাবারী উপরোক্ত ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন এই দু'ব্যক্তির শোণিতপণ আদায় করেন তখন তিনি সাথে সাথে এটাও বলেন-

أما إن ذلك ليس علي إذ نازلا أهل الحرب [৩]

"(আমি শোণিতপণ আদায় করছি) কিন্তু এটা আমার উপর ওয়াজিব ছিল না। কেননা এরা দু'জন শত্রুদের ওখানে অবস্থান করছিল এবং তাদেরই মেহমান ছিল।"

যেহেতু বিদ্রোহজনিত ঐসব বিশৃঙ্খলা বনু তাগলাবই সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইরানীরা যা কিছু করেছিলেন তা ওদেরই সহোযোগিতায় করেছিল তাই হযরত খালিদ (রা) শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি বনু তাগলাবকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবেন না। তিনি মুসায়খ থেকে অবসর হয়ে কা'কা' এবং আবূ ইয়ালাকে দু'টি ভিন্ন পথে রওয়ানা করেন। তিনি তাদেরকে একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন, তোমরা ঐ রাতেই বনু তাগলাব এর উপর আক্রমণ করবে। এ দু'জনের রওয়ানা হওয়ার পর তিনি নিজেও রওয়ানা হন। তিনি প্রথমে সানা নামক স্থানে পৌছেন, অতঃপর জামীল নামক স্থানে (বনু তাগলাবের বিশেষ কেন্দ্র) পৌছে তিন দিক থেকে বনু তাগলাবের উপর এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, অপর কোন ব্যক্তির কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ পৌছাতে বনু তাগলাবের এমন একটি লোকও রক্ষা পায়নি। এই আক্রমণে যে সমস্ত মহিলা গ্রেফতার হয় তাদের মধ্যে রাবিয়া ইবনে বুযায়র তাগলাবীরও একটি কন্যা ছিল।[৪] গনীমতের মাল এবং গ্রেফতারকৃত মহিলাদের

---

১. ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২।
২. ইবনে আসীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২।
৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮১।
৪. তার নাম ছিল সাহ্বা এবং উপনাম ছিল উম্মে হাবীব।

www.pathagar.com

মদীনায় প্রেরণ করা হয়। হযরত আলী (রা) বিনতে রাবীয়া (যার নাম আস্‌সাহ্‌বা এবং উপনাম উম্মে হাবীব)-কে ক্রয় করেন। তার গর্ভে থেকেই ওমর ও রোকেয়া জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

এখান থেকে অবসর হয়ে হযরত খালিদ (রা) রিদাব অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে উক্‌বাহ্‌র পুত্র হিলাল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রেখেছিল। হিলালের সাথীরা হযরত খালিদ (রা)-এর আক্রমণ শুনামাত্র তাকে ছেড়ে পলায়ন করেন। তাই সেখানে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি।

ফারাযের যুদ্ধ

ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় এবং ফুরাত নদীর উত্তরে ফারায অবস্থিত। হযরত খালিদ (রা) ইরাকের বিশৃঙ্খলা দমন করার পর ফারায পৌঁছেন এবং ফুরাত নদীর তীরে দুর্গ স্থাপন করেন। রমযান মাস তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। রোমানরা মুসলিম বাহিনীকে এ অবস্থায় দেখে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়। ইরানীদের যে সমস্ত সৈন্য আশেপাশে অবস্থান করেছিল এবং তাদের ছাড়া যে সমস্ত আরবগোত্র কায়সার-এর করদাতা ছিল তাদের নিকট রোমানরা সাহায্য প্রাথনা করে। এ ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠে। দ্বাদশ হিজরীর ১৫ যিলকাদ উভয় দলের সৈন্যরা মুখামখী হয়। মাঝে ছিল শুধু একটি নদী। রোমানরা লাফিয়ে নদী অতিক্রম করে। অতএব যুদ্ধ শুরু হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। হযরত খালিদ (রা) শত্রু সৈন্যদেরকে বিচ্ছিন্ন হতে না দেয়া এবং চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলিম বাহিনী রোমানদেরকে ঘেরাওয়ের মত ফেলে মরণপণ যুদ্ধ করতে থাকে। ফলে ইরানী ও আরব গোত্রের সৈন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে উপরোক্ত যুদ্ধে শত্রুদের এক লাখ সৈন্য নিহত হয়। আমাদের মতে এখানেও এই সংখ্যা দ্বারা নিহতদের সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে। নতুবা ঐ যুগে কোন দলের পক্ষে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধের মাঠে একত্র করা খুবই কঠিন ছিল।

হযরত খালিদ (রা)-এর হজ্জ আদায়

দ্বাদশ হিজরীর ২৫শে যিলকাদ ফারায-এর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তখন হজ্জের মাত্র পনের দিন বাকী। হযরত খালিদ (রা) হঠাৎ হজ্জের নিয়ত করেন এবং দীর্ঘ দুর্গম পথ মাত্র কয়েক দিনে অতিক্রম করে এরূপ রহস্যজনকভাবে মক্কা মুয়ায্‌যামায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন যে, ফারাযের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে

---

১. তাবারী, ইবনে আসীর, আল বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫২ বালাযুরী সিরিয়া বিজয়ের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন এবং বিনতে রাবীয়ার পরিবর্তে বিনতে হাবীব ইবনে বুযাইর লিখেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই মহিলা রাবীয়া' ইবনে বুযাইর এর কন্যা ছিলেন না বরং ভাতিজী ছিলেন। ফুহুতুল বুলদান ঃ পৃঃ ১১৭।

www.pathagar.com

বাহিনীকে তিনি হিরাহ্ প্রেরণ করেছিলেন, হজ্জ হতে ফিরে এসে ঐ বাহিনীর সাথে তিনিও একত্রে হিরায় প্রবেশ করেন। বাহিনীর লোকজন এ সংবাদই জানতে পারেন নি যে, তিনি হজ্জ করে ফিরে এসেছেন। এর চেয়েও আশ্চার্যের বিষয় হল এই যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী ঐ বছর স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা) হজ্জের আমীর ছিলেন। অন্য রিওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওমর (রা) হজ্জের আমীর ছিলেন, মোটকথা আমীরুল হজ্জেরও সামান্যমত খোঁজ মিলেনি যে, সিরিয়ায় যুদ্ধে নিয়োজিত হযরত খালিদ (রা) হাজীদের দলে রয়েছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত খালিদ (রা)-এর এই কার্যক্রম তাঁর দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব, ঔদার্য, পৌরুষ ও শক্তির প্রমাণ বহন করে। কিন্তু খলীফার অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এভাবে চলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই শৃংখলা বিরোধী কাজ ছিল। তাই হযরত আবূ বকর (রা)-এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা)-এর নামে এই মর্মে সতর্কবাণী প্রেরণ করেন যে, স্বীয় বিজয়সমূহের উপর তোমার এভাবে গর্ব করা উচিৎ নয়। তিনি কঠোরভাবে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সাবধান! ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে।[১]

ইরাকে হযরত খালিদ (রা) দ্বাদশ হিজরীর মুহর্‌রম মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত কম বেশী এক বছর দু'মাস অবস্থান করেছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ে তিনি যে বিজয় লাভ করেন তা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সমস্ত যুদ্ধ ক্ষেত্র পারস্য উপসাগর হতে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা ফারায পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাছাড়া শুধু একটি গোত্রের সাথেই যুদ্ধ হয়নি, বরং ইরানী, রোমী এবং আরব গোত্রসহ তিনটি সম্মিলিত বাহিনীর সাথেই যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ বাহিনী আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে মুসলিম বাহিনীর চাইতে ছিল অনেক উন্নত। এতদসত্ত্বেও সবগুলো যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।

এছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে, হযরত খালিদ (রা) যে শহর বা প্রদেশই বিজয় করতেন সেখানে নিয়ম শৃঙ্খলাও প্রতিষ্ঠা করতেন। একজন আমীরকে সমগ্র এলাকার রক্ষক ও হাকিম নিয়োগ করা হত। তার অধীনে কর আদায়কারী লোকজন থাকতেন। কৃষকদের সাথে সর্বদা অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হ'ত। জমিদার ও জায়গীরদারদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হত। এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত খালিদ (রা) শুধু একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজয়ী ছিলেন না বরং একজন সমাজ সংগঠকও ছিলেন।

সিরিয়া বিজয়

সিরিয়া-বিজয় সম্পর্কিত ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অত্যন্ত বিরোধ ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। সেখানে হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম কখন সৈন্য প্রেরণ করেন এবং ঐ সৈন্যরা ছিল কারা? কে ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান ? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪।

www.pathagar.com

একটি নয়। তাবারীর বর্ণনায় এর বিভিন্ন উত্তর রয়েছে। বালাযুরীর এ সম্পর্কিত বর্ণনা এতই অবিন্যস্ত ও জটিল যে, তা থেকে কোন সঠিক ও চূড়ান্ত উত্তর বের করা সম্ভব নয়। তার কোন কোন বর্ণনা তাবারীর বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে কোন কোনটি সম্পূর্ণ বিপরীত। আবূ ইসমাঈল আয্‌দী এবং ওয়াকিদীর বর্ণনার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। ইবনে আসীর, ইবনে খালদূন এবং ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাবারীর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আমরা এই সমস্ত উৎসকে সামনে রেখেই সিরিয়ার ঘটনাকে এমন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছি যার দ্বারা ঘটনার তারিখসমূহের ক্রমধারাও বাকী থাকে এবং যুক্তি অনুযায়ী শৃঙ্খলাও বজায় থাকে। পাঠকবর্গ আশা করি আমাদের বর্ণনা থেকে এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ

ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে লিখে থাকেন যে, যখন হযরত আবূ বকর (রা) ধর্মত্যাগীদের দমন করেন তখন সিরিয়ার প্রতিও তিনি দৃষ্টিপাত[১] করেন। কিন্তু আমাদের মতে, প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাবুক ও মূতার যুদ্ধ হিরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট)-কে সাবধান করে দিয়েছিল যে, মুসলমানরা বার বার সিরিয়া আক্রমণ করবে। হযরত উসামার অস্বাভাবিক বিজয় লাভ সে সাবধানবাণীকে অতঃপর সত্য প্রমাণিত করেছিল। রোম সম্রাট যিনি ইরানীদের উপর বিজয়লাভ করে গর্বিত ছিলেন এবার আতংকিত হয়ে আপন সীমান্তে সৈন্যবাহিনী মুতায়েন করতে শুরু করেন। ইবনে আসাকির লিখেছেন ঃ[২]

فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص فدعى بطارقته فقال هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها و لم تكلم قال أخوه نياف فابعث رابطة تكون بالبلقاء فبعث رابطة واستعمل عليهم رجلا من أصحابه فلم يزل مقيما حتى تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر -

হিরাক্লিয়াস হিমসে ছিলেন এমন সময় তার নিকট (উসামা বাহিনীর বিজয়ের) সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি তার পাদ্রীদেরকে ডেকে বলেন, এটাই সে বিষয় যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছি কিন্তু তোমরা তা মানতে অস্বীকার করেছ, দেখ এ আরববাসী এক মাসের দূরত্বে এসে তোমাদের উপর লুটপাট করে থাকে এবং আহত না হয়েই নিজেদের দেশে ফিরে যায়। তখন হিরাক্লিয়াসের ভাই নিয়াফ বলেন, 'তা হলে আপনি বালকায় একটি সৈন্যবাহিনী মুতায়েন করুন। হিরাক্লিয়াস তা করেন। তিনি সেখানে একটি বাহিনী মুতায়েন করে দেন। সাথে

১. বালাযুরী ঃ ১১৪ তারীখে ইবনে খালদূন ঃ ২য় খণ্ড, ৮৩।
২. তারীখে ইবনে আসাকির ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

www.pathagar.com

একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ বাহিনী ঐ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে, যতক্ষণ না হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের যুগে সিরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী আসতে শুরু করে।"

প্রকাশ থাকে যে, রোম সম্রাট যখন সীমান্তে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন তখন তার সংবাদ নিশ্চয়ই হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে পৌঁছে ছিল। এবং তিনি এর জবাবে নিজ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সৈন্যদল মুতায়েন করেছিলেন। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এই জন্য ছিল যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন বিদ্রোহীদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে তখন ঐ সুযোগকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য রোম সম্রাট আরবের ভেতরে প্রবেশ করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। আর এই পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধচলাকালীন সময়েই হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ ইবনে সাঈদের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী সিরিয়ার সীমান্তে প্রেরণ করেন।

কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে খালিদ ইবনে সাঈদ-এর নিয়োগকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত, যুদ্ধের পরের ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। তাদের কারণেই বিষয়টি এত জটিল হয়ে উঠছে। আমাদের ধারণা এই যে, খালিদ ইবনে সাঈদ-এর নিয়োগ সাধারণ সৈন্যদের রওনার বহু পূর্বে সীমান্তের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই হয়েছিল। হাফিয ইবনে হাজার আস্‌কালানী বলেন ঃ[১]

إن أبا بكر أمره على مشارف الشام في الردة —

"হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের সময় সিরিয়ার দিকে আমীর নিযুক্ত করেন।"

তাবারীর একটি বর্ণনায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আর তা এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন হযরত খালিদ ইবনে সাঈদকে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা তিমা'এর দিকে প্রেরণ করেন তখন এই নির্দেশ দেন যে, সেখানকার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনদেরকে নিজেদের সাথে একত্র করার চেষ্টা করবে, যারা মুরতাদ হয়নি শধু তাদের সেবা গ্রহণ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশ না পৌঁছবে এবং ঐ সমস্ত লোক নিজেরা যুদ্ধ শুরু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না।[২]

এ ছাড়া অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-এর প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার কারণ ছিল এই যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের এক বা দু'মাস পর যখন তিনি হুযূর (সা-এর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ইয়ামন এলাকা থেকে মদীনায় ফিরে আসেন তখন

১. আল ইসাবা ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬ তাযকিরায়ে খালিদ ইবনে সাঈদ।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৭।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) যখন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই বরং সম্পূর্ণ সঠিক তখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। এই অসন্তুষ্টির কারণেই হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা) যখন সিরিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন তখন হযরত ওমর (রা) তাতে বাধা দেন এবং হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)কে তাঁর দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করার দাবী জানান। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-পরামর্শ এভাবে গ্রহণ করেন যে, তিনি হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-কে পদচ্যুত করেন, কিন্তু মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসেবে তাঁকে পুনরায় সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন। মূল বাক্যটি হলো নিম্নরূপ ঃ

وجعله رداً للمسلمين بتيماء -

"এবং তাকে তিমা'নামক স্থানে মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করেন"[১] মোটকথা ردا রিদ্‌য়ান শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো সাহায্যকারী সৈন্য (Auxiliary force)। অতএব এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-কে যুদ্ধের জন্য নয় বরং একমাত্র সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি রোম সম্রাটের পক্ষ হতে কোন আক্রমণ হয় তাহলে যেন তিনি তা প্রতিহত করেন।

যতক্ষণ আরবে ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ এবং সেই সাথে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করছিল ততক্ষণ রোম সম্রাট সম্ভবত এই কল্পনা করেছিলেন যে, ইসলামের মূল ভিত্তি গৃহযুদ্ধের এই আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এছাড়া এটাও তার কল্পনা হতে পারে যে, এ অবস্থায় যদি তিনি নিজেই মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন, তাহলে হয়ত আরবরা সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। মোটকথা এ ধরনের কোন না কোন কারণেই রোম সম্রাট তার সীমান্তে যে সৈন্যদল নিয়োজিত করেছিলেন তারা সেখানেই পড়ে থাকে, এবং আগে বেড়ে কখনো মুসলমানদের আক্রমণ করেনি।

রোম সম্রাটের যুদ্ধপ্রস্তুতি

কিন্তু ইয়ামন, হাযরামাউত এবং আম্মান এলাকায় ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের যে বিজয় লাভ হয় তাতে রোম সম্রাট ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তিনি বাহ্‌রা', তানুখ, মসীহ্‌, গাস্‌সান, কালর, লাখম, জুযাম প্রভৃতি আরব গোত্রের, যারা সিরিয়া সীমান্তে বাস করত এবং রোম সম্রাটকে কর দিত, সমন্বয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেন এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এদিকে ধর্মত্যাগীদের

১. ফুহুতুশ শ্যাম ঃ ওয়াকেদী ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ২।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং ইয়ামন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। অন্যদিকে হিরা বিজিত হয়, দূমাতুল জান্দালও মুসলিম মুজাহিদদের জন্য তার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে সিরহানের বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তাসমূহ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা) যখন রোম সম্রাটের যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ পান তখন তিনিও সিরিয়ার উপর আক্রমণ করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হন।

পরামর্শ সভা

যেহেতু এটা ছিল একটি অতি গরুত্বপূর্ণ ও অস্বাভাবিক আক্রমণ, তাই এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ এবং তাদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ত্রয়োদশ হিজরীর সফর মাসে হযরত আবূ বকর (রা) একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন যাতে হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত জুবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত সাদ ইবনে আবি ওককাস (রা) হযরত আবূ উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ (রা) এবং হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও বিখ্যাত মুহাজির ও আনসারগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম ভাষণ পেশ করে বলেন, আঁ-হযরত (সা) সিরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে তার সান্নিধ্যে ডেকে নেন। আরবরা একই পিতামাতার সন্তান। আমি চাই তাদেরকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে, এতে আপনাদের মত কি ? সবাই একবাক্যে বলেন, হে রাসূল (সা)-এর খলীফা ! আপনার আনুগত্য আমাদের উপর ওয়াজিব। আপনি আমাদেরকে যে নির্দেশই দিবেন আমরা তা পালন করব।

আবূ ইসমাঈলের বর্ণনা মতে উক্ত পরামর্শ সভায় খালিদ ইবনে সাঈদ উমুভীও ছিলেন এবং তিনিই সিরিয়া গমনের জন্য সর্বপ্রথম নিজের নাম পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাবারী ইবনে আসীর এবং ইবনে খালদূনের বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না। তাই উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তা-ই ঠিক। অর্থাৎ খালিদ ইবনে সাঈদ ঐ সময় তীমা নামক স্থানে ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ (রা)-এর পত্রের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা) রোম সম্রাটের যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ অবগত হওয়ার পর এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল।

আমন্ত্রণ পত্র

সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেন এবং এর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু রোম সম্রাট যেহেতু ঐ সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক ছিলেন ঐ পরামর্শ সভায়ই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেছিলেন, (এই রোমবাসী অত্যন্ত তেজোদ্বীপ্ত ও মযবুত স্তম্ভ বিশেষ)

www.pathagar.com

তাই হযরত আবূ বকর (রা) হিজায ও ইয়ামনের সকল গোত্রের আমীরের নিকট এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং তাদের মদীনায় আগমন

বিভিন্ন গোত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট-চিত্তে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দলে দলে মদীনায় আসতে থাকেন। জুলকিলা, আল-হুমাইরী হযরত আবূ বকর (রা)-এর পত্রের বিষয়বস্তু শুনেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে স্বীয় গোত্র ও ইয়ামনের অন্যান্য লোকদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হন। এভাবে কায়েস ইবনে হুভায়রা আল মুরাদী, মুযহাজ্জ গোত্র জুনদুব ইবনে আমর দাওসী, ইজদ গোত্র, এবং হাকিস ইবনে বাদ আত্তাই তাই গোত্রের মুজাহিদদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। হুযূর (সা)-এর খাদিম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ সমস্ত পত্রাদি নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সুসংবাদ দেন যে, আপনার জিহাদের আমন্ত্রণ পেয়ে ইয়ামনের গোত্রসমূহ যে অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থায়ই নিজেদের স্ত্রী সন্তান-সন্ততি এবং জমাকৃত পুঁজি নিয়ে রওনা দিয়েছে। এটা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। পরের দিন হযরত আবূ বকর (রা) মদীনাবাসীদের নিয়ে বহিরাগত ঐ সমস্ত মুজাহিদদের অভ্যর্থনার জন্য মদীনার বাহিরে গমন করেন। সর্বপ্রথম ইয়ামনের হূমায়র গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়। জুলকিলা' একটি পাগড়ী বেঁধে ঐ গোত্রের নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন গোত্রের মুজাহিদরা আসতে থাকে। মদীনার নিকটবর্তী জরফ নামক স্থানে এ সমস্ত গোত্রের জন্য তাঁবু খাটানো হয় এবং সেখানেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[১]

রোম সম্রাটের কাছে হযরত আবূবকর (রা)-এর দূত

ইত্যবসরে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের দাওয়াতসহ রোম সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। হাফিয যাহ্বী বিস্তারিতভাবে এই দূতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।[২] এ প্রসঙ্গে ডঃ হামিদুল্লাহ্ বলেন, "আর্মানী ঐতিহাসিক সাবিউস উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময় রোম সম্রাটের নিকট একজন মুসলিম রাষ্ট্রদূত আগমন করেন। এই বর্ণনাকে হিউবাশম্যান তার গ্রন্থে যে ভাবে উল্লেক করেছেন। তা হল,

"তারা (মুসলমানগণ) সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই অঞ্চল আমাদের পিতামহ (হযরত ইবরাহীম (আ) এর বংশধরকে দান করেছেন। তুমি দীর্ঘদিন এ অঞ্চল অধিকার করে রেখেছ। একটি চুক্তির মাধ্যমে তা

১. ফাতুহুশ শাম লিল ওয়াকেদী, পৃঃ ৩-৪ এবং ফাতুহুশ শাম লিল আযদী, পৃঃ ৭ ও তারিখে ইবনে আসাকির ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।
২. তারীখে কাবীর হালাতে আবূ বকর (রা)।

www.pathagar.com

আমাদেরকে ফেরৎ প্রদান কর। অতঃপর আমরা তোমার রাজ্যে আসব না।[১] রোম সম্রাট তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, "এই রাজ্য হ'ল আমার, তোমাদের অংশ হল বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তোমরা সেখানে গিয়েই শান্তিতে বসবাস কর।"

বিভিন্ন গোত্রের অধৈর্য অবস্থা

এই চূড়ান্ত চেষ্টার পর হযরত আবূ বকর (রা) সৈন্যদের শৃংখলা এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হলেন। বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই হযরত আবূ বকর (রা) গভীর চিন্তা ভাবনা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতার সাথে অগ্রসর হন। ফলে সৈন্যদের রওয়ানা হতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। এতে ইয়ামন ও হিজাযের যে সমস্ত গোত্র জরফ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তারা অধৈর্য হয়ে উঠে। এমন কি কিছু দিন অতিবাহিত হলে পর তারা কায়েস ইবনে হাবীরাহ্ আল মুবাদীকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে আবেদন করে, 'আমাদের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হয় আমাদেরকে সিরিয়ায় প্রেরণ করুন, নতুবা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি দিন। হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমাদের পুংখানুপুংখ ব্যবস্থার জন্যই এই বিলম্ব হচ্ছে।[২]

মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস

সিরিয়ায় গমনকারী সেনাবাহিনীর একটি বৈশিষ্ট স্মরণ রাখার মত। আর তা হলো এই যে, এই বাহিনীতে ইয়ামন ও হিজাযের প্রখ্যাত বীর ও যুদ্ধ প্রিয় গোত্রসমূহ ছাড়াও বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরনের সাহাবায়ে কিরামদের সংখ্যা তিন শত পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া হযরত আকরামা ইবনে আবূ জেহেল যিনি কুন্দাহ্, হাযরামাউত, আম্মান প্রভৃতি স্থানে ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ দমন করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন তাঁকেও একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। হযরত আমর ইবনে আস (রা) ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ দমন করার পর কুদাআ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'এখন আপনি কি করতে চাচ্ছেন ?' তিনি উত্তরে বলেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আমি হলাম আল্লাহ্র তীর, যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করুন। অতএব তাকেও মদীনায় আগমনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৩]

সেনা বাহিনীর অগ্রযাত্রা

রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবূ বকর (রা) একটি টিলার উপর উঠে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করে

---

১. হুযুর (সা)-এর রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ২৮০।
২. ফাতুহুশ শাম ওয়াকেদী, পৃঃ ৬০।
৩. ওয়াকেদী, পৃঃ ৬।

www.pathagar.com

অত্যন্ত আনন্দিত হন। গোটা মুসলিম বাহিনীকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ এক হাযার সৈন্য দ্বারা গঠিত এবং গোটা বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল বলে ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন।[১] কিন্তু হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর-এর মতে গোটা বাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেক ভাগে তিন হাযার সৈন্য ছিল।[২] আমাদের মতে এটাই সঠিক। বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রত্যেক বাহিনী আগে পিছে রওনা হয়েছিল এবং কোন কোন ক্ষুদ্র বাহিনী আগে বেড়ে অপর একটি বিরাট বাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছিল। তাই আমীরদের সংখ্যা ও সৈন্যদের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত চারটি বাহিনীর মধ্যে ইয়াযিদ ইবনে আবূ সুফিয়ান এর বাহিনী ছিল সর্ব বৃহৎ। মক্কা ও ইয়ামনের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বাহিনী হযরত আবূ উবায়দা ইবনে জার্‌রাহ্‌র তৃতীয় বাহিনী হযরত আমর ইবনে আস (রা)-এর এবং চুতর্থ বাহিনী হযরত শারাহ্‌বীল ইবনে হাসনার নেতৃত্বাধীন ছিল। ঐতিহাসিকরা বাহিনীর সংখ্যা তিন বা চার বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, আমাদের মতে এর অর্থ বিশাল, অন্যথায় এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা চার হাযারেরও অধিক ছিল। হযরত আকরামা ইবনে আবূ জেহেল (রা)-এর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) সব বাহিনীকেই পৃথক পৃথকভাবে রওয়ানা করলেন এবং তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মদীনার বাহিরে পদব্রজে গমন করতেন। বিদায় জানানোর পূর্বে তিনি প্রত্যেক বাহিনীকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ ও উপদেশ দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে দু'আ করে তারপর বিদায় দিতেন। ঐ সব বাহিনীকে যেসব নির্দেশ প্রদান করা হত তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল এই যে, তারা সবাই একই রাস্তা দিয়ে গমন না করে যেন ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে গমন করে। এই প্রেক্ষিতে দামেশকে প্রেরিত ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে তাবুকের রাস্তায় গমন করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমর ইবনুল আস (রা) ফিলিস্তিনের যুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাকে ইলার রাস্তায় গমন করার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যান্য আমীররা যারা হিম্‌স্‌ ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা বালকার রাস্তা ধরে অগ্রসর হন। বালাযুরীতে বর্ণিত আছে যে, ত্রয়োদশ হিজরীর সফর মাসের ১লা তারিখ বৃহস্পতিবার দিন এই বাহিনী রওনা হয়েছিল।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য এই বার হাযার মুসলিম সৈন্য যথেষ্ঠ ছিল না। তাই হযরত আবূ বকর (রা) যখন অবগত হন যে, রোম সম্রাট অত্যন্ত ব্যাপক আকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তখন তিনি পরবর্তী সময়ে আরো সৈন্য

---

১. ফাতুহুশ শাম, পৃঃ ৬।
২. আল্ বিদায়া ওয়াননাহিয়া খণ্ড ৭, পৃঃ ৩।
৩. বালাযুরী, পৃঃ ১১৪।

www.pathagar.com

প্রেরণ করেন। বালাযুরীতে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বাধীন সাড়ে সাত হাযার মুজাহিদ ছিল। এভাবে ঐ যুদ্ধে প্রেরিত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চব্বিশ হাজার।[১] প্রকাশ থাকে যে, এখানেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা বাহিনীর সংখ্যা যদি তিন হয় তাহলে প্রত্যেক বাহিনীতে সাড়ে সাত হাযার সৈন্য থাকলেও মোট সংখ্যা চব্বিশ হাযার হয় না।

রোমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ প্রথম হতেই তীমা' নামক স্থানে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে লিপ্ত হতে বারণ করেছিলেন। অতএব যখন তিনি রোমান সৈন্যদের বিরাট সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেন তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে সে সম্পর্কে জানান। হযরত আবূ বকর (রা) তখন তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সাথে সাথে এই নির্দেশও দেন, 'রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পথে গমন করবে না। নতুবা শত্রু তোমার পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে।[২] কিন্তু খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) আবেগ ও উৎসাহের কারণে এই উপদেশের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। তাকে দেখে রোমানরা পিছু হটে যায়। তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। সে সময়ের প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা বাহান রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাহান দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দাকুসা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী মারজুস্ সুকুর নামক স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন এবং সে স্থানটিকে সেনা ছাউনীতে পরিণত করবেন। কিন্তু বাহানের ঐ পশ্চাৎমুখিতা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কূট-কৌশল ছাড়া কিছু ছিল না। কেননা খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) যেই মাত্র বুহায়রা-ই তাবারীয়ার পূর্ব দিকস্থ মারজুস সুকুরের নিকটবর্তী হন অমনি বাহান হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে মুসলিম বাহিনীকে পিছন দিক থেকে এমন ভাবে ঘিরে ফেলেন যে, তখন তার পিছনে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগই বাকি ছিল না। খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-এর পুত্র মুসলমানদের একটি দলের সাথে বাইরে কোথাও অবস্থান করছিলেন। বাহান সুযোগ পেয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করেন।

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ আপন পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এতই মর্মাহত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হন যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনার নিকটবর্তী জুলমারাওয়াহ নামক স্থানে ফিরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এটা অবগত হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)-কে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন যে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর তুমি তোমার অবস্থান পরিত্যাগ করবে না।

---

১. ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১১৫।
২. তারীখে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১, তাবারী ও ইবনে আসীর।

www.pathagar.com

তিনি পত্রে এটাও বলেন, "যদি আমি খালিদ ইবনে সাঈদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) ও আবূ উবায়দা (রা)-এর (উভয়ে খালিদকে আমীর নিযুক্ত করার বিরোধী ছিলেন) মতামত মেনে নিতাম তাহলে এই দিন আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হত না।[১]

মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গন

হযরত আবূ বকর (রা) মদীনা হতে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করে। আবূ উবায়দা দামেশ্কে শারাহবীল ইবনে হাসনা[২] তাবারীয়া ও জর্ডান নদীর উপকূলে ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান বালাকায় (যেখান থেকে তিনি সহজেই বসরা আক্রমণ করতে পারে) এবং আমর ইবনুল আস আরাবায় অবস্থান নিয়েছিলেন। এই বাহিনীগুলো পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করলেও তাদের নেতাদের মধ্যে পত্রালাপ ও পরামর্শের ক্রমধারা অব্যাহত ছিল। সাধারণ বর্ণনানুযায়ী এই মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট ত্রিশ হাযার।

রোমান সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ

রোম সম্রাট এই মুসলিম বাহিনীর সংবাদ অবগত হওয়ার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে আপন বাহিনীকে সজ্জিত[৩] করেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে কোন একটি রণাঙ্গনে একত্র হতে না দেওয়া। যেহেতু তাদের অসংখ্য সৈন্য ছিল তাই তাদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভক্ত হয়ে থাকলে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে না। এই প্রেক্ষিতে রোম সম্রাট প্রথম হিম্স্ আগমন করেন। সেখানে সিরিয়ার একটি বিরাট দুর্গ ছিল। তিনি সেখানে নিজের সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ এবং তাদের আসবাবপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যখন এ কাজ সম্পন্ন হয় তখন তিনি তার বাহিনীকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করেন।

১. নব্বই হাযার বীর যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক বাহিনী আমর ইবনুল আস (রা)-এর সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। ঐ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন রোম সম্রাটের সহোদর ভাই থিউডরস (Theodoroies)। এই নব্বই হাযারের মুকাবিলায় আমর ইবনুল আস (রা)-এর সৈন্য সংখ্যা সাত আট হাযারের অধিক ছিল না।

---

১. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৯।

২. শারাহ্বীল ইবনে হাসনা প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ (রা)-এর পক্ষ হতে ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছিলেন; কিন্তু এখানে সিরিয়ার যুদ্ধ সম্মুখে থাকায় হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে একদল সৈন্যের সাথে সোজাসুজি সিরিয়ায় প্রেরণ করেন।

৩. ইবনে আসীর লিখেছেন যে, হিরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট) প্রথমত রোমান নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় নেতাদেরকে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার পরামর্শ দেন। যখন ঐ সমস্ত লোক তাঁর কথা গ্রহণ করেন নি তখন বাধ্য হয়ে তাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮)।

www.pathagar.com

২. ষাট হাযার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় বাহিনী হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। ঐ দলের নেতৃত্বে ছিলেন পিটার (Peter)। আরব ঐতিহাসিকগণ তাকে ফীকার ইবনে নাসতূস বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবূ উবায়দার সৈন্য সংখ্যাও সাত আট হাযারের বেশী ছিল না।

৩. তৃতীয় দলটি সারজীস (Sergius)-এর নেতৃত্বে ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। আরব ঐতিহাসিকরা একে জারজাহ ইবনে তুযরা নামে উল্লেখ করেছেন।

৪. চতুর্থ দলটি দারাকুস-এর নেতৃত্বে শারাহবিল ইবনে হাসনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। শত্রুদের এই বিরাট সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ শুনে নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণে মুসলমানদের মনে কিছুটা আশংকার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সেনাপতিরা আমর ইবনুল আস (রা)-কে লিখেন, 'এখন কি করা যায় ?' আযদী লিখেছেন যে স্বয়ং আমর ইবনুল আস ও হযরত আবূ বকর (রা)-কে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন। তখন খলীফার পক্ষ থেকে উত্তর আসে, "তোমরা সবাই একত্র হয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী তৈরি কর, তোমাদের সংখ্যায় অল্প তার কারণে চিন্তা কর না, তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী, তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন।" অতঃপর সম্মিলিত বাহিনীকে ইয়ারমূকে একত্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ইয়ারমূকে সমাবেশ

ইয়ারমূক প্রকৃতপক্ষে একটি নদীর নাম যা হুরানের পাহাড় হতে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জর্ডান নদী এবং মৃত সাগরে (Dead Sea) পতিত হয়েছে। এই নদী যেখানে জর্ডান নদীর সাথে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে ত্রিশ অথবা চল্লিশ মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম দাকুসা, এই স্থানটি একটি বিস্তীর্ণ নিম্ন এলাকায় অবস্থিত এবং তিন দিক থেকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেহেতু এটা একটা বিস্তীর্ণ এলাকা তাই রোমানরা এটাকে তাদের হেড কোয়ার্টার হিসেবে নির্বাচন করে।

রোমানরা এখানে পৌঁছে মুসলমান সৈন্যদের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হয়। মুসলিম বাহিনী ইয়ারমূক নদীর ডান দিক দিয়ে রোমানদের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করে। রোমান বাহিনী তিন দিক থেকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাদের সম্মুখে যে পথটি ছিল তার উপর মুসলিম বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং আমর ইবনুল আস (রা) এই কুদরতী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং মুসলমানদেরকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময় রোমান বাহিনী তাজারক (থিউডরস)-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন সারজীস, ডানে ও বামে বাহান ও দারাকুস এবং রণাঙ্গনের ইনচার্জ ছিলেন পিটার।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেনাপতি মনোনীত

মুসলিম ও রোমান বাহিনী দু'মাস পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে থাকে। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া উন্মুক্তভাবে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। হযরত আবূ বকর (রা) এ সংবাদ শুনে চিন্তিত হন। তিনি ইরাকে মুসান্নাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-কে তৎক্ষণাৎ সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

যদিও হযরত খালিদ (রা) হিরায়, মাদায়েন আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু খলীফার নির্দেশের দরুন সিরিয়ার রণাঙ্গনের গুরত্ব তাঁর কাছে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় সিরিয়া রওয়ানা ছাড়া তার গত্যন্তর[১] ছিল না।

এখানে কোন কোন ঐতিহাসিকদের ধারণা এই যে, হযরত খালিদ (রা)-কে শুধু সিরিয়ার যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁকে সেখানে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়নি, এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা সিরিয়ার রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীতে যে অভাব ছিল তা ছিল হযরত খালিদ (রা)-এর মত প্রখ্যাত সেনাপতিরই অভাব। আর সে অভাব পূরণের জন্যই হযরত খালিদকে ইরাক হতে সিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাবারীতে উল্লেখ আছে যে, উক্ত নির্দেশনামায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশটিও ছিল ঃ[২]

سر حتى تأتي الجموع من المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا أو اشجوا –

"তোমরা রওনা হয়ে যাও এবং ইয়ারমূকে যে সমস্ত মুসলমান সমবেত হয়েছে তাদের সাথে একত্র হও। কেননা তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে আছে।"

এ ছাড়াও আবূ ইসমাঈল আযদী হযরত খালিদ (রা)-এর নামে প্রেরিত হযরত আবূ বকর (রা) পত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা সেখানে পৌঁছবে এবং লোকজনের সাথে একত্র হবে তখন তুমিই হবে দলের নেতা।[৩]

আল্লামা ওয়াকিদীর "ফুতুহুশ শাম" (পৃঃ ৪০) গ্রন্থে এর চেয়ে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে সিরিয়ায় প্রেরিত সমগ্র সেনাবাহিনীর এবং হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহর আমীর বা নেতা হিসেবে প্রেরণ করেন।" তাবারীর একটি বর্ণনায় একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট সিরিয়ার আমীরদের সেই কথাটি

---

১. সিরিয়া রওনার সময় হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে কতজন সৈন্য ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবেদ রয়েছে, কেউ বলেন নয় হাযার, কেউ ছয় হাযার, কেউ আট শত, কেউ ছয়শত, আবার কেউ পাঁচশত। (ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৯) বালাযুরি আটশত হতে পাঁচশত পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। (পৃঃ ১১৬) আমাদের মতে এটাই সঠিক। কেননা সিরিয়ার রণাঙ্গনে শুধু হযরত খালিদ (রা)-এর মত একজন প্রধান সেনাপতির প্রয়োজন ছিল। সেখানে সৈন্যও যথেষ্ট ছিল এবং মদীনা হতেও আরো সৈন্য আসার সম্ভাবনা ছিল। এ ছাড়া হযরত খালিদ (রা) যখন ইরাক হতে যাচ্ছেন তখন সেখানে বেশীর ভাগ সৈন্য থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক।

২. ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০২।

৩. ফুতুহুশ শাম, পৃঃ ৫৮।

www.pathagar.com

পৌঁছে যাতে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছিল, তখন সেগুলো পাঠ করেই হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, خالد لها এই যুদ্ধ তো হযরত খালিদ (রা)-এর দ্বারাই সম্পন্ন হবে।[১]

হযরত খালিদ (রা)-এর অগ্রযাত্রা

হযরত খালিদ (রা) রওয়ানা হয়ে প্রথমে সিরিয়ার মরুপ্রান্তরের ফুরাত উপত্যকা সংলগ্ন এবং দামেশ্‌ক হতে দেড়শো মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত তাদ্‌মির নামক স্থানে উপনীত হন। পথিমধ্যে তাকে পানির অভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং কোন কোন গোত্রের সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে হয়। তিনি তাদ্‌মির হতে সানীয়াতুল উকাব[২] এবং সেখান থেকে সিরিয়ার নিম্নাঞ্চলের মরগে রহিত নামক স্থানে পৌঁছেন। অতঃপর সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বসরায় উপনিত হন।

দামেশ্‌ক হতে পনের মাইল দূরে অবস্থিত মরগ রহিত ছিল খৃস্টান ধর্ম গ্রহণকারী গাস্‌সানীদের একটি বিরাট কেন্দ্র। হযরত খালিদ (রা) হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে বসরায় গিয়ে পৌঁছেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে হযরত সারাহবিল ইবনে হাসনা ও হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান ঐ শহরটিকে অবরোধ করে রেখেছিলেন কিন্তু তখনও জয় করতে পারেন নি। হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, রোমানদের প্রধান সেনাপতি রোমানস (Rumanus) পিছু হটে বসরা শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই সাথে শহরটি বিজিত হয়।

ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী, রোমান্স পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। একজন আরব পয়গাম্বরের হাতে যে রোমানদের পতন হবে একথা তিনি পূর্ব হতেই জানতেন। সুতরাং তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে খোদ মুসলমান হওয়ার আশায় ছিলেন। কিন্তু যখন তার গোত্র একথা জানতে পারল তখন তারা তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত জীবনাশংকায় বাধ্য হয়ে তিনি রোমানদের সাথে হযরত খালিদ (রা)-এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। অবশ্য পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের খিদমতে উল্লেখযোগ্য অবদানও রাখেন।

আবূ ইসমাঈল আযদী, বসরার রোমান সেনাপতির নাম দারনাজার লিখেছেন এবং রোমানদের সংখ্যা পাঁচ হাযার এবং মুসলমানদের সংখ্যা এক হাযার বলে উল্লেখ করেছেন। বসরা বিজয়ের পূর্বে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল তিনি সেইগুলোরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৩]

---

১. তাবারীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৯।

২. উকাব ছিল হযরত খালিদ (রা)-এর পতাকার নাম। তিনি সেখানে তার পতাকা স্থাপন করেছিলেন বলে ঐ স্থানের নাম 'সানীয়াতুল উকাব' হয়ে যায়।

৩. ফাতুহুশ শাম, পৃঃ ৭১-৭২।

www.pathagar.com

আজনাদায়নের যুদ্ধ

বসরা বিজয়ের পর হযরত খালিদের দামেশ্‌কের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি সংবাদ পান যে আজনাদায়নে রোম সম্রাট একলাখ সৈন্যের এক বাহিনী একত্র করেছেন। এছাড়া খৃস্টান ধর্মের নেতৃবৃন্দ, পাদ্রী এবং বিশপগণ সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আজনাদায়নে আসছে। এই সংবাদ পেয়ে হযরত খালিদ (রা) বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর আমীরদেরকে আজনাদায়ন-এর রণাঙ্গনে এসে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁর কিছু সাথীদের নিয়ে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে সহস্রাধিক দামেশ্‌কবাসী পিছন দিক থেকে তাদেরকে আক্রমণ করেন। হযরত খালিদ (রা) এই সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং রোমানদেরকে দামেস্কের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

সেখান থেকে হযরত খালিদ (রা) যখন আজনাদায়ন পৌঁছেন ঠিক তখনি দরদান নামক একজন প্রখ্যাত রোমান সেনাপতি একটি বাহিনী নিয়ে আজনাদায়নে এসে পৌঁছেন। অপর দিকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান এবং শারাহ্‌বিল হাসনা (রা) নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ (রা) আহ্বানে আজনাদায়নে এসে উপস্থিত হন।

এবার হযরত খালিদ (রা) সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। তিনি প্রত্যেকটি দলের কাছে গিয়ে তাদেরকে জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। মুসলিম মহিলারাও ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে পুরুষদের পিছনে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল "যদি কোন মুসলমান রণাঙ্গন থেকে তোমাদের নিকট দিয়ে পলায়ন করে তা হলে তোমরা তাকে বুঝাবে এবং পরাজয়ের অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।"

সাধারণত যোহরের নামাযের পর যুদ্ধ শুরু করা হুযূর (সা)-এর রীতি ছিল। হুযূর (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ করেই হযরত খালিদ (রা) যোহর পর্যন্ত যুদ্ধ মূলতবী রাখতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু রোমানরা আগে বেড়ে আক্রমণ করে বসে। মুসলিম বাহিনীর ডানে ছিলেন হযরত মু'আয ইব্‌নে জাবাল (রা) এবং বামে ছিলেন হযরত ওমর (রা)-এর ভাইপো হযরত সাঈদ ইব্‌নে যায়েদ (রা)। রোমানরা মুসলিম বাহিনীর উভয় দিকে এমন প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুজাহিদদের ঘোড়াগুলো লাফাতে শুরু করে এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। হযরত খালিদ (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং সে আক্রমণের নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত খালিদ (রা)-এর

www.pathagar.com

আক্রমণের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী প্লাবনের মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার পলায়ন ছাড়া শত্রুদের আর কোন উপায় থাকল না। অবশেষে তারা হিম্‌স ও দামেশকে আশ্রয় গ্রহণ করে। রোমানদের প্রধান সেনাপতি থিউডর্‌স্‌ পলায়ন করে হিম্‌সে্‌ আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোম সম্রাট (কায়সার) পূর্ব হতে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি থিউডরসকে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে পদচ্যুত করেন এবং এই অবস্থায়ই থিউডরসের মৃত্যু হয়। আবূ ইসমাঈল আযদীর বর্ণনা মতে, সে যুদ্ধে, তিন হাযার রোমান সৈন্য মৃত্যুবরণ করে, এবং মুসলমানদেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত[১] হয়। বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধ ১৩ হিজরীর ১৮ই জামাদিউল উলা বা ২রা জামাদিউল উখরা তারিখে সংঘঠিত[২] হয়। কিন্তু আবূ ইসমাঈল আয্‌দীর বর্ণনা অনুযায়ী, আজনাদায়েনের সর্ববৃহৎ যুদ্ধটি ১৩ হিজরীর ২৮ সে জামাদিউল আউয়াল দ্বিপ্রহরের সময় সংঘঠিত হয়।

হযরত আবূবকর (রা)-এর নামে হযরত খালিদ (রা)-এর পত্র

বিজয় লাভের পর হযরত খালিদ (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাম্বল জাময়ী এর মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন, "আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘঠিত[৩] হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনী আজনাদায়ন নামক স্থানে একত্র করে এবং শপথ গ্রহণ করে যে, রণাঙ্গনে থেকে কখনো পলায়ন করবে না এবং আমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করে তবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাদের' বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি। তা প্রথমত তীর দ্বারা, পরে তরবারীর সাহায্যে যুদ্ধ করি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জয়ী করে তার অঙ্গীকার পূরণ করেন।

এটা হল হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্‌তিকালের চব্বিশ দিন পূর্বের ঘটনা। তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর উপরোক্ত পত্র পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এবং বলেন, "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র, যিনি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয়ের ঐ আনন্দে আমার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করেছেন।[৪] "

আজনাদায়ন যুদ্ধের পর কি হয়েছিল ? এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আবূ ইসমাঈল আযদীর মতে, অতঃপর হযরত খালিদ (রা) দামেশ্‌কে গিয়ে শহর অবরোধ করেন, কিন্তু তা জয়ের পূর্বেই হযরত আবূ বকর (রা) ইন্‌তিকাল করেন। কিন্তু বালাযুরীর বর্ণনা হল, আযনাদায়েনের পর রোমানরা দাকুসা (বালাযুরীতে ইয়াকুসা

---

১. ফাতুহুশ শাম, পৃঃ ৭৪-৭৯।

২. ফাতুহুল বুলদান, পৃঃ ১২০।

৩. রোমানরা প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে মুশরিক বলেছেন এজন্য যে, এরা প্রকৃত খৃস্টানধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে ইবনুল্লাহ্‌ (আল্লাহর পুত্র) বলছে এবং একত্ববাদের পরিবর্তে তিন আল্লাহ্‌র দাবী করছে

৪. ফুতুহুশ শাম, আযদী, পৃঃ ৮১।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে) নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। হযরত খালিদ (রা) এই সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর দাকুসা পৌঁছে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। রোমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং সিরিয়ার প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বালাযুরীর বর্ণনা মতে, মুসলিম বাহিনী দাকুসা অবস্থানকালেই হযরত খালিদ (রা) খলীফার মৃত্যুর সংবাদ পান।[১]

একটি আলোচনা

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় যে সমস্ত বিজয় সূচিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। এমনকি এতেও মতানৈক্য রয়েছে যে, ইয়ারমূকের ঘটনা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সংগঠিত হয়েছিল, না হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে? তাবারী এবং ইবনে আসীর ইয়ারমূক-এর ঘটনা আজনাদায়নের পূর্বের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আযদী, ওয়াকিদী ও বালযুরীর মতে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় যে বিরাট যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তা হলো আজনাদায়ন-এর যুদ্ধ। ইয়ারমূকের ঘটনা ১৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

আমাদের মতে প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত খালিদ (রা)-এর ইরাকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রোম সম্রাট তার সেনাবাহিনীকে ইয়ারমূকের নিকটবর্তী দাকুসাহ্ নামক স্থানে একত্র করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে এখানে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে সিরিয়ার ভাগ্য পরীক্ষা করা। মুসলিম ও রোমান বাহিনী প্রায় দু'মাস পর্যন্ত পরস্পরকে সামনে রেখে সেখানে অবস্থান করে। এই সময়ে সাধারণ বা ক্ষদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারে কোন যুদ্ধ হয় নি।

হযরত আবূ বকর (রা) এই অবস্থায় মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তিনি ইরাকের রণাঙ্গন মুসান্নার হাতে সোপর্দ করে হযরত খালিদ (রা)-কে সিরিয়া অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ অবিলম্বে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং হযরত খালিদ (রা) তাতে জয়লাভ করে দক্ষিণ পূর্ব দিক হতে সিরিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি উপলব্ধি করেন যে, রণ-কৌশলের দৃষ্টিতে দাকুসাকে (ইয়ারমূক) রণাঙ্গন নির্বাচন করা সঠিক হবে না। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই স্থানটি তিনদিকে পাহাড় বেষ্টিত ও একদিকে উন্মুক্ত ছিল। এটা প্রত্যক্ষ করে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন এবার শত্রুরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটাছিল হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) জানতেন যে, শত্রুদেরকে এভাবে ঘেরাও করা বিশেষ করে যখন তারা অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে এসেছে—বুদ্ধিমত্তার

১. ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ১২।

www.pathagar.com

কাজ হবে না, বরং সর্বদা শত্রুদের পলায়নের পথ খোলা রেখে যুদ্ধ করা উচিত। তাই হযরত খালিদ (রা) প্রথমত দাকুসার পরিবর্তে দামেশ্ক অভিমুখে রওনা হন। এবার রোমানদের রাস্তা দাকুসায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনী স্থানান্তরিত হওয়ায় রোমান বাহিনী আজনাদায়নে দুর্গ স্থাপন করে এবং সমস্ত সৈন্য সেখানে নিয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা) এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর দামেশ্ক ত্যাগ করে আজনাদায়নে চলে যান। পরবর্তী ঘটনা তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমতা বিধান করা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়নি, বরং সেখানে তখন উভয় দিকের সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল মাত্র। এ সময়ে সিরিয়ার আজনাদায়নের যুদ্ধ ছিলই সর্ববৃহৎ। ইয়ারমূকের যে ঘটনাকে তাবারী হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালের বলে ইঙ্গিত করছেন তাতে দাকুসার সৈন্য সমাবেশকে ইয়ারমূকের যুদ্ধ মনে করা হয়েছে। প্রকৃত যুদ্ধের উপর যাদের দৃষ্টি রয়েছে তারা ইয়ারমূককে ১৫ হিজরীর ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন।[১] আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

ইরাকে বিদ্রোহ

হযরত খালিদ (রা) ইরাক হতে রওয়ানা হওয়ার পর মুসান্না ইবনে হারিসা বিভিন্ন এলাকায় দুর্গ স্থাপন করেন। স্থানে স্থানে গোয়েন্দা নিয়োজিত করে তিনি নিজে হিরায় অবস্থান করেন। ময়দান শূন্য মনে করে ইরানীরা সাহসী হয়ে উঠে। এদিকে ইরানে কিছুদিন বিশৃংখলা চলার পর শহর[২] ইয়ারাজবন আরদেশীর ইবনে শাহ্রিয়ার-এর শাসনাধীনে সকল ইরানী ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে ইরানে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরই ভিত্তিতে ইরানের সম্রাট, হারমুয জাদুবিয়ার নেতৃত্বে দশ হাযার সৈন্য হযরত মুসান্না (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইরানী বাহিনীর সাথে হাতীও ছিল। আর হাতীর সাথে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আরবদের এই প্রথম। শত্রু বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার পর বিভিন্ন দুর্গে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদেরকে হযরত মুসান্না একস্থানে জমা করেন। তিনি আপন ভাই মায়ানী এবং মাসউদকে বাহিনীর দু'দিকে নিয়োজিত করেন এবং বাবেল নামক

---

১. এবার যখন সিরিয়া বিজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত হচ্ছে তখন এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অধ্যায় লিখার সময় ফুতুহুশ শাম যা ওয়াকেদীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাও আমাদের সামনে ছিল। এই গ্রন্থটি স্যার উইলিয়াম নাসারলীস যিনি স্প্রেঙ্গার এর পর ১৮৫৭-১৮৭০ খৃঃ পর্যন্ত কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এর সম্পাদনা করেন। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি এটা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা এই গ্রন্থের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ কিছু পাইনি। তাছাড়া এ বিষয়ে অকাট্য কোন প্রমাণ নেই যে, এই গ্রন্থটি প্রকৃত পক্ষে ওয়াকেদীর লিখিত। যদিও প্রমাণ পাওয়া যায় তবুও এতে এরূপ প্রচুর কাহিনী রয়েছে যা শুধু কাহিনীর শোভা বর্ধনে কাজে লাগতে পারে, ইতিহাসের মূলধন হতে পারে না।

২. এই নামটি বিভিন্নভাবে লিখা হয়েছে শহর বাজান, শহর বাজার, শহর বারাজ এবং শহর ইয়ারান।

www.pathagar.com

স্থানে দুর্গ স্থাপন করেন। এখানে হযরত মুসান্না (রা) ইরান সম্রাটের পক্ষ হতে একটি পত্র পান। এতে তিনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যে বাহিনী প্রেরণ করেছি তারা হল মুরগী ও শূকরের রাখাল। তোমাদের মর্যাদা অনুযায়ীই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের লোক প্রেরণ করেছি।' হযরত মুসান্না (রা)-এর উত্তরে লিখেন, "তুমি হয়ত বিদ্রোহী অথবা মিথ্যাবাদী। যদি বিদ্রোহী হও তা হলে এর পরিমাণ তোমার জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আমাদের জন্য উত্তম। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট যে সব মিথ্যাবাদীর জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে তারা হল মিথ্যাবাদী বাদশাহ।

এখন রইলো মুরগী ও শূকর রাখালদের কথা। তোমার নিকট এধরনের নীচু প্রকৃতির লোক থাকায় আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই উত্তর পেয়ে ইরান-সম্রাট অত্যন্ত চিন্তান্বিত হন। এদিকে ইরানীরা সম্রাটের পত্রের বিষয়বস্তু জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং সম্রাটকে বলে, 'আপনি এরূপ পত্র না লিখলে আপনাকে এরূপ কথা শুনতে হত না।' তারা সম্রাটকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'ভবিষ্যতে আপনি যাদের সম্পর্কে কোন পত্র লিখবেন তাদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করবেন।

বাবেল নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। হারমুযের হাতী যে দিকে রওয়ানা হত মুসলিম বাহিনী সেদিকে বিশৃংখলা হয়ে যেত। হযরত মুসান্না (রা)-এর জন্য এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। অবশেষে তিনি সকল মুসলমানদেরকে একত্র করে একই সময় সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে হাতীগুলো মারা পড়ে এবং ইরানী বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী মাদায়েন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। যে সমস্ত ইরানী গ্রেফতার হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়, এই যুদ্ধের ঘটনাকে কবি আবদাহ্ ইবনে তাবীব আস'আদী নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

حلت خويلة في حي عهدهم + دون المدائن فيها الديك والفيل

يقارعون رؤس العجم ضاحية + منهم فوارس لا عزل ولا ميل

প্রখ্যাত আরব কবি ফারাজদাকেরও একটি কবিতা রয়েছে, যাতে তিনি হযরত মুসান্না (রা)-এর হাতে ইরানীদের হাতী নিহত হওয়ার ঘটনাটি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة + ببابل إذ في فارس ملك بابل

শহরইয়ারাজ এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবার ইরানীরা ইরান সম্রাটের কন্যাকে বাদশাহ্ মনোনীত করেন। কিন্তু অনুপযুক্ততার দরুন তাকে অচিরেই পদচ্যুত করা হয়। অতঃপর সাবুর ইবনে শহরইয়াজার সম্রাট হন। সাবুর মন্ত্রীত্বের জন্য ফরখযাদকে মনোনীত করেন এবং তার উপর এত অনুগ্রহ করেন যে,

www.pathagar.com

ইরান সম্রাটের কন্যা আযারমীদখ্তকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন। আযারমীদখ্ত-এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, "কি ভাই, আপনি আমাকে আমার গোলামের সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন? কিন্তু সাবুর এদিকে দৃষ্টিপাত না করে আযারমীদখ্তকে কটূক্তি দ্বারা থামিয়ে দেয়।

সায়াদখাশ আরবাযী নামে একজন ইরানী ছিল। সে ছিল সাংঘাতিক হামলাবাজ। আযারমীদখ্ত তার সাথে ষড়যন্ত্র করে। বিয়ের রাতে যখন ফরখ্যাদ আযারমীদখ্ত এর কামরায় প্রবেশ করে তখন সায়াদখাশ হঠাৎ গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে ফরখযাদকে আক্রমণ করে হত্যা করে। এরপর সায়াদখাশ, আযারমীদখ্ত এবং তার সাথীগণ সাবুর-এর অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাকেও হত্যা করে এবং তার স্থানে আযারমীদখ্তকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

হযরত মুসান্না (রা) এই গোলযোগ ও বিশৃংখলার সংবাদ পেয়ে স্বস্তি লাভ করেন। অবশ্য আজ যে অবস্থা বিরাজ করেছে আগামীকাল তা নাও থাকতে পারে। তাই এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি স্বীয় বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং ইরানের রাজধানী মাদায়েনের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছান। কিন্তু তার সাথে যে সৈন্য ছিল তারা মাদায়েন জয় করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি হযরত আবূ বকর (রা)কে সাহায্য প্রেরণের জন্য পত্র লিখেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) কি করবেন? তখন সমস্ত মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত। শেষ পর্যন্ত খলীফার দরবারে থেকে কোন উত্তর এল না। এই নিস্তব্ধতার কারণে হযরত মুসান্না (রা) বিচলিত হয়ে নিজেই মদীনা পৌঁছেন। এখানে এসে দেখেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত অসুস্থ এবং তার সুস্থ হওয়ার তেমন কোন আশাই নেই। এতদসত্ত্বেও তিনি হযরত মুসান্না (রা)-কে কাছে ডেকে নিয়ে ইরাক রণাঙ্গনের ঘটনা শ্রবণ করেন। সাথে সাথে তিনি হযরত ওমর (রা)-কেও ডেকে পাঠান। কেননা ঐ সময় তিনি হযরত ওমর ফারুক (রা)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে ছিলেন। হযরত ওমর (রা) উপস্থিত হলে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, "হে ওমর (রা) আমি যা কিছু বলছি তা শুনুন এবং এর উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমার মনে হয় আমি আজই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করব। যদি বাস্তব ঘটনা তাই হয় তা হলে সন্ধ্যার পূর্বেই মুসান্নার সাথে লোকজন প্রেরণ করুন। যদি আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তা হলে ভোর হওয়ার পূর্বেই এ কাজটি করবেন। অতঃপর তিনি উপদেশ প্রদান করে বলেন, 'বিপদ যত বিরাট হোক তা কেন, দীনের কাজ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন থেকে বিরত হবেন না।' তিনি ওসীয়ত করেন যে, সিরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যেন হযরত খালিদ (রা)-কে ইরাকে ফিরিয়ে আনা হয়।[১]

অতঃপর ইরাকে যে সব বিষয়ের ঘটনা ঘটেছে তা হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের কালেই ঘটেছে। তাই সেগুলো আমাদের এই আলোচনা বহির্ভূত।

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ২৮৬।

www.pathagar.com

বিজয়ের কারণসমূহ

ইরাক ও সিরিয়ার বিজয়ের ঘটনা পাঠ করার পর স্বাভাবিকভাবে একজন ইতিহাস পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হতে পারে যে, ইরান ও রোম ঐ যুগে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং উন্নত সাম্রাজ্য ছিল। ধন-সম্পদ, জাঁকজমক সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে উক্ত দু'টি সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই হতে পারে না। সিরিয়ার যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৬ হাযার এবং তার বিপরীতে শত্রুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ। অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে উভয় বাহিনীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। প্রত্যেকটি ইরানী ও রোমান সৈন্য জর্রাহ্ বকতর, চালতা, জুশ্রান, চারআয়না, আহেনী দাস্তানে, মৌজে, জাহ্লাম, বরগাসতাওয়া, গোপাল, গুর্জ, তেগ, সেফর, দরফাহ্, খঞ্জর, জদবীন, তীর, খন্দক, কমন্দ, সিনান ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহ্নামা' হতে জানা যায়। কিন্তু এর বিপরীতে মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল,? তাদের নিকট চামড়ার তৈরী এবং লোহার পরিবর্তে লাকড়ীর তৈরী রেকাব ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আরব তরবারি, নেজা এবং ছোট খঞ্জর ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। ঘোড়া ছিল কিন্তু অধিকাংশ ঘোড়ার জিন বা গদি ছিল না। উক্ত দুটি সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও তাহ্যীব-তামাদ্দুনের যখন এই অবস্থা, তখন এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে, কয়েক হাযার অস্ত্রশস্ত্রহীন মরুবাসী আরব মরুভূমি হতে বের হয়ে উভয় সাম্রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দিল, রোম ও ইরানের জাঁকজমকপূর্ণ রাজ প্রসাদ ধূলায় ধূসরিত হলো, তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব কালীমা লিপ্ত হলো তাও আবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে।[১]

পাশ্চাত্যের লোকদের মতে বিজয়ের কারণসমূহ

পাশ্চাত্যের লেখকরা বিজয়ের যে সমস্ত কারণ বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ভন ক্রিমার বলেন, "আরব, ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তে যে সমস্ত আরব গোত্র বাস করত তারা তাদের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যের সাথে পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বগোত্রীয় আরবদের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ দেখতে পায়। তাছাড়া এতে মালে গনীমতে অংশীদার হওয়ার সুযোগও রয়েছে। দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ায় প্রবেশ করার পর স্থানীয় আরবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা একটি বিচ্ছুরণশীল অগ্নির পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।"[২]

---

১. বিজয়ের পূর্ণতা যদিও হযরত ওমর (রা)-এর সময় হয়েছিল যাতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরান ও রোমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে আক্রমণ হয়েছিল যার দ্বারা পরিমাপ করা সহজ ছিল না।

২. The Orient Under the Caliphs, page 97.

www.pathagar.com

"আরবদের বিজয়ের আরও বহু কারণ রয়েছে। এর অর্থনৈতিক কারণ এই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর এক শতাব্দী পূর্বেই আরবদের কৃষি পদ্ধতি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও দুর্বল ছিল। তাই সেখানকার শস্য উৎপাদন ভয়ানকভাবে হ্রাস পায়। ইরাক ও সিরিয়ার উর্বর ও শ্যামল ভূমি জয় করার একটি প্রেরণা আরবদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ এই ছিল যে, রোমান ও ইরানী উভয় রাজ্য পরস্পর যুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রজাদের উপর বিরাট বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই অসন্তোষ শুধু শহরবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী লোকের কোন অভাব ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, এই পবিত্র যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। এছাড়া আরব মুসলমানরা অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। আরব সৈন্য শৃংখলা ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিল। তাদের নেতা ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ও উপযুক্ত।"[১]

প্রফেসর ফ্লিউলী এন্ড ওয়েচ (prof fleuley & weech) একটি নতুন ধর্ম (ইসলাম) আরবদের পরস্পর ঐক্য, নেতৃত্ব ও বিজয়ের ক্ষেত্রে বিরাট প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। উপরোক্ত বিজয়ের আরো কিছু কারণ রয়েছে। যেমন সিরিয়ার আরবদের সাথে হেজাযের আরবদের গোত্রীয় সম্পর্ক ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে রোমান ও ইরানী রাজ্যের দুর্বল হয়ে পড়া, অপরাপর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, রোমান সাম্রাজ্যই ধর্মীয় মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠা ইত্যাদি। আর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, আরবরা ছিল অত্যন্ত নিপুণ যোদ্ধা এবং সহনশীল জীবন যাপনে অভ্যস্থ।[২]

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত লেখক এইচ, জি, ওয়েলস লিখেছেন ঃ

"যদি তোমরা এই ধারণা করে থাক যে, ইসলামের গতি প্রবাহ ইরানী রোমান, গ্রীক বা মিসরীয় সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাহলে এই চিন্তাধারাকে যত শীঘ্র মন থেকে দূরীভূত করবে ততই মঙ্গল। ইসলামের বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভের কারণ ছিল এই যে, এটা ঐ যুগের একটি উত্তম সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি ও পদ্ধতি ছিল। ইসলাম একটি প্রশস্ত সজীব এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে। সে এমন একটি উত্তম নীতিমালা পেশ করেছে যা আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারে নি। রোমান সাম্রাজ্যের অর্থ কুক্ষিগত করে রাখার নীতি, দাস সৃষ্টির নীতি, ইউরোপীয় সংস্কৃতি সব কিছুই ইসলামের অগ্রগতি ও উন্নতির সামনে পরাজিত হয়ে বিলিন হয়ে যায়।[৩]

---

১. The Age of Faith, page 188.
২. ওয়ার্ল্ড হিস্টরী।
৩. History of the World, page-329.

www.pathagar.com

প্রফেসর ফিলিপ কে, হিট্টি বলেন,

"ইসলামের যুদ্ধের আওয়াজ এরূপ ছিল যেমন পৃথিবীর দু'টি মহাযুদ্ধের সম্মিলিত জনগণের আওয়াজ। ইসলাম ঐ সমস্ত গোত্রের মধ্যে এরূপ ঐক্য সৃষ্টি করে যা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি। যদিও মুসলমানদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেকটা ইসলামের প্রচার প্রসার ও বেহেশ্ত লাভের প্রেরণার উপর নির্ভরশীল ছিল, তবু স্বীয় মাতৃভূমি দর্শন করে আনন্দ লাভ করার আশা অনেক মুসলমানের অন্তরে দোলায়িত হত এবং এ থেকেও তাদের অন্তরে জিহাদের প্রেরণা আন্দোলিত হত।"[১]

বিজয়ের মূল কারণ

প্রতীচ্য লেখকদের উপরোল্লিখিত মন্তব্যগুলো সঠিক না হলেও সত্য হতেও সম্পূর্ণ দূরেও নয়। মুসলিম লেখকবৃন্দ বিশেষ করে প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যদি কোন প্রতীচ্য লেখক মুসলমানদের কোন অস্বাভাবিক বিজয়ের কারণ অর্থনৈতিক বলে নির্ধারণ করেন তাহলে তারা ক্ষেপে যান। অথচ স্বয়ং সাহাবা কিরাম (রা)-এর জীবন পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নতুন আবাদীর জন্য এবং একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণ যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর হয়ে থাকে।

ওয়ালজার যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) যে বক্তব্য পেশ করেন সে সম্পর্কে তাবারী লিখেছেন ঃ

وقام خالد في الناس خطيبا يرغبهم في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب –

"হযরত খালিদ (রা) বক্তৃতা প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে লোকদেরকে আযমী (অনারব দেশসমূহ)-এর প্রতি উৎসাহিত এবং আরবের দিকে নিরুৎসাহিত করেন।"

তিনি ইরাকের সবুজ শ্যামল মাঠের উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা কি দেখ না যে, সেখানে মাটির গোলার মত খাদ্যের স্তুপ রয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! যদি আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং লোকদেরকে তাদের দীনির দিকে আহ্বান করা না হত বরং শুধু জীবিকা অর্জন হ'ত তা হলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অভিমত হত 'আমরা এই শস্য শ্যামল এলাকার জন্য যুদ্ধ করব, আমরা এর মালিক হ'ব এবং ক্ষুধা ও খাদ্যভাব ঐ লোকদের জন্য ছেড়ে দেব যারা আলস্য ও দুর্বলতার জন্য আমাদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে নি।

এমনিভাবে একবার হযরত জাবীর ইব্নে আবদুল্লাহ্ বিজলী (রা) স্বীয় গোত্রের সাত শত লোক নিয়ে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, "আমরা সবাই সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক। সেখানে আমাদের

---

১. History of Sayria, page-419-পাশ্চাত্যের লেখকদের যে উদ্ধৃতি উপরে বর্ণিত হয়েছে তা ডাঃ আতা মুহিউদ্দীন তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ "আবূ বকর (রা) সংকলিত করেছেন। আমরা এই গ্রন্থ থেকেই উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করেছি।

www.pathagar.com

পূর্বপুরুষ ছিল এবং বর্তমানে তাদের বংশধররা রয়েছে।[১] হযরত ওমর (রা) বলেন, 'তোমরা সিরিয়ায় অবস্থান করে কি করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মান-মর্যাদা হ্রাস করে দিয়েছেন। হাঁ, তবে ইরাক যাও, ইরাকবাসী এবং ঐ সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যারা জীবনের সকল উপকরণ নিয়ে সেখানে বাস করছে। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে ঐ সমস্ত জীবিকার উপকরণে তোমাদেরকে তাদের অংশীদার করে দেবেন এবং তোমরা তাদের সাথে জীবন যাপন করতে পারবে।"[২]

এ ছাড়া এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, ঐ যুগে ইরান ও রোম উভয়ের নৈতিক চরিত্রে চরম অবনতি ঘটে। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের লোকজনে জনসাধারণকে জুলুম নির্যাতন করা এবং তাদের উপর বেশী বেশী টেক্স ধার্য করাকে নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করত। ইরানে মুযদাফী শিক্ষা এবং সিরিয়ায় খৃস্টান ধর্মের বিকৃতি এবং ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতা লোভী আচরণ দেশব্যাপী পাপ ও অশ্লীলতাকে সাধারণ করে দিয়ে ছিল। এর বিপরীতে প্রত্যেকটি আরব মুসলমান ছিল উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাছাড়া ঘুণে ধরা সমাজের সংস্কারের জন্য মুসলমানদের মত একটি মানবতাবাদী জাতির উত্থানের সময় তখন হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ - فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। যখন ঐ সময় পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন একটি মুহূর্তও অগ্রপশ্চাৎ হতে পারবে না।"

এ সমস্ত নৈতিক ও চারিত্রিক কারণসমূহ ছাড়াও বিষয়টির সাথে যতটুকু বস্তুগত সম্পর্ক রয়েছে তাতে একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, উপরোক্ত বিজয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর অসাধারণ বীরত্ব, সৈন্য পরিচালনার আশ্চর্যজনক দূরদর্শিতা এবং যুদ্ধের নিপুণতা ও কৌশলেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাকুসা নামক স্থানে মুসলমান এবং রোমান সেনাবাহিনী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারের কোন আক্রমণ সেখানে সংঘঠিত হয়নি। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌছতেই রণাঙ্গনের অবস্থা বদলে যায় এবং মোট ছিয়াল্লিশ হাযার মুসলিম সৈন্য দু'লাখের অধিক রোমান সৈন্যকে পরাজিত করে।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সত্য ও স্বীকৃত। তবে বিজয়ের সবচেয়ে বড় এবং মূল কারণ এই যে, মুসলমানদের যুদ্ধ যেহেতু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাদের মধ্যে যে, নিঃসার্থপরতা, অকৃত্রিম

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

www.pathagar.com

উদ্যম ও সাহসিকতা বিদ্যমান ছিল তা আর কারো মধ্যে ছিল না। তাছাড়া ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সম্পর্কিত কুরআন মজীদের আয়াত এবং আঁ-হযরত (সা) এর বাণী মুসলমানদের মধ্যে এমন বিশ্বাস, প্রশান্তি ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে যে, ভয়ানক বিপদে অবরুদ্ধ হয়েও তারা কখনো ভীত হয় নি। একজন মানুষ সবচেয়ে বেশী ভয় করে মৃত্যুকে। কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধকালীন মৃত্যু আল্লাহ্‌র পথে হয়ে থাকে। অতএব তা মৃত্যু নয় বরং প্রকৃত ও যথার্থ জীবন।

উপরন্তু প্রকৃতি প্রদত্ত সহনশীলতা, কঠোরতা এবং বিপদে ভীত না হওয়ার যে গুণ আরব মুসলমনাদের মধ্যে ছিল তা ইরান ও রোমের আরাম প্রিয় সৈন্যদের কাছ থেকে কখনো আশা করা যেত না।

মৃত্যুরোগ এবং ইন্তিকাল

ত্রয়োদশ হিজরীর ৭ই জামাদিউল আখির রোববার দিন (দিনটি ছিল অত্যন্ত শীতল) হযরত আবূ বকর (রা) গোসল করেন। অতঃপর জ্বরে আক্রান্ত হন। এই জ্বর ইন্তিকাল পর্যন্ত ক্রমাগত পনের দিন অব্যহত থাকে। চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু তাতে কোন উপকার হয় নি। লোকজন হযরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো আপনি কি ডাক্তার দেখিয়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি আমাকে দেখেছেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার কি বলেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, ডাক্তার বলেছেন, افعل ما اشاء আমি যা চাই তাই করি।" শেষ পর্যন্ত দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, নামাযের জন্য বাইরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তিনি হযরত ওমর (রা)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন।

কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী, জনৈক ইয়াহূদী হযরত আবূ বকর (রা)-কে চাউলের সাথে বিষ মিশ্রিত করে খাইয়ে দিয়েছিল এবং এক বছর পর ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[১] হাকিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে হুযূর (সা)-এর বিচ্ছেদ বেদনা হযরত আবূ বকর (রা)-এর মনে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি সব সময় ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকেন এবং এর চিহ্ন তার বাহ্যিক স্বাস্থ্যেও ফুটে উঠে। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর এ অবস্থা দেখে আশংকিত হয়ে পড়েন এবং তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) যেহেতু তার প্রতিবেশী ছিলেন তাই সাহাবাদের মধ্যে তিনিই অধিক সেবা শুশ্রূষার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২]

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১১।
২. তাবারী : পৃঃ ৬২।

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের জন্য পরামর্শ

রোগের এই কঠোরতা সত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতের বিষয় এবং মুসলমানদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে গাফিল ছিলেন না। তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের বিষয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভাবলেন, খলীফা হিসেবে যদি তিনি কারো নাম উল্লেখ না করেন তাহলে বিশৃংখলার আশংকা রয়েছে। আর যদি নাম উল্লেখ করেন তাহলে কার নাম উল্লেখ করবেন? সাহাবা-ই কিরাম ইসলামের খনিতে যেন ছিলেন এক একটি মনি-মুক্তা সদৃশ। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ হযরত ওমর (রা)-এর প্রতিই ছিল কিন্তু নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামদের পরামর্শ এবং মতামত ছাড়া তিনি এর ঘোষণা দিতে পারেন না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি সর্বপ্রথম তার সাথে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবূ বকর (রা) ঃ হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) ঃ আপনি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করেছেন যা আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবূ বকর (রা) ঃ তবুও আপনার মতামত জানা প্রয়োজন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি অতি উত্তম ব্যক্তি। কিন্তু মিযাজ ও স্বভাবের দিক দিয়ে একটু কঠোর।

হযরত আবূ বকর (রা) ঃ এর কারণ হলো এই যে, তিনি আমাকে একটু লক্ষ্য করেছেন। যখন তাঁকে খিলাফত প্রদান করা হবে তখন তিনি কোমল এমনিতেই কঠোরতা পরিত্যাগ করেন।

অতপরঃ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) আগমন করলে তাঁর সাথে আলোচনা হয় নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবূ বকর (রা) ঃ হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হযরত ওসমান (রা) ঃ এ বিষয়টি আপনি আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছেন।

হযরত আবূ বকর (রা) ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্! আমি তোমাদের মতামত জানতে চাই।

হযরত ওসমান (রা) ঃ আমি এতটুকু জানি যে, হযরত ওমর (রা)-এর ভেতর তাঁর বাইরের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাঁর মত কেউ নেই।

www.pathagar.com

অতঃপর উসায়দ ইবনে হুযায়ের (রা) আগমন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তরে বলেন, "আমি আপনার পর হযরত ওমর (রা)-কে উত্তম বলে মনে করি। তাঁর হৃদয় বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম। আপনার পর খিলাফতের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য আর কেউ হতে পারে না।"

এদের ছাড়াও হযরত আবূ বকর সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। সবাই হযরত ওমর (রা)-এর পক্ষেই মতামত পেশ করে। ইতিমধ্যে সাধারণ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ওমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তখন হযরত তালহা (রা) আগমন করে বলেন, হে আবূ বকর (রা) আপনি অবগত আছেন যে, হযরত ওমর (রা)-এর মিযাজ অত্যন্ত কঠোর। এতদসত্ত্বেও কি আপনি তাঁকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন। হাশরের মাঠে যখন আপনার প্রভু এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন তখন আপনি এর কি উত্তর দিবেন?

হযরত আবূ বকর (রা) তখন শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তালহার এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হ'ন এবং বলেন, 'আমাকে বসিয়ে দাও, লোকজন তাঁকে বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্র ভয় দেখাচ্ছ? আমি যখন আমার প্রভুর সাথে মিলিত হ'ব এবং তিনি আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন তখন আমি বলব, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দাহ্দের জন্য তোমার একজন উত্তম বান্দাহ্কেই খলীফা নির্বাচন করেছি।'[১]

হযরত ওমর (রা)-এর নাম ঘোষণা

যখন লোকেরা চলে গেল তখন হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে বলেন, 'হযরত ওমর (রা)-এর খলীফা মনোনীত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি লিখুন। তিনি দোয়াত কলম নিয়ে বসলে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, 'লিখুন,

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين - أما بعد

এতটুকু বলেই তিনি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। হযরত ওসমান (রা) পূর্ব হতে বিষয়টি জানতেন। তিনি চিন্তা করলেন, যদি এই অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন এবং এই আদেশ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা'হলে এটাকে কেন্দ্র করে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। অতএব أما بعد এর পর তিনি নিজেই লিখে নিলেন,

استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آل لكم خيرا -

"আমি তোমাদের উপর হযরত ওমর (রা)-কে খলীফা করলাম এবং আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মঙ্গল চিন্তার কোন প্রকার ত্রুটি করিনি।" অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) চেতনা ফিরে পেলেন। তখন হযরত ওসমান (রা) তাঁকে এই বাক্যটি

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

www.pathagar.com

পাঠ করে শুনালেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আল্লাহু আকবর' এবং হযরত ওসমান (রা)-কে দু'আ করলেন। অতঃপর লোকদেরকে এই নির্দেশটি শুনিয়ে দেয়ার জন্য তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে নির্দেশ দেন। হযরত ওসমান (রা)-এর আহ্বানে সবাই একত্র হন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় বিশেষ গোলামের মাধ্যমে এই নির্দেশ পত্রটি সেখানে প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা) সাথে ছিলেন। সভায় হট্টোগোল চলছিল। হযরত ওমর (রা) বললেন, 'হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, খলীফার নির্দেশ শোন'-এ বলে তিনি লোকদেরকে থামিয়ে দিলেন। তখন হযরত ওসমান (রা) নির্দেশ পত্রটি পাঠ করে শুনালেন। সবাই সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ব্যালকনিতে আসেন এবং সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি তোমাদের উপর যাকে খলীফা নির্বাচন করেছি তিনি আমার কোন আত্মীয় নন। তিনি হচ্ছেন হযরত ওমর (রা)। তোমরা কি তাকে গ্রহণ করেছ? সবাই এক বাক্যে বলল, سمعنا وأطعنا অর্থাৎ আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছি।

হযরত ওমর (রা)-কে ওসীয়ত ও নসীহত

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)হযরত ওমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ওসীয়ত প্রদান করেন।

يا عمر ! إن لله حقا بالليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله بالليل وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ألم تر يا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقلته عليهم وحق الميزان أن لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا - ألم تر يا عمر ! إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل ؟ وخفته عليهم وحق الميزان أن لا يوضع فيه إلا باطل أن يكون خفيفا - ألم تر يا عمر ! إنما نزلت الرخاء مع الشدة وآية الشدة مع الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا ؟ لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه - ألم تر يا عمر ! إنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم فإذا ذكرتم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم ؟ وإنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من شيء - فإذا ذكرتم قلت : أين عملي من أعمالهم ؟ فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر من الموت ولست بمعجزه -

"হে ওমর (রা)! নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, রাত্রিকালে আল্লাহ্র প্রতি বান্দাহ্দের যে কর্তব্য রয়েছে তা তিনি দিবাকালে কবূল বা গ্রহণ করেন না এবং দিবাকালে যে

কর্তব্য রয়েছে তা তিনি রাত্রিকালে গ্রহণ করেন না। (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল বা কর্তব্য কাজ সঠিক সময়ে করা উচিৎ) আল্লাহ্ ত'আলা ঐ সময় পর্যন্ত নফল কবূল করবেন না যতক্ষণ না তোমরা ফরয আদায় করবে। হে ওমর (রা)! তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত লোকদের পাল্লা ভারী, যাদের পাল্লা কাল কিয়ামতের দিন সত্য অনুসরণের কারণে ভারী হবে। এটাই সঠিক যে, কাল কিয়ামতের দিন, যাদের পাল্লা সত্য ও ন্যায় ছাড়া কিছু নেই সেটাই ভারী হবে। পক্ষান্তরে বাতিলের অনুসরণের কারণে যাদের পাল্লা হালকা, কিয়ামতের দিন তাদের পাল্লাই হালকা হবে। আর যে পাল্লায় বাতিল ছাড়া কিছু নেই সেটা হালকা হওয়াই উচিৎ। হে ওমর (রা)! তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, পৃথিবীতে সংকীর্ণতা, উদারতা—উভয় ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যাতে মু'মিনদের মধ্যে ভয়, আশা উভয়ই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট মু'মিনদের এরূপ বস্তুই আশা করা উচিৎ যাতে তার অধিকার রয়েছে। এমনিভাবে মু'মিনদের এরূপ জিনিসকে ভয় করা উচিৎ নয় যে, যাতে সে নিজেই পতিত হবে। (অর্থাৎ কেউ যদি কোন জিনিসকে ভয় করে তাহলে তাকে সে জিনিস থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ) হে ওমর! তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদের উল্লেখ তাদের অন্যায় ও অবৈধ কাজের সাথে করেছেন। যখন তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবে তখন আশা পোষণ করবে যে, আমি যেন তাদের মধ্যে না হই। আল্লাহ্ তা'আলা বেহশ্তবাসীদের কথাও তাদের উত্তম কাজের সাথে উল্লেখ করেছেন। কেননা তাদের যে অন্যায় কাজ ছিল আল্লাহ্ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। যখন তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবে তখন বলবে, তাদের মত আমার আমল কোথায়? যদি তোমরা আমার ওসীয়ত স্মরণ রাখ তাহলে এমন কোন অদৃশ্য বস্তু যা বর্তমানের চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয়, মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যু তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হবে। অধিকন্তু মৃত্যুকে তোমরা ফিরিয়েও রাখতে পারবে না।)

হযরত মুসান্না (রা) যে মুহূর্তে ইরাক হতে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য মদীনায় আগমন করেন তখন আবূ বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন। হযরত মুসান্নার চাহিদার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা) ইরাকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

ব্যক্তিগত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি

উপরোল্লিখিত জাতীয় বিষয় ছাড়াও হযরত আবূ বকর (রা) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে একটি জায়গীর প্রদান করেছিলেন। এবার তিনি ভাবলেন, এর দ্বারা অন্য অংশীদারের অধিকার খর্ব হবে। তাই বললেন, হে প্রিয় কন্যা! আমীরী ও গরীবী উভয় অবস্থায় তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলে। আমি তোমাকে যে জায়গীর প্রদান করেছি এতে কি তুমি তোমার ভাই-বোনদেরকে অংশীদার করতে পারবে? হযরত আয়েশা (রা) সন্তুষ্টচিত্তে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে একবার তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আমি (খলীফা হওয়ার পর) এ পর্যন্ত বায়তুলমাল হতে মোট কত টাকা বেতন পেয়েছি? হিসেব করে বলা হলো, "ছয় হাযার দিরহাম," 'ভারতীয় মুদ্রায় কম বেশী দেড় হাযার টাকা) তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, আমার অমুক জমি বিক্রি করে এই টাকা বায়তুলমালে ফিরিয়ে দিবে। এরপর জিজ্ঞেস করেন, বায়'আত গ্রহণের পর আমার সম্পদ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে? খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত সম্পদ বায়'আত গ্রহণের পর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১। একজন হাবশী গোলাম যিনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলা করেন এবং সাথে সাথে মুসলমানদের তরবারি শান দিয়ে থাকেন। ২। একটি উট যার দ্বারা পানি বহনের কাজ করা হয়। ৩। একশত টাকা মূল্যের একটি চাদর। মৃত্যুর পর তিনি এই তিনটি বস্তু খলীফার নিকট প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী যখন তিনটি বস্তু হযরত ওমর (রা)-এর খিদমতে পৌছান হয় তখন তাঁর অন্তর কেঁপে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে থাকেন, "হে আবূ বকর (রা)! তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত লোকের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ ছেড়ে গেলে।"[১]

মুয়াইকিব দূসী নামক এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-এর পারিবারিক কাজ পরিচালনা করতেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যু রোগের সময় তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম জানাই। এ সময় তিনি খিলাফতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তা থেকে অবসর হয়ে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে মুয়াইকিব! তুমি আমার ঘরের ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলে, বলো তোমার আমার মধ্যে কি কোন লেন-দেন বাকী আছে? আমি আরয করলাম, আমার পঁচিশ দিরহাম আপনার নিকট পাওনা আছে এবং আমি তা মাফ করে দিয়েছি। তিনি বললেন 'চুপ থাক। আমার আখিরাতের সম্বলকে কর্জের দ্বারা হ্রাস কর না, এটা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "মুয়াইকিব! অশ্রুপাত করো না, ভীত হয়ো না, ধৈর্য-ধারণ করো। আশা করি আমি ঐ স্থানে যাচ্ছি যা আমার জন্য উত্তম ও স্থায়ী হবে। অতঃপর আমাকে দিরহাম টাকা প্রদানের জন্য তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।[২]

দাফন-কাফন সম্পর্কে ওসীয়ত

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, হুযূর (সা)-কে কয়টি কাপড় পড়ানো হয়েছিল ? তিনি উত্তরে বলেন, তিনটি কাপড়, তখন হযরত আবূ বকর (রা) তার গায়ের চাঁদরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমার এ দু'টি কাপড় রয়েছে, তৃতীয় একটি কাপড় বাজার থেকে ক্রয় করে আমাকে পরিধান করাবে। তখন উম্মুল মু'মিনীন বলেন, আব্বাজান! আমরা তিনটি কাপড় বাজার

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : প্রথম অধ্যায় : ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩৯।
২. ইযালাতুল খাফা : দ্বিতীয় অধ্যায় : পৃঃ ৪১।

www.pathagar.com

থেকে ক্রয় করতে পারব। তিনি ইরশাদ করলেন, 'কন্যা, মৃতের চেয়ে জীবিতরা নতুন কাপড়ের অধিক যোগ্য। কাফনের এই উভয় কাপড়তো রক্ত ও পুজের[১] জন্য (অর্থাৎ খারাপ হওয়ার জন্য)।

তিনি আপন স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইসকে মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য ওসীয়ত করেন। তিনি বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। তিনি (আবূ বকর) বলেন, তোমার পুত্র আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর তোমার সাহায্য করবে। সে পানি ঢালতে[২] থাকবে।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, আজ কি বার ? লোকজন বললো আজ সোমবার। এরপর জিজ্ঞেস করেন, হুযূর (সা)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল কি বারে? উত্তরে বলা হলো, "সোমবার" এরপর তিনি বললেন, আমি আশা করি আজই আমার মৃত্যু[৩] হবে। এরপর ওসীয়ত করেন, "আমার কবর যেন রাসূল (সা)-এর কবরের পার্শ্বে দেয়া হয়।

এই ওসীয়ত শেষ হওয়ার পর পর তাঁর মৃত্যু যাতনা শুরু হয়। হযরত আয়েশা (রা) এ সময় শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বেদনাহত হয়ে নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করেন ঃ

وأبيض تستسقى الغمام بوجهه — ثمال اليتامى عصمة للأرامل

"এই উজ্জ্বল আকৃতি, চেহারার সদ্‌কাহ্ দিয়ে মেঘের নিকট বৃষ্টি চাওয়া হয় যিনি ইয়াতীমদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দারিদ্রের আশ্রয় স্থল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর কানে যখন এই কবিতার আওয়ায পৌছে তখন তিনি চোখ খুলেন। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতা হুযূর (সা)-এর প্রশংসায় রচিত হয়েছিল। তাই হুযূর (সা)-এর সম্মান ও আদবের কারণে ঐ একই কবিতা তাকে উপলক্ষ্য করে আবৃত্তি করাটা পছন্দ করেন নি, তিনি বলেই ফেলেন, এই মর্যদা তো শুধু হুযূর (সা)-এর জন্য ছিল।

এই দুশ্চিন্তার সময়ে হঠাৎ হযরত আয়েশা (রা) মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নলিখিত কবিতাটি বেরিয়ে পড়ে।

وكل ذي إبل موروث + وكل ذي مسلوب سلب .
وكل ذي غيبة يؤوب + وغائب الموت لا يؤوب

'উটের প্রত্যেক মালিককে একদিন আপন মাল উত্তরাধিকারীর হাতে সোপর্দ করতে হবে। প্রত্যেক লুন্ঠনকারীকে একদিন লুন্ঠিত হতে হবে এবং প্রত্যেক অদৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তু ফিরে আসে, কিন্তু মৃত্যুর কারণে অদৃশ্য ব্যক্তি আর ফিরে আসে না।'

হযরত আবূ বকর (রা) এই কবিতা শুনে বলেন, না কন্যা তা নয় বরং প্রকৃত বিষয় তাই যা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৬১৩।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৬১৩।
৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩৬।

www.pathagar.com

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ –

"মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, ইহা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ।"

অবশেষে সেই নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো। একটি হিঁচ্‌কি এল এবং সেই সাথে খিলাফত ও ইমামতের সূর্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পবিত্র মুখে এই দো'আটি উচ্চারিত হয়েছিল

رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ –

"হে প্রভু! তুমি আমাকে আত্মসমপর্ণকারীদের মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর"।

ত্রয়োদশ হিজরীর ২২শে জামাদিউস্‌সানী, সোমবার দিন মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। ওসীয়ত অনুযায়ী রাতেই হযরত আসমা' বিনতে উমাইস (রা) তাকে গোসল দেন। হযরত ওমর (রা) জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা) কবরে নেমে তাঁকে এমনভাবে আঁ-হযরত (সা)-এর পার্শ্বে শোয়ালেন যে, তাঁর মাথা হুযূর (সা)-এর পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত এসেছিল। ইহ্‌কাল ও পরকালের নেতা হুযূর (সা)-এর প্রতি মৃত্যুর পরও তিনি আদব ও মর্যাদা এমনভাবে প্রদর্শন করলেন যে, কবরেও তাঁর সমান্তরালে না থেকে বরং একটু পিছিয়েই থাকলেন।[১]

رضي الله عنهم ورضوا عنه

ইন্‌তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। খিলাফত কাল ছিল দু'বছর তিন মাস এগার দিন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া

আঁ-হযরত (সঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যুই ছিল প্রথম আকস্মিক দুর্ঘটনা যা মদীনার আকাশ বাতাসকে শোকাভিভূত করে এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে শোকের ছায়া নেমে আসে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে যার যত বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল, এঁর ইন্‌তিকালে তিনি তত বেশী মর্মাহত হন। এ পর্যায়ে আমরা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাহাবার ভাষণ পেশ করব। হযরত আলী (রা)-এর ভাষণটি বেশী দীর্ঘ, তবু আমরা হুবহু তাঁর ভাষণটি এখানে পেশ করব। যাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও আলী (রা)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক কেন্দ্র করে কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকলে এর দ্বারা তা প্রকাশিত হয়ে যায়।

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১৪।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা)-এর সমবেদনাপূর্ণ ভাষণ

হযরত আলী (রা) খলীফার ইন্‌তিকালের সংবাদ শুনেই انا لله وانا إليه راجعون পাঠ করতে করতে বাইরে আসেন এবং বলেন, اليوم انقطعت خلافة النبوة অর্থাৎ "আজ হতে খিলাফতে নবূওতের সমাপ্তি ঘটলো।" অতঃপর যে বাড়ীতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল সে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি এক ব্যঞ্জনাময়পূর্ণ ভাষণ দেন। তাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পবিত্র জীবনের একটি উত্তম ও সৌন্দর্যময় এবং ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত নক্‌শা অংকন করা হয়। হযরত আলী তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

يرحمك الله يا أبا بكر كنت ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله ﷺ واحدهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله ﷺ هديا وسمة ورأفة وفصلا وأشرفهم مترلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول له خيرا كنت عنده بمترلة السمع والبصر صدقت رسول الله ﷺ حين كذبه الناس فسماك الله عز وجل في تتريله صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به - الذي جاء بأصدق محمد ﷺ وصدق به أبو بكر واسته حين بخلوا وقمت به عند المكاره حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمترل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة بني فنهضت حين وهن أصحابك وبرزت حين استكانوا وقويت حين ضعفوا ألزمت منهاج رسول الله ﷺ إذ هووا كنت خليفة حقا لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وغيظ الباغين وقمت بالأمر حين فشلوا وثبت حين تضعضعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأمثلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأشجعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر عنه الناس وآخرا حين أقبلوا كنت للمؤمنين أبا رحيما حتى صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما ضعفوا وعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا وعلمت ما جهلوا وشمرت إذ خضعوا

www.pathagar.com

وصبرت إذ جزعوا فأدركت أوتار ما طلبوا وراجعوا برشدهم برأيك فظفروا ونـالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا ولهبا وللمؤمنين رحمـة وأنسـا وحصنا فطرت والله بفضائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها وأدركت سـوابقها لم تفلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك ويخـر كنـت كالجبل الذي لا تحركه العواصف وكنت كما رسول الله ﷺ أمن الناس علينا في محبتك وذات يدك وكنت كما قال ضعيفا وبدنك قويا في أمـر الله متواضعـا في نفسك عظيما عند الله جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم لم يكن لأحد فيـك مغمز ولاالقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع و لا لمخلوق عندك هوادة الضيـف الذليل عنك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه والقوي عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منـه الحق القريب والبعيد عندك ذلك سواء أقرب الناس إليك أطوعهم الله وأتقـى لـه شأنك الحق والصدق والرفق قولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيـك علـم وعزم فأقلعت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفيت النيران واعتدل بك الديـن وقوي بك الإيمان وثبت الإسلام والمسلمون وظهر أمر الله ولو كـره الكـافرون فسبقت والله سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا وفزت لخير فـوزا مبينـا فجلت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنـا إليه راجعون - ورضينا عن الله قضاة وسلمنا له أمره فوالله أن يصاب المسـلمون بعد رسول الله ﷺ بمثلك أبدا - كنت للدين عزا وحرزا وكهفا وللمؤمنين فئـة وحضنا وغيثا وعلى المنافقين غلظة وغيظة فألحقك الله بنبيك ﷺ ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون -

"হে আবূ বকর (রা), আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনি রাসূল (সা)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সাথী, সান্ত্বনাদাতা, বিশ্বস্থ সহচর, রহস্যের আঁধার এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। আপনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সবচেয়ে খাঁটি মু'মিন ছিলেন। আপনার বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক দৃঢ় ও মযবুত। আপনি ছিলেন সর্বাধিক আল্লাহ্ভীরু। আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনের ব্যাপারে সর্বাধিক স্বাধীনচেতা অর্থাৎ অন্যান্য সর্ব বস্তু হতে আপনি বেপরওয়া ছিলেন। আপনি ছিলেন হুযূর (সা)-এর কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, ইসলামের প্রতি সবচেয়ে অনুরাগী, হুযূর (সা)-এর সাথীদের জন্য সবচেয়ে বরকতময়, সহচরদের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদা, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সর্বোচ্চ, উসীলার দিক দিয়ে হুযূর (সা)-এর ঘনিষ্ঠ, চরিত্রের দিক দিয়ে হুযূর (সা)-এর সাথে অধিক সাদৃস্য পূর্ণ, সর্বাধিক সহানুভূতিশীল, সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক

www.pathagar.com

মর্যাদা সম্পন্ন, হুযূর (সা)-এর নিকট সর্বাধিক ভদ্র ও নির্ভরশীল। সুতরাং আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন। আপনি ছিলেন হুযূর (সা)-এর কর্ণ ও চক্ষু সাদৃস্য। যখন হুযূর (সা)-কে লোকজন অবিশ্বাস করে তখনি আপনি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে আপনাকে "সিদ্দীক" বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বলা হয়েছে

والذي جاء بالصدق وصدق به

(অর্থাৎ হুযূর (সা) সত্যতা নিয়ে এসেছেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন) আপনি হুযূর (সা)-এর সাথে ঐ সময় সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন যখন লোকজন কৃপণতা করেছেন। আপনি সংকটময় মুহূর্তে হুযূর (সা)-এর সাথে রয়েছেন যখন লোকজন তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আপনি কঠিন কঠিন মুহূর্তে বিভিন্নভাবে হুযূর (সা) এর অকৃত্তিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আপনি দু'জনের মধ্যে একজন। 'সাওর' নামক গুহায় আপনিই হুযূরের সঙ্গী ছিলেন। তখন আপনাদের উপর রহমত নাযিল হয়েছিল। আপনি হিজরতের সময় আঁ-হযরত (সা)-এর সাথী ছিলেন। যখন লোকজন ধর্মত্যাগী হয়ে যাচ্ছিল তখন আপনি আল্লাহ্র দীনের ও রাসূল (সা)-এর উম্মতের জন্য এমন একজন খলীফারূপে আর্বিভূত হন, যিনি সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সর্বাধিক যোগ্য। আপনি খিলাফতের দায়িত্ব এমন সুষ্ঠুভাবে পালন করেন—যা কোন পয়গাম্বরের খলীফার পক্ষে সম্ভব হয়নি। লোকজন যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন আপনি ছিলেন কার্যক্ষম। আপনি ঐ সময়ই যুদ্ধ করেছেন যখন লোকজন অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। আপনি হুযূর (সা)-এর পথ ও আদর্শকে ঐ সময় অনুসরণ করেছেন যখন লোকজন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। আপনি কোন বির্তক ও অনৈক্য ছাড়াই খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন যদিও এ নির্বাচন মুনাফিকদের ক্রোধ কাফিরদের মনবেদনা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের হিংসার কারণে পরিণত হয়েছিল। যখন লোকজন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আপনি সত্যের উপর স্থায়ী ছিলেন। যখন লোকজন আন্দোলিত হয়ে উঠে তখন আপনি অটল ছিলেন। যখন লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে তখন আপনি আল্লাহ্র নূর (আলোক রশ্মি) নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। অবশেষে তারা আপনাকে অনুসরণ করেছে এবং হিদায়াত লাভ করেছে। তাদের তুলনায় আপনার আওয়াজ ক্ষীণ ছিল কিন্তু সবার চেয়ে আপনার মর্যাদা ছিল অধিক, আপনার কথোপকথন অত্যন্ত সুশৃংখল ও সঠিক ছিল। আপনি স্বল্পভাষী ছিলেন। আপনার বক্তব্য সবচেয়ে অলংকারপূর্ণ ছিল। বীরত্বের দিক দিয়ে আপনি অগ্রগণ্য ছিলেন। আপনি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট বিজ্ঞ ছিলেন। সঠিক আমলের দিক দিয়ে আপনি সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। আপনি দীনের প্রথম নেতা ছিলেন। যখন লোকজন দীন থেকে ফিরে যায় তখন আপনি ছিলেন কঠোর। যখন তারা দীনের দিকে ফিরে আসে তখন আপনি ছিলেন মু'মিনদের জন্য সহৃদয় নেতা। যে ভারী

www.pathagar.com

বোঝা তারা উঠাতে সক্ষম হয়নি তা আপনি উঠিয়েছেন। লোকজন যে সমস্ত বস্তু ত্যাগ করেছে আপনি তা হিফাযত করেছেন। যাকিছু তারা হারিয়েছে আপনি তা সংরক্ষণ করেছেন। তারা যা জানত না তা আপনি শিখিয়েছেন। যখন তারা ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ে তখন আপনি কার্যক্ষম ছিলেন। যখন তারা ভীত হয়ে পড়ে তখন আপনি সহনশীলতার সাথে কাজ করেন। যখন তারা হিদায়াতের জন্য আপনার আদর্শ গ্রহণ করে তখন তারা সফলতা অর্জন করে এবং তারা যে বস্তুর কল্পনা করেনি তা তারা লাভ করে। আপনি কাফিরদের জন্য আযাবের বৃষ্টি এবং অগ্নির প্রজ্বলিত শিখা স্বরূপ ছিলেন এবং মু'মিনদের জন্য ছিলেন রহমত ও আশ্রয় স্থল। আপনি বিভিন্ন গুণাবলী ও কামালাত অর্জন করেছিলেন। আপনাকে যেগুলো প্রদান করা হয়েছিল এবং আপনি তার উত্তমগুলোই অর্জন করেছিলেন। আপনার যুক্তি পুরাভূত হয়নি, আপনার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়নি, আপনার মন দুর্বল হয়ে যায় নি। আপনার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়নি এবং তা কখনো দুর্বল হয়ে যায়নি। আপনি ছিলেন ঐ পাহাড়ের মত যেটাকে কোন ঝর নাড়াতে পারেনি। হুযূর (সা)-এর ঘোষণা অনুযায়ী আপনি বন্ধুত্ব ও সম্পদ দ্বারা সবচেয়ে উত্তম খিদমত করেছেন। হুযূর (সা)-এর ইরশাদ অনুযায়ী দৈহিক দিক দিয়ে যদিও আপনি জীর্ণ ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই শক্তিশালী। আপনি মনের দিক দিয়ে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাশীল এবং লোকদের চোখে অত্যন্ত সম্মানীত ছিলেন। আপনার প্রতি কেউ বিদ্রুপ করতে পারেনি এবং আপনার সামনে কেউ বাক্‌চাতুরী করতে সাহস পায় নি। আপনার প্রতি কারো লোভ ছিল না। আপনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি। দুর্বল ও হীন ব্যক্তিও আপনার নিকট শক্তিশালী ছিল। কেননা আপনি তার অধিকার ও দাবী আদায় করে দিতেন। আর শক্তিশালী ব্যক্তিও আপনার নিকট দুর্বল ছিল। কেননা আপনি তাদের নিকট থেকে অন্যের দাবী আদায় করে দিতেন। দূরবর্তী নিকটবর্তী উভয় প্রকারের লোকই আপনার নিকট সম্মানিত ছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অধিক মুত্তাকী ছিলেন তিনিই আপনার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। সততা ও বিনয় ছিল আপনার বৈশিষ্ট, আপনার কথা ছিল অকাট্য, কার্যক্রম ছিল সহনশীলতা ও দূরদর্শিতাপূর্ণ। আপনার মতামত ছিল জ্ঞানগর্ভ ও দৃঢ়তাপূর্ণ। আপনি এই অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে যাচ্ছেন যখন পথ নিষ্কন্টক হয়েছে, বিপদাপদ সহজ হয়ে গিয়েছে, অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে, দীন মধ্য পন্থায় উপনীত হয়েছে, ঈমান শক্তিশালী হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়েছে, আল্লাহ্‌র বিধান সফলতা অর্জন করেছে, যদিও এতে কাফিরদের বিরোধিতা ছিল। আপনি এমন দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন যে, আপনার পরবর্তীদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনি মঙ্গলের সাথে সফলতা অর্জন করেছেন। আপনার উপর আক্ষেপ করা হবে তা থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে। আপনার মৃত্যুর বেদনা আকাশে অত্যন্ত দুঃখের সাথে অনুভূত হচ্ছে। আপনার বিচ্ছেদ সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহ্ প্রদত্ত ভাগ্যের উপর আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং আমাদের সমস্ত বিষয় তার উপর সোপর্দ করে দিয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ! হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর আপনার মৃত্যুর মত এমন বিপদ মুসলমানদের উপর আর পতিত হয়নি। আপনি ছিলেন দীনের মর্যাদা ও আশ্রয়স্থল। আপনি মুসলমানদের জন্য ছিলেন দুর্গ সদৃশ এবং মুনাফিকদের জন্য কঠোর। আল্লাহ্ আপনাকে আপনার নবীর সাথে মিলিত করুন, আমরা যেন আপনার পর আপনার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত অথবা পথ ভ্রষ্ট না হই।[১]

فإنا لله وإنا إليه راجعون –

যতক্ষণ হযরত আলী (রা) এই বক্তব্য পেশ করছিলেন ততক্ষণ উপস্থিত সকলেই স্তব্দ হয়ে তা শুনতে থাকে। কিন্তু বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে ক্রন্দনের রোল উঠে এবং সবাই বলতে থাকে "হে রাসূল (সা)-এর জামাতা, আপনি সত্য কথা বলেছেন।"

হযরত আয়েশা (রা) তখন বলেন, "আব্বা,! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সফলকাম করুন এবং আপনাকে আপনার উত্তম প্রচেষ্টার প্রতিদান দিন। আপনি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়েছেন তা এটাকে হীন করে দেয়া হয়েছে এবং আপনি আখিরাত অভিমুখি হয়েছেন তা সেটাকে মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়েছে। যদিও হুযূর (সা)-এর পর আপনার ইন্‌তিকাল আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ, কিন্তু সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ধৈর্যই আপনার ইন্‌তিকালের সবচেয়ে বড় প্রতিদান। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করছি যে, তিনি আমাকে আমার এই ধৈর্যের প্রতিদান দিয়ে তার অঙ্গীকার পূরণ করবেন।

"আব্বা, আপনি আপনার এই কন্যার সর্বশেষ সালাম গ্রহণ করুন, যে, আপনার জীবনে কখনো আপনার সাথে বিবাদ করিনি এবং আপনার মৃত্যুর পরও হয়রান পেরেশান বা অস্থির হয়নি।"

হযরত ওমর (রা) ঘরে প্রবেশ করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত দেহের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে রাসূল (সা)-এর খলীফা, আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে জাতিকে কঠোর বিপদের মধ্যে নিপতিত করেছেন। আপনার মত হওয়াতো দূরের কথা আপনার নিকট পৌঁছতে পারে এমন কোন ব্যক্তিও আমাদের মধ্যে নেই।

আঁ-হযরত (সা)-এর একটি সুসংবাদ

দুনিয়া যখন এরূপ শোকাভিভূত তখন আধ্যাত্মিক জগতে কি অবস্থা বিরাজ করছিল, স্বয়ং হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকে তা অনুমান করা যায়।

১. আররিয়াদুল নুদরাত, আল মুহিব্বুত, তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩-১৮৪। হযরত আলী (রা)-এর এই ভাষণ সামান্য বাক্যের পরিবর্তনের সাথে কানজুল উম্মাল এর মুসনাদে ইমাম ইবনে হাম্বল আহমদেও উল্লেখ করা হয়েছে (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৬৬)।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, 'একদিন আমি হুযূর (সা)-এর সম্মুখে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করি।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعُوْا إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

"হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।"

অতঃপর হুযূর (সা)-এর নিকট আরয করি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কত উত্তম এই আল্লাহ্‌র বাণী! হুযূর (সা) বলেন, হাঁ! হে আবূ বকর (রা)! যখন তোমার মৃত্যু হবে তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তোমাকে এটাই বলবে।"[১]

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

বর্তমান যুগের সর্বাধিক উন্নত ও মার্জিত রাষ্ট্রীয় নীতি হল গণতন্ত্র। আমাদের মুসলমান গ্রন্থকার ও লেখকরাও সাধারণভাবে বলতে শুরু করেছেন যে, ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে গণতন্ত্রেরই পক্ষপাতি। তবে আসল ব্যাপার এই যে, পবিত্র কুরআন, হাদীস, এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের কার্যক্রম দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায় তা প্রকৃত বিচারে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্রও নয়, ধর্মতন্ত্রও নয়, আবার ব্যক্তিতন্ত্রও নয়। বরং এটা এসব গুলোরই মিশ্রণ এবং একটি আলাদা বস্তু।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, দীনী হুকুমতে (Theocratic Government) বাদশাহকে আল্লাহ্ হিসেবে মান্য করা হয়। যেমন—মিসরে ফিরাউনের যুগে এর প্রচলন ছিল। অথবা তাকে আল্লাহ্‌র ছায়া বা সাদৃশ্য হিসেবে মান্য করা হয়। যেমন মধ্যযুগে ইউরোপে এর প্রচলন ছিল। এই দু'টি অবস্থায় বাদশাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তার প্রত্যেকটি আদেশ আল্লাহ্‌র আদেশের মতই মান্য করা হয়। তার অবাধ্য হওয়া তো দূরের কথা, কোন ব্যক্তি তার সমালোচনাও করতে পারে না।

ইসলামে উপরোক্ত ধরনের নীতি বা পদ্ধতির কোন অবকাশ নেই। বাদশাহ্ ও বিচারক অথবা খলীফা তো দূরের কথা, স্বয়ং নিষ্পাপ পয়গম্বরও হক্কুল ইবাদ (বান্দাহ্‌র হক) অথবা পার্থিব বিষয়ে ঐ সমস্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে থাকেন, যা সাধারণ লোকদের জন্য রচিত। এ সমস্ত ব্যাপারে অন্যদের মত পয়গাম্বরদেরও ভুলত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আঁ-হযরত (সা) বলেছেন- أنتم أعلم بأمور دينكم এ ছাড়া হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সা) স্বয়ং তার বিরোধীদের অভিযোগও শুনতেন এবং ন্যায় বিচার করতেন[২] সুতরাং

---

১. কানজুল উম্মাল ঃ মুসনাদে আহমদ ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃঃ ৩৪৫।

২. সীরাতে ইবনে হিশামঃ পৃঃ ৪৪৪ দ্রষ্টব্য, সীরাতে শামীর মধ্যে এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

যখন হুযূর (সা) সম্পর্কে উলহিয়ত (ঈশ্বরত্ব)-এর কল্পনা করা যায় না তখন রাসূল (সা)-এর খলীফা সম্পর্কে তো মোটেই ধরা যাবে না। এর কারণেই বায়'আতের পর যখন লোকজন হযরত আবূ বকর (রা)-কে يا خليفة الله "হে আল্লাহ্র খলীফা" বলে সম্বোধন করেন তখন তিনি সাথে সাথে এর বিরোধীতা করে বলেন ঃ

لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله -

"আমি আল্লাহ্র খলীফা নই, বরং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর খলীফা"

বনু সাকীফায় বায়'আতের পর হযরত আবূ বকর (রা) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। আমার আশা ছিল এই দায়িত্ব অন্য কাউকে অপর্ণ করা হবে, কিন্তু অবশেষে আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে। তবে আমি যদি সঠিক পথে চলি তাহলে তোমারা আমার অনুসরণ করবে, আর যদি আমি বিপথে চলি তাহলে তোমরা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে।"

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগে প্রচলিত যে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে দীনী হুকুমাত বলা হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি কখনো দীনী নয়। তবে প্রকৃত পক্ষে ইসলামী হুকুমাত দীনী হুকুমাত আর তা এই অর্থে যে, এই হুকুমাতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্র সেই বিধান যা আল্লাহ্র নিকট থেকেই এসেছে। এই হুকুমাতের অধীন বাদশাহ, শাসনকর্তা এবং সকল মুসলমান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি অভিজাততন্ত্র ও (Aristocratic) নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে উঁচুস্তরের লোক সাধারণ স্তরের লোকদের উপর শাসন চালায়। সাধারণের কিন্তু আমরা খিলাফতের মূলতত্ত্বের আলোচনায় বলেছি যে, ইসলামে কোন স্তর বিভাগের অস্তিত্ব নেই। যে মুসলিম ব্যক্তি খিলাফতের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় ও পালন করার যোগ্যতা রাখে তাকেই খিলাফতের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। হযরত হুযায়ফাহ (রা)-এর গোলাম সালিম সম্পর্কে হযরত ওমর (রা)-এর এই মর্মে একটি বাণী রয়েছে যে, "যদি সালিম এখন জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাকে গভর্নর নিযুক্ত করতাম। ইসলামে স্বৈরতন্ত্রের কোন অবকাশ নেই। আঁ-হযরত (সা) স্বীয় পরিবারবর্গের পক্ষে খিলাফতের কোন ওসীয়ত করেন নি। খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁর এই নীতি কঠোভাবে অনুসরণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তারা কখনো একনায়কতন্ত্রের পক্ষপাতী হতে পারে না। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদে এই আয়াতের টীকায় লিখেছেন

"এই আয়াতে পরস্পর পরামর্শের যে নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, হুযূর (সা) তা তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকরী করেছেন। প্রথম দিকের রাষ্ট্র প্রধান ও খলীফা এই নীতিকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করেছেন। বর্তমান "জাতীয় পরিষদ" রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এ নীতি বাস্তবায়নের একটি অসম্পূর্ণ প্রয়াস মাত্র।"[১]

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ –

"আপনি কাজে-কর্মে ওদের (লোকদের) সাথে পরামর্শ করুন, কিন্তু যখন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এগিয়ে যান।"

প্রকাশ থাকে যে, হুযূর (সা) ছিলেন আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। কোন ব্যাপারে অন্যের সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সে আদর্শের জন্য পরস্পর পরামর্শের প্রয়োজন ছিল, তাই পবিত্র কুরআনে তাঁকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশ তিনি যথারীতি পালনও করেছেন। তিনি এর উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর এবং আমীরও পরামর্শের মাধ্যমে নিয়োগ করতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ঃ[২]

لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد –

"যদি পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমি আমীর নিযুক্ত করতাম তাহ্লে ইবনে উম্মে আবদ্ (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ)-কে নিযুক্ত করতাম।"

আঁ-হযরত (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) ও একই নীতি যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি পরামর্শ ব্যতীত মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র বিষয়েরও সিদ্ধান্ত নিতেন না।

বাহ্রাইনের বুযাখা নামক স্থানের লোকজন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের অতীত কর্মের জন্য তাওবা করে। হযরত আবূ বকর (রা) তখন বলেন, "এখন তোমরা জঙ্গলে গিয়ে উট চরাও। আমি মুহাজিরদের সাথে পরামর্শ করার পর তোমাদের উত্তর দেব।" অতঃপর তিনি একটি সভা আহ্বান করেন এবং সমগ্র ঘটনা সাধারণ মুসলমানদের সামনে পেশ করেন।[৩]

পরস্পর পরামর্শের পর যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে।

---

১. মতবুআহ শায়খ মুহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, পৃঃ ১০৩১৭।
২. সুনান তিরমিযী ঃ ২য় খণ্ডঃ কিতাবুল মানাকিব।
৩. সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭২।

www.pathagar.com

فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوْا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"(পরামর্শের পর জিহাদের) সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ওদের পক্ষে মঙ্গল আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা।"

এখন বাকী থাকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মূল প্রেরণার দিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে ঃ

১. জনসাধারণের মতামতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করা হয়। বর্তমান যুগের ভোটের মতই খলীফার বায়'আত গ্রহণ করা হয়।

২. খলীফার যে কোন কাজে প্রত্যেকেরই সমালোচনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

৩. খলীফা নিজকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন না, বরং নিজেকে জাতির খাদেম বলেই মনে করেন। তাই তাঁর নিকট পৌঁছতে কারো অসুবিধা হয় না।

৪. খলীফা যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তখন সকলের সম্মতি ও মতামত নিয়েই করেন।

৫. তবে এই সলাপরামর্শ গ্রহণের পর অধিকাংশের মতানুযায়ী কাজ করতে তিনি বাধ্য হন। তিনি ইচ্ছা করলে এর বিরুদ্ধেও আপন সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারেন। হুযূর (সা)-এর নীতিও এই ছিল। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

"আপনি গুরুত পূর্ণ কাজে পরামর্শ গ্রহণ করুন, কিন্তু যখন কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এগিয়ে চলুন।"

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালের সাথে সাথেই হযরত উসামা (রা)-কে আরব ও সিরিয়ার সীমান্তে প্রেরণের ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম একমত হতে পারেন নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাদের মতবিরোধের কোন পরোয়া করেন নি। এমনিভাবে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন না কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারেও তাদের রায় গ্রহণ করেন নি বরং নিজ মতানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন তিনি সিরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে মনস্থ করেন তখন এ ব্যাপারে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেন। সাহাবায়ে কিরাম এব্যাপারেও বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) খলীফার পক্ষে মত দেন এবং আলীর মতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান যুগের প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত গণতন্ত্রে স্রেফ সংখ্যাধিক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন কোন দিকে যদি একান্ন ভোট পড়ে এবং এই ভোটারদের সকলেই মূর্খ, স্বার্থপর ও মূল বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয় তবু তাদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পক্ষান্তরে অন্যদিকে যদি এক ভোট কম অর্থাৎ পঞ্চাশ ভোট পড়ে এবং ভোটারদের সাথেই

www.pathagar.com

মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয় তবুও তাদের মতামতের কোন মূল্যে দেয়া হবে না। বরং সিদ্ধান্ত ও ফলাফল ঐ লোকদের পক্ষেই হবে, এক ভোটে হলেও যাদের দল ভারী। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্রে এই সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব সকল ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে।

তাছাড়া বর্তমান গণতন্ত্রে যত কাজ হয়ে থাকে তা দলকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করার জন্যই হয়ে থাকে। দলের প্রতিটি সদস্য যে কোন বিষয়ে দলের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য। যদি কেউ তা না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্রে দলের পক্ষপাতিত্বের কোন ব্যাপার নেই।

এখানে পক্ষপাতিত্বের যদি কোন ব্যাপার থেকে থাকে তাহলে সেটা হলো ন্যায় ও সত্যের ব্যাপার। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সাহাবীদের মধ্যে তিনটি দল ছিল—একটি মুহাজিরদের, একটি আনসারদের এবং একটি বনু হাশীমদের। কিন্তু কেউ কখনো দলের দিকে চেয়ে আপন মতামত পেশ করেন নি, বরং সত্য ও ন্যায়ের দিকে চেয়েই মতামত পেশ করেছে।

এক কথায় বর্তমান যুগের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে যতটুকু মংগলজনক দিক রয়েছে ইসলাম তা গ্রহণ করেছে এবং যতটুকু ক্ষতিকর ও নিন্দনীয় দিক রয়েছে ইসলাম তা পরিত্যাগ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে শূরাভী হুকূমত বা উপদেষ্টা-মূলক রাষ্ট্রপদ্ধতি বলাই সঠিক যুক্তিযুক্ত হবে।

হযরত আবূবকর (রা)-এর রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

হযরত আবূ বকর (রা)-এর রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি কি ছিল? এর উত্তর এই যে যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফতের ভিক্তি হল পবিত্র কুরআন ও হাদীস। তাই হযরত আবূ বকর (রা)-এর সামনে যখন কোন বিষয় উপস্থিত করা হত তখন তিনি সর্বপ্রথম এর সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন এবং সেখানে তা না পাওয়া গেলে পবিত্র হাদীস অনুসন্ধান করতেন। যদি হাদীসেও এর সমাধান না পাওয়া যেত তাহলে তিনি মুসলমানদের সাধারণ সভা আহ্বান করতেন। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারো কোন হাদীস স্মরণ থাকলে সে তা পাঠ করে শুনাত এবং হযরত আবূ বকর (রা) তা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতেন। এজন্য যে, হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারো কোন হাদীস স্মরণ না থাকত তখন তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ সভা ডেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে বিশেষ পরামর্শ দাতা হিসেবে মনোনীত

www.pathagar.com

করেছিলেন। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হত তখন তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। ইবনে সাদ বলেন ঃ

إن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه ودعا رجالا من المهاجرين والأنصار دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت -

"হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যখন জটিল বিষয় উপস্থিত হত এবং সেজন্য জ্ঞানী ফিকাহ্‌বিদদের পরামর্শের প্রয়োজন হ'ত তখন তিনি এই উদ্দেশ্যে আনসার ও মুহাজিরদের থেকে হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান, হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা), হযরত উবায় বিন কা'ব (রা) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে আহ্বান করতেন।[১]

রাষ্ট্রীয় নীতি

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কাল ছিল মোট দু'বছর[২] তিন মাস। এই সময়টুকু ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়করণ এবং বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর যথাযথভাবে রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মোটেই অমনযোগী ছিলেন না বরং সীমারেখা যতটুকু বেড়েছে তার রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার আওতাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান যুগের সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের মত হযরত আবূ বকর (রা) সমগ্র সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অপর পৃষ্ঠায় এর একটি বিস্তারিত বিবরণী দেয়া গেল।

	প্রদেশের নাম	শাসন কর্তার নাম	অবস্থা
১.	মক্কা (হিজায)	হযরত ইতাব ইবনে উসাইদ	
২.	তায়েফ ,,	হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস	
৩.	সান'আ (ইয়ামন)	মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া	
৪.	হাযরামাউত ,,	যিয়াদ ইবনে লাবীদ আনসারী	
৫.	খাওলান	ইয়ালা ইবনে মুনিয়াহ্	
৬.	জাবিদ ও রিমা	আবূ মুসা আশ'আরী (ইয়ামনের একটি এলাকার নাম)	
৭.	জুন্দ	হযরত মু'আয ইবনে জাবাল	

---

১. তাবাকাতে ইবনে সাদ ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১০৯।
২. সর্বমোট দু'বছর তিন মাস এগার দিন।

www.pathagar.com

৮.	বাহ্‌রাইন	আলা বিন আল হাদ্‌রামী	
৯.	নাজরান	জারীর বিল আবদুল্লাহ্ আল্ বিজলী	
১০.	দূমাতুল জান্দাল	আয়াদ ইব্‌নে আল্ গানাম	
	প্রদেশের নাম	শাসন কর্তার নাম	অবস্থা
১১.	ইরাক	মুসান্না ইবনে হারিসা	
১২.	জারশ	আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওর	
১৩.	হিমস (সিরিয়া)	আবূ উবায়দাহ্ ইবনে আল্ জার্‌রাহ্	
১৪.	জর্ডান ,,	শারহ্‌বিল ইবনে হাসনাহ্	
১৫.	দামেশ্‌ক ,,	ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফিয়ান	
১৬.	ফিলিস্তিন ,,	আমর ইবনে আল আস	
১৭.	মদীনা	(রাজধানী)এটা খলীফার অধীনে ছিল।	

রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন

যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার উপর একটি রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিই যোগ্য, যে লোকদের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং যে দূরদর্শিতার অধিকারী। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিক ইবনে নুভায়রার ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে পদচ্যুত করার জোর দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তা গ্রহণ করেন নি। অবশেষে যখন হযরত খালিদ (রা)-এর বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় তখন খোদ হযরত ওমর (রা) স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সাহাবীদের মধ্যে লোকদের চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানী হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত আর কেউ নেই।

নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নীতি

এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দু'টি নীতি ছিল। যেমন ঃ

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে যে ব্যক্তি যে পদে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সেই পদেই বহাল রাখেন। কেননা তিনি জানতেন যে, হুযূর (সা)-এর চাইতে সঠিক নির্বাচন অন্য কারো হতে পারে না। উসামা বাহিনী রওনা হওয়ার সময় সবাই হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বের বিরোধীতা করেছিল, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। হযরত ওমর (রা) যখন হযরত খালিদ (রা)-এর পদচ্যুতির জন্য অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তরবারি হুযূর (সা) কোষ থেকে উন্মুক্ত করেছেন। আমি তা কিভাবে কোষবদ্ধ করব? আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে মক্কায় ইতাব ইবনে উসায়দ, তায়েফে ওসমান ইবনে আবিল আস, সানয়ায় মুহাজির ইবনে আমি উমাইয়া, হাযরামাউতে জিয়াদ ইবনে লাবিদ এবং বাহ্‌রাইনে আলাউল হাদ্‌রামী প্রশাসক ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)- এর যুগেও তারা স্ব-স্ব পদে বহাল ছিলেন।[১]

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১৭।

www.pathagar.com

২. দ্বিতীয় নীতি সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার, আল ইসাবা'য় যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো, কোন কাজের জন্য হযরত আবূ বকর (রা) ঐ ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্বাচন করতেন যিনি হুযূর (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে অধিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষত মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

স্বজন-প্রীতি থেকে দূরে থাকা

সঠিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বজন-প্রীতি বা বন্ধু-বান্ধবদের পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যোগ্য ব্যক্তিকেই সঠিক রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করতে হবে। হযরত আবূ বকর (রা) কঠোরভাবে এটা পালন করতেন এবং স্বীয় প্রশাসকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতেন।

ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে আমীর নিয়োগ করে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় তিনি এরশাদ করেন-[১]

يا يزد إن لك قرابة عسيت أن تؤثر هم بالأمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك فإن رسول الله ﷺ قال من ولي من أمر المسلمين شيئا ما مر عليهم أحدا محابلة فعليه لعنة الله لا يقبل الله عنه صرفا و عدلا حتى يدخله جهنم -

"হে ইয়াযীদ! সেখানে তোমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে সর্বাধিক আশংকা করছি যে, তুমি তাদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অথচ হুযূর (সা) ইরশাদ করছেন, কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পতিত হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার ফিদিয়া ও কাফ্‌ফারাহ্ গ্রহণ করবেন না। এমন কি তাকে দোযখে দাখিল করবেন।

প্রশাসক নিয়োগে তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিক বিবেচনা

হযরত আবূ বকর (রা) একদিকে যেমন স্বজন-প্রীতি থেকে দূরে থাকতেন অন্যদিকে তেমনি শাসনকর্তা নিয়োগ করার সময় তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিকটি বিবেচনা করতেন। তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষের প্রতি মোটেই দিকপাত করতেন না। তিনি সিরিয়ার যুদ্ধে খালিদ ইবনে সাঈদকে একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করলে হযরত ওমর (রা)-এর বিরোধীতা করে বললেন, খালিদ আপনার খিলাফতে সন্তুষ্ট ছিল না, সে আপনার বিরুদ্ধে বনু হাশিমকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-এর এ কথার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। তিনি ইবনে সাঈদের নিয়োগ বহাল রাখেন।[২]

---

১. মুসনাদে আহমদ ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৬।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৫৮৪।

www.pathagar.com

প্রশাসকদের মনস্তুষ্টি ও মর্যাদার দিক লক্ষ্য রাখা

একটি রাষ্ট্রের শিষ্টাচার ও সুশাসনের সবচেয়ে বড় চিহ্ন হল, সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে জবরদস্তি সেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার না করা। হযরত আবূ বকর (রা) এ দু'টি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। উসামা বাহিনীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার সময় তিনি কামনা করেছিলেন যেন হযরত ওমর (রা) এই বাহিনীতে না গিয়ে খলীফার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য মদীনায় অবস্থান করেন। কিন্তু হযরত উসামা (রা) যেহেতু বাহিনী প্রদান ছিলেন তাই তিনি হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে নিজে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে হযরত উসামা (রা)-কে অনুরোধ করেন, সম্ভব হলে যেন হযরত ওমর (রা)-কে তিনি মদীনায় তাঁর কাছে রেখে যান। এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী যখন রওনা হয় তখন উসামা তাঁর বাহনে উপবিষ্ট ছিলেন। অথচ হযরত আবূ বকর (রা) বহু দূর পর্যন্ত পদব্রজে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। হযরত উসামা (রা)-এর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি অশ্বে আরোহণ করেন নি এবং হযরত উসামা (রা)-কেও অশ্ব হতে অবতরণ করতে দেন নি। এমনিভাবে ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান সিরিয়ার যুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় তিনি পদব্রজে বহু দূর পর্যন্ত তার সাথে গমন করেন।

নির্বাচনে সতর্কতা

আরবের প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য سل الحرب ولا تسأل الحكيم অনুযায়ী যে সব লোক কোন কারণে একবার নির্ভরশীলতা হারিয়েছে হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার পরও কোন দায়িত্বশীল পদ প্রদান করতে ইতস্ততঃ করতেন। তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে ইরাকের যুদ্ধে প্রেরণের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি ত্যাগীদেরকে (মুরতাদ) সেনাবাহিনীতে ভর্তি না করেন। তাদের সততা, অকপটতা এবং ঈমানের দৃঢ়তার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মুরতাদদের প্রতি আবূ বকরের উপরোক্ত আচরণ অব্যাহত ছিল। এই কারণেই ইরাক যুদ্ধের সময় তাদের উপর যে বিধি-নিষেধ ছিল সিরিয়ার যুদ্ধের সময়ে তা ছিল না।

পরীক্ষামূলক নিয়োগ

বর্তমান যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তম কার্যাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্য শর্ত হলো, উত্তম কার্যাবলী। হযরত আবূ বকর (রা) ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে সিরিয়ার যুদ্ধে যখন একটি দলের আমীর নিয়োগ করেন তখন তাঁকে যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তার প্রারম্ভিক কথা ছিল —[১]

---

১. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৬।

www.pathagar.com

إني قد وليتك لا بلوك وأجربك وأخرجك فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك وإن أسأت عزلتك -

"আমি তোমাকে যাঁচাই ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য গভর্নর নিযুক্ত করলাম।" যদি তুমি উত্তম কাজ কর তা হলে আমি তোমাকে এই পদে স্থায়ী করব এবং পদোন্নতিও প্রদান করব। আর যদি অন্যায় কাজ কর তা হলে তোমাকে পদচ্যুত করব।"

প্রশাসকদের পদচ্যুতি

নিয়োগের পর যদি কেউ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হত তাহলে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে বিনাদ্বিধায় পদচ্যুত করতেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ ইবনে সাঈদকে আরব ও সিরিয়ার সীমান্তে প্রহরার কাজে নিয়োগ করেছিলেন এবং অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ সীমান্তে রোমান বাহিনীর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করে এবং তার সাহায্যের জন্য নতুন সৈন্য আসছে এই ধারণা করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি না পেয়েই শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করেন। ফলে মুসলিম বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য হয়। হযরত আবূ বকর (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে খালিদ ইবনে সাঈদকে কঠোর সতর্কতামূলক পত্র লিখেন এবং তাকে পদচ্যুত করেন। তিনি পত্রে লিখেন -

أقم مكانك فلعمري أنك مقدم محجام فجاء من الغمزت إلا تخوصها إلى حـــق ولا تصبر عليه -

"তুমি তোমার জায়গায়ই অবস্থান কর, বড় বেশী অগ্রে গমনকারী হয়ে গেছ, অথচ গভীরে প্রবেশ করা থেকে পলায়ন কর। না তুমি সঠিকভাবে ওদের মধ্যে প্রবেশ কর, আর ওদের ব্যাপারে না ধৈর্য ধারণ কর।"

অতঃপর হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি তাকে মৌখিকভাবে বলেন, 'তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বলতা প্রদর্শন করেছ। যখন খালিদ চলে যান তখন যারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন তিনি তাদেরকে বলেন, 'হযরত ওমর (রা) হযরত আলী (রা) হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। যদি আমি তাদের কথা মেনে নিতাম তাহলে খালিদ ইবনে সাঈদ থেকে প্রথমেই বেঁচে যেতাম।[১] অর্থাৎ তাকে প্রশাসক নিযুক্ত করতাম না।

গভর্নরদের কর্তব্য

বর্তমান যুগের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা)-এর শাসনকে শামরিক শাসন (Military Administration) বলা যেতে পারে।

---

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৯০।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যিনি যে অঞ্চলের গভর্নর বা প্রশাসক হতেন তিনিই সে অঞ্চলের সেনাবাহিনীর প্রধান হতেন। এই হিসেবে তখন একজন গভর্নরের দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মসজিদে নামাযের ইমামতি বিশেষ করে জুম'আর দিন খুতবা প্রদান।
২. সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ এবং তাদের মধ্যে বেতন ভাতাদি বন্টন।
৩. সর্বপ্রকার কর সংগ্রহ এবং আমদানী-রফতানীর মালামালের রক্ষণা-বেক্ষণ।
৪. আপন এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা।
৫. আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।
৬. বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং এতে যে গনীমতের মাল হস্তগত হবে তা মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বন্টন এবং এর পঞ্চমাংশ কেন্দ্রে প্রেরণ।
৭. প্রতি বছর হজ্জে গমনকারী কাফেলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
৮. অধিক বয়স্ক সৈন্যদের পেনশন এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা।
৯. কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং যতটুকু সম্ভব এলাকার কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা।

পদসমূহের বন্টন

একাকী একজন গভর্নরের উপর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হত না বরং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে প্রত্যেক শাখার জন্য পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হত। স্বয়ং হুযূর (সা)-এর যুগেও এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা)এই ব্যবস্থা বহাল রাখেন। যতদূর জানা যায়, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে প্রশাসক ও গভর্নর ব্যতীত নিম্নলিখিত পদগুলোর অস্তিত্ব ছিল। যেমন —

বিচারক

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা) বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা শিবলী "আল ফারূক"[১] এবং প্রফেসার হিট্টি "তারিখে আরব"[২] নামক গ্রন্থে এটাই লিখেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পদ বা বিভাগের অস্তিত্ব হুযূর (সা)-এর যুগেও ছিল। হাদীস গ্রন্থে كتاب الأقضية নামক শিরোনামে যে অধ্যায় রয়েছে তাতে এরূপ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এই পদের শর্তাবলী ও আদাব, সাক্ষীদের আহ্কাম

১. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৪৮।
২. চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩।

www.pathagar.com

ইত্যাদি খোদ হুযূর (সা)- বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যদিও বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর সিদ্ধান্তই কার্যকর হত, কিন্তু রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাই বিভিন্ন এলাকায় তিনি তাঁর পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ প্রদান করতেন। যখন হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামনের বিচারক নিয়োগ করা হয় তখন হযরত আলী (রা) আরয করেন, 'আমি অল্প বয়স্ক এবং বিচার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই।[১] আঁ-হযরত (সা) উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তোমার অন্তরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন এবং তোমার বাণীতে বিশুদ্ধতা দান করবেন। যখন তুমি দু'ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করতে চাও তখন উভয় পক্ষের সাক্ষী প্রমাণ না দেখে সিদ্ধান্ত নেবে না। এরূপ করলে যে কোন বিষয়ের সমাধান করা তোমার পক্ষে সহজ হবে।[২]

এমনিভাবে হুযূর (সা) যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'যখন তোমার নিকটে কোন মোকদ্দমা আসবে তখন তুমি কিভাবে এর সমাধান করবে? মু'আয উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী। অতঃপর হুযূর জিজ্ঞেস করেন, 'যদি কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে এর সমাধান না পাওয়া যায়? তিনি আরয করেন, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্র আলোকে। এবার হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করেন, যদি রাসূলের সুন্নাহ্ না পাওয়া যায়? তিনি উত্তরে বলেন, এই অবস্থায় আমি স্বীয় মতানুযায়ী ইজ্তিহাদ করব এবং এতে কোন রকম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেব না। তখন হুযূর (সা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর বুকে থাপপর মেরে বলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য যিনি আল্লাহ্র রাসূলের রাসূলকে সেই তাওফীক দান করেছেন যা আল্লাহ্র রাসূল পছন্দ[৩] করেন।"

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী (রা), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীকে বিচারকের কাজে নিয়োগ করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ইতিহাস গ্রন্থে এদেরকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে মুফতি বলা হত। যেমন আল্লামা মারাখুসী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন[৪] যে, প্রথম যুগে কাযীকে মুফতী বলা হত এবং এরাও বিচারকের কাজ করতেন।

তখন হযরত ওমর (রা) প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। সম্ভবত এ কারণেই ইতিহাসে হযরত ওমর (রা)-এর ক্ষেত্রে ইফ্তা নয় বরং কাযা (قضاء) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

---

১. চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩।

২. সুনানে আবিঃ দাউদঃ অধ্যায় - كيف القضاء

৩. সুনানে আবু দাউদঃ অধ্যায় - اجتهاد الرأي بالقضاء

৪. আল মাবসূতঃ ষোড়শ খণ্ডঃ পৃঃ ১০৯।

www.pathagar.com

"তাবারী" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন হযরত আবূ বকর (রা খলীফা নির্বাচিত হন তখন হযরত ওমর (রা) বলেন, إنا أكفيك القضاء আমি আপনার বিচারকের দায়িত্ব পালন করব। কিন্তু এটা যেহেতু খায়রুল কুরুন (خير القرون) বা উত্তম ও সোনালী যুগ ছিল তাই সারা বছর বিবাদ বিসম্বাদের কোন ঘটনাই হযরত ওমর (রা)-এর সামনে উপস্থিত[১] হয়নি।

'ইবনে আসীরে' উল্লেখ করা হয়েছে যে,[২]

وفيها استقضى أبو بكر عمر بن الخطاب وكان يقيض بين الناس خلافته

"ঐ বছরই হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-কে বিচারক (কাযী) নিয়োগ করেন এবং তাঁর খিলাফত পর্যন্ত তিনি (ওমর) বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।"

হযরত ওমর (রা) স্বাধীনভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মতেরও কোন গুরুত্ব দিতেন না। একদিন আকরা ইবনে হারিস ও উয়াইনা ইবনে হাসান হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে একটি পতিত জমি তাদেরকে প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। যেহেতু তারা উভয়ে দোদুল্যমান অন্তরের লোক ছিল তাই হযরত আবূ বকর (রা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এই জমির দলীল তাদের নামে লিখে দেন। তখন তারা খলীফার নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্য হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আসে। কিন্তু হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে নির্দেশটি তাদের হাত থেকে নিয়ে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন হুযূর (সা) সেইযুগে তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করতেন যখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে, অতএব তোমাদের যা খুশি করতে পার। তখন উভয়ে সেখান থেকে সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসে এবং বলে, 'খলীফা কি আপনি, না ওমর (রা)? হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, 'খলীফা ওমর হতেন যদি তিনি ইচ্ছা করতেন। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে সেখানে পৌছেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আপনি এদেরকে কিভাবে এই জমি দান করলেন? এটার মালিক আপনি, না সমগ্র মুসলমান? তিনি বললেন, সমগ্র মুসলমান। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, 'তাহলে কিভাবে আপনি এই দু'জনকে তা দান করলেন? হযতর আবূ বকর (রা) বলেন, এই সময় যারা আমার নিকট উপস্থিত ছিল তাদের সাথে পরামর্শ করেছি। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় সিদ্ধান্ত তুলে নেন এবং হযরত ওমর (রা)-এর সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন।[৩] বরং একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর লিখিত দলীল ছিড়ে ফেলেন। অতঃপর উয়াইনা

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৭।

২. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৬০।

৩. আল ইসাবাঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৬। ذكر عيينة بن حصن الفزاري

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে অন্য একটি দলীল লিখে দেয়ার আবেদন করে। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, لا احدد شيئا رده عمر আমি এখন কিছু নবায়ন করতে পারব না যা, হযররত ওমর (রা) রদ করে দিয়েছেন।[১]

একটি তথ্য

উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, হযরত ওমর (রা)-এর যুগে যেভাবে বিচার বিভাগ (Gudicial)-কে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছিল, হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে এরূপ ছিল না। কিন্তু বিষয়টির মূল প্রেরণা ও অনুভূতির দিকটি বিবেচনা করলে বলতেই হয় যে, এদু'টি বিভাগ পরস্পর থেকে পৃথক হওয়াই উচিৎ, যেমন উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগে হয়ে থাকে। মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও এই বিচার ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

প্রধান মন্ত্রী

ঐ যুগে প্রশাসনের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী যদিও মন্ত্রীত্বের পদ ছিল না। কিন্তু মন্ত্রীত্বের যে দায়িত্ব রয়েছে তা হযরত ওমর (রা)-এর উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশেষ উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে মদীনায় নিজের সাথেই রাখতেন। যুদ্ধ উপলক্ষে প্রেরণ করতেন না। উসামা-বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণের জন্য হুযূর (সা) যাদের নাম ঘোষণা করেছিলেন হযরত ওমর (রা)ও ছিল তাদের অন্যতম; কিন্তু বাহিনী রওনা হওয়ার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতের কাজে হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁকে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য হযরত উসামা (রা)-কে অনুরোধ করেন।[২]

কোষাগার বিভাগ

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগেই কোষাগার প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সকল ব্যবস্থাপনা হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর উপর ন্যস্ত করেন। তিনি বায়তুল মালের আমদানী ও ব্যয়ের হিসেব রাখতেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সুতরাং প্রথম খলীফার ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, প্রথম হতে এই পর্যন্ত কোষাগারে কি পরিমাণ মাল আমদানী হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন, দু'লাখ দিনার।"[৩]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দা ঃ পৃঃ ২২৭।
২. তারীখে ইয়াকুবী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৪২।
৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৫১।

www.pathagar.com

হস্তলিপি বিভাগ

সে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও আহ্কাম যেহেতু কাতিবকে লিখিত হত তাই তখন হস্তলিপি বিভাগটি ছিল খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। হযরত আবূ বকর (রা) প্রয়োজন অনুযায়ী তার নিকট উপস্থিত লোকদের দ্বারা এই কাজ সমাধান করতেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান[১] (রা) এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রশাসকদের নামে নির্দেশাবলী প্রেরণের পদ্ধতি

প্রশাসকদের কাছে নির্দেশ প্রেরণের যে পদ্ধতি হুযূর (সা) গ্রহণ করেছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) সে পদ্ধতিই বহাল রাখেন। অর্থাৎ من أبي بكر إلى فلان দ্বারা তিনি আরম্ভ করতেন। এই পদ্ধতি খিলাফতে রাশেদার পর বনু উমাইয়ার প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যখন ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক খলীফা হন তখন তিনি এই পদ্ধতি বদলে দেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন, 'লোকজন যেন আমাকে সেভাবে সম্বোধন না করে যে ভাবে তারা পরস্পরকে সম্বোধন করে থাকে।[২]

ফতওয়া বিভাগ

ইফ্তা অর্থাৎ শরীয়তের আহ্কাম প্রচার ও ফতওয়া প্রদানের জন্য তাকওয়া ছাড়াও ফিক্হী জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এটা এমন একটা সম্পদ যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকেন। কোন দীনী আলিম এ থেকে অজ্ঞ থাকতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে যাদেরকে ফকীহ্ বলে মনে করা হত এবং ফতওয়া বিভাগের দায়িত্বে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের নাম হলঃ হযরত আলী (রা), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)।[৩]

পুলিশ

তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পুলিশ বিভাগের মত পৃথক কোন বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোন প্রয়োজনও ছিল না। তবুও উপস্থিত চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকজন বীর বাহাদুরকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়। উসামা বাহিনী মদীনা হতে রওনা হওয়ার পর কোন কোন গোত্রের পক্ষ হতে মদীনা আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবীকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়।

---

১. তাবারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১৭।

২. العقد الفريد باب التوقعات فصل استفتاح الكتب

৩. তারীখে ইয়াকুবী : ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭।

www.pathagar.com

প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশাবলী

হযরত আবূ বকর (রা) যখন কোন ব্যক্তিকে কোন দায়িত্ব দিতেন কিংবা কোন পদে নিয়োগ করতেন তখন তাঁর কাছে তার দায়িত্বগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তার কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করতেন। হযরত উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত বাহিনী যখন সিরিয়ার দিকে রওনা হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হয় তখন তিনি তাদেরকে থামিয়ে নিম্নলিখিত দশটি হিদায়ত প্রদান করেন[১]

أيها الناس قفوا أوصيكم بعشرة فاحفظوها عني ولا تخوفوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بانية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها اندفعوا بسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون

"লোক সকল, তোমরা একটু থাম, আমি তোমাদেরকে দশটি ওসীয়ত করব, তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। খিয়ানত করবেনা, ধোঁকাবাজি করবে না, বিদ্রোহ করবে না, শত্রুদের হাত পা কর্তন করবে না, শিশু বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না, খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না, ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না, বকরী, গাভী এবং উট, খাবার প্রয়োজন ব্যতীত যবেহ্ করবে না। তোমাদের সাক্ষাৎ এরূপ লোকদের সাথে হবে যারা তাদের জীবনকে ইবাদতখানার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তোমরা তাদেরকে কিছু বলবে না, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছিড়ে দিবে। এরূপ লোকদের সাথেও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা তোমাদের জন্য বিভিন্ন খানা নিয়ে হাযির হবে। যখন তোমরা ঐ খানা খাবে তখন অবশ্যই আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে। যাও আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে রওনা হও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে শত্রুদের বর্শা ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন।

এমনিভাবে সিরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় বাহিনী প্রধান হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে বিস্তারিত হিদায়ত প্রদান করেন। এটা যদিও দীর্ঘ কিন্তু এতে নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে বিশ্ববাসীর অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাই নিম্নে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল ঃ

عليك بتقوى الله فإنه يرى من بطنك مثل الذي من ظاهرك وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله وقد وليتك عمل خالد فإياك و عبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض أهلها وإذا قدمت على جندك

---

১. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৬৩।

www.pathagar.com

فأحس صحبتهم وإبدائهم بالخير وعدهم إياه وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكـلام ينسي بعض بعضا وأصلح نفسك يصلح لك الناس وصل الصلوات لأوقاها بإتمـــام ركوعها وسجودها والتخشع فيها وإذا قدم عليك رسول عدوك فأكرمهم ولبثلـــل قهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا ترينهم فيرى خللك ويعلمــــوا علمك وأنزلهم في ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم وكن أنـــت المتـــولي لكلامهم ولا تعجل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك وإذا استشرت فاصدق الحديـــث تصدق المشورة ولا تخزن عن المشير خيرك فتوتي من قبل نفسك واسمـــر بـــالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عنك الأستار وأكـــثر حرســـك وبددهـــم في عسكرك وأكثر مفاجاقم في محارسهم بغير علم منهم بك فمن وجدته غفل عــــن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط وأعقب بينهم بالليل واجعل النوبـــة الأولى أطول من الآخرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار ولا تخف من عقوبة المســـتحق ولا تلجن فيها ولا تسرع إليها ولا تتخذ لها مدفعا ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفســده ولا تجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن النـــاس واجتنب الغول فإنه يقرب الفقرويدفع النصر وستجدون أقواما حبسوا أنفســـهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له.[১]

"তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা তিনি তোমার ভেতর-বাহির একইভাবে দেখতে পান। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসেন। আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে তাঁর আমলের দ্বারাই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছে। আমি তোমাকে হযরত খালিদ (রা)-এর দায়িত্ব প্রদান করেছি; তুমি জাহেলিয়াতের কাজ ও কথা থেকে দূরে থাক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লোকদের উপর গযব নাযিল করেন। যখন তুমি তোমার সৈন্যদের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং সদ্ব্যবহারের সাথে কাজ আরম্ভ করবে এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবে। যখন তাদেরকে উপদেশ প্রদান করবে তখন সংক্ষিপ্তভাবে তা শেষ করবে। কেননা অধিক কথা মানুষ ভুলে যায়। নিজকে সংশোধন কর তাহলে লোকজন তোমার অনুগত থাকবে। নির্ধারিত সময়ে পূর্ণাঙ্গ রুকূ, সিজদা ও আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় কর। যখন শত্রুদের দূত তোমার নিকট আগমন করবে তখন তাকে সম্মান

১. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ড: পৃ: ৩৭৭।

www.pathagar.com

প্রদর্শন কর এবং তাকে সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান করতে দাও। যেন সে তোমাদের সৈন্যদের সংবাদ অবগত হতে না পারে। তাদেরকে তোমার সেনাবাহিনী দেখাবে না নতুবা সে তোমাদের দুর্বলতা দেখে ফেলবে এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। এই সমস্ত দূতকে উত্তম জায়গায় অবস্থান করতে দাও এবং তাদেরকে তোমাদের লোকদের সাথে আলাপ করতে দিও না। তুমি নিজে তাদের সাথে আলাপ কর। স্বীয় গোপন বিষয় কারো নিকট প্রকাশ কর না। নতুবা কাজে বিশৃংখলা দেখা দেবে। সত্য কথা বল তা হলে তোমার পরামর্শ সঠিক হবে। পরামর্শদাতার নিকট কোন বিষয় গোপন রেখ না নতুবা দায়িত্ব তোমার উপর এসে পড়বে। রাতে সঙ্গীদের সাথে আলাপ কর তাহলে বিভিন্ন বিষয় অবগত হতে পারবে এবং অনেক গোপন বিষয়ের সংবাদ পাবে। নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা অধিক করে তাদেরকে বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দাও। এবং কোন কোন সময় তাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ করে তাদের পাহারার স্থানে গিয়ে পরিস্থিতি যাচাই কর। তাদেরকে কর্তব্য কাজে গাফেল দেখলে ভালভাবে সতর্ক করে দাও এবং সামান্য পরিমাণ শাস্তিও দাও। রাতে তাদের দায়িত্ব পালাক্রমে বন্টন করে দাও। প্রথম পালা দ্বিতীয় পালার চেয়ে দীর্ঘ করবে। কেননা এটা দিনের সাথে জাড়িত বলে অধিক সহজ হবে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা দেখাবে না। শাস্তির ব্যাপারে অধিক কালক্ষেপণ করবে না এবং তাড়াহুড়াও করবে না। স্বীয় বাহিনীর ব্যাপারে গাফিল হবে না নতুবা তুমি তাদেরকে খারাপ করে ফেলবে। আর অধিক পরিমাণে তাদের খোঁজও নিও না। নতুবা তুমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। লোকদের গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করবে না। তাদের বাহ্যিক অবস্থাকে মেনে নেবে। বেকার ও অকর্মণ্য লোকদের সাথে বসবে না। সত্যবাদী লোকদের সাথে উঠাবসা করবে। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করবে, দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না। নতুবা লোকজন তোমাকে দুর্বল মনে করবে। খিয়ানত থেকে বেঁচে থাক, কেননা খিয়ানত দারিদ্রের কারণ হয়ে থাকে। এমন লোকদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে যারা ইবাদত খানায় বসে আছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে।

তাকওয়া ও পবিত্রতার নির্দেশ

হযরত আবূ বকর (রা) পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক হিদায়াত প্রদান করতেন। প্রতিটি খুতবায়, প্রতিটি ফরমান ও পত্রে এবং প্রতিটি সভা ও মাহফিলেও তিনি তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।

যেমন হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ও হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যখন তিনি বনু কুদায়া গোত্রের কাছ থেকে সাদকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন তখন তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে নিম্ন লিখিত হিদায়াত প্রদান করেন।

www.pathagar.com

اتق الله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فإن تقوى الله خير ما تواصي به عباد الله - أنك في سبيل من سبيل الله لا يسعك فيه إلا دهان والتفريط والغلقة مما فيه توام دينكم وعصمة أمركم فلا تن ولا تفتر [1]

"গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য সব কিছু সহজ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিযক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করে নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তার পুরস্কার বৃদ্ধি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্-ভীতির জন্য নসীহত (বান্দাহ্‌দের জন্য) একটি অতি উত্তম নসীহত। তোমরা আল্লাহ্‌র এমন পথে রয়েছ যেখানে বেশী-কম বা বাড়াবাড়ির কোন অবকাশ নেই বরং দীনের স্থায়িত্ব ও খিলাফতের নিরাপত্তার রহস্য নিহত রয়েছে। সুতরাং তোমরা দুর্বলতা ও আলস্য ইখতিয়ার করো না।

· হযরত আবূ বকর (রা) ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানাকে হিদায়াত করতে গিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এ নিম্নলিখিত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন-[2]

ومن أعطى الله أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله

"যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ চারণক্ষেত্র (কোন পদ) প্রদান করে এবং সে নিজের কোন অধিকার ছাড়া ঐ চারণক্ষেত্রে অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করে (পদে ও দায়িত্বে খিয়ানত করে) তা হলে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত পতিত হবে।

প্রশাসক ও আমীরদের কাজের মূল্যায়ন

বিস্তারিত নির্দেশ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যতদূরেই অবস্থান করুন না কেন, হযরত আবূ বকর (রা) তার কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কারো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতেন। মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া সম্পর্কে যখন তিনি জানতে পারেন যে, মুসলমানদেরকে গালি দেয়ার অভিযোগে তিনি জনৈক মহিলার দাঁত উপড়ে ফেলেছেন তখন সাথে সাথে তাকে ভর্ৎসনা করে পত্র লিখেন। সর্বশেষ এটাও লিখেন যে, তোমার এই অন্যায় যেহেতু প্রথম তাই এবারের মত মার্জনা করা হল। নতুবা শাস্তি প্রদান করা হত।[3]

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে অত্যন্ত সম্মান করতেন। এতদসত্ত্বেও ইয়ামামার যুদ্ধের পর যখন তিনি মুজাআর কন্যাকে বিয়ে করেন তখন তিনি (হযরত আবূ বকর (রা)) তাকে সতর্কতামূলক পত্র লিখেন -

১. তাবারী : ২য় খণ্ড: পৃঃ ৫৮৮।
২. মুসনাদে আহমদ : ১ম খণ্ড: পৃঃ ৬।
৩. তাবারী : ২য় খণ্ড: পৃঃ ৫৫০।

www.pathagar.com

لعمري يا ابن خالد انك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومئتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد –

"হে উম্মে খালিদের পুত্র! নিঃসন্দেহে তোমার অন্তর অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তুমি এমন সময় বিয়ের আনন্দ উপভোগ করছ যখন তোমার ঘরের আঙ্গিনায় বারো'শ মুসলমানের রক্ত এখনো শুকায়নি।"[১]

তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই পত্রটি এরূপ ক্রোধপূর্ণ ছিল যে, মনে হচ্ছিলো যেন এ থেকে রক্ত ঝড়ে পড়ছে।

এরপর ইরাকে, ফারাজের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই হযরত খালিদ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুমতি ব্যতীত যখন হজ্জে আসেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তা জানতে পারেন তখন তিনি তাকে সংগে সংগে নিন্দাসূচক পত্র লিখেন। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা)-এর এই অন্যায়ের কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।[২]

সাধারণ ভুলত্রুটি উপেক্ষা

একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রতিটি কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। যদি কারো কোন ত্রুটি প্রকাশ পায় তা হলে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। সাথে সাথে সামান্য ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করার ধৈর্যও থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে সতর্ক করতে হবে তবে সামান্য ব্যাপারে নিন্দা করা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিরুদ্ধ। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে মূল্যায়ন ক্ষমতার সাথে সাথে এই গুণও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। "তাবারী" গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وكان ابو بكر لايقيد من عما له ولا وزعته [৩]

"হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় রাজ্যের প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের উপর খুব বেশী খবরদারী করতেন না।

প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগ হতেই প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজন মাফিক বেতন ভাতা প্রদানের রীতি চালু হয়েছিল। পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদেরকে বেতন ভাতা ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, খাদেম ইত্যাদি সরবরাহ করা হ'ত।

---

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৯৯।
২. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৮৪।
৩. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫০৩।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গভর্নর হবে, তার স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, চাকর না থাকলে চাকর নিয়োগ করতে পারে, ঘর না থাকলে ঘর তৈরি করতে বা ভাড়া করতে পারবে, আরোহণের কোন জন্তু না থাকলে তাও গ্রহণ করতে পারে। যে এরচেয়ে অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় খিয়ানতকারী অথবা চোর[১]

গভর্নর বা অন্য কোন পদাধিকারী তো দূরের কথা, স্বয়ং খলীফা সম্পর্কেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র সম্পদ থেকে খলীফার জন্য মাত্র দু'পেয়ালা গ্রহণ করা জায়েয। এক পেয়ালা পরিবারবর্গের জন্য এবং দ্বিতীয় পেয়ালা লোকদের মেহমানদারীর জন্য।[২]

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে ইতাব ইবনে উসায়দ (রা) মক্কার প্রশাসক ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। প্রতি মাসে তিনি ত্রিশ দিরহাম ভাতা পেতেন[৩] প্রকাশ থাকে যে, এই সামান্য ভাতা দ্বারা কোন মতে মৌলিক প্রয়োজন মিটানো যেত, এ থেকে অর্থ জমা করার কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র দু'টি কাপড় যা তিনি তাঁর গোলাম কায়শানকে পড়িয়ে দেন।[৪]

হুযূর সা)-এর যুগের চাইতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে রাষ্ট্রীয় আমদানি অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে বেতন ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। হযরত আবূ বকর (রা) (মৌলিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে) সবার বেতন ভাতা সমান রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ইয়াকূবী বলেন,

وقسم أبو بكر بين الناس بالسوية لم يفضل أحدا على أحد [৫]

"হযরত আবূ বকর (রা) লোকদের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করতেন। একের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেন না।"

একদিন কিছু মাল আসল। তিনি তা নিয়মানুযায়ী সমপরিমাণে বণ্টন করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি। আমি হুযূর সা)-এর যুগে যে সমস্ত জিহাদ করেছি শুধু আল্লাহ্রই[৬] সন্তুষ্টির জন্য ছিল।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাতা

হযরত আবূ বকর (রা) প্রথমত কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু যখন খিলাফতের কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়

---

১. কানজুল উম্মাল, (টীকা)মুসনাদে আহমদ : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৪২।
২. কানজুল উম্মাল, (টীকা)মুসনাদে আহমদ : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৪২।
৩. আত তারাতিবুল ইদারিয়া লিল কাত্তানী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ২৬৪।
৪. আল ইসাবাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৪।
৫. আল-ইসাবাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৫৪।
৬. কিতাবুল আমওয়াল : পৃঃ ২৬২।

www.pathagar.com

তখন আর ব্যবসা করার সুযোগ ছিল না। কেননা এতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্নতার সৃষ্টি হ'ত। তাই হযরত ওমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবীদের অনুরোধে হযরত আবূ বকর (রা) নিজের জন্য মৌলিক প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই ভাতার পরিমাণ ছিল কত? এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে —

তারিখে ইয়াকূবীর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি দৈনিক তিন দিরহাম গ্রহণ করতেন।[১] কোন কোন বর্ণনামতে তিনি ছয় হাযার দিরহাম গ্রহণ করতেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র খিলাফতকালে স্বীয় ঘরের খরচের জন্য ছয় হাযার দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইন্তিকালের সময় তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁর পরিত্যক্ত মাল বিক্রি করে উক্ত টাকা বায়তুলমালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।[২]

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যাচ্ছে, প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবীদের অনুরোধে স্বীয় ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে এটা নিয়মিত গ্রহণ করতেন না। তার জীবন-যাপন খুবই সহজ ছিল, ঘরের প্রয়োজনও ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত এবং শুধু প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা গ্রহণ করতেন। যদি নিয়মের বাহিরে হঠাৎ কোন প্রয়োজন হয়ে পড়ত তখন নির্ধারিত ভাতার চেয়ে অধিক গ্রহণ করতেন। কিন্তু যা কিছু করতেন তা মজলিশে শূরার পরামর্শ ও তাদের অনুমতি নিয়েই করতেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের উল্লেখ কি কোথাও আছে?

অর্থ ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়

হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে প্রধানত আরব উপদ্বীপের আভ্যন্তরীণ স্থায়ীত্ব, জাতীয় ঐক্য এবং বাইরের আক্রমণ থেকে এর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাই হযরত ওমর (রা)-এর মত তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর, প্রত্যেক দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক প্রশাসক নিয়োগ এবং এর জন্য বিধি-বিধান তৈরির সুযোগ হয়ে উঠেনি। তাই হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সেই কার্য পদ্ধতি ও সরলতা পাওয়া যায় যা হুযূর (সা)-এর পবিত্র যুগে ছিল। অতএব হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা জানতে হলে স্বয়ং হুযূর (সা)-এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা অধ্যায়ন করতে হবে।

হুযূর (সা)-এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা

অন্যান্য আহকামের মত ধন-সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত আহকামও একবারে নাযিল হয়নি বরং তা প্রয়োজনানুযায়ী ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে অথবা হুযূর (সা)-এর

---

১. তারিখে ইয়াকূবীঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৫৪।
২. কিতাবুল আমওয়াল ঃ পৃঃ ২৬৭।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ নির্দেশে কার্যকরী হয়েছে। একেবারে প্রথম যুগের বাধ্যতামূলক কোন অর্থব্যবস্থা ছিল না বরং তা ছিল দাওয়াতের মতই এক ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কাজ। হুযূর (সা) যখন মক্কায় ছিলেন তখন বিভিন্ন কাজে অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় কর, যদিও খেজুরের একটি টুকরা মাত্র হয়।"[১] পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা রয়েছে। অতঃপর হুযূর (সা) যখন হিজরত করেন এবং সাহাবা কিরাম বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন, তখন মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। আর এটা অর্থ ব্যতীত সম্ভব ছিল না। আঁ-হযরত (সা) এই জরুরী সমস্যাকে এমনি উত্তমভাবে সমাধান করেন, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের শর্ত ছিল এই যে, মুহাজির ও আনসার জীবিকা অর্জনের জন্য একত্রে কাজ করবে, এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে একে অপরের অংশীদার হবে। এভাবে মুহাজিরদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হলো কিন্তু অন্য কাজের জন্যও তো অর্থের প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় সাদকা খয়রাতকে উত্তম কাজ বলে ঘোষণা করা হলো এবং সাদকাহ্ খয়রাত আদায় করার একটি নীতিও নির্ধারিত হলো। আদায়কৃত এই সাদকা খয়রাতও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। এই সাদকা খয়রাত হুযূর (সা) এবং বনু হাশিমের জন্য হারাম ছিল। হুযূর (সা) এমনিভাবে ঐ সমস্ত অসৎ উদ্দেশ্যের মূলোৎপাটন করেন যা সাধারণভাবে পাবলিক ফান্ডের নামে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এখানো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যসমূহের ধারণা এই যে, জন-সাধারণের যে অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হয় তার মালিক হচ্ছেন বাদশাহ্। তিনি এই অর্থ নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারেন।

সর্বপ্রথম ২য় হিজরীতে সাদকায়ে ফিত্র ওয়াজিব হয়। অতঃপর সাদকাহ্ খয়রাতের সাধারণ আহকাম নাযিল হয়। লোকজন জিজ্ঞেস করল, হুযূর (সা), আমরা কি পরিমাণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব? হুযূর (সা) ইরশাদ করেন, "মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকে,

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلِ الْعَفْوَ -

অতঃপর যখন মুসলমানরা বিভিন্ন দেশ জয় করে, তখন বিভিন্ন এলাকার ভূমি ও জায়গীর তাদের হস্তগত হয় এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্যও প্রসার লাভ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসে —

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪০।

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসীগণ! যে হালাল বস্তু তোমরা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করে থাকি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।" (বাকারা)

কিন্তু যেহেতু ঐ সময় পর্যন্ত আরব আনুগত্য প্রকাশ করেনি, বরং ইসলাম শুধু একটি বিপ্লবের পর্যায়ে ছিল এবং সাংবিধানিকভাবে কোন রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি—তাই তখন পর্যন্ত অর্থের আয়-ব্যয়ের কোন বাঁধাধরা বিধি-বিধানও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর এর পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে প্রথমে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয় —

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا -

"ওদের সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"

৮ম হিজরীর শেষ দিক সূরাহ্ তাওবার ঐ আয়াত নাযিল হয় যাতে যাকাতের আহ্কাম, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, এবং জিযিয়ার আহ্কাম বর্ণিত হয়। এর আলোকে ৯ম হিজরীতে আঁ-হযরত (সা) যথারীতি যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন এবং যাকাতের আহ্কাম তথা বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সমস্ত আহ্কামের সাথে বিভিন্ন প্রশাসককে যাকাত আদায় করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের নিকট পাঠানো হয়। এটা ঐ সময়কার কথা যখন যাকাতের অবস্থা ছিল অনেকটা রাষ্ট্রীয় টেক্স (State duty)-এর মত। ঐ সময় বায়তুলমালও স্থাপন করা হয়।

যাকাতের হার

সম্পদের উৎস তিনটি যথা—স্বর্ণ-রৌপ্য, জন্তু এবং জমির উৎপন্ন দ্রব্য। আঁ-হযরত (সা) এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক যাকাতের হার নির্ধারণ করেন। স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের হার ৪০/১অংশ এবং জীব জন্তুর যাকাতের হার রকম ও শ্রেণী অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়। যেমন উটের ক্ষেত্রে যাকাতের হিসাব হচ্ছে পাঁচ। এর চেয়ে কম হলে সেগুলোতে যাকাত ওয়াজিব নয়। পাঁচ হতে নয় উট পর্যন্ত একটি বকরি, দশ হতে চৌদ্দটি উটের জন্য দু'টি বকরী, পনের হতে উনিশ পর্যন্ত তিনটি বকরী, বিশ হতে চব্বিশ পর্যন্ত চারটি বকরী, পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটের জন্য এক বছরের একটি বাচ্চা উট, ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দু'বছরের উট, ছিয়াল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত তিন বছরের একটি উট, একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত চার বছরের একটি উট, ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দু'বছরের দু'টি উট, একানব্বই থেকে একশো বিশ পর্যন্ত তিন বছরে দু'টি উট, একশত বিশের পর প্রত্যেক চল্লিশটির জন্য দু'বছরের একটি উট, অতঃপর প্রতি পঞ্চাশটির জন্য তিন বছরের একটি উট। এমনি ভাবে বকরী, গাভী এবং মহিষের সম্পর্কে বিস্তারিত আহ্কাম রয়েছে।

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা)-এ সমস্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একটি বিশেষ ফরমানের মাধ্যমে জারী করেছিলেন কিন্তু তা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণের পূর্বেই তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আঁ-হযরত (সা)-এরপর হযরত আবূ বকর (রা)-এটা কার্যকর করেন এবং ফরমানের অনুলিপি সাদকা আদায়কারীদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) তার (আবদুল্লাহ্‌র) পিতা হযরত আনাস (রা)-কে সাদকা আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করার সময় একটি লিপি দেন যার উপর হুযূর (সা)-এর মোহর অঙ্কিত ছিল। হযরত আনাস (রা) সেটা খুলে দেখতে পান যে, তাতে জীবজন্তুর যাকাত সম্পর্কেও বিস্তারিত আহ্‌কাম রয়েছে।[১]

ভূমি কর

ভূমি যদি মুসলমানদের মালিকানাধীন হয় তাহলে তা দু'প্রকার। একঃ যা চাষাবাদ করতে নদী হতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকায় বা মৌসুমী আবহাওয়ার কারণে কৃষককে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করতে হয়। দুইঃ যা চাষাবাদ করতে কৃষককে কূপ থেকে পানি উঠাতে হয়। ফলে তাকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। প্রথম প্রকার আবাদী ভূমির উপর উশর অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ প্রদান করতে হবে। সেটা টাকার হিসেবেও হতে পারে। আবার বস্তুর হিসেবেও হতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ভূমির কর উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ।

লাগান-ইজারাহ্

রাষ্ট্রের আমদানির অপর একটি মাধ্যম হ'ল লাগান-ইজারাহ্ বা ঠিকা। এর ব্যাখ্যা এই যে, ভূমির কোন একটি অংশ কোনরূপ কারবারের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হ'ত। শর্ত থাকত এই যে, এই কারবারের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ বায়তুল-মালে প্রদান করা হবে। যেমন বনূ মাতয়ান গোত্রের হেলাল নামক এক ব্যক্তি মৌমাছির চাষের জন্য হুযূর (সা)-এর নিকট সাল্‌বাহ্ নামক একটি বিস্তীর্ণ ভূমি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। হুযূর (সা) উৎপন্ন মধুর এক দশমাংশ বায়তুল মালে প্রদানের শর্তে তার আবেদন মঞ্জুর করেন। হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে তায়েফের গভর্নর সুফিয়ান ইবনে ওয়াহ্‌হাব খলীফার নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এই ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর যুগে যেভাবে উশর আদায় করত যদি এখনো সেভাবে করে তাহলে এই ভূমি তাকে এখনো ইজারাহ্ দেয়া যেতে পারে। নতুবা বিস্তীর্ণ এই ভূমির মৌমাছি জঙ্গলের অন্যান্য মৌমাছির মতই-যে ব্যক্তি ইচ্ছা এগুলোর মধুও পান করতে পারে।[২]

---

১. সুনানে আবিদাউদঃ কিতাবুযযাকাতঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৫।

২. আবূ দাউদঃ কিতাবুল যাকাতঃ পৃঃ ২৫৩।

www.pathagar.com

খেরাজ বা রাজস্ব

মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের ফলে খেরাজ বা রাজস্ব ইসলামী রাষ্ট্রের আমদানির একটি বড় উৎসে পরিণত হয়। খেরাজ, সম্পদ বা ভূমির উৎপাদনের ঐ নির্ধারিত অংশ, যা বিজিতদের ভূমির উপর মাশুল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আঁ-হযরত (সা) যখন খায়বার জয় করেন তখন সেখানকার লোকেরা বলে, "আমরা এই ভূমির মালিক, এর চাষাবাদ এবং এতে ফসল উৎপাদন তোমাদের চেয়ে ভাল জানি, অতএব ভাগাভাগির মাধ্যমে এই ভূমির ব্যাপারটি আমাদের সাথে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আধা-আধি ফসলের উপর বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। ফিদাকের লোকজন যখন এই ঘটনাটি জানতে পারে তখন তারাও অনুরূপভাবে তাদের জমির ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করতে চায়। হুযূর (সা) তাদের আবেদনও মঞ্জুর করেন।[১]

হযরত আবূ বকর (রা) তার খিলাফত আমলে ঐ সমস্ত লোকদের সাথে একই ব্যবস্থা বহাল রাখেন।[২] কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার যে অঞ্চল তাঁর আমলে বিজিত হয়, তিনি সে অঞ্চলের জমির উপর মোটামুটিভাবে খেরাজের একটি হার নির্ধারণ করে দেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রনায়কের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে বিজিত জমির উপর ভাগাভাগির ভিত্তিতে অথবা একটি নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ করতে পারেন। মোটকথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই নির্দেশ বা ব্যবস্থা ঐ সময় কার্যকরী হতে পারে যখন তরবারীর জোরে তথা যুদ্ধের মাধ্যমে ভূমি বিজিত হয় এবং ইমাম বা নেতা কর্তৃক তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়ে না থাকে।

জিযিয়া

এই টেস্কও অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা হ'ত। খেরাজ (রাজস্ব) ও জিযিয়ার মধ্যে পার্থক্য এই যে, খেরাজ সম্পর্কে কুরআনে কোন আয়াত নেই, আঁ-হযরত (সা)-এর সুন্নাহ্ ও আমলের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বয়ং কুরআনে জিযিয়ার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, খেরাজ হল ভূমির কর। ভূমির মালিক মুসলমান হয়ে গেলেও এই কর বহাল থাকে। কিন্তু জিযিয়া হলো অমুসলিমের উপর আরোপিত কর। এটা মুসলমানদের উপর আরোপিত যাকাতের মত। যদি অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার উপর থেকে জিযিয়া কর রহিত করা যায়।

হযরত ওমর (রা)-এর যুগে জিযিয়ার সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয়। হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত ছিল না, বরং সহজ পদ্ধতিতে যার কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব, তাই গ্রহণ করা হ'ত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে —[৩]

---

১. কিতাবুল খেরাজঃ কাযী আবু ইউসুফঃ পৃঃ৫১-৫২।
২. কিতাবুল খেরাজঃ পৃঃ ৫০।
৩. কিতাবুল খেরাজঃ কাযী আবু ইউসুফঃ পৃঃ ১২৩।

www.pathagar.com

ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو –

"যিম্মীদের সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ করা হবে যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়।"

ইয়ামনবাসীদের পেশা, ব্যবসা হওয়ার কারণে তারা সুখী ও সম্পদশালী ছিল, তাই তাদের উপর বাৎসরিক এক দিনার জিযিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১] নাজরান ও বাহরাইনের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতেও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে হিরা সন্ধিসূত্রে বিজিত হয়েছিল তাই সেখানে খেরাজ নির্ধারণের কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য হযরত খালিদ (রা) বাৎসরিক দশ দিরহাম হিসেবে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেন এবং তা মদীনায় প্রেরণ করেন।[২]

ফাই ও গনীমত

ফাই ও গনীমতও রাষ্ট্রীয় আয়ের এক একটি মাধ্যম। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফাই ঐ মালকে বলা হয় যা কোন শত্রু পক্ষের কাছ থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই অর্জিত হয়, আর যুদ্ধ বিগ্রহের পর শত্রু পক্ষের কাছ থেকে যে সম্পদ হস্তগত হয় তাকে গনীমত বলা হয়। আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে এটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হ'ত। তন্মধ্যে চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত এবং বাকী এক ভাগকে পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হ'ত। এর মধ্যে প্রথম ভাগ ছিল আল্লাহ্ ও তার রসূলের, দ্বিতীভাগ হুযূর (সা)-এর আত্মীয়দের, তৃতীয় ভাগ ইয়াতিমদের, চতুর্থ ভাগ মিস্‌কিনদের এবং পঞ্চম ভাগ মুসাফিরদের। হুযূর (সা)-এর যুগে এভাবেই বণ্টন করা হত।

জায়গীর প্রদান

হুযূর (সা)-এর যুগে জায়গীর প্রদানের প্রচলন ছিল। এর পদ্ধতি ছিল এই যে, হুযূর (সা) কোন ব্যক্তিকে একটি ভূমি এই শর্তে প্রদান করতেন যে, সে জমি চাষাবাদ করবে এবং এর আমাদানির একটি অংশ বায়তুল মালে জমা দেবে।[৩] একবার তিনি মুযীনা গোত্রের কয়েকজন লোককে একটি ভূমি প্রদান করেন। কিন্তু তারা সেটা চাষাবাদের কষ্ট স্বীকার করে নি। ফলে অন্য লোকেরা তা চাষাবাদ করে। অতঃপর মুযীনা গোত্রের লোকেরা ঐ ভূমি তাদের অধিকারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঘটনাটি হযরত ওমর (রা)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি রায় দেন, যে ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কোন জমি অনাবাদ রাখে, অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তা চাষাবাদ করে, এমতাবস্থায় ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিই ঐ জমির হকদার।[৪]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৭।
২. কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৭।
৩. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবু উবায়দাহ ঃ পৃঃ ২৭২।
৪. আল খততঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৮২। এছাড়া মাত্তাওরদীর আল আহকামুল সুলতানীয়া গ্রন্থের ১৮১ পৃঃ হতে ১৮৫ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা)ও এই পদ্ধতি বহাল রাখেন। একবার হুযূর(সা) ইয়ামামাহ্‌র মুজাআহ্‌ নামক এক ব্যক্তিকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ ফরমানের মাধ্যমে ইয়ামামাহর কিছু ভূমি প্রদান করেন। ফরমানে তিনি এটাও লিখে দেন যে, " কেউ তোমার সাথে বিবাদ করলে আমার কাছে আসবে।" আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর মুজাআহ্‌ ইবনে মারারাহ্‌ হযতর আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরো ভূমির জন্য আবেদন করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) খাদরামাহ্‌ নামক একটি ভূমি তাকে প্রদান করেন।[১]

একবার হযরত আবূ বকর (রা) হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি দলীল লিখে দেন। হযরত তালহা (রা) এই দলীল নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে যান, এবং তাতে মোহর লাগিয়ে দেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তা অস্বীকার করে বলেন, 'অন্যান্য লোকদের বাদ দিয়ে শুধু তোমাকেই কি এই সব ভূমি প্রদান করা হবে? এটা শুনে হযরত তালহা (রা) ক্রোধান্বিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে ফিরে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জ্ঞাত নই যে, খলীফা আপনি না হযরত ওমর (রা)? হযরত আবু বকর (রা) বলেন, ওমর (রা)-ই খলীফা, তবে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।[২]

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হুযূর (সা)-এর যুগে এবং তাঁর ইন্‌তিকালের পর খলীফাদের যুগেও যে ভূমি বা জায়গীর কাউকে প্রদান করা হ'ত তা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে যেত না বরং এর উদ্দেশ্য ছিল যে, এই জমি যে চাষাবাদ করবে এর দ্বারা সে নিজে এবং তার পরিবারবর্গ উপকৃত হবে। উপরন্তু এ থেকে আমরাও উপকার পাব। সুতরাং কোন ব্যক্তি ঐ জমি অনাবাদ অবস্থায় ফেলে রাখলে তা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দেয়া হ'ত। জায়গীর এবং ভূমি যেহেতু কারো নিজস্ব সম্পদ নয়, তাই প্রত্যেক খলীফার আমলেই এর অধিকার নবায়ন করার প্রয়োজন ছিল। আঁ-হযরত (সা) তামীম ইবনে আউস দারীকে 'জীরুন ও' 'বাইতে আইনুন' নামক দু'টি গ্রাম প্রদান করেছিলেন এবং একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা ঘোষণাও করেছিলেন। যখন আঁ-হযরত (সা) ইন্‌তিকাল করেন তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে তা নবায়ন করা হয় এবং তিনিও প্রায় একই ধরনের শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।[৩]

খনির উপর কর

আঁ-হযরত (সা) কোন কোন লোককে খনিও প্রদান করেছিলেন। যেমন বিলাল ইবনে মুযনীকে তিনি কাবলিয়াহ (মদীনা হতে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত

১. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দাহ ঃ পৃঃ ২৮১।
২. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দাহ্‌ঃ পৃঃ ১৭৬।
৩. কিতাবুল আমওয়াল, আবূ উবায়দাহ, পৃঃ ২৭৫।

www.pathagar.com

একটি এলাকা) খনি প্রদান করে। এমনিভাবে সহীহ্ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রিকাজের (গুপ্ত ভাণ্ডার বা খনি) এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা ওয়াজিব। কিন্তু এর কর স্বয়ং আঁ-হযরত (সা) আদায় করেছেন তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য ইবনে সাদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন বনু সালিম-এর খনি বিজিত হয় তখন এর আমদানি বায়তুলমালে জমা করা হয়। এমনিভাবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে কাবলিয়া ও জুহায়নার খনিসমূহ হতে প্রচুর মাল আসত।[১]

আমদানি বা আয়ের অন্যান্য উৎস

উপরোল্লিখিত উৎসসমূহ ছাড়াও আয়ের আরো কিছু উৎস আছে। যেমন কোন ব্যক্তির যদি কোন উত্তরাধীকারী না থাকে কিংবা উত্তরাধিকারী থাকে কিন্তু গোলামী বা হত্যার অপরাধে শাস্তিযোগ্য وجوب قتل হওয়ার কারণে সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের অধিকারে চলে যায়। ব্যবসার মালামালের উপরও কর আরোপ করা হয়। এটাও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটা উৎস।

হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত আমলে রাজস্ব আয়ের আরো কিছু নতুন উৎস সৃষ্টি হয় যা হুযূর (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে ছিল না। যেমন ইসলামী রাষ্ট্রে বাইরের কোন দেশ থেকে কোন মাল আমদানি হলে এর উপর আমদানি শুল্ক ধার্য করা হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু রহমতে আলম (সা)-এর মর্যাদা ও বিশ্বজননীতার দাবী এই যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ অবাধ ও উন্মুক্ত রাখা হবে এবং এর উপর কোন শর্ত আরোপ করা হবে না। সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যুগ ছিল প্রকৃত পক্ষে নবী (সা)-এর যুগের প্রতিবিম্ব। তাই হুযূর (সা) যা গ্রহণ করেন নি, হযরত আবূ বকর (রা)-তা কিভাবে করবেন? অবশ্য হযরত ওমর (রা) বাধ্য হয়ে আমদানি শুল্কের প্রচলন করেন। কেননা অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই কর আদায় করত।

সমুদ্র হতে যে আয় হত হযরত ওমর (রা) তার উপরও কর আরোপ করেন। হুযূর (সা) এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যুগে এ ধরনের উৎসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য ঐ সময় পর্যন্ত সাগরের উপর মুসলমানদের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

যাকাত আদায় করা একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা যে অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন, সে

১. তাবাকাতে ইবনে সাদ ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

www.pathagar.com

সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, যাকাত অস্বীকারকারীরা প্রকৃতপক্ষে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী হলো, যারা যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করেনি। অপর শ্রেণী হলো, যারা যাকাতকে ফরয হিসেবে স্বীকার করত, কিন্তু তা মদীনায় প্রেরণে তারা রাযী ছিল না। আঁ-হযরত (সা) একবার বলেছিলেন ঃ

تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم -

অর্থাৎ "তাদের স্বচ্ছল লোকদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং অস্বচ্ছলদের মধ্যে বন্টন করা হবে" দ্বিতীয় দল হুযূর (সা)-এর ইরশাদ অনুযায়ী এটা প্রমাণ করত যে, যে সব গোত্রের আমীর থেকে যাকাত আদায় করা হবে ঐ সব গোত্রের দারিদ্রের মধ্যে তা বন্টন করা উচিৎ। এ ছাড়া তাদের এটাও ধারণা ছিল যে, যেহেতু আঁ-হযরত (সা) কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাই গোত্র থেকে তার যাকাত আদায় করার অধিকার ছিল। কিন্তু হুযূর (সা)-এর পর এই অধিকার তা আর কারো নেই, তাই যাকাত মদীনায় প্রেরণ করারও প্রযোজন নেই। বরং এমতাবস্থায় মদীনায় যাকাত প্রেরণ করা তাদের কাছে একপ্রকার ক্ষতিপূরণ বলেই মনে হত, যেমন কুররাহ্ ইবনে হুভায়রাহ্ এবং হযরত আমর ইবনে আস (রা)-এর কথার দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। কুররাহ্ যাকাতের জন্য الفلاة শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১]

হযরত আবূ বকর (রা) এ উভয় দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, হুযূর (সা) যেভাবে যাকাত আদায় করতেন আমিও সেভাবে আদায় করব। যদি তারা যাকাত বাবদ একটি উটের রশি প্রদান করতেও অস্বীকার করে যা তারা হুযূর (সা)-এর যুগে প্রদান করত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই ঘোষণা ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এ বিষয়টির উপর অল্প সংখ্যক লোকই দৃষ্টিপাত করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) এই ঘোষণা দ্বারা প্রথম দলের কল্পনা–প্রসূত ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে এই বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করে দেন যে, যাকাত নামাযের মতই একটি ফরয ইবাদত। এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নেই। তিনি এই সাথে দ্বিতীয় দলের ধারণাকে খণ্ডন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন 'যাকাত প্রকৃতপক্ষে এস্টেট ডিউটি বা রাষ্ট্রীয় কর। অর্থাৎ যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা-হলে রাষ্ট্রকে এই কর দেয়া বাধ্যতামূলক। হুযূর (সা) যতদিন জীবিত ছিলেন, এই কর আদায় করেছেন, এখন আমি রাষ্ট্র প্রধান তাই আমিও তা আদায় করব। 'সুতরাং যাকাত আদায়ের এটাই পদ্ধতি, কোন ব্যক্তি বা কোন গোত্রের জন্য এই অধিকার নেই যে, তারা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী যাকাত প্রদান করবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই সিদ্ধান্ত যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই হযরত ওমর (রা)-এর মত বিজ্ঞ সমালোচক এই

১. তাবারী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন[১] فعرفت أنه الحق 'অতএব আমি অবগত হলাম যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক।

রাষ্ট্রের ব্যয়

উপরোক্ত পদ্ধতিতে যে রাজস্ব আয় হ'ত তা খলীফার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল বিভাগের জন্য ব্যয় হ'ত। সাদকা আদায়কারীদের ভাতা তাদের আদায়কৃত সাদকা হতেই দেয়া হ'ত। তাছাড়া রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তাদের বেতন, খলীফার বেতন, সৈন্যদের রসদপত্র, যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়, সামাজিক, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজ কর্মের ব্যয় বায়তুলমাল থেকেই নির্বাহ করা হত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়াদা পূরণ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যে সমস্ত এলাকা বিজিত হয় তার মধ্যে কোন কোন এলাকা সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা) ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। ঐ সমস্ত এলাকার ব্যাপারে হুযূর (সা) কোন ওয়াদা করে থাকলে তা যাতে অপূর্ণ না থাকে তার জন্য হযরত আবূ বকর (রা) সাধারণভাবে ঘোষণা করেন, 'যদি হুযূর (সা) কারো সাথে কোন ওয়াদা করে থাকেন তাহলে সে যেন আমার কাছে আসে'। একবার বাহ্‌রাইনের মাল (গনীমত) আসলে ইবনে উবাই বাখীহ্ নামক এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলে, হুযূর (সা) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, "যদি বাহ্‌রাইনের মাল আসে তাহলে আমি তোমাকে এত এত উভয় হাতে ইশারা করে মাল দেব।" হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, তুমি তোমার দু'হাতে উঠিয়ে নাও। ঐ ব্যক্তি একবার উঠানোর পর হিসেব করে দেখা গেল পাঁচশো দিরহাম। যেহেতু ঐ ব্যক্তি দু'বার ইশারার কথা বলেছিল তাই হযরত আবূ বকর (রা) তাকে সর্বমোট এক হাযার দিরহাম প্রদান করেন।[২]

সমবণ্টন

এভাবে আঁ-হযরত (সা)-এর ওয়াদা পূরণের পর যা উদবৃত্ত থাকত হযরত আবূ বকর (রা) তা নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ সবার মধ্যে হুযূর (সা)-এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বণ্টন করে দিতেন। একবার বাহ্‌রাইন থেকে মাল আসে তিনি মাথাপিছু সোয়া সাত দিরহাম করে সমভাবে সবার মধ্যে বণ্টন করে দেন। পুনরায়

---

১. আবু দাউদ কিতাবুয যাকাত, এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, এই নির্দেশ ঐ সময় পর্যন্ত ছিল যখন মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র এবং সামগ্রিক বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যাকাত আদায়ের জন্য প্রশাসক নিয়োজিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত এই বিধান অব্যাহত থাকে কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর যুগে যখন রাষ্ট্র সম্পদশীল হয় তখন ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়

২. কিতাবুল খেরাজঃ কাযী আবু ইউসুফঃ পৃঃ ৪২।

www.pathagar.com

আরো অধিক মাল আসলে তিনি তাও পূর্বের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে দেন। এতে মাথাপিছু বিশ দিরহাম করে পড়ে। কোন কোন লোক তখন সমলোচনার ভঙ্গিতে বলেন, 'হে খলীফাই রাসূল! আপনি সবার মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিলেন, অথচ তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তাদের ফযীলত ও ইসলামের প্রতি তার অগ্রগামী তার বিষয়টি বিবেচনা করা হলে খুবই ভাল হ'ত। হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, তোমরা যে ফযীলতের কথা বলছ তা আমার চেয়ে অধিক কে জানে? কিন্তু এসব ফযীলতের প্রতিদান তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে। এটা হলো জীবন জীবিকার ব্যাপার। এতে সমবণ্টন একের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার চেয়ে উত্তম।[১]

গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ মাল বণ্টন

হুযূর (সা)-এর যুগে গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ পুনরায় পাঁচ অংশে ভাগ করা হ'ত। এর মধ্যে এক অংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের থাকত এবং এক অংশ আঁ-হযরত (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনেরা পেত। হযরত আবূ বকর (রা)-ও এই বণ্টন নীতি বহাল রাখেন। এতে সামান্য পরিবর্তনও করেন নি। হুযূর (সা)-এর যুগে হযরত আলী (রা) সম্পূর্ণ এক পঞ্চমাংশ নিয়ে তা আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বণ্টন করে দিতেন। হযরত আবূ বকর (রা) এই নীতিতেও কোন পরিবর্তন করেন নি। হযরত আলী (রা) নিজেই বর্ণনা করেন, আমি হুযূর (সা)-এর আমলে এক পঞ্চমাংশ গনীমতের মাল বণ্টন করতাম। হযরত আবূ বকর (রা)-ও আমাকে এর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন এবং তাঁর আমলেও এক পঞ্চমাংশ বণ্টন করা হ'ত।[২] আবূ উবায়দ, ইবনে শেয়াবুল যুহরীর এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার দ্বারা উপরোক্ত কথা প্রমাণিত হয়।[৩]

وكان أبو بكر يقسم من الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله-

"হযরত আবূ বকর (রা)ও হুযূর (সা)-এর নীতি অনুযায়ী গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বণ্টন করতেন।"

একটি ভুল বর্ণনা

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাজী আবূ ইউসুফ এর একটি বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা), এক পঞ্চমাংশ হতে রাসূল

---

১. কিতাবুল খেরাজ : কাযী আবূ ইউসুফ: পৃঃ ৪২: মুল কিতাবে الأسوة ছাপা হয়েছে কিন্তু এটা ভুল। সঠিক হল السوية মূল বাক্য হলো - السوية خير من الأثرة

২. কিতাবুল খেরাজ : কাযী আবূ ইউসুফ : পৃঃ ২০।

৩. কিতাবুল আমওয়াল পৃঃ ৩৩১।

www.pathagar.com

(সা) এবং তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশীদের অংশ বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং তিন অংশ বাকী রেখেছিলেন।[১] কিন্তু এই বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা। কেননা এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে সায়িব কালবী। মুহাদ্দিসদের নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন اتقوا الكلبي (কালবী হতে বেঁচে থাক)।

লোকজন বলল, এরপরও কেন আপনি তার থেকে রিওয়ায়েত করেন? তিনি (সুফিয়ান) উত্তরে বলেন, আমি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে থাকি। ইয়াযীদ ইবনে জুরাই, একজন প্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম। তিনি একবার কালবী হতে বর্ণনা করার পর বলেন, কালবী হলো সর্বাঙ্গ। হযরত আ'মাশ (রা) এটা শুনে বলেন, সাবাঈদের থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। আমি তাদেরকে খুব ভালভাবে জানি। লোকজন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে।

তাছাড়া আলোচ্য রিওয়ায়েতের সনদ হল – عن أبي صالح عن ابن عباس আর মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবীর এই বিশেষ সনদের দ্বারা যে রিওয়ায়েত বর্ণিত হবে তার মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে হাদীসের আয়েম্মারা একমত। কালবী হতে রিওয়ায়েতকারী হযরত সুফিয়ান (র) বলে, আমাকে একদিন কালবী বলেছেন যে, আমি আবূ সালেহ্ হতে যে রিওয়ায়েত করব তার সবটুকুই মিথ্যা। ইবনে আদীর উক্তি

وأما في الحديث فعدة مناكير وخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس

"হাদীসের ক্রমধারায় কালবী হতে বহু মুন্‌কির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ ভাবে আবূ সালেহ্‌র মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে যা বর্ণিত হয়েছে।"

এই ব্যক্তির তাফসীরেরও ঐ একই অবস্থা। কোন এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ ইবনে সায়েরের তাফসীর দেখা কি জায়েয। তিনি বলেন, "না"।[২]

অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা

অমুসলিমরা যখন জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা-স্বীকার করে তখন তাদেরকে যিম্মি বলা হয়। তাদের সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হলো,

فهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين –

"মুসলমানদের যে অধিকার তাদেরও সে অধিকার এবং মুসলমানদের উপর যা ওয়াজিব তাদের উপরও তা ওয়াজিব।" এই সমঅধিকারের কারণে মুসলিম অভাবগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গদের খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা

---

১. কিতাবুল খেরাজ : পৃঃ ১৯। باب قسمة الغنائم

২. কালবী সম্পর্কে এ সমস্ত বিষয় ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، حافظ ذهبي ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১-৬২ 'মীম' অক্ষরের বর্ণনা হতে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

ইসলামী বায়তুলমালের উপর যেমন ফরয তেমনি অমুসলিমদের নিরাপত্তা এবং তাদের দৈহিক ভাতার ব্যবস্থা করাও বায়তুল মালের উপর ফরয। হিরাহ্ বিজয়ের সময় হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর পক্ষ হতে হিরাহ্বাসীদের নামে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরো যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তা হলো

أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام -

"যদি কোন (অমুসলিম) বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে অথবা কোন বিপদে পতিত হয় অথবা কোন সম্পদশালী এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে তার গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্য করতে থাকে এমতাবস্থায় তার জিযিয়া মাফ হয়ে যাবে। মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তার এবং তার পরিবারবর্গের দায়িত্ব ঐ সময় পর্যন্ত বহন করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে।

চুক্তিপত্রের শেষ দিকে এটাও লিপিবদ্ধ ছিল আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ সকল অমুসলিমদের জন্য এই নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য।[১]

فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به مؤنة العون من بيت مال المسلمين

"এই সমস্ত লোক যদি মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তা হলে তাদেরকে সাহায্য দেয়া হবে। এই সাহায্যের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন তা বায়তুলমালই বহন করবে।"

যে সব জিনিস কর মুক্ত

অনেক বস্তু বা দ্রব্য আছে যেগুলোকে প্রকৃতির অবদান মনে করা হয়। অর্থাৎ এসব বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয় এবং এতে মানুষের প্ররিশ্রমের কোন প্রয়োজন[২] পড়ে নি। ইবনে খালদূন এগুলোকে الفلاحة শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা[৩] করেছেন। যেমন ঘাস, বাঁশ, কাঠ, লবণ, পানি, জঙ্গলের জীবজন্তু, জঙ্গল ইত্যাদি। যদিও বর্তমান যুগের সভ্য রাষ্ট্রসমূহ এ গুলোর উপর কর ধার্য করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে কর থেকে মুক্ত রেখেছে। মুসলিম অথবা অমুসলিম প্রত্যেকেরই এগুলো থেকে লাভবান হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিতাবুল খেরাজ ঃ কাযী আবূ ইউসুফ এবং কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দাহ্র এর মধ্যে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হুযূর (রা) এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যুগে এই সব জিনিস কর মুক্ত ছিল।

---

১. কিতাবুল খেরাজঃ কাযী আবূ ইউসুফঃ পৃঃ ১৪৪।
২. মিশকাত ঃ পৃঃ ১৫৯।
৩. মুকাদ্দাহ ঃ ইবনে খালদুন ঃ পৃঃ ৩২১-৩৩২।

www.pathagar.com

সামরিক ব্যবস্থা

আরবরা জন্মগতভাবে বীর যোদ্ধা। কিন্তু তাদের মধ্যে নিয়মিত কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। বর্তমান যুগে প্রচলিত গেরিলা যুদ্ধের মত তারা গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্থ ছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) অন্যান্য বিভাগের মত সামরিক বিভাগকে সুশৃংখল করেন। এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মুসলমানরা ঐ যুগের সবচেয়ে সভ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ইরান ও রোমের সৈন্যদেরকে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের সল্পতা সত্ত্বেও পরাজিত করে। প্রকাশ থাকে যে, এসব কিছু এমনিভাবে দৈবাৎ হয়ে যেতে পারে না।[১]

আমরা আরবদের যে যুদ্ধ পদ্ধতিকে গেরিলা পদ্ধতি বলে থাকি আল্লামা ইবনে খালদূন সেটাকে كروفر বলেছেন। আরবের বাইরে এই পদ্ধতির উল্টো সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার (আরবে যেটাকে زحف বলা হয় এবং পবিত্র কুরআনেও উক্ত শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) নীতি প্রচলিত ছিল। হুযূর (সা) স্থান ও কাল ভেদে উত্তম পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। যেখানে শত্রু সৈন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াত সেখানে তিনি زحف এ পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। পবিত্র কুরাআনে এটাকে كأنهم بنيان مرصوص (যেন এ সমস্ত লোক একটি মযবুত ভিত্তির মত) বলে উল্লেখ করেছে।[২]

সৈন্যদের বিভিন্ন অংশ

আরবী ভাষায় সেনাবাহিনীকে খামীস خميس বলা। এটা خمس শব্দ হতে নির্গত। অর্থাৎ তখনকার সেনাবাহিনী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হ'ত ঃ প্রথম ভাগে বাহিনী-প্রধান থাকতেন। এটাকে "কালব" বলা হত। সেনাপতি বা বাহিনী প্রধানের ডান দিকের ভাগকে মায়মানাহ ميمنة এবং বাম দিকের ভাগকে মায়সারাহ্ ميسرة বলা হত। বাহিনীর পিছনের ভাগকে সাকাহ ساقة এবং সম্মুখের ভাগকে মুকাদ্দিমাতুল জায়শ مقدمة الجيش বলা হত। সৈন্যদের দু'ভাবে সাজানো হত। একটিতে সকল দল পরস্পর

---

১. মেজর জেনারেল আকবর খান ইতিমধ্যে 'হাদীসে দিফা' حديث دفاع নামক ৩৬৬ পৃষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন এবং লাহোরের ফিরোজ সন্স এটা প্রকাশ করেছেন। আধুনিক সামরিক বিদ্যায় অভিজ্ঞ জেনারেল এতে প্রমাণ করেছেন যে, আঁ-হযরত (সা) সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী জেনারেল এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের যে নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেন, সাহাবাদেরকে যেভাবে রণকৌশল শিক্ষা প্রদান করেন এরপর নিজে যেভাবে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং এর জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, আজ চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগেও এর উপর একটু বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, এই গ্রন্থ বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব এবং সুখ পাঠ্য।

২. মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন باب القسم السابع في الحروب

www.pathagar.com

নিকটবর্তী থাকত। এটাকে বলা হত তাবীয়া। অপরটিতে এক দল অন্য হতে কিছুটা দূরে অবস্থান করত। এই দলের প্রত্যেকটি অংশকে করদাউ كردوس বলা হত। হুযূর (সা)-এর যুগে তা'বীয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে হযরত খালিদ (রা) সিরিয়ায় পৌঁছে যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, শত্রু সংখ্যা দু'লাখ চল্লিশ হাযার এবং এর তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ হাযার, তখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে ছত্রিশ হতে চল্লিশ দলে বিভক্ত করেন। প্রতি দলে এক হাযার মুজাহিদ ছিল এবং প্রতি দলের পৃথক পৃথক আমীরও ছিলেন। 'কালব' এর আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ্, 'মাইমানাহ্' এর আমীর ছিলেন আমর ইবনুল আস এবং সারাহবিল ইবনে হাসনা, এবং 'মাইসারার'-এর আমীর ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান। অতএব প্রতিটি উপদলের আবার পৃথক পৃথক আমীর ছিলেন। সাহসীকতা ও বীরত্বের দিক দিয়ে ওরা সবাই ছিলেন বিখ্যাত। যেমন কা'কা ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, কাবাস ইবনে আসীম।[১] শত্রুর সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করে কোন একজন উক্তি করেন, 'হায়! রোমানদের সংখ্যা কত বেশী, মুসলমানদের সংখ্যা কত কম। হযরত খালিদ (রা) তখন বলেন, 'না মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী এবং রোমানদের সংখ্যা অনেক কম। কেননা যারা জয়লাভ করে তারাই বেশী। অর্থাৎ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলেন।[২]

সৈন্যদের জন্য নসীহতকারী

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সেনাবাহিনীর সাথে এরূপ কিছু লোকও প্রেরণ করা হত যারা কুরআন মজীদে বর্ণিত জিহাদের আয়াত তিলওয়াত করে তাদের আকর্ষণীয় বক্তৃতা দ্বারা মুজাহিদদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করতেন। সিরিয়ার যুদ্ধে এই দায়িত্ব আবূ সুফিয়ান ইবনে হারাব এর উপর অর্পিত হয়েছিল। তাছাড়া পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন হযরত মিক্দাদ (রা)। তাবারীর বর্ণনায় আছে, বদর যুদ্ধের পর হতে হুযূর (সা)-এর এটা নীতি ছিল যে, শত্রুদের সামনে সারিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সূরা আন্ফাল তিলওয়াত করতেন। হুযূর (সা)-এর পরও এই নিয়ম জারী ছিল।[৩]

যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র

সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী, পদাতিক উভয় প্রকারের সৈন্য ছিল। তারা যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করত সেগুলো হলো যেরাহ, তলোয়ার, রেমাহ অর্থাৎ বড় নেযাহ, হারবাহ্ (ছোট নেযাহ্) আলখত-বাহরাইনের একটি উপকূলীয় এলাকা।

---

১. তারিখে ইবনে আসীরঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৮২।
২. তারিখে ইবনে আসীরঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪।
৩. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৪।

www.pathagar.com

সেখানে উত্তম নেযাহ্ তৈরি হত এবং সেটাকে বলা হত الرمح الخطي এমনিভাবে ভারতে খুব উত্তম তরবারি তৈরি হ'ত এবং সেটাকে বলা হত السيف الهندي এ সমস্ত অস্ত্র সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। এছাড়া আঁ-হযরত (সা) অন্য যে সব অস্ত্র ব্যবহার করতেন সেগুলোর নাম হলো

মিনজানীক ঃ এর আকৃতি তোপ বা কামানের মত। এর দ্বারা শত্রুদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হ'ত। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামে সর্বপ্রথম আঁ-হযরতই (সা) মেন্‌জিক ব্যবহার করেছেন।[১]

দাবাবাহ্ ঃ এর একটি বিরাট আবরণ বা খোল ছিল। বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য এর ভেতর বসতে পারত। এটা ধাক্কা দিয়ে শত্রুদের দুর্গের দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত। এর উপকারিতা হল, শত্রুদের দুর্গ হতে যে তীর নিক্ষেপ করা হত তা এর অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের কোন ক্ষতি করতে পারত না। এর মাধ্যমে নিরাপদ দুর্গের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালানো যেত।

আদ্‌দাবুর ঃ এটাও দাবাবাহর মত, তবে লাকড়ী দিয়ে এমনভাবে করা হত যার উপর চামড়ার আবরণ থাকত। এর খোলে বসেও নিরাপদে শত্রুদের দুর্গে পৌছা যেত। এই দুটি অস্ত্র স্বয়ং হুযূর (সা) ব্যবহার করেছেন।[২]

সৈন্যদের পোশাক

সৈন্যদের ইউনিফর্ম নির্ধারিত সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে নিরাপত্তার জন্য যেরাহ্ এবং খোদ পরিধানের সাধারণ প্রচলন ছিল। সাফার পরিধানেরও প্রচলন ছিল। ডঃ মুহাম্মদ হাসান ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন যে, পদাতিক সৈন্যরা হাটু পর্যন্ত ছোট কুবা পরিধান করতেন। লুঙ্গির পরিবর্তে তারা পায়জামা এবং বর্তমান যুগের আফগানবাসীদের মত জুতা পরিধান করতেন।[৩]

মহিলারাও যুদ্ধে সৈন্যদের সাথে থাকত

আহত সৈন্যদের পট্টিবাঁধা পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের জন্য মহিলারাও সৈন্যদের সাথে থাকতেন। সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য তারা দপ ও তবলা বাজাতেন। সংকটময় মুহূর্তে তারা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতেন। হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) এর যুগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে।[৪]

---

১. সীরাতুন নবী ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৪০৪।

২. আরবদের যুদ্ধাস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ ইবনে কুতায়বার উয়মুল আখবার ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ১২৮-১৩২ দ্রষ্টব্য।

৩. তারিখুল ইসলাম আস সিয়াসী ঃ ১ম খণ্ডঃ ৩৭৪ঃ হযরত খালিদ (রা) হযরত আবূ বকর (রা) এর পক্ষ হতে যে চুক্তিপত্র হিরাবাসীর জন্য লিখে দিয়ে ছিলেন। তাতে ছিল ফিরিঙ্গীরা যে পোশাক পরিধান করে করুক, তাতে কোন বাধা নেই। অবশ্য তারা যেন সামরিক পোশাক পরিধান না করে। (কিতাবুল খেরাজঃ কাযী আবূ ইউসুফ পৃঃ ১৪৭)। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের নিশ্চয় এমন কোন পোশাক ছিল বা পরলে পরিধানকারী খুব স্মার্ট মনে হত।

৪. فتوح الشام للواقدي ذكر عهد صديق

www.pathagar.com

সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ

আঁ-হযরত (সা) একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী বদর যুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। কোথাও কাউকে আগে পিছে দেখলে সোজা করে দেন।

তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের জন্য এক একজন প্রধান নিয়োগ করতেন এবং তাদেরকে পৃথক পৃথক পতাকা দিতেন। তিনি অনুমতি ছাড়া সৈন্যদেরকে সারি না ভাঙ্গার এবং নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু না করারও নির্দেশ দিতেন। তিনি আরো নির্দেশ দিতেন, শত্রু যদি দূরে অবস্থান করে তাহলে তীর নিক্ষেপ করে অযথা তীরটি নষ্ট করবে না বরং সে সামনে আসলে তীর চালাবে, নিকটবর্তী হলে মিনজানীক ব্যবহার করবে, অধিক নিকটবর্তী হলে নেযা দ্বারা আক্রমণ করবে এবং সর্বশেষে তরবারি দিয়ে আঘাত হানবে। যুদ্ধের মাঠে গণ্ডগোল হওয়াটা সাধারণ ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও নবী (সা) সেনাদেরকে মুখে কোন কথা উচ্চারণ না করার নির্দেশ প্রদান করেন।"[১]

প্রধান সেনাপতির পদ

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে তিনি স্বয়ং অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। ফলে সৈন্যদের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি তিনি নিজেই করতেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত কালে স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি যেন বর্তমান যুগের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন। এ কারণে রণাঙ্গনের জন্য তিনি প্রধান সেনাপতির পদ সৃষ্টি করেন। সকল সৈন্য সেনাপতির নির্দেশ ও নেতৃত্বে যাবতীয় কাজ করত। সিরিয়ার যুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) প্রতিটি দলের জন্য পৃথক পৃথক আমির নিযুক্ত করেন, কিন্তু হযরত খালিদ (রা)-কে সমাগ্রিকভাবে আমীর বা প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়।[২]

হযরত খালিদ (রা)-এর উপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরাট ভরসা ছিল তা একটি ঘটনা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। সিরিয়ার যুদ্ধে মুসলমান ও রোমান বাহিনী যখন দীর্ঘ দিন যাবত মুখোমুখী হয়ে অবস্থান করে এবং কারো পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণ শুরু হয় নি তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد –

"আল্লাহ্‌র শপথ ঃ রোমানদের অন্তরে যে প্ররোচনা ও শঠতা রয়েছে তা আমি হযরত খালিদ (রা)-কে (ইরাক হতে সিরিয়ায়) প্রেরণ করে ভুলিয়ে দেব।"

সৈন্যদের নির্বাচনে সতর্কতা

হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে সৈন্যদের জন্য কোন পৃথক বিভাগ ছিল না এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন সমগ্র জাতি যেন ছিল একটি সেনাবাহিনী। প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধের কথা ঘোষণা করা হ'ত এবং

---

১. সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ও আসসিয়ার।
২. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬০১।

www.pathagar.com

যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসত তাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময় সন্দেহভাজন লোকদের যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হ'ত না। সিরিয়া যুদ্ধের যখন তিনি সেনাবাহিনী গড়ে তুলছিলেন তখন প্রথম দিকে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাতে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দেন নি। তিনি হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে যুদ্ধে রওয়ানা করার সময় নির্দেশ প্রদান করেন,[১]

وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد

"মুরতাদ ব্যতীত তোমাদের আশে-পাশের সকল আরবকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের দাওয়াত দাও।"

মুসলিম মুজাহিদের মূল্যায়ন

রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) যুগে মুসলিম সৈন্যদের প্রশিক্ষণের তেমন কোন পদ্ধতি ছিল না, আর বাস্তবে তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আরবরা স্বভাবগত ভাবেই যোদ্ধা ছিল। তরবারী চালনা এবং তীর নিক্ষেপ করা তাদের সকলেরই জানা ছিল। ইরাকে, আম্বারের যুদ্ধে জেনারেল শিরযাদ-এর নেতৃত্বে ইরানের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিরাট বাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় বটে কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয় হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রটি একটি চক্কও দিয়ে এসে (ইতিমধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে) তীরন্দাজ দলের নিকট গিয়ে বলেন,'আমার মনে হয় শত্রুদল রণ-কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তোমরা তাদের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ কর। মুসলিম তীরন্দাজরা তখন এমনিভাবে তীর নিক্ষেপ করল যে, শত্রুদের এক হাজার সৈন্যের চোখ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল। শত্রুদল এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে চিৎকার দিয়ে উঠে। সংগে সংগে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, আম্বারের সকল যুদ্ধা অন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে এ যুদ্ধকে ذات العيون (চোখওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। শেরযাদ তখন ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে।[২]

অস্ত্র সরবরাহ

লোকজন সে যুগে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত। যাদের অস্ত্র থাকতনা চাঁদার মাধ্যমে তাদের অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হ'ত। অবশ্য হযরত আবূ বকর (রা) বিভিন্ন খাতে যে রাজস্ব আয় হ'ত তার একটি অংশ যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে গনীমতের মালে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাও এই কাজে ব্যবহার করা হত।[৩]

---

১. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।
২. তাবারীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৫।
৩. কিতাবুল খেরাজ কাজী আবূ ইউসুফ, পৃঃ ২১।

www.pathagar.com

মদীনায় 'নাকী' নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। হুযূর (সা)-এর চারণক্ষেত্রকে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[১] হযরত আবূ বকর (রা)-ও এই ব্যবস্থা বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা) রাবযার চারণভূমিকেও সাদকা ও যাকাতের উট এবং ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশ্য হযরত আবূ বকর (রা)-ও সাদকা ও যাকাতের জীর্ণ-শীর্ণ উটগুলোকে রাবযাহ ও তার আশে-পাশে প্রেরণ করতেন।[২]

সেনাবাহিনীকে হিদায়াত প্রদান

মূল যে বিষয়ের উপর সৈনিকদের বিজয় নির্ভর করে তা-হলো তাদের জীবনের মহান লক্ষ্য ও তাদের উন্নত চরিত্র। হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। যখন সেনাবাহিনী রওনা হ'ত তখন তিনি তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মদীনার বাহিরে বহু দূর পর্যন্ত পদব্রজে গমন করতেন। সেনাপতিদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বাহন থেকে নামতে দিতেন না এবং তিনি নিজেও কোন বাহনে আরোহণ করতেন না। যখন সৈন্য রওয়ানা হ'ত তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। তাতে জিহাদের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহ্র পুরস্কার ও পরকালের সওয়াব, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হত। তখন তিনি যুদ্ধ সম্পর্কেও তাদেরকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করতেন যার দ্বারা তাঁর রণকৌশল সম্পর্কিত দূরদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠত।

হযরত উসামা (রা) এবং হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে তিনি যে হিদায়াত প্রদান করেছিলেন তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত খালিদ (রা) একজন প্রখ্যাত জেনারেল ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাকে মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জুলকিসসার দিকে প্রেরণ করা হয় হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সমর কৌশল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত হিদায়েত প্রদান করেন।

"তোমাদের লক্ষ্য বুজাখা হলেও প্রথমে তোমার সামনে 'ত্বায়' গোত্র পড়বে। অতএব প্রথম 'ত্বায়'-এর মুকাবিলা কর, অতঃপর বুজাখা হয়ে বাতাহ্ যাও। বাতাহ্ বিজয়ের পর আমার সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করো।

হযরত আবূ বকর (রা) এক দিকে হযরত খালিদ (রা)-কে এই নির্দেশ প্রধান করেন এবং তাদের রওয়ানা করে দেন, অন্য দিকে তিনি কৌশলে প্রচার করে দেন যে, তিনি নিজে খায়বার যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আকনাফে সালমী হযরত খালিদ (রা)-এর সৈন্যর সাথে মিলিত হবেন। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলে শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। ফলে ত্বায় গোত্রের বিদ্রোহীরা প্রথম ধাক্কায় বশ্যতা স্বীকার করে।[৩]

---

১. কিতাবুল আমওয়াল আবূ উবায়দা পৃঃ ২৯৮।
২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯।
৩. তাবারীঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৮৩।

www.pathagar.com

ইরাকের যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) এবং হযরত আইয়াজ ইবনে গানাম রওয়ানা করার সময় তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে নিম্নভূমি দিয়ে এবং হযরত আইয়াজকে উঁচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে হিরাহ্ পৌঁছবে সেই হিরাহ্ যুদ্ধের আমীর হবে। এরপর তিনি বলেন, হিরাহ্ পৌঁছতে পৌঁছতে তো তোমরা আরব ও ইরানের মধ্যে যে সব সেনা ছাউনি রয়েছে সেগুলো ধ্বংস করবে এবং এই মর্মে সান্ত্বনাও লাভ করবে যে, মুসলিম বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আর কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। হিরাহ্ পৌঁছার পর তোমাদের দু'জনের একজন হিরায় অবস্থান করবে এবং অন্যজন এগিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাবে।

এটা ছিল শুধুমাত্র যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ। এরপর তিনি ইরশাদ করেন — "আর হাঁ, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাঁকে ভয় করবে এবং আখিরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রধিকার দেবে'। এরূপ করলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভই পাবে। দুনিয়াকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবে না, নতুবা উভয়ই হারাবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে বস্তু হতে বেঁচে থাকতে বলেছেন তা থেকে বেঁচে থাকবে, পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকবে। যদি কোন পাপ ও অন্যায় হয়ে যায় তা হলে সাথে সাথে তাওবা করবে। কোন পাপ পুনঃ পুনঃ করবে না।[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রখরতা এরূপ ছিল যে, তিনি মদীনা অবস্থান করলেও হাযার হাযার মাইল দূরবর্তী রণাঙ্গনের চিত্র যেন তাঁর চোখে ভাসত। তিনি মদীনা বসেই প্রয়োজন অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে নির্দেশও প্রদান করতেন। হযরত খালিদ ইবনে সাঈদকে তীমা রওয়ানা করার সময় তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, 'যতক্ষণ আমার অনুমতি না পৌঁছবে ততক্ষণ সম্মুখে অগ্রসর হবে না।' কিন্তু খালিদ ইবনে সাঈদ তা পালন করতে পারেন নি বলে তাকে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়।[২] হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হযরত খালিদ (রা) জ্ঞাত ছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পালন করতেন। তাই হিরাহ্ বিজয়ের পর হযরত আবূ বকর (রা) তাকে এ মুহূর্তে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হযতর খালিদ (রা) এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এক বছর পর্যন্ত কর্মহীন হয়ে বসে থাকেন। এতে তিনি এত বিরক্ত হন যে, ঐ বছরকে তিনি মহিলাদের বছর বলে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু খলীফার নির্দেশ তিনি অমান্য করেন নি। এ বিষয়ে যখন লোকদের মধ্যে কিছু বিরুদ্ধ আলোচনা হতে থাকে তখন হযরত খালিদ (রা) বলেন, 'এটা খলীফার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির সিদ্ধান্ত সমান।[৩]

হযরত আবূ বকর (রা) সিরিয়ার দিকে একই সময় কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন। তিনি রোমানদের রণ-কৌশল এবং তারা কোথায় কোথায় ঘাঁটি তৈরি

---

১. তাবারী : দ্বিতীয় খণ্ড: পৃঃ ৫৭৩-৫৭৪।
২. ফুতুহুল বুলদান : বালাযুরি : পৃঃ ১১৪।
৩. তাবারীঃ ২য় খণ্ডঃ ৫৭৪।

www.pathagar.com

করেছেন সে খবর তিনি রাখতেন বলে মুসলিম সেনাপতিদেরকে কোন পথে অগ্রসর হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন —

أن الروم ستشغلهم فأحب أن يصعد المصوب ويصوب المصعد لئلا يتواكلوا – [১]

"একটি ঘাঁটিতে আবদ্ধ করে রোমানরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে চাইবে। তাই আমার ইচ্ছা হলো, তোমাদের মধ্যে নিচু পথ দিয়ে গমনকারিগণ উঁচু পথ দিয়ে যাবে, আর উঁচু পথ দিয়ে গমনকারীগণ নীচু পথ দিয়ে যাবে। (অর্থাৎ রাস্তা পরির্তন করে যাবে) যেন রোমান বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার সুযোগ না পায়।"

উপরোক্ত রিওয়ায়েতের বর্ণনাকারী হযরত উরওয়াহ্ (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) যা কিছু বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

সেনা ছাউনি বা সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন

হযরত আবূ বকর (রা) সৈন্যদেরকে শুধু হিদায়াত ও নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হতেন না, মাঝে মাঝে নিজেও সেনা ছাউনি ও ঘাঁটি পরিদর্শন করতেন। সেখানে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করে দিতেন। একবার একটি যুদ্ধ উপলক্ষে 'জরফ' নামক স্থানে সেনাবাহিনী একত্র হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) পরিদর্শনের জন্য সেখানে যান। তিনি যখন বনু ফাযারার ছাউনিতে পৌঁছেন তখন তারা তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। হযরত আবূ বকর তাদেরকে স্বাগত জানান। এরপর লোকজন বললো, রাসূলের খলীফা। আমরা ঘোড়দৌড়ে খুবই অভিজ্ঞ, তাই সাথে ঘোড়া নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের হাতে পতাকা দিয়ে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরো শক্তি ও বরকত প্রদান করুন। কিন্তু বৃহৎ পতাকা তোমাদেরকে প্রদান করা হবে না, সেটা বনু আবস্ পাবে। একজন ফাযারী দাঁড়িয়ে বললো, আমরা বনু আবস্ হতে উত্তম। হযরত আবূ বকর (রা) রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'বেয়াদব, চুপ থাক! বনু আবস্ তোমাদের চেয়ে উত্তম। অন্য একজন আবসী ব্যক্তি কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাকেও ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন এবং বলেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে যা বলার বলেছি।[২]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশের প্রতিক্রিয়া

হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও হিকমত পূর্ণ আহকাম ও হিদায়াত এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সময়োযোগী সতর্ক করণের ফলে সমস্ত সৈন্য এবং সেনাপতিগণ সর্বদা সাবধান থাকত, শৃংখলা বজায় রাখত এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত। কখনো তাদের চরিত্রের পদস্খলন হ'ত না। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বস্তুগত আসবাব প্রাপ্তি থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মধ্যেই সৈন্যর সাফল্যের কারণ নিহিত রয়েছে।

---

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৮৯।
২. কানযুল উম্মাল : ৫ম খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬১।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের লেখকদের মতামত

প্রফেসার হিট্টি লিখেছেন ঃ "আরব মুসলিম সৈন্যদের শক্তির মূল রহস্য না তাদের যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্য না তাদের উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত বরং প্রকৃত এটা তাদের ঐ উন্নত চরিত্রেরই ফল, যে চরিত্র গঠনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তাদের ধর্মের বিরাট অবদান রয়েছে। এবং ধৈর্যধারণের ব্যাপারে তারা তাদের মরু এলাকার জীবন থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে।[১]

প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই (DR-GUEGE) স্বীকার করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) সৈন্যদেরকে যে হিদায়াত প্রদান করেছেন তার মধ্যে সংযম বাস্তবতার যে জীবন্ত শিক্ষা রয়েছে সেজন্য তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তিনি তাঁর (ফতুহাতে শাম) গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠা হতে ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।—

"প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ায় লোকজন আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, আর এটা হওয়াই অনিবার্য ছিল। কেননা আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার সাথে সেখানকার যদি পূর্ববর্তী বাদশাহ্দের নীতিহীন যুলুমের তুলনা করা যায় তাহলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। সিরিয়ার সে সমস্ত খৃস্টান কাল্সী ডোন (Chalce Don)-কে মানত না, রোম সম্রাটের নির্দেশে তাদের নাক কান কর্তন করা হত, ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দেয়া হ'ত। অথচ আরবের নতুন শাসকরা আবূ বকর (রা)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের মন প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য দিত। এই বিজয়ের পনের বছর পর একজন নাসতুরী পাদ্রী লিখেছেন, "এই আরবজাতি, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাজ্য প্রদান করেছেন, আমাদেরও প্রভু হয়ে গেছে। কিন্তু তারা খৃস্টান সম্প্রদায় ও ঈসায়ী ধর্মের সাথে কখনো পাঠায় না। বরং আমাদের দীনের হিফাযত করেন, আমাদের পাদ্রী ও মহাপুরুষদের সম্মান করে এবং আমাদের গীর্জা ও উপাসনালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।"[২]

প্রখ্যাত পাদ্রী কারালিফ্সী ফ্রানসিসি, বিশ্ব কোষে ইন্তাকিয়ার অবস্থা লিখতে গিয়ে বলেছেন,—"ইয়াকূবী খৃস্টানগণ (gacobites) তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে আরব মুসলমানদের সাথে হাত মিলিয়েছে।[৩]

কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশাবলীতে যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত তাহলো ধর্মীয় নেতা এবং ইবাদতকারীদের যেন কোন মতেই আক্রমণ করা না হয়; বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুর প্রতি যেন তরবারি উঠানো না হয়, বৃক্ষ

---

১. হিস্ট্রি অবদি এরাস ঃ ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৭৪।
২. হুযুরে আকরাম (সা) কী সিয়াসী জিন্দেগী ঃ ডঃ হাবিবুল্লাহ ঃ ২৮১।
৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫৭।

www.pathagar.com

কর্তন করা না হয়। খেজুর বাগান যেন ধ্বংস করা না হয়, এবং যুদ্ধের এলাকায় কৃষক ও কৃষিবিদদের উপর যেন কোন প্রকার যুলুম করা না হয়। গাযওয়ায়ে যাতুস্ সালাসিলের ঘটনায় তাবারী লিখেছেন —

و لم يحرك خالد وأمرائه الفلاحين في شيء من فتوحهم لتعدم أبي بكر إليه فيهم-

"হযরত খালিদ (রা) ও তাঁর আমীরগণ তাদের বিজয়ের মুহূর্তে কোন কৃষককে আক্রমণ করেন নি। কেননা হযরত আবূ বকর (রা) এদের সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।"

গ্রামবাসীদের প্রতি ব্যবহার

যখন কোন দেশ আক্রমণ করা হয় তখন শহর বাসীদের তুলনায় গ্রামবাসীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা শহরের মত সেখানে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) উভয় ক্ষেত্রেই একই ব্যবহার করার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখতেন, সুতরাং হযরত আইয়ায ইবনে গানাম (রা) যখন হারান সন্ধি সূত্রে জয় করেন তখন এই শহরে গ্রামবাসিগণ বলে —

نحن أسوة أهل مدينتنا ورؤسائنا-

"আমাদের সাথে ঐ ব্যবহার করুন যা আপনি শহরবাসী ও আমাদের নেতাদের সাথে করেছেন।" হযরত আইয়ায ইবনে গানাম (রা)-এর কি উত্তর প্রদান করেছেন কাজী আবূ ইউসুফ সে সম্পর্কে অবগত নন বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এরপর তিনি লিখেছেন—

فلما من ولى من خلفاء المسلمين بعد فتحها فإنهم قد جعلوا أهل الرساتين أسوة أهل المدائن -

"বিজয়ের পর মুসলমানদের যে, প্রতিনিধি এবং শাসক নিযুক্ত হন তিনি গ্রামবাসীদের সাথে ঐ ব্যবহার করেছেন যা তিনি শহর বাসীদের সাথে করেছেন।"

এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, হযরত আইয়ায ইবনে গানাম তখন কি উত্তর প্রদান করেছিলেন।

বিপক্ষীয় সৈন্যদের সাথে ব্যবহার

একটি জাতির উন্নত চরিত্র ও উত্তম কর্ম-কাণ্ডের দিকটি বিপক্ষীয় সৈন্যদের সাথে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে সাঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিজয়ীরা কি ব্যবহার করে এবং বিপক্ষীয় দল পরাজয়বরণ করে সন্ধির প্রস্তাব দিলে সন্ধির শর্তাবলী কি ধরনের করা হয় এবং তা কতটুকু পালন করা হয় এগুলোর দ্বারা তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রাচীনকালে ইরান ও রোম শত্রুদের সাথে যুদ্ধে কি ব্যবহার করত তা উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। বিগত দুটি মহাযুদ্ধে জাতি সংঘ জার্মানীর সাথে কি ব্যবহার করেছে, ইটালী ও জাপানের সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে, যখন তাদের সাথে সন্ধি করা হয় তখন কি কি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিজিত

www.pathagar.com

এলাকার নাগরিক স্বাধীনতা কতটুকু বাকী ছিল, তাদের জাতীয় স্বাধীনতা কতটুকু বাকী ছিল, তাদের মানবীয় অধিকার কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে — এগুলো দ্বারাও প্রাচীন ইরানী ও রোমীয়দের দুর্ব্যবহারের দিকটি অনায়াসে অনুমান করা যায়।

হযরত খালিদ (রা)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতা, যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে তাঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ইতিহাস খ্যাত। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এই বীর কেশরী যুদ্ধের সময় বা সন্ধির সময় শত্রুদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করতেন তা ছিল অতুলনীয়। সাওয়াদের (ইরাক) গ্রাম বানকিয়া, বারুসামা এবং উল্লাইসের নেতা ছিলেন ইবনে জালুবা। তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলে খালিদ যে সন্ধি পত্র লিখেন তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ —[১]

إنك أمن بأمن الله إذ حقن دمك بإعطاء الجزية وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتك بانقيا وباروسما ألف درهم فقبلتها منك ورضى من معي من المسلمين على ذلك ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين على ذلك

"তুমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রয়েছ। জিযিয়া আদায় করার পর তোমার জীবন নিরাপদ হয়েছে। তুমি তোমার পক্ষ হতে, প্রজাদের পক্ষ হতে, জাযীরাহ্‌, বানকিয়া এবং বারুসামার লোকদের পক্ষ হতে যে এক হাযার দিরাহাম প্রদান করেছ তা আমি গ্রহণ করেছি। আমার সাথে যে সমস্ত মুসলমান রয়েছে তারাও এতে সম্মত হয়েছে। এখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা) এবং মুসলমানদের জিম্মাদারীতে এসে গিয়েছে।"

হীরার সন্ধিপত্র

হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে হীরাবাসীদের নামে যে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা ছিল অতি-দীর্ঘ। এর গুরুত্বপূর্ণ দফাগুলো হল এই—

১. এই সমস্ত লোকদের গীর্জা বা উপাসনালয় অথবা যে ইমারতকে তারা যুদ্ধের সময় দুর্গেরমত ব্যবহার করত তা ধ্বংস করা হবে না।

২. নাকুস বাজনা থেকে তাদেরকে বাধা প্রদান করা হবে না।

৩. কোন ধর্মীয় পর্বের সময় ক্রুসের মিছিল বের করতে তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না।

৪. এরা জিযিয়া আদায় করতে থাকলে চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং তাদের হিফাযত করা আমাদের উপর ফরয হবে।

৫. তাদের ধর্মীয় নেতা এবং আবিদ ও যাহিদরা জিযিয়া আদায় থেকে ব্যতিক্রান্ত থাকবে।

১. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫১।

www.pathagar.com

৬. তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ, অকর্মণ্য এবং পঙ্গুলোকদের ব্যয়ভার বায়তুল মাল বহন করবে।

৭. মুসলিম সেনাবাহিনীর পোশাক ব্যতীত অন্য যে কোন পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

৮. তাদের কোন গোলাম ইসলাম গ্রহণ করলে কোনরূপ তাড়াহুড়া বা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া বাজারের সর্বোচ্চ মূল্যে তাকে ক্রয় করা হবে এবং এই মূল্য তার মালিককে প্রদান করা হবে।

৯. যদি তারা মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তাদেরকে বায়তুলমাল থেকে সাহায্য প্রদান করা হবে।

সন্ধির এই সমস্ত শর্তের সাথে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এগুলো কত টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়েছিল বা ওদের মোট সংখ্যা কত ছিল? ওদের মোটসংখ্যা ছিল সাত হাযার। তাদের মধ্যে এক হাযার পঙ্গু অকর্মণ্য বা ধর্মীয় নেতা ছিল। এদের বাদ দিলে মাত্র ছয় হাযার অবশিষ্ট থাকে। তাদের উপর বাৎসরিক জিযিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল মোট ষাট হাযার দিরহাম। অর্থাৎ মাথাপিছু দশ হাযার দিরহাম।[১] উদারতা ও শত্রুদের সাথে উত্তম ব্যবহার এর চেয়ে দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

এটাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সন্ধি বা নিরাপত্তা প্রদানের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উভয় অবস্থায়ই সমান হত।

মুসলিম বাহিনীর এই উদার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হ'ত এই যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শহরের নাগরিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে আসত। ফসলাদি, বাগান, খেজুর বাগান কোন কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত না। স্থায়ী বাসীন্দারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজে মগ্ন হয়ে যেত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের কোন প্রকার ভীতি সন্ত্রাস বা অশান্তির আশংকা থাকত না।

শাস্তি

শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো অন্যায়কে প্রতিরোধ করা। কিন্তু অন্যায়কারীদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়েই থাকে। কেননা অন্যায়ের প্রকার ভেদ আছে। কোন কোন সময় একজন ভদ্র ও সৎ-লোকের দ্বারা তার অসর্তকতার মুহূর্তে কোন অন্যায় কাজ হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় ন্যায় বিচারের দাবী এই যে, অপরাধী যদি তার অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে তাহলে বিচারকের উচিৎ তার অপরাধকে ক্ষমা করে দেওয়া, যাতে শাস্তি তাকে আরো অন্যায় করার প্রতি প্ররোচিত না করে। এরূপ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান না করলেই বরং শাস্তির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু এটা ঐ সময় হতে পারে যখন সে গোপনে কোন অপরাধ করে যদি প্রকাশ্যে কোন অপরাধ করে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করাই উচিত।

---

১. কিতাবুল খেরাজ ঃ কাযী আবূ ইউসুফ ঃ পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

www.pathagar.com

আঁ-হযরত (সা) মাইয ইবনে মালিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের বেলায় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি বলেছেন —

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب -

"তোমরা শাস্তির ব্যাপারটি আপোষে মিটিয়ে ফেল। কেননা আমার সামনে ব্যাপারটি উপস্থাপিত হলে শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

অপরাধীর অপরাধ উপেক্ষা

হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত ইরশাদ অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ প্রকাশিত না হত ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা) অপরাধীকে শাস্তি না দেওয়ারই চেষ্টা করতেন।[১] তিনি বর্ণনা করেন, মাইয ইবনে মালিক (রা) যখন তৃতীয় বারের মত অপরাধ স্বীকার করেন এবং হুযূর (সা) তা-রদ করে দেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) মাইযকে বলেন, যদি তুমি চুতর্থবারের মত অপরাধ স্বীকার কর তাহলে হুযূর (সা) তোমাকে শাস্তি প্রদান করবেন।[২] এটা বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে মাইয চতুর্থবার অপরাধ স্বীকার না করে এবং শাস্তি হতে রেহাই পায়। কিন্তু অত্যধিক আল্লাহ্ ভীতির কারণে মাইয আবূ বকরের কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি। ফলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আশআ'স ইবনে কায়েস যখন মুরতাদ হিসেবে বন্দী হয়ে আসে এবং খাঁটি অন্তরে তাওবা করে তখন হযরত আবূ বকর (রা) শুধু তার প্রাণ রক্ষা করেন নি বরং তার আবেদন অনুযায়ী তাঁর সম্পর্কিত বোন উম্মে ফারওয়াহ্কে তার সাথে বিয়েও দেন।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

অপরাধ যদি কঠোর হ'ত এবং তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের না হয়ে জাতীয় পর্যায়ের হত তাহলে হযরত আবূ বকর (রা) সে অপরাধা ক্ষমা করতেন না, বরং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন, যাতে অন্যরা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আয়াস আ'সসালমী নামক এক ব্যক্তি যখন ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) থেকে তাওবা করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করে তখন হযরত আবূ বকর (রা) তার সম্পর্কে এই মর্মে কড়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে যেন গ্রেফতার করে এনে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।[৩]

---

১. আবূ দাউদ ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৪০।

২. মুসনাদে আহমদঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৮।

৩. তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৯১। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, হযরত আবূ বকর (রা) পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐ সময় আয়াসকে এই শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু যত বড় অপরাধী হোক না কেন তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা ইসলাম পছন্দ করে না তাই হযরত আবূ বকর (রা) এই ঘটনার জন্য সর্বদা দুঃখ করতেন এবং ইনতিকালের সময় এই অনুতপ্ত হয়ে বলেন, যদি এরূপ করা না হ'ত।

www.pathagar.com

মদ্য পানের শাস্তিঃ

হুযূর (সা)-এর যুগে মদ্য পানকারীদের জন্য কোন বিশেষ শাস্তি নির্ধারিত ছিল না বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো তাকে প্রহার করা হত যাতে সে লজ্জা পেয়ে ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে। আবার কখনো চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হত। হযরত আবূ বকর (রা) একই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। এতে তিনি কোন পরিবর্তন করেন নি। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর যুগে যখন এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন বেত্রাঘাতের সংখ্যা চল্লিম থেকে আশি পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে — [১]

عن السائب من يزيد (رض) قال كنا تؤتى بالشارب على عهد رسـول ﷺ وإمرة أبي بكر (رض) وصدرا من خلافة عمر (رض) فنقوم إليه بأيدينا ونعالنـا و أوديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين –

"হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা)-এর যুগে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের সূচনায় শারাব পানকারীকে আমাদের নিকট নিয়ে আসা হলে আমরা আমাদের হাত, মুযা এবং চাঁদর নিয়ে (শাস্তি প্রদানের জন্য) তার দিকে এগিয়ে যেতাম। কিন্তু হযরত ওমর (রা) মদ্য পানকারীদের শাস্তি চাল্লিশ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। যখন এ সমস্ত লোকদের মধ্যে অন্যায় আরো বৃদ্ধি পায় তখন আশি বেত্রাঘাতের নিয়ম চালু করেন।[২]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা) চল্লিশ বেত্রাঘাতের নিয়ম চালু করেন, অথচ এই শাস্তি স্বয়ং হুযূর (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও চালু ছিল। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খিলাফতকালে একবার ওয়ালিদ ইবনে উক্‌বাহ্ গ্রেফতার হয়ে আসে এবং দু'ব্যক্তির সাক্ষি অনুযায়ী তার মদ্য পানের অপরাধ প্রমাণিত হয়। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য হযরত আলী (রা) -কে নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রা) ওয়ালীদকে বেত্রাঘাত করতে থাকেন এবং হযরত আলী (রা) তা হিসেব করতে থাকেন। চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার পর হযরত আলী (রা) বলেন এবার থাম। কেননা হুযূর (সা) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং আমি তার হিসেব রেখেছি। অবশ্য হযরত ওমর (রা) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। কিন্তু আমার কাছে এটা এবং এছাড়া হুযূর (সা)-এর দ্বিতীয় সুন্নত অধিক প্রিয়। এই বর্ণনাই অধিক অনুমান নির্ভর বলে মনে হয়। কেননা লোকদেরকে হাত বা জুতা দিয়ে পিটানো একটি বিশৃংখল শাস্তি। এটাকে বিচার বলা যেতে পারে না। এছাড়া যদি বেত্রাঘাতের শাস্তি হুযূর (সা) এর যুগে প্রচলিত না হ'ত তাহলে হযরত আবূ বকর (রা) তার কোমল হৃদয়ের কারণে কখনো এই শাস্তির প্রচলন করতেন না।

---

১. বুখারীর ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১০০২।

২. আবূ দাউদ ঃ باب الحد في الخمر ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ২৪১।

www.pathagar.com

চুরির শাস্তি

চুরির শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে যে বর্ণনা আছে তাতে কোন মতভেদ নেই। অবশ্য বিচারক যদি মনে করেন যে, চোর বাধ্য হয়ে চুরি করেছে তাহলে তাকে ক্ষমা করার অধিকার বিচারকের রয়েছে। হযরত ওমর (রা)-এর যুগে এমন এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে চুরির শাস্তি কার্যকর করা হয় নি। হযরত আবূ বকর (রা) অপ্রাপ্ত বয়স্ক চোরকে শাস্তি প্রদান করতেন না।

ব্যভিচারের শাস্তি

আঁ-হযরত (সা) অবিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত এবং দেশ থেকে বিতাড়নের শাস্তি প্রদান করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এই নীতি অব্যাহত রাখেন। তাঁর খিলাফতকালে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে এবং তাতে তিনি এই শাস্তিই প্রদান করেন।

ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন

যদিও হযরত আবূ বকর (রা) জাতীয় পর্যায়ের অপরাধের ব্যাপারে কোনরূপ করুণা ও কোমলতা প্রদর্শন করতেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোন অপরাধ সংঘঠিত হত তাহলে তিনি তা উপেক্ষা করে যেতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটায়। তখন হযরত আবূ বকর (রা) তার উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এক ব্যক্তি তখন বলেন, হে রাসূল (সা)-এর খলীফা ! আপনি আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। এটা শুনে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্রোধহ্রাস পায় এবং তিনি আশ্চার্য হয়ে বলেন, যদি আমি তোমাকে নির্দেশ দিতাম তাহলে কি সত্যিই তুমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে? অতঃপর বলেন, স্মরণ রেখ! হুযূর (সা)-এর পর এরূপ করা করো জন্য বৈধ নয়।[১]

দীনী সেবা

আকায়িদ সংশোধন

হযরত আবূ বকর (রা) তার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে যদিও আভ্যন্তরীণ ও বাইরের গুরতত্বপূর্ণ কাজে প্রধানত ব্যস্ত ছিলেন (এবং এ সব কিছুই দীনের জন্যই ছিল) তবু (সাধারণ প্রচলিত অর্থে যেটাকে) দীনী খিদমত (বলা হয়) এটা তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে তার প্রকৃত আকৃতি ও অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভুল চিন্তা দ্বারা ও বিদয়াতের মূলোৎপাটন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সময় তিনি যে, খুতবা পেশ করেছিলেন তাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তার খুতবায়

---

১. ইযালাতুল খাফা ঃ ২য় অধ্যায় ঃ পৃঃ ৩৮

www.pathagar.com

বলেছিলেন, পয়গাম্বর হলেন শরীয়ত প্রাপ্ত, তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতিটি কাজ আদর্শমূলক এবং প্রতিটি বাণী অবশ্যই অনুসরণ যোগ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন মানব তাই যতটুকু মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা রয়েছে তাতে তাঁর এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং হুযূর (সা) যদি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে থাকেন তা হলে এটা বাস্তবতা-বিরোধী কোন অসাধারণ ব্যাপার নয়।

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, খলীফা ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। কেননা পয়গাম্বরের মত তাঁর নিকট ওহী আসে না। কাজেই খলীফার যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তা হলে এর উপর চুপ না থেকে তা সংশোধন করে দেয়া মুসলিম মিল্লাতের ফরয ও কর্তব্য। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন — وإن زغــت فقومـوني কথা ও মনের এরূপ স্বাধীনতার উদাহরণ কোন গণতান্ত্রিক সমাজে কি পাওয়া যাবে? জনৈক ব্যক্তি তাঁকে খলীফাতুল্লাহ্ বলে আহ্বান করলে তিনি তার কথা সংশোধন করে দিয়ে বলেন, 'আমি আল্লাহ্র খলীফা নই বরং আমি তাঁর রাসূল (সা)-এর খলীফা।

যাকাত অস্বীকারের বিরুদ্ধে তিনি যে জিহাদ করেছেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল ফরয একই সমান। শরীয়তে এগুলো খণ্ডিত হতে পারে না।

অতএব একটি অংশ অস্বীকার করা সকল অংশ অস্বীকার করারই শামিল।

সৎকাজের আদেশ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

يَاۤ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে বিশ্বাসিগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

উপরোক্ত আয়াতের ভাল ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, যখন এখানে আপন আপন বিষয়ে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে তখন অন্যকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তথা সত্য প্রচারের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আবূ বকর (রা) একবার খুতবা প্রদানের সময় এই আয়াত পাঠ করেন এবং বলেন, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর, কিন্তু এর সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পার না। আমি হুযূর (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি লোকজন তাদের মধ্যে অন্যায় ও অবিচার প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তার উপর অসন্তোষ প্রকাশ না করে তা হলে এমন হতে পারে যে, দোষী নির্দোষী সবাইকে এই ব্যাপারে শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[১]

---

১. মুসনাদে আহমদ : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৯।

www.pathagar.com

বিদ'আতের উপর সতর্কবাণী

ধর্মের জন্য সবচেয়ে বড় ফিত্না ও বিশৃংখলা হলো বিদ'আত। এদিকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রখর দৃষ্টি ছিল। যখন তিনি করো বিদ'আত সম্পর্কে অবগত হতেন তখন তাকে সাথে সাথে সতর্ক করে দিতেন। এক বার হজ্জের সময় তিনি অবগত হন যে, আহমাস্ গোত্রের যয়নাব নাম্নী এক মহিলা হজ্জ আদায় করছেন কিন্তু (এই সময়) কারো সাথে কথা বলছেন না। তখন তিনি সাথে সাথে তার নিকট যান এবং বলেন, 'হজ্জের সময় কথা না বলা এবং চুপ থাকা জাহেলিয়াতের রীতি।'[১]

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

হযরত আবূ বকর (রা) যখন কোথাও সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন যেন তারা শুধুমাত্র তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এই প্রেক্ষিতেই হযরত আদী ইবনে হাতিম-এর চেষ্টায় বনু ত্বায় গোত্র ইরতিদাদ হতে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত মুসান্না ইবনে হারিসা (রা)-এর দাওয়াতে বনু ওয়ায়েল গোত্র ও বহু ভূত পূজারী ও খৃস্টান ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা)-এর চেষ্টায় ইরাক এবং সিরিয়ার অধিকাংশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নলিখিত কবিতা প্রেরণ করেন[২]

فهل يقبل الصديق أني مراجع + ومعط بما أحدثت من حدث يدي

وإني من بعد الضلالة شاهد + شهادة حق لست فيها بملحد –

"আবূ বকর (রা) কি এটা গ্রহণ করেন যে, আমি ইসলামের ফিরে আসি এবং যা কিছু পাপ ও অন্যায় আমি করেছি তার ক্ষতিপূরণ করি। পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আমি এই সাক্ষী প্রদান করেছি যে, সত্য থেকে আমি আর পিছু হটবো না।"

এ ছাড়া হীরার বহু খৃস্টান পাদ্রী নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

পবিত্র কুরআন সংকলন

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক কাজ হলো কুরাআন মজীদ সংকলন করা। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইয়ামামার যুদ্ধে এক হাযার দু'শত মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এদের মধ্যে উনচল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও হাফিযে কুরআন ছিলেন। এটি ছিল একটি মাত্র যুদ্ধের অবস্থা। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, যদি অন্যান্য যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিও পরিমাপ করা হয় তাহলে এর

---

১. সহীহ্ বুখারী ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৪১। باب أيام الجاهلية

২. তারিখে ইয়াকুবী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৪৫।

www.pathagar.com

মোট পরিমাণ আরো অনেক বেশী হবে। নিশ্চয় হযরত আবূ বকর (রা) এটা অনুমান করেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে তিনি এমন কোন কাজ করতে অগ্রসর হতেন না যা স্বয়ং হুযূর (সা) করেন নি কিন্তু হযরত ওমর (রা) সাহসিকতার সাথে হযরত আবূ বকর (রা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, "ইয়ামামার যুদ্ধে যথেষ্ঠ পরিমাণ কুরআনের হাফিয ও কারী শাহাদাত বরণ করেছেন, তাই আপনি যদি পবিত্র কুরআন সংকলনের ব্যবস্থা না করেন তাহলে এর একটি বিরাট অংশ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।" হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, হুযূর (সা) যা করেন নি আমি তা কিভাবে করব? হযরত ওমর (রা) বলেন, 'এটা তো উত্তম কাজ।' তিনি পুনঃ পুনঃ একই কথা বলেন। হযরত আবূ বকর (রা) মনে শান্তি পেলেন, তাঁর চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হলো এবং তিনি তখনই হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে ডেকে বললেন, "তুমি যুবক, তুমি জ্ঞানি, তুমি রাসূল (সা)-এর কাতেবে ওহী ছিলে। অতএব তুমিই অনুসন্ধান চালিয়ে কুরআন সংকলিত কর।" হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন, "যদি হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে কোন একটি পাহাড় এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন তবুও তা-এই নির্দেশের চেয়ে অধিক কঠিন হত না।" হযরত আবূ বকর (রা)-এর অনুরোধের জবাবে তিনিও ঐ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন যা প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা) করেছিলেন। উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) তাই বলেন যা হযরত ওমর (রা) তাঁকে বলেছিলেন। অর্থাৎ এই কাজটি তো উত্তম। যাহোক হযরত যায়েদও এ ব্যাপারে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করেন এবং কুরআন মজীদের বিভিন্ন অংশ যা কাপড়ের টুকরায়, বৃক্ষের ছালে এবং খেজুরের পাতায় লিখিত ছিল অথবা বিভিন্ন লোকদের মুখস্ত ছিল তা সকলই সাবধানতার সাথে একত্রে সংকলিত করা হয়। এই কুরআন শরীফ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট রক্ষিত ছিল। তার ইন্‌তিকালের পর হযরত ওমর (রা) তা সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইন্‌তেকালের পর হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে তা সংরক্ষিত থাকে।[১]

একটি ভুল বর্ণনা

একটি বর্ণনায় আছে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) সর্বপ্রথম কুরআন একত্র করেন।[২] কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম কুরআন একত্র করার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। কিন্তু এই কাজের পূর্ণতা সঠিক খিলাফতে সিদ্দিকীরই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। বর্ণনাকারী হযরত ওমর কুরআন একত্র করার প্রস্তাবকে কুরআন একত্র করা মনে করেছেন। স্বয়ং হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর

---

১. সহীহ্ বুখারী : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৬৭৬, ৭৪৫।

২. كتاب المصاحف لابن أبي داود' طبع أو المطبعة الرحمانية بمصر (ص ١٠)

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হোক। কুরআন জমা করার ব্যাপারে তার প্রতিদান হলো সর্বাধিক। কেননা তিনিই এটা সর্বাগ্রে জমা করেছেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক সাহাবায়ে কিরামদের সাক্ষ্য রয়েছে, যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।[১]

কুরআন জমা করার মূল কারণ ও একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

কুরআন মজিদ সংকলন ও বিন্যস্তকরণ সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি ধারণা রয়েছে যে, হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকাল পর্যন্ত কুরআনের আয়াতসমূহ অবিন্যস্ত ছিল, একটির সাথে অপরটির যোগ ছিল না, সূরাসমূহও অবিন্যস্ত ছিল, এবং সেগুলোর নাম পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেই ঐ সমস্ত সূরা ও আয়াত বিন্যস্ত করণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই ধারণাকে পুঁজি করে কোন কোন প্রাচ্যবিদ বিশেষ করে স্যার উইলিয়াম ম্যূর ও আর্থার জিকরে (যিনি "কিতাবুল মাসাহিফ লি ইবনে আবূ দাউদ" অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত সম্পাদনা করে মিসর থেকে প্রকাশ করেছেন) অত্যন্ত জোরের সাথে এই দাবী করেছেন যে, বর্তমান কুরআন ঐ কুরআন থেকে ভিন্ন, যা হুযূর (সা)-এর যুগে ছিল।

আমাদের মতে, এ ধরনের কল্পনা জ্ঞান পাপীদের শুধু পথ ভ্রষ্টতাই নয়, অসাধুতাও বটে। কেননা বহু নির্ভরযোগ্য দলীলের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরার বিন্যাস স্বয়ং হুযূর (সা)-এর যুগেই এবং তারই নির্দেশে হয়েছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বর্ণনা করেন, "আমি সমগ্র কুরআন হুযূর (সা)-এর সামনে পাঠ করেছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, আনসারের মধ্যে হতে চার ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর যুগে কুরআন জমা করতেন। তাঁরা হলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং হযরত আবূ যায়েদ।[২] মুহাম্মদ ইবনে ইস্‌হাক 'আল ফিহ্‌রিস্‌ত' (রা) নামক কিতাবে এমন সাত জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যারা হুযূর (সা)-এর যুগে কুরআন জমা করেছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য হুযূর (সা)-এর কয়েক জন নির্ভরযোগ্য লিখক ছিলেন। যখন কোন আয়াত নাযিল হ'ত তখন তিনি ঐ লিখকদের বলে দিতেন, 'এই আয়াতকে অমুক সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।' উপরোল্লিখিত চারজন আনসারের কাজ ছিল, পবিত্র কুরআন লিখা ও তা সংরক্ষণ করা। এটাকেই জমা শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত আনাস (রা) যে চার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন এর অর্থ এই নয় যে, হুযূর (সা)-এর যুগে অন্য কোন কুরআন জমাকারী ছিল না, কেননা নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ও এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়েতের অর্থ এই যে, শুধু আনসারদের মধ্যেই চারজন নিয়মিত লিখক ছিলেন।

১. কিতাবুল মাসাহিফ ইবনে আবু দাউদ, পৃঃ ৫।
২. বুখারী ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৭৪৮।

www.pathagar.com

এ ছাড়া অন্যান্য মুতাওয়াতির রিওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সা) বছরে একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে নাযিলকৃত সমগ্র কুরআন পড়ে শুনাতেন। যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সে বছর সমগ্র কুরআন দু'বার পড়ে শুনিয়েছিলেন।[১]

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন মজীদ হুযূর (সা)-এর যুগে বিশৃংখল বা অবিন্যস্ত ছিল না বরং সংকলন আকারেই ছিল। খোদ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এটাকে 'আল কিতাব' বলা হয়েছে। যার অর্থ লিখিত ও সংকলিত। সূরায় মুযাম্মিলে বলা হয়েছে — وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (আপনি কুরআনকে তারতীলের সাথে পড়ুন)

প্রকাশ থাকে যে, যদি কুরআন সংকলিত না হয়ে থাকে তাহলে তারতীল হবে কিসের?

হুযূর (সা)-এর যুগে সুরাসমূহের বিন্যাস

হুযূর (সা)-এর যুগেই সূরাসমূহের নাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর স্বপক্ষে অনেক সহীহ্ রিওয়ায়েত পেশ করা যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, 'আমি হুযূর (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকেই ত্রিশটি সূরা পড়েছি।[২]

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের হাতে যে সহীফা দেখতে পান তাতে সূরা তা-হা লিখা ছিল।

কোন কোন সময় অনেকগুলো আয়াত এক সংগে নাযিল হ'ত এবং হুযূর (সা) তা তিলাওয়াত করার পর ওহী লিখকদের বলতেন অমুখ আয়াত অমুখ সূরার অমুক জায়গায় লিপিবদ্ধ কর।

এ ছাড়া অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আঁ-হযরত (সা) নামাযে এবং নামাযের বাইরেও পূর্ণাঙ্গ সূরা পাঠ করতেন। যেমন — আল বাকারা, আলে ইমরান, আন নিসা ইত্যাদি। তাছাড়া হুযূর (সা) বিশেষ বিশেষ সূরা যেমন — আল বাকারা, আল কাহাফ, আররাহমান, ইয়াসীন প্রভৃতি তিলাওতের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বিশেষ সূরা হুযূর (সা) বিশেষ বিশেষ নামাযে পাঠ করতেন। যেমন — সহীহ্ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, হুযূর (সা) মাগরিবের নামাযে সূরা আরাফ ও সূরা ইখলাস এবং অন্যান্য নামাযে আল-ইমরান ও নিসা তিলওয়াত করতেন। এ ধরনের রিওয়ায়েতের উল্লেখ হাদীসের প্রায় কিতাবেই রয়েছেন।[৩]

আমরা উপরে যা কিছু বললাম তা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন-

---

১. বুখারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৭৪৮।
২. বুখারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৭৪৮।
৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সহীহ্ বুখারী ২য় খণ্ডের ৭৪৯-৭৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

১. আঁ-হযরত (সা)-এর জীবিতকালেই কুরআন লিখিত হয়েছিল উপরন্তু তিনি কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন لا تكتبوا عني غير القرآن
"কুরআন ছাড়া তোমরা আমার নিকট হতে অন্য কিছু লিখ না।
২. প্রতিটি সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসও হুযূর (সা)-এর যুগে এবং তাঁরই নির্দেশে হয়েছিল।
৩. হুযূর (সা)-এর যুগেই সূরার নামকরণ করা হয়েছিল।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রকৃতি

যখন এ সমস্ত কিছুই হুযূর (সা)-এর যুগে হয়েছে তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে কুরআন সংকলিত হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, যদিও হুযূর (সা)-এর যুগে পূর্ণাঙ্গ কুরআন সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং বিভিন্ন জনের নিকট ছিল—কারো নিকট একটি সূরা, আবার কারো নিকট একটি সূরার কিছু অংশ। এর কারণ ছিল এই যে, যখন ওহী নাযিল হ'ত তখন সকল ওহী লিখক উপস্থিত থাকিত না, যিনি নিকটে থাকতেন হুযূর (সা) তার দ্বারাই ওহী লিখিয়ে নিতেন। এমন লোক অনেক ছিল যারা সরাসরি হুযূর (সা) থেকে কুরআনের আয়াত শুনে নি। তাই তাদের নিকট সূরা বা আয়াত কোন না কোন মাধ্যমে পৌঁছেছে তা আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ এবং কখানো আংশিক। মোটকথা হুযূর (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে বিদ্যমান ছিল না। সংকলিত ছিল বলে কিন্তু এক স্থানে ছিল না। বিভিন্ন হাফিযে কুরআনের নিকট বিভিন্ন অংশ ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফিয এবং কারী শাহাদাত বরণ করেন। তখন হযরত ওমর (রা) কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সম্ভবত যারা শাহাদাত বরণ করেছেন কুরআনের কোন কোন অংশ হয়ত শুধু তাদের নিকটই ছিল। অন্য কারো নিকট ছিল না। কাজেই তাঁদের শাহাদাতের পর ঐ অংশসমূহ যদি অন্য কোথাও না পাওয়া যায় তা হলে দুনিয়া অনন্তকালের জন্য এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।

মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে সমগ্র কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। হাফিয ইবনে হাযার লিখেছেন।

قد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله يتلو صحفا مطهرة الآية وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت متفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد -

"আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে, এটা বিভিন্ন সহীফার মধ্যে সংরক্ষিত আছে। যেমন বলা হয়েছে, يتلو صحفا مطهرة এবং কুরআন সহীফাসমূহে লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ সহীফা-সমূহ (বিভিন্ন অংশ যা পৃথকভাবে লিখিত ছিল) বিক্ষিপ্ত ছিল। অতএব হযরত আবূ বকর (রা) তা এক স্থানে জমা করেন।"[১]

---

১. ফাতহুল বারী ঃ ৯ম খণ্ডঃ পৃঃ ১০

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর সংকলনের মধ্যে পার্থক্য

যদিও পবিত্র কুরআন জমা করার মূল অবদান হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রাপ্য, কিন্তু এ বিষয়ে হযরত ওসমান (রা) সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন এবং সাধারণভাবে তাকেই কুরআন জমাকারী বলা হয়। কিন্তু তাঁদের এই উভয় কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন জমা করার বাস্তবতা হলো এই যে, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার লাভ করে তখন বিভিন্ন শহরের লোকজন নিজ নিজ এলাকায় হাফিযে কুরআনের কিরাত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে থাকে। যেমন কূফাবাসী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ(রা)-এর এবং বসরাবাসী আবূ মূসা আশ'আরীর এবং দামেশ্কবাসী হযরত মিক্দাদ ইবনে আসওয়াদের, সিরিয়াবাসী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর নুস্খা অনুযায়ী কিরাত পাঠ করতে থাকে। এই পার্থক্য কিরাতের শব্দ ও বাক্যের মধ্যে ছিল না বটে, তবে একারণে বাক্যের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে কিরাতের মধ্যেও সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সময় আরমেনীয়া ও আযার বাইজান সীমান্তে যুদ্ধ চলছিল। হযরত হুযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কিরাতের বিরাট পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেন। এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং হযরত ওসমান (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! এই উম্মত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মত স্বীয় কিতাবে (কুরআনে) মতভেদ সৃষ্টি করে গুমরাহ্ হওয়ার পূর্বে আপনি এটা প্রতিহত করুন। হযরত ওসমান (রা) হযরত হাফ্সা বিনতে ওমর (রা)-কে বলেন, 'আপনার নিকট (হযরত আবূ বকর (রা)-এর সংকলিত) যে কুরআন রয়েছে তা দিন, আমরা এর কিছু কপি তৈরী করে মূল কপি আপনাকে ফেরৎ দেব।' এবার হযরত ওসমান (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঐ কপির অনুলিপি তৈরি করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিস (রা), এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের(রা)-কে নিয়োজিত করেন। এঁদের মধ্যে তিনজন কুরাইশী ছিলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, 'যে কিরাত সম্পর্কে তোমাদের ও হযরত ইবনে সাবিত (রা)-এর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে তোমরা সেখানে কুরাইশদের কিরাত অনুসরণ করবে। কেননা কুরাইশদের কিরাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। যখন কয়েকটি অনুলিপি তৈরি হয়ে যায় তখন তিনি এর এক একটি কপি এক একটি প্রদেশে প্রেরণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য যত কপি ছিল তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।[১]

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) কুরআন মজীদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্র করেন, তবে কোন কিরাত নির্দিষ্ট করেন নি। পক্ষান্তরে হযরত ওসমান (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কুরআনের উপর ভিত্তি করে কতিপয় কিরাতও নির্ধারণ করেন যা' 'সাবআ কিরাত' নামে প্রসিদ্ধ।

---

১. সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৭৪৬। باب جمع القرآن

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি অন্যান্য কিরাতসমূহকে প্রমাণহীন ঘোষণা দেন এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে লিখিত সকল কপি পুড়িয়ে ফেলেন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) কাযী আবূ বকর হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (কাযী) বলেছেন যে, [১]

لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين اللوحين وإنما قصد جمعهم على القرأت الثابتة المعروفة عن النبي ﷺ وإلغاء ما ليس كذلك -

"হযরত আবূ বকর (রা) সমগ্র কুরআনকে একত্র করার যে কাজ করেছেন হযরত ওসমান (রা) তা করেন নি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যে কিরাত হুযূর (রা) থেকে প্রমাণিত তার উপর মুসলমানদের একত্র করা এবং বাকী কিরাতসমূহে মিটিয়ে ফেলা।[১]

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কৃতিত্বপূর্ণ কাজ

হযরত আবূ বকর (রা) কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী (র) লিখছেন—এই জমাকৃত কুরআন, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وإنا له لحافظون সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যার সুসংবাদ- إن علينا جمعه وقرآنه এর মধ্যে নিহীত রয়েছে।[২]

যতদিন দুনিয়াতে কুরআন ও কালিমা পাঠকারী বিদ্যমান থাকবে তত দিন হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই ইহ্সান থেকে মুসলিম উম্মাহ্ ঋণ মুক্ত হতে পারবে না।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সামাজিক জীবন

আঁ-হযরত (সা)-এর যুগেই আরবদের সামাজিক জীবনে আধুনিকতার পরশ লেগেছিল। ইসলামের পূর্বে ঘরের ভেতর পায়খানা তৈরির প্রচলন ছিল না। মদীনায় হিজরতের পর এর প্রচলন পড়ে। তবে লক্ষ্য রাখা হ'ত যেন তা ঘরের ভেতর না হয়ে ঘরের নিকটে হয়।[৩] পোশাক-পরিচ্ছেদে, আচার-ব্যবহারে, এবং চাল-চলনেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আমেজ লাগে। আরবদের জীবন সারল্য চিরদিনই বিদ্যমান ছিল। কৃত্রিমতা কখনো তাদের মধ্যে সরলতা পুরাপুরি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে যুগের দু'টি সভ্য ও উন্নত জাতি ইরানী ও রোমানদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে ইরাক ও সিরিয়ায় মুসলমানদের জীবনে কিছু কিছু কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা ঢুকে পড়তে শুরু করে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব একটি মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং ইরানের শিল্পজাত ও উৎপন্ন দ্রব্য মিসর ও পাশ্চাত্যের

---

১. الإتقان في علوم القرآن ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ১০৩

২. ইযালাতুল খাফা : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫।

৩. সহীহ্ বুখারী : ২য় খণ্ডঃ حديث الإفك

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশে আমদানী রফতানী হ'ত। এই প্রেক্ষিতে আরবী কাব্যে ভারতীয় তরবারী, মশলা, বাদ্যযন্ত্র, কাফুর ও যানজাবীল প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি আরবে ব্যবহৃত হ'ত।

পোশাক

পোশাক হিসেবে আরবরা সাধারণত একটি চাদর ও একটি পায়জামা ব্যবহার করত। কিন্তু পরে যখন সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয় তখন তাদের মধ্যে কুর্তা, জামা, পায়জামা ইত্যাদির প্রচলনও পড়ে। এছাড়া পুরুষরা বাইরে বের হওয়ার সময় মাথায় পাগড়ী বাঁধত এবং জুব্বা পরিধান করত। মহিলারা মাথায় রুমাল বা উড়নী ব্যবহার করত—যেটাকে খিমার বলা হয়। অলংকারের মধ্যে বাজুবন্দ, কড়াবালী, অঙ্গুরী, হার, লঙ্গ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। গাযওয়ায়ে বনী মুসতালেকের সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর যে হার হারানো গিয়েছিল তা মোহরায়ে ইয়ামানীর তৈরি ছিল।[১] সুরমা ও মেহেন্দীর ব্যবহারও ছিল। অরস নামক এক প্রকার লাল ঘাস রংয়ের জন্য মুখমণ্ডলে মালিশ করা হ'ত। সুগন্ধির জন্য মিশ্‌ক আম্বর এবং জাফরান ব্যবহার করা হ'ত।

খাদ্যদ্রব্য

সাধারণভাবে আরবদের খাদ্য খুব সহজ ও সরল ছিল। দুধ, খেজুর এবং গোশ্‌ত আরবদের খুবই প্রিয় খাদ্য ছিল। বিভিন্ন পদ্ধতিতে গোশত রান্না করা হ'ত। খেজুর এবং দুধ ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হ'ত। মাখন, পনির, এবং হারিরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। তরকারীর মধ্যে কদুর কথা হাদীসে উল্লেখিত আছে। কদু হুযূর (সা)-এর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল। হাদীসে অন্যকিছু তরি-তরকারীর উল্লেখও রয়েছে। হুযূর (সা) সিরকাকে উত্তম তরকারী আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বুখারীর কিতাবুল আত্‌ইমাহ্‌ এবং ইবনে কাইয়্যূমের জাদুল মা'আদ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

জীবন জীবিকার উপায়

ইউরোপীয় লেখকদের সাধারণ ধারণা এই যে, ইসলামের পর মুসলমানদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল গনীমতের মাল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা শুধুমাত্র জিহাদে অংশ গ্রহণকারীরাই গনীমতের মালের অংশ পেতেন এবং তাদের সংখ্যা সাধারণ বাসিন্দাদের তুলনায় ছিল খুবই নগণ্য। হুযূর (সা)-এর যুগে এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও মুহাজির ও আনসার এই দু'দলের দ্বারাই মূল ইসলামী সমাজ গঠিত হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকার পৃথক পৃথক

---

১. সুনানে আবূ দাউদ । باب التيمم

www.pathagar.com

উপায় ছিল। মুহাজিররা ব্যবসা করতেন এবং আনসাররা শস্য উৎপাদন করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার মুহাজির ভাইরা ব্যবসায়ের কাজ এবং আনসার ভাইরা ক্ষেত খামারের কাজ করত এবং আমি হুযূর(সা)-এর খিদমতে হাযির থাকতাম।[১] মুহাজিরদের মধ্যে ব্যবসায়ী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এবং হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কা'স (রা)। মুহাজিরদের মূল পেশা যদিও ব্যবসা ছিল কিন্তু মদীনায় আনসারদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেত খামারের কাজও করতেন।

স্বাধীন ব্যবসা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল উকাজ, জুল মাজনা এবং জুল মিজায। ঐ সমস্ত বাজারে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেত। কিন্তু তাদের ঐ ব্যবসা স্বাধীন ছিল না। তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হ'ত। হুযূর (সা) মদীনায় অপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এর বৈশিষ্ট ছিল এই যে, সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন কর আদায় করা হ'ত না। তিনি যখন এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন বলেন,[২] هذا سوقكم لاخراج عليكم فيه "এটা তোমাদের বাজার, এখানে ব্যবসা করতে তোমাদের কোন কর লাগবে না।"

হস্তশিল্প ও স্বাধীন পেশা

মুসলমানরা ব্যবসা ও কৃষিকাজ ছাড়া জীবিকার্জনের জন্য হস্তশিল্প এবং অন্যান্য শ্রমের কাজও করতেন। ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে হালাল উপার্জনের জন্য কাজ করতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। হযরত সালমান ফারসী (রা) চাটাই তৈরি করতেন[৩] হযরত সা'দ আনসারী পাথর খোদাইয়ের কাজ করতেন।[৪] কোন কোন সাহাবী মৌমাছি পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন।[৫] হযরত সাওদা (রা) তায়েফে চামড়ার ব্যবসা করতেন। তাই সকল উম্মুল মু'মিনীনের চাইতে তিনি অধিক বিশ্বাসী ছিলেন। কোন কোন সাহাবী (রা) কামার এবং ছুতারের কাজ করতেন। কেউ কেউ খনির কাজে ঠিকাদারী করতেন। কাযী আবূ ইউসুফের কিতাবুল খিরাজ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

---

১. সহীহ্ বুখারী كتاب البيوع
২. ফুতুহুল বুলদান বালাযুরী পৃঃ ২১।
৩. ইসতিয়াব : তাযকিরায়ে হযরত সালমান ফারসী (রা)।
৪. উসদুল গাবা تذكرة سعد الأنصار
৫. সুনানে আবূ দাউদ। باب زكاة العسل

www.pathagar.com

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর যুগে বেতন ভাতা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ

হযরত ওমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতকালে মর্যাদা অনুযায়ী সকলের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণ করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এই আশংকা করেছিলেন যে, বেতন ভাতা প্রদানের কারণে 'লোকজন অলস হয়ে পড়বে, এবং তাদের কর্মস্পৃহা হ্রাস পাবে। তাই তিনি কোন সুস্থ লোকের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণ করেন নি। যা কিছু আমদানী হ'ত, সাথে সাথেই তা সমভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এ কারণেই যখন হযরত ওমর (রা) সকল মুসলমানের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব এর প্রতিবাদ করে বলেন —[1]

إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة -

"সমাজের সকল লোকের জন্য যদি আপনি বেতন ভাতা নির্ধারণ করে দেন তাহলে এর উপর ভরসা করে ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দেবে।"

সমাজের সাধারণ অবস্থা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নত। এতে মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ছিল। গোলাম ও দাসিদের প্রতিও অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করা হ'ত। দেশে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত ওমর (রা) প্রধান বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত তাঁর কাছে কোন মুকদ্দমা পেশ করা হয় নি। খলীফা, প্রশাসক এবং সাধারণ মুসলমানদের জীবন-যাপনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। একজন সাধারণ মুসলমান নিঃসঙ্কোচে খলীফার কাজের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পারত। অমুসলিমদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল এবং মুসলমান ও তাদের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। নিজের অবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যা অর্জনের পরিপূর্ণ সুযোগ তারা ভোগ করত।

ইজ্‌তিহাদ ও কিয়াস

হুযূর (সা)-এর যুগে কিয়াস

কুরআন ও হাদীসে মৌলিক বিধি-বিধান ছাড়া যদিও হাযার হাযার মাসআলা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নতির সাথে সাথে এরূপ হাযার হাযার মাসআলা সামনে আসে যা কুরআন ও হাদীসে সরাসরি বর্ণিত হয় নি। ফলে ইজ্‌তিহাদ ও কিয়াস ব্যতীত এরূপ মাসআলার মীমাংসা করা সম্ভব ছিল না। আর ইজতিহাদ ও কিয়াসের বৈধতা খোদ আঁ-হযরত (সা) স্বীকার করেছেন। অতএব ইসলামে এটা কোন নতুন জিনিস নয়। আঁ-হযরত (সা) যখন হযরত মু'আয ইবনে

---

১. ফুতহুল বুলদান : বালাযুরী : পৃঃ ৪৬৩।

www.pathagar.com

জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে কাযী (বিচারক) হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি লোকদের মাঝে মাসআলার মীমাংসা কিভাবে করবে? তিনি বলেন, যদি আমি কুরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট নির্দেশ না পাই তা হলে أجتهد رأيي (আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা এর মীমাংসা করবো)।[১] এর অর্থ হলো যখন কোন বিষয় আমার সামনে আসবে তখন আমি দেখব, কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় বিষয়ের কি মীমাংসা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী আমি এ বিষয়ের মীমাংসা করবো। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কিয়াসের সংজ্ঞা। শরীয়তের আহ্‌কাম বের করার চারটি উৎসের মধ্যে এটি অন্যতম। হুযূর (সা) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর এই জবাব শুনে তাঁর প্রশংসা করেন এবং আনন্দিত হয়ে তাঁর বুকে হাত রাখেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সা)-এর যুগে কিয়াসের প্রচলন ছিল এবং শরীয়তের দলীল হিসেবে হুযূর (সা) নিজেই এটাকে অনুমোদন করেছেন।

শরীয়তের আহ্‌কামের তিনটি উসূল

আঁ-হযরত (সা)-এর পর যখন কোন মাসআলা আসত তখন হযরত আবূ বকর (রা) কুরআনে তার সমাধান খোঁজতেন। কুরআনে পাওয়া গেলে তাই বাস্তবায়িত করতেন। নতুবা হাদীসে অনুসন্ধান করা হ'ত। তাতে না পাওয়া গেলে মুসলমানদেরকে একত্র করে জিজ্ঞেস করা হত। 'তোমাদের মধ্যে কারো কি এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর কোন আমল জানা আছে? যদি এ সম্পর্কে কারো জানা থাকত তাহলে আবূ বকর (রা)-এ জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি কারো জানা না থাকত তাহলে নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে তাদের পরামর্শ চাওয়া হ'ত এবং সবাই যে বিষয়ের উপর ঐক্যমত্য পোষণ করতেন তাই বাস্তবায়িত করা হ'ত। এক বার দাদীর অংশীদারিত্ব সম্পর্কে মাসআলা আসে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ ছিল না। তাই হযরত আবূ বকর (রা) হাদীসে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বাহ্ (রা) বলেন, হুযূর (সা) দাদীকে ৬/১ অংশ প্রাদন করতেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে আরো সাক্ষীর খোঁজ করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম হযরত মগীরা ইবনে শু'বাহ (রা)-এর উক্তিকে সত্যায়িত করেন। অতএব হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরই চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেন।

চতুর্থ উসূল অর্থাৎ কিয়াস

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা শরীয়তের আহ্‌কামের তিনটি উসূল অর্থাৎ কুরআন, হাদীস এবং ইজমা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে কার্যকর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেল। চতুর্থ উসূল হলো কিয়াস। হযরত আবূ বকর (রা) কোন ব্যাপারে ইজমা না হলে কিয়াস দ্বারাই তার কাজ চালাতেন। যে সিদ্ধান্তকে তিনি

১. মুসনাদে আহমদ : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২৩০।

www.pathagar.com

সঠিক মনে করতেন তাই ঘোষণা করতেন। كلالة কালালাহ্ সম্পর্কে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়। (যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়) তখন তিনি বলেন, আমি আমার মতানুযায়ী ইজতিহাদ করব। যদি সঠিক হয় তাহলে এটা হবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে, নতুবা শয়তানের পক্ষ হতে।[১] যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারেও অনুরূপ হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরোধী ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যাকাতকে নামাযের উপর কিয়াস করেন। কেননা ফরযও গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং নামায অস্বীকারকারী (মুনকির) যেমন মুরতাদ হয়ে যায় তেমনি যাকাত অস্বীকারকারীও। অতএব তার বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব বলে তিনি ঘোষণা দেন। এটা নিঃসন্দেহে কিয়াসের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

এমনিভাবে একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট দাদার অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআনে কোন নির্দেশ ছিল না এবং হুযূর (সা)-এর কোন আমলও এ ব্যাপারে বিদ্যমান ছিল না। তখন তিনি দাদাকে পিতার উপর কিয়াস করে বলেন, মিরাসের ব্যাপারে দাদার হুকুম পিতার মতই।[২]

মালিক ইবনে নুভায়রার ঘটনায় হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা)-এর পক্ষ হতে রক্তপণ আদায় করেন। সেটাও কিয়াস ছিল। কেননা হুযূর (সা) স্বয়ং হযরত খালিদ (রা)-এর এক ঘটনায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

খায়বার ও ফিদাকের মাসাআলা

এ প্রসঙ্গে খায়বার ও ফিদাকের মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই মাসআলা মুসলমানদের আলোচনার বিষয় ছিল। এ বিষয়ে হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-এর অসন্তুষ্টি ঘটনার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

মূল ঘটনা

মূল ঘটনা এই যে, খায়বার বিজয়ের পর আঁ-হযরত (সা) সেটাকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তার মধ্যে আঠার ভাগ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং বাকী অংশ অন্যান্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এ কাজ সম্পন্ন করে যখন তিনি ফিরে আসেন তখন মাহিয়সাহ ইবনে মাসউদ আল আনসারীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফিদাকবাসীর নিকট প্রেরণ করেন। ইউশা ইবনে নূন ছিলেন তাদের সরদার। ফিদাকবাসী সন্ধির আবেদন করে এবং অর্ধেক ভূমি দেয়ার ব্যাপারে

---

১. সুনানে দারমী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬৫।
২. ইজালাতুল খাফা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৮।
৩. সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৯৯৮।

www.pathagar.com

চুক্তি সম্পাদন করে। আঁ-হযরত (সা) তা গ্রহণ করেন। সে সময় থেকে এই জমি হুযূর (সা)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল।[১] আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ফাতিমা (রা) ও হযরত আব্বাস (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে খায়বার ও ফিদাকের ভূমির যে অংশ হুযূর (সা)-এর ছিল তা অংশীদারিত্ব হিসেবে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই, আমরা যা কিছু ছেড়ে যাব তা সাদ্কা হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারবর্গ তা থেকে জীবিকার্জন করবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আঁ-হযরত (সা) যেভাবে যে কাজ করতেন আমিও সেভাবে সে কাজ করব। হযরত ফাতিমা (রা) একথা শুনে ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেন নি।[২]

মূল ঘটনা এরূপই। কিন্তু তাবারী ও বালাযুরী এ ব্যাপারে আরো যে কয়েকটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তা থেকে যে কোন সমালোচক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, উক্ত ঘটনাটি আবেগ অনুভূতি থেকে খালি ছিল না। যাহোক এ ব্যাপারে সমলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, হযরত আবূ বকর (রা) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন তা কতটুকু সঠিক ছিল এবং কেন ছিল?

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসমূহ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খায়বার ও ফিদাকে আঁ-হযরত (সা)-এর যে অংশ ছিল তা হুযূর (সা)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল সুতরাং হযরত ওমর (রা)-এর নিকট যখন বিষয়টি উত্থাপন করা হয় তিনি নিম্নলিখিত আয়াতটি পাঠ করেন —

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ নির্যাতিত ইয়াহূদীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

হুযূর (সা)-এর জন্য নির্ধারিত হওয়ার অর্থ

উপরোক্ত আয়াতে "ফাই" এর যে উল্লেখ রয়েছে তার দ্বারা খায়বার ও ফিদাক বুঝানো হয়েছে এবং সাথে সাথে বলা হয়েছে — فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ[৩]

---

১. ফুতুহুল বুলদান ঃ বালাযুরী ঃ পৃঃ ৩৪-৪৬।

২. সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৯৯৭। কিতাবুল ফারায়েয। কিছু বাক্যের পরিবর্তনের সাথে বুখারী باب الخمس এবং باب المغازي তে ঐ একই রিওয়াতের উল্লেখ আছে।

৩. সহীহ্ বুখারী ঃ ১ম খণ্ড ঃ باب الخمس

www.pathagar.com

কিন্তু একজন নবী একজন বাদশাহ্ ও একজন রাষ্ট্র নায়কের জন্য দু'টি উপায়ে কোন বস্তু নির্ধারিত হতে পারে। প্রথমত ঐ বস্তুটি তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হবে। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তা তাঁর খরচাদির জন্য ওয়াকফ (নির্ধারিত) হবে। প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্র প্রধানের ইন্তিকালের পর ঐ বস্তুটি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু এটা তাঁর ব্যক্তিগত নয় তাই তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও বণ্টন করা হবে না বরং তাঁর পর যিনি রাষ্ট্র প্রধান হবেন তিনিই এর উত্তরাধিকারী হবেন। হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) খায়বার ও ফিদাক হুযূর (সা)-এর জন্য নির্ধারিত মনে করতেন, তবে এমনভাবে নয় যে, তাতে উত্তরাধিকার চলবে বরং এমনভাবে যে তা বাধ্যতামূলকভাবে রাসূল (সা)-এর খলীফার কাছে হস্তান্তরিত হবে। মুসনাদে ইমাম আহমদে সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠান, রাসূল (সা) উত্তরাধিকারী আপনি, না তাঁর সন্তান-সন্ততি? হযরত আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, "আমি নই, বরং তার পরিবারবর্গ।" তখন হযরত ফাতেমা (রা) বলেন, তাহলে হুযূর (সা)-এর অংশ কোথায়? উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আহার দান করেন কিন্তু যখন তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়া হয় তখন নবীর অংশ তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।[১]

এ ছাড়া হযরত উরওয়াহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর উম্মুল মু'মিনীনগণ হযরত আয়েশা (রা) নিকট এসে খায়বার ও ফিদাকের অংশ দাবী করেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন বলেন, তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহ্ ভীতি নেই? তোমরা কি হুযূর (সা)-এর নিকট শোন নি যে, তিনি বলেছেন, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমরা (নবীরা) যা কিছু ছেড়ে যাব তা সাদকা হবে। আমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব তখন আমার অংশ সেই পাবে যে আমার খলীফা হবে।" হযরত আয়েশা (রা)-এর এই বক্তব্য শুনে উম্মুল মু'মিনীনগণ তাঁদের দাবী প্রত্যাহার করেন।[২]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর বিষয়টি যখন হযরত ওমর (রা)-এর নিকট পেশ করেন তখন তিনি বলেন।

هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمـــــر قال وهما على ذلك اليوم -

"খায়বার ও ফিদাক উভয়ই রাসূল (সা)-এর জন্য সাদকা (ওয়াকফ) স্বরূপ ছিল। এগুলো ছিল হুযূর (সা)-এর দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য। এগুলোর পরবর্তী ব্যবস্থাপনা হুযূর (সা)-এর প্রতিনিধির উপর নির্ভরশীল। এ দু'টি বিষয় এখনো একই অবস্থায় এবং একই পর্যায়ে রয়েছে।[৩]

---

১. ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪।
২. ফুতুহুল বুলদান ঃ বালাযুরী ঃ পৃঃ ৩৭।
৩. মুসনাদে আহমদ ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৭।

www.pathagar.com

খায়বার ও ফিদাকের ব্যয় খাত

খায়বার ও ফিদাক-এর এই অবস্থা নির্ধারিত হওয়ার পর রাষ্ট্র প্রধান ও খলীফা হিসেবে এগুলোর আমাদানী নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য নির্ধারিত করে নেয়ার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এখতিয়ার ছিল। কিন্তু নবী (সা)-এর আদব ও মর্যাদা প্রর্দশন এবং হুযূর (সা)-এর পরিবারবর্গের সাথে তাঁর যে মহব্বত ও সুসম্পর্ক ছিল সে প্রেক্ষিতে তিনি হুযূর (সা)-এর যুগের অনুরূপ খায়বার ও ফিদাকের ব্যয় খাত অব্যাহত রাখেন। এর কোন অংশ নিজের বা নিজের সন্তানদের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করেন নি। হুযূর (সা)-এর যুগে খায়বার ও ফিদাকের আমদানী হতে তাঁর পরিবারবর্গের সারা বছরের ব্যয় মিটানো হ'ত। তা ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনেও তা ব্যয় করা হ'ত।[১]

হযরত আবূ বকর (রা) এই নীতি অব্যাহত রাখেন। আহ্‌লে বায়ত বা হুযূর (সা)-এর পরিবারবর্গের সম্পর্কে তিনি বলেন,

والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلي من أن أصل من قرابتي – [২]

"ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার আত্মীয় স্বজনের চাইতে হুযূর (সা)-এর আত্মীয় স্বজন আমার কাছে অধিক প্রিয়।" তিনি আরো বলেন,

سمعت أن النبي ﷺ لا يورث ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ يعول وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق – [৩]

"আমি শুনেছি যে, নবীদের কোন উত্তরাধিকারী নেই, এতদসত্ত্বেও আমি তাঁদেরকে প্রতিপালন করব যাঁদেরকে হুযূর (সা) প্রতিপালন করতেন এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করব যাঁদের জন্য (সা) ব্যয় করতেন। দায়িত্ব ও মহব্বতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এর চাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?

হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা)-এর কর্ম-পদ্ধতি

এখন প্রশ্ন হতে পারে, হযরত আবূ বকর (রা) এত কিছু করার পরও কি হযরত ফতিমা (রা)-এর অন্তর তার দিকে প্রসন্ন হয়েছিল ? যদিও বিভিন্ন রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেননি, কিন্তু যে বর্ণনাকারীরা এই বর্ণনা দিয়েছেন তারা তা নিজেদের ধারণা ও কিয়াসের উপরই দিয়েছেন। তাছাড়া তাদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ আছেন যাদের থেকে শিয়াই মতের দিকে ছিল। হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর লিখেন,

ولعله روى بمعنى ما فهمه بعض الرواة وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك–

"সম্ভবত কোন কোন বর্ণনাকারী নিজে যা বুঝেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন। এটাও জানা প্রয়োজন যে, বর্ণনাকারীদের মধ্যে শিয়া মতাবলম্বীও রয়েছেন।"

---

১. সহীহ্ বুখারীঃ ২য় খণ্ড কিতাবুল ফারায়েয।
২. মুসনাদে আহমদ ঃ ১ম খণ্ডঃ ১০।
৩. ইযালাতুল খাকা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯।

www.pathagar.com

যে সমস্ত বর্ণনাকারী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত ফাতিমা (রা)-এর অসন্তুষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করেছেন তারা এই মর্মে হযরত ফাতিমা (রা)-এর এমন কোন উক্তির উদ্ধৃতি দেয় নি যা তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে আলোচনার পর করেছেন এবং যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূ বকর (রা)-এর জবানী হুযূর (সা)-এর হাদীস শ্রবণ করা সত্ত্বেও তাঁর মনোবেদনা দূর হয় নি। অতএব কিয়াস এটাই বলে যে, এটা শুধু বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র। অবশ্য এর বিপরীতে এমন একটি রিওয়ায়েত পাওয়া যায় যাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট উল্লেখিত হাদীস শ্রবণ করবার পর হযরত ফাতিমা (রা) বলেন ঃ

فانت وما سمعت من الرسول ﷺ أعلم - [১]

"অতঃপর আপনি রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন সে সম্পর্কে আপনিই অধিক জ্ঞাত।"

অতএব একথা বলা চলে যে, শেষ পর্যন্ত হযরত ফাতিমা (রা)-এর কোন মনোবেদনা ছিল না। কেননা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট হুযূর (সা)-এর বাণী শ্রবণ করার পর হযরত ফাতিমা (রা)-এর সামনে মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল—হয় তিনি হাদীস অস্বীকার করবেন, নয়ত তা সঠিক বলে গ্রহণ করবেন। প্রথম পথে চলা তার জন্য ছিল অসম্ভব। কেননা হযরত আবূ বকর (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ্ না হয়ে পারে না। তা ছাড়া সেখানে তিনি একা ছিলেন না, বরং উম্মুল মু'মিনীনগণ, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত ওসমান , হযরত ওমর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্, জুবায়ের ইবনে আওয়াম, হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখও ছিলেন এবং তারা সকলেই ছিলেন এই হাদীস সঠিক ও নির্ভেজাল হওয়ার সাক্ষী। ফলে হযরত ফাতিমা (রা)-এর পক্ষে হাদীসের অশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত ফাতিমা (রা) সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও কি এটা বিশ্বাস করা যায় যে, হাদীসের শুদ্ধতা মেনে নেয়ার পরও তাঁর মনোবেদনা দূর হয় নি এবং তিনি সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁর দাবী প্রত্যাহার করেন নি ? নবী (সা)-এর সুস্পষ্ট বাণী শোনার পর, এর বিরুদ্ধে স্বীয় দাবীর উপর অটল থাকাটা একজন নিম্নস্তরের মুসলমানের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা যায় না, এমতাবস্থায় সাইয়্যেদাতুন নিসা, হযরত ফাতিমা (রা) যিনি দরিদ্রতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র একান্ত অনুগত হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, হুযূর (সা)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন, নিজের প্রাণ প্রিয় পিতার অমৃত বাণী শুনার ফলে চাক্কী পিষে নিজের হাতে ফোসকা তুলেছিলেন, তবু উফ্ শব্দও করেন নি, কখনো ধন-সম্পদের দিকে চোখ তুলে তাকান নি, দরিদ্র ছিল যার জীবনের মহান বৈশিষ্ট্য তার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে উত্তরাধিকার সামান্য অংশের জন্য তিনি এত উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন ?

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৫ম খণ্ডঃ পৃঃ ৮৯।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর (রা)-এর দূরদর্শিতামূলক চিন্তাধারা

তারপর ঘটনা শুধু এতটুকু নয় যে, ফাতিমা (রা) দাবী করেছেন এবং এটা ছিল এমন একটা ব্যাপার যার সাথে আঁ-হযরত (সা)-এর পয়গাম্বরীর মহান মর্যাদা এবং তার কথা বাস্তবায়নের দিকটিও জড়িত ছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর এই নীতি ছিল যে, যা কিছু তাঁর নিকট ছিল তা তিনি কখনো শুধু নিজের এবং নিজের ঔরসজাত সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট করে যান নি বরং এর উপর সকল মুসলমানেরই অধিকার ছিল। হুযূর (সা) বলেছেন ঃ [১]

انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين و لم يترك وفاء فعلينا قضاءه ومن ترك مالا فلورثته –

"আমার উপর মুসলমানদের এতটুকু অধিকার রয়েছে, যা তাদের নিজেদের উপরও নেই। অতএব যদি কোন মুসলমান ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ না রেখে যায় তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব। আর যদি কেউ কিছু অর্থ রেখে মারা যায় তাহলে তা তার উত্তরাধিকারদের প্রাপ্য।[২]

এ জন্যই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয একদা ফিদাক সম্পর্কে একটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ফিদাক হুযূর (সা)-এর অধিকারে ছিল, তিনি এ থেকে ব্যয় করতেন, বনু হাশিমের দরিদ্রদের দান করতেন, এবং তাদের অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে দিতেন। হযরত ফাতিমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর কাছে আবেদন করেন, আপনি ফিদাক ওদের নামে হিবাহ্ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা অস্বীকার করেন।

অতএব লক্ষণীয় যে, রহমতে আলম (বিশ্বের আশীর্বাদ)-এর এই নীতি ছিল যে, তিনি যাকাত ও সাদকা-খয়রাতকে স্বীয় বংশধরদের জন্য অবৈধ মনে করতেন তাঁর ব্যাপারে এটা কি করে সম্ভব যে, এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ বংশের কতিপয় লোকদের মধ্যে বণ্টন করে সাধারণ মুসলমানদের তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। অতএব হুযূর (সা)-এর وما تركنا صدقة (আমি যা কিছু ত্যাগ করে যাব তা সমস্ত মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হবে)-নীতিকে হযরত আবূ বকর (রা) সঠিকভাবেই বাস্তবায়িত করেছিলেন।

১. সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৯৯৭।

২. সুনানে আবি দাউদ কিতাবুল ফারায়েয (বুখারী ঃ ২য় খন্ড) باب صفا يا رسول الله ﷺ ওমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখের সামনে وما أفاء الله على رسوله الآية পাঠ করেন এবং এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আঁ হযরত (সা)-এর নিকট যা কিছু ছিল তাতে সকল মুসলমানের অধিকার রয়েছে। এমন কি এই খয়বার ও ফিদাকের আয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করতেন এবং নিজ পরিবারবর্গের বাৎসরিক ব্যয়ভার মেটানোর পর জাতীয় কাজে ব্যয় করতেন। বুখারীর মূল বাক্য হলো فيجعل مجعل مال الله বুখারী ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৩৬ সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল ফারায়েয।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর অনমনীয়তা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট হুযূর (সা)-এর বাণী শ্রবণ করার পর হযরত ফাতিমা (রা) শান্ত হয়েছেন বটে কিন্তু এরপরও হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর অনমনীয়তার কারণ কি? তাঁরা কেন সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন নি। এর উত্তর এই যে, খায়বার ও ফিদাক ওয়াকফ হওয়া সম্পর্কে হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা) নিশ্চিত ছিলেন কিন্তু তৎকালীন খলীফাকেই এর মুতাওয়াল্লী হতে হবে এমন কথা তারা মনে করেন নি বরং তারা মনে করতেন আঁ-হযরতের আত্মীয়-স্বজনরাই এর মুতাওয়াল্লী হবেন। এ ছাড়া তাঁদের এ ধারণা ছিল যে, খায়বার ও ফিদাক শুধু আঁ-হযরত (সা)-এর আত্মীয় স্বজনের জন্যই ওয়াকফ ছিল, সকল মুসলমানদের জন্য নয়। নেতৃস্থানীয় মুহাজিরদের উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-এর মধ্যে যে আলোচনা হয় এবং যার উল্লেখ সহীহ্ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে রয়েছে — তা পাঠ করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে যে, আলোচনার বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার ছিল না বরং অন্য দু'টি বিষয় ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি হলো ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী হওয়া। যেহেতু এটা খলীফার অধিকার ছিল এবং একজন ন্যায়বান লোক ইচ্ছা করলে অপর কারো জন্য নিজের অধিকার থেকে বিরত থাকতে পারে। তাই হযরত ওমর (রা) আহ্লে বায়ত (নবী পরিবার) এর মনসন্তুষ্টির জন্য খায়বার ও ফিদাকের মুতাওয়াল্লীর পদ এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-কে প্রদান করেন। দ্বিতীয় বিষয় হলো, ফিদাকের ব্যয় সম্পর্কে। যেহেতু এটা হুযূর (সা) এর বাণী - ما تركنا صدقة -এর সাথে জড়িত। তাই হযরত ওমর (রা) অথবা অন্য কারো পক্ষেই এতে পরিবর্তন করার অধিকার নেই। সুতরাং হযরত ওমর (রা) যখন হযত আলী (রা) ও হযররত আব্বাস (রা)-কে ফিদাকের দায়িত্ব প্রদান করেন তখন তাদের নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তাঁরা যেন এর উৎপন্ন আয় ঐ সমস্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেন, যাদের জন্য হুযূর (সা) ব্যয় করতেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন —

فإن عجزتما فادفعا إلي فإني أكفيكماها -

"যদি আপনারা এই শর্ত পূর্ণ করতে না পারেন তা হলে আমার কাছে তা ফেরৎ দিয়ে দিবেন। আপনাদের পক্ষ থেকেই আমি এর ব্যবস্থা করব।"

আবূ দাউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর যুগেও ফিদাক মুসলমানদের জন্য সাদকা স্বরূপ ছিল।[১]

---

১. সহীহ্ বুখারী : ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬ এবং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯৬ কোন কোন মুহাদ্দিসের ধারণা এই যে, হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-একে হযরত উমর (রা) খয়বার ও ফিদাক এর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত

www.pathagar.com

কালালাহ্ সম্পর্কে আলোচনা

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইজ্‌তিহাদ ও কিয়াসের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা হলো দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত এর বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, কুরআন মসজিদে উল্লেখ রয়েছে ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ -

"লোকে তোমার নিকট পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, কালালাহ্ (পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, আর সে যদি সন্তানহীনা তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা নিসা)

এই আয়াতের কালালাহ্ كلالة সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে । এর অর্থ কি? এবিষয়ে সবাই একমত যে, কালালাহ্ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে না পিতা থাকে আর না পুত্র । কিন্তু এরপর মতভেদ হ'ল এই নিয়ে যে, দাদা না হওয়া কালালাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত কিনা ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা).হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জুবায়র (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে দাদার হুকুম পিতার মত একই। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে কেউ এর বিরোধিতা করেনি। কিন্তু পরে কয়েক জন সাহাবা এ মতের বিরোধীতা করেন।

এই মতবিরোধের ফলশ্রুতি হলো—ধরে নেয়া যাক, এক ব্যক্তি তার দাদা এবং ভাই-বোন রেখে মারা গেল। এখন প্রশ্ন হলো, দাদার বর্তমানে ভাই-বোন তার সম্পত্তির অংশীদার হবে কিনা ? হযরত আবূ বকর (রা) এর মতে, দাদার হুকুম পিতার মতই সুতরাং পিতার বর্তমানে ভাই-বৌন যেমনিভাবে অংশ হতে বঞ্চিত হয় তেমনিভাবে দাদার বর্তমানেও তারা অংশ হতে বঞ্চিত হবে।

এই মাসআলায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর দলীল এই যে[১] কুরআন মজীদে আরো একটি আয়াত রয়েছে যাতে কালালাহ্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

"যদি কোন পুরুষ অথবা নারী কালালাহ্ (পিতামাতাহীন) অবস্থায় কাউকেও উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই অথবা ভগ্নী থাকে তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ।" (সূরা নিসা)

করেন নি। বরং মদীনায় আঁ-হযরত (সা)-এর যা নিজস্ব ছিল তারই মুতাওয়াল্লী করেছিলেন। কিন্তু বুখারীর বর্ণনা দ্বারা এরূপ কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না।

১. বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ কিতাবুল ফারায়েয।

www.pathagar.com

এই আয়াতে কালালাহ্‌র অর্থ সবার নিকট ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার পিতা বা দাদা না থাকবে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, যদি দাদা থাকে তা হলে ভাই-বোন অংশ হতে বঞ্চিত হবে। যখন এখানে কালালাহ্‌র অর্থে দাদাকে পিতার সমান বলা হয়েছে তখন এই ব্যাখ্যা প্রথম আয়াতে প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।[১] উত্তরাধিকারী না পাওয়ার ক্ষেত্রে পুত্রের যা হুকুম নাতিরও তাই। সুতরাং শাখার জন্য যখন এই ব্যবস্থা তখন দাদার হুকুম পিতার মত কেন হবে না। দাদা পিতার মত মূল। তাই পিতার মত দাদারও একই হুকুম হওয়া উচিৎ।

মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামে প্রথম ব্যক্তি যিনি ইজ্‌তিহাদের নীতি নির্ধারণ করেন। বর্তমান পর্যন্ত মুসলমানের আমল ঐ নীতি অনুযায়ী চলে আসছে। হযরত শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ দেহলভী (র) লিখেছেন —"আঁ-হযরত (সা)-এর উম্মতের জন্য শরীয়তের গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা) ইজ্‌তিহাদের যে নীতি ও পদ্ধতি প্রচলন করেন তা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

সন্তান কাকে দেয়া হবে

কোন সন্তানের পিতা-মাতার মধ্যে যদি বিবাদ-বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে তাদের মধ্যে কার হাতে সন্তান সোপর্দ করা হবে? এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত হলো মা-এর হাতে সোপর্দ করা হবে। হযরত ওমর (রা) একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে একটি সন্তান জন্মে যার নাম ছিল আসিম। পরে হযরত ওমর (রা) এই স্ত্রী-কে তালাক প্রদান করেন। এরপর একদিন হযরত ওমর (রা) কুবা গমন করেন। সেখানে পুত্র আসিমকে মসজিদের আঙ্গিনায় খেলতে দেখে তার পিতৃস্নেহ উথলে উঠে। হযরত ওমর (রা) সন্তানের বাহু ধরে নিজের অশ্বের উপর তাকে উঠিয়ে নেন। ইতিমধ্যে শিশুর নানী সেখানে আগমন করায় উভয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উভয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ঐ শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) শিশুটিকে তার নানীর হাতে সোপার্দ করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ওমর (র) কোন প্রতিবাদ না করে এই সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইমাম মালিক (র) এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেন, এই মাসআলার ব্যাপারে আমার অভিমত তাই।[২]

ঈমানী দূরদর্শিতা

কোন মামলার সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য বাইরের সাক্ষী ছাড়াও স্বয়ং বিচারকের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন। হাদীসে সাধারণ মু'মিনদের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমরা এর থেকে নিরাপদ থাক। কেননা মু'মিন আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা দেখতে

---

১. আহকামুল কুরআন : পৃঃ ১০৪-১০৮।

২. মুয়াত্তা -ই-ইমাম মালিক : কিতাবুল আকযিয়া, باب من أحق بالولد

www.pathagar.com

পায়।' যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা) ঈমানের দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন তাই তার অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতাও ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ। নিম্নের ঘটনাটি তার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মৃত্যু রোগের সময় হযরত আয়েশা (রা)-কে তিনি বলেন, কন্যা! আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি আমার পর তোমরা ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র কিতাবের আইনানুযায়ী তা বন্টন করে নেবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আব্বাজান, আমার বোন আসমা হলেন একজন, কিন্তু আপনি "বোনেরা" কেন বললেন ? এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) এর স্ত্রী হাবীবা বিনতে খাদ্বীজা গর্ভবতী ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, أراها جارية আমার ধারণা মেয়ে জন্ম হবে।[১] শেষ পর্যন্ত হয়েও ছিল তাই।

জ্ঞানের আভিজাত্য ও পূর্ণতা

ইসলামের পূর্বে আরবদের আধ্যাত্মিকতার চর্চা থাকলেও তাদের চরিত্রগত একটি নিজস্ব নীতি ছিল যাকে মানবতা বা মনুষ্যত্ব বলা হ'ত। যে ব্যক্তি চরিত্রের এই নীতি অনুযায়ী পরিপূর্ণতা লাভ করতেন তাঁকে সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হ'ত। আর কাব্য-কবিতা, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং উচ্চবংশের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি বিখ্যাত হতেন তাকে জাতির নেতা বলে মান্য করা হ'ত। হযরত আবূ বকর (রা) এ সমস্ত গুণাবলীতে ছিলেন পরিপূর্ণ।

বংশ তালিকার জ্ঞানে পারদর্শিতা

ইলমুল আন্‌সাব বা বংশ তালিকার জ্ঞানে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

وكان أبو بكر مقدما في كل خير وكان رجلا نسابة

"হযরত আবূ বকর (রা) সকল উত্তম কাজেই অগ্রগামী ছিলেন এবং বিশেষ করে বংশ তালিকার জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।"

এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) তাঁর দেখা একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন হুযূর (সা) বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হন তখন হুযূর (সা), হযরত আবূ বকর (রা) এবং আমি এই তিনজন আরবদের একটি সমাবেশে উপস্থিত হই। হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কোন গোত্রের লোক?" তারা বলেন, 'রাবীয়া গোত্রের।' অতঃপর আবূ বকর ও ঐ গোত্রের লোকদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপ—

হযরত আবূ বকর (রা)— রাবীয়া গোত্রের উঁচুস্তরের না নিম্নস্তরের?

রাবীয়া গোত্র — উঁচুস্তরের।

---

১. মুয়াত্তাই-ইমাম মালিক ঃ باب ما لا يجوز من النحل

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) উঁচ্চস্তর কোনটি? যাহ্লুল আকবার না যাহ্লুল আসগার? রাবীয়া গোত্র। যাহ্লুল-আকবার।

এরপর হযরত আবূ বকর (রা) কয়েকজন প্রখ্যাত আরব ব্যক্তিত্বের নাম পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করেন, এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকি তোমাদের গোত্রের? আহ্লে কাবায়েলের লোকেরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের না বাচক উত্তর দেয়। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে তোমরা যাহ্লুল আকবার গোত্রের সাথে নয় বরং যাহলুল আসগার গোত্রের সাথেই সম্পর্কিত।

ঐ লোকদের মধ্যে হতে একজন যুবক অগ্রসর হয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে বললো, আপনি তো আমাদের প্রশ্ন করেছেন, এবার আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য আমাদের অনুমতি দিন। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। ঐ যুবক না থেমে শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। এতে হযরত আবূ বকর (রা) বিরক্ত হয়ে উটে আরোহণ করে রওয়ানা দেন। তখন যুবকটি একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করে, যার বিষয়বস্তু হলো, কখনো চিৎ, কখনো পটাং। এটা দেখে হুযূর (সা)-এর বেজায় হাসি পেল।[১]

হযরত জুবায়র ইবনে মুতঈম (রা) বংশ জ্ঞানে সমগ্র আরবে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তিনিও বলতেন, আমি এই বিষয়টি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট থেকেই লিখেছি।[২]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বংশ সম্পর্কিত জ্ঞান ইসলাম প্রচারের কাজে লেগেছে। কুরাইশ বংশের মুশরিকদের কেউ কেউ আঁ-হযরত (সা)-এর নিন্দা-সূচক কবিতা আবৃতি করতো। এতে দরবারে নবূওতের কবি হযরত হাস্সান ইবেন সাবিত (রা) ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা আবৃত্তির অনুমতি প্রার্থনা করেন। হুযূর (সা) বলেন, আমি নিজেই তো কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত, তাই তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে। হযরত হাস্সান (রা) বলেন, 'আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে পৃথক করব যেমন—আটা থেকে চুল পৃথক করে নেওয়া হয়। তখন হুযূর (সা) তাঁকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যেতে বলেন। কেননা তিনি হযরত হাসসান থেকে কুরাইশ বংশ সম্পর্কিত অধিক জ্ঞান রাখেন। সুতরাং হযরত হাসসান (রা) প্রায়ই হযরত আবূ বকর (রা)-এর থেকে এ সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করতেন। ফলে হযরত হাসসান (রা)-এর রচিত কবিতা শুনেই কুরাইশরা বুঝতে পারত যে, এটা হাসসানের সংকলন, তবে এতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আইয়ামুল আরব

বংশ সম্পর্কিত বিদ্যার মত হযরত আবূ বকর আইয়ামুল আরব অর্থাৎ আরবদের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত ইতিহাসেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আরবে সে যুগে

---

১. আল-ইকদুল ফারীদ ঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৫।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা)-কে ইল্‌মে হাদীস ও ইল্‌মে নসবে সর্বাধিক জ্ঞানী মনে করা হ'ত। তাঁর এই জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে হযরত আবূ বকর (রা) থেকেই গৃহীত হয়েছিল। হযরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ্ থেকে বর্ণিত, আছে।[১]

كان عروة يقول لعائشة يا أمتاه لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله ﷺ وبنت أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو ؟ قال فضربت على منكبيه وقالت أي عروة أن رسول الله ﷺ كان سقيم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له إلا نعات فكنت أعالجها له فمن ثم –[১]

"হযরত উরওয়াহ (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন, হে আম্মা! আপনার বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য আমি আশ্চার্যবোধ করি না। কেননা আমি বলি যে, আপনি হুযূর (সা)-এর সহধর্মিণী এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা। আমি আপনার কাব্য জ্ঞান ও ইতিহাস জ্ঞানের জন্যও আশ্চার্য বোধ করি না। কেননা আমি বলি যে, আপনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা এবং তিনি এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানি ছিলেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে আশ্চার্যবোধ করি। এই জ্ঞান আপনি কিভাবে অর্জন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে হযরত আয়েশা (রা) হযরত উরওয়া (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন শোন! রাসূল (সা) শেষ বয়সে অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর নিকট আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আগমন করতো। তাঁরা বিভিন্ন ঔষধপত্র এবং সেগুলোর গুণাবলী বর্ণনা করত আর আমি ঐ সকল ঔষধ তৈরি করতাম। তাই আমার চিকিৎসা সম্পর্কে এই জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

কাব্য চর্চা

আরবের ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও কাব্যের অনুরাগ ছিল। এটা হলো তাদের সৌন্দর্য চর্চা ও প্রফুল্ল চিত্ততার প্রমাণ। হযরত আবূ বকর (রা) এ বিষয়েও দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজে কবিতা আবৃত্তি করতেন। ইবনে সা'দ তাঁর ঐ সব কবিতা বর্ণনা করেছেন যা তিনি রাসূল (সা)-এর ইনতিকালে আবৃত্তি করেছিলেন। ইবনে রাশিক পনেরটি কবিতা বর্ণনা করেছেন[২] যা হযরত আবূ বকর (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) জাহেলিয়াত যুগে কবিতা আবৃত্তি করতেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কখনো কবিতা আবৃত্তি করেন নি। মোদ্দাকথা হলো যে, রাসূল (সা)-এর জন্য পবিত্র কুরআন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ

---

১. মুসনাদে আহমদ ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পৃ ৬৭।

২. কিতাবুল উমদাহ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

(আমরা এই পয়গাম্বরকে কবিতা শিক্ষা দেয় নি এবং এটা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়) বলা হয়েছে তাঁর প্রথম খলীফার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি কবিতা নিয়ে মগ্ন থাকবেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ[১]

أن أبا بكر ما قال بيت شعر في الإسلام حتى مات–

"নিঃসন্দেহে হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত কখনো একটি কবিতাও আবৃত্তি করেন নি।"

ইবনে রাশিক যে কবিতাসমূহ বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে ইবনে হিশাম[২] এবং সুহায়লী[৩] বলেন বেশীল ভাগ জ্ঞানী ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কবিতা বলে যে কথাটি বলা হয় তা সঠিক মনে করেন নি। অবশ্য তার কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি অধিকাংশ সময় নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করতেন যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার অনুকূল।[৪]

إذا أردت شريف الناس كلهم + فانظر إلى ملك في ذي مسكين

"যদি তোমরা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সভ্য লোকটিকে দেখতে চাও তাহলে এই বাদশাহ্কে দেখ যিনি ফকীরের পোশাকে জীবন-যাপন করছেন।"

বক্তৃতা বিবৃতি

কাব্যের মত বক্তৃতা-বিবৃতিও আরবদের একটি প্রিয় বিষয় ছিল। পবিত্র কুরআন একটি বিশেষ বর্ণনা রীতি, একটি নতুন চিন্তাধারা এবং একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেয়। ফলে, আরবদের স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গির দক্ষতা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। কাব্যের মত বক্তৃতা-বিবৃতির বিষয়টিও আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বিশেষ গুণ যা মুখস্ত বিদ্যা দ্বারা অর্জিত হয় না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যেও আল্লাহ্ প্রদত্ত এই যোগ্যতা ছিল। ইসলামী জীবনে তিনি যে বক্তৃতা ও ভাষণ পেশ করেন তার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর যুগের একজন উঁচুদরের বক্তা ছিলেন।

একটি ফলপ্রসূ বক্তৃতা ও ভাষণের মাপকাঠি হলো, বক্তার বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে রেখাপাত করতে এবং যে কোন বিরোধী ব্যক্তিও এটা শ্রবণ করার পর উপলব্ধি করবে যে, বক্তা যা বলেছে তা তার অন্তরের অভিব্যক্তি। তাই কুরআন মজিদে আঁ-হযরত (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً

"তাদেরকে তাদের মর্মে স্পর্শ করে এমন কথা বল।"

---

১. استيعاب حرف العين

২. সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩।

৩. আররাওদুল আনফ ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫।

৪. কানজুল উম্মাল ঃ হাশিয়া মুসনাদে আহমদঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৪৩।

www.pathagar.com

এই বিষয়টি কবি গালিব এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

دیهکنا تقریر کي لذت کے جو اس نے کها

مین نے یه جانا که گویا یه بهي میرے دل مین هے—

একটি বক্তৃতা বা ভাষণে এ বিষয়টি তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যাবে।

১. বক্তা যা বলবে সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে তার নিজস্ব আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে।

২. শ্রোতাদের মনের চাহিদা সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত হতে হবে।

৩. অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বক্তৃতা প্রদান করতে হবে। বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য, চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর হতে হবে।

৪. আওয়াজের মধ্যে দৃঢ়তা ও দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি থাকতে হবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাষণে ঐ সমস্ত গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যেত। তার বক্তৃতা শ্রবণ করবার পর কোন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারত না।

সাহাবায়ে কিরামের জন্য হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের চেয়ে অধিক বিপজ্জনক ও মর্মান্তিক ঘটনা আর কি হতে পারে? হযরত ওমর (রা)-এর মত শক্ত হৃদয়ের লোকও এই ঘটনায় স্থির থাকতে পারেন নি। তার মুখ থেকেও কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা উচ্চারিত হয়েছে এবং বেদনার আধিক্যের কারণে তার উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায়ও কোন প্রতিক্রিয়া শ্রোতাদের উপর হয়নি। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যখন বক্তৃতা শুরু করেন তখন তা শুনে হযরত ওমর (রা)-এর মনের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বয়ং হযরত ওমর (রা) পরবর্তীকালে এটা স্বীকার করেছেন। সাকীফায়ে বনু সায়েদার ঘটনা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। হযরত ওমর (রা) পূর্ব হতেই বক্তৃতার বিষয় চিন্তা করে সেখানে যান। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে যে উপস্থিত-বক্তৃতা দেন তা এরূপ কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয় যে, হযরত ওমর (রা) উপলব্ধি করেন যে, তিনি যে বিষয় চিন্তাভাবনা করে গিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) তাই অত্যন্ত মার্জিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করেছেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর কোন কোন ভাষণের অংশ যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি ভাষণের অংশ বিশেষ পেশ করা গেল। এর দ্বারা তাঁর বাক্যের গ্রন্থনা, বাক-পটুতা ও ভাষার অলঙ্কার ও দার্শনিকসুলভ বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে। একটি ভাষণে তিনি বলেন ঃ

أوصيكم بتقوى الله وإن تثنوا عليه بما هو أهله وإن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا إلا لحاف بالمسئلة فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال - "أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين-" ثم أعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم وعوض بالقيل ألفا في

www.pathagar.com

الكثير أليا في وهذا كتاب الله فيكم لا تفني عجائبه ولا يطفأ نوره فثقــــوا بقولـــه
وانتصحوا الكتابة فإنه خلقكم لعباده وكل بكم الكرام الكاتبين يعملون ما تفعلــون
ثم أعلموا عباد الله أنكم تغدون وترجون في أجل قد غيب عنكـــم علمـــه - فـــإن
استطعتم أن تنقضي إلا جال وأنتم في عمل الله ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله فسابقوا
في مهل بأعمالكم فإن أقواما جعلوا آجالهم بغيرهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم فالوحا
الوحا ثم النجا النجاء فإن وراءكم طالبا حنيثا أمره سريعا سيره - [১.]

"আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার জন্য আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি এবং যথাযথভাবে তাঁর প্রশংসা করার জন্যও ওসীয়ত করছি। তাঁর প্রতি অনুরাগের সাথে সাথে তোমাদের অন্তরে তার ভয়-ভীতিও বিদ্যমান থাকতে হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনার সময় খুব অনুনয়-বিনয় করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রশংসা করে বলেছেন, "তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।"

হে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ তোমাদের এটাও জ্ঞাত হওয়া উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অধিকারের পরিবর্তে তোমাদের জীবন বন্ধক রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বল্পস্থায়ী বস্তুর বিনিময় অধিক স্থায়ী বস্তু প্রদান করেছেন। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে যার বিস্ময়কর বস্তুর শেষ নেই, যার আলো কখনো নিষ্প্রভ হবে না। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তার কিতাব থেকে উপকৃত হও। তিনি তোমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের কাজ কর্মের হিসেব রাখার জন্য তিনি তোমাদের উপর ফিরিশ্তা নিয়োগ করেছেন। তারা তোমাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। হে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ! তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, তোমাদের সকাল সন্ধ্যা ঐ নির্ধারিত সময়েই হতে থাকবে যার সীমা তোমাদের জানা নেই। সুতরাং যদি তোমাদের দ্বারা এটা সম্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে থেকেই তোমাদের সময় অতিবাহিত হোক (আল্লাহ্র তাওফীক ব্যতীত এটা সম্ভব নয়) তাহলে জীবনের অবসর মুহূর্তগুলোকে নেক কাজে লাগাও। কেননা অনেক জাতি তাদের অবসর মুহূর্তগুলোকে অপরের কাজে ব্যয় করেছে। তাদের মত তোমাদের হওয়া উচিৎ নয়। তোমাদের গতি দ্রুত হওয়া উচিৎ। কেননা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী অত্যন্ত দ্রুতগামী।

অন্য একটি ভাষণে তিনি বলেন ঃ[২]

---

১. আল-উকদুল ফারীদ ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ১৪৬।
২. আল ইকদুল ফারীদ ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ১৪৬।

www.pathagar.com

إني أوصيكم بتقوى الله العظيم في كل أمره وعلى كل حال ولزوم الحق فيما أحبتم وكرهتم فإنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير كم من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك - وإياكم والفخر وما فخر من خلق من تراب إلى التراب يعود هو اليوم حي وغدا ميت - فاعلموا وعدوا نفسكم في الموتى وما أشكل عليكم فردوا علمه إلى الله وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه محضرا فإنه قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما علمت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا -

"সকল কাজে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতি রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি। স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপারে সত্যের উপর স্থায়ী থাকবে। সত্য হতে বিচ্যুতি ভাল (রাস্তা) নয়। মিথ্যাবাদী সত্য হতে বিরত থাকে, আর সত্য হতে বিরত ব্যক্তি অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সাবধান! অহংকার করো না। মাটির তৈরি মানুষ পুনরায় মাটিতে মিশে যাবে। তাদের পক্ষে অহংকার করা কি শোভা পায়? যে আজ জীবিত কাল সে মৃত। নেক আমল অব্যাহত রাখ এবং মৃত ব্যক্তিদের সাথে নিজেকে গণ্য কর। যে বিষয় তোমরা বুঝতে পার না তা আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ কর। নিজের ফায়দার জন্য পূর্ব হতেই নেক কাজ কর। কেননা কাল শুধু এই সম্পদই তোমার কাছে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-"যেদিন প্রত্যেকে সে যে-ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে কামনা করবে তার ও এর মধ্যে দূর ব্যবধান।"

হযরত আবূ বকর (রা) প্রকৃতিগতভাবে খতীব (বাগ্মী) ছিলেন। তাই তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও বাক পটুতায় পূর্ণ ছিল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেন, আমি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মৃত্যু রোগের সময় তাকে দেখতে যাই এবং তার নিকট আরয করি, হে রাসূল (সা)-এর খলীফা। আপনাকে তো একটু সুস্থ মনে হচ্ছে। তখন তিনি বলেন ঃ

إني على ذلك لشديد الوجع ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من وجعي أني وليت خيركم في نفسي فكلكم روم أنفه أن يكون له الأمر من دونه والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم على حسك السعدان والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا ما هادي الطريق جرت أذما والله الفجر أو البحر -[১]

"শোন, এতদসত্ত্বেও আমি কঠিন ব্যথায় আক্রান্ত। হে মুহাজিরের দল, আমি তোমাদের যে কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছি তা আমার এই ব্যাথার চেয়েও অধিক কষ্টকর।

১. আল কামিলু লিল মুবরাদ ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে (হযরত ওমর রা) আমি তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করেছি কিন্তু এতে তোমাদের প্রত্যেকেরই রাগ হয়েছে এজন্য যে, খিলাফত তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে পেতে পারে ? আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা রেশমের গদী ও রেশমের পর্দা পছন্দ করবে এবং আজার বায়জানের পশমী বস্ত্রেও তোমাদের কষ্ট হবে, যেমন কারো সাদানের কাটার দ্বারা কষ্ট হয়ে থাকে। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কারো গর্দান কোন অপরাধ ব্যতীত উড়িয়ে দেয়া হবে — এটাও তার জন্য এই বিষয় হতে উত্তম যে, সে দুনিয়ার গভীরে প্রবেশ করবে! হে পথ প্রদর্শক, তুমি সীমা অতিক্রম করেছ। সুতরাং এখন পথ দু'টি আছে, হয়ত ভোর বেলায় আলোতে পথ চল নয়ত অন্ধকারে চলে বিপদে পতিত হও।

রচনা ও লিখনী শক্তি

বক্তৃতা বিবৃতির মত হযরত আবূ বকর (রা)-এর লিখনী ছিল যথেষ্ট। হযরত খালিদ (রা) ইরাকের যুদ্ধ শেষ করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিনা অনুমতিতে তার ফাঁকে যখন চুপে চুপে এ হজ্জ সামাধা করে আসেন। এবং হযরত আবূ বকর (রা) তা জানতে পারেন তখন হযরত খালিদ (রা)-এর নামে নিম্নের নিন্দাসূচক পত্রটি লিখেন ঃ

ستر حي تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجو فاشجو وإياك أن تعود لمثل ما فعلت فإنه لم يشبج الجموع من الناس بعون الله شجاك و لم ينتزع الشعبي مـــن النـــاس نزعك فليهنئك أبا سليمان النية والخطوة فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخســـر وتخذل وإياك أن تدل بعمل فإن الله عز وجل له المن وهو ولي الجزاء

"তুমি শীঘ্র ইয়ারমুকে মুসলিম বাহিনীর সাথে একত্র হও কেননা তারা চিন্তাযুক্ত ও বিপন্ন অবস্থায় আছে। সাবধান! ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তোমরা শত্রু সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পার (যদি আল্লাহর সাহায্য হয়) এবং লোকদের বিপদ তোমাদের ছাড়া অন্য কারো দ্বারা দূরীভূত হবার নয়। হে আবূ সুলায়মান, তোমার নিয়ত এবং মর্যাদা বরকতময় হোক। তুমি ইসলামের পূর্ণ খিদমত করতে থাক। আল্লাহ্ তোমাকে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। তোমার অন্তরে যেন অহংকার সৃষ্টি না হয়, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। স্বীয় বিজয়ের গর্ব করবে না। কেননা এটা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রতিদানকারী।"

তিনি হযরত ওমর (রা)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর দায়িত্ব প্রদানের দলীলে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখিত ছিল—

هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله ﷺ عند آخر عهده بالدنيـــا وأول عهدة بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر إني استعملت عليكم عمـــر

www.pathagar.com

بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به ورائي فيه وإن جاركم يدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل أمري ما اكتسبت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون -

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) এই দলীল এমন মুহূর্তে লিখেছেন, যখন তার এই জীবনের শেষ এবং নব জীবনের সূচনা। এই দলীল এমন এক সময়ে লিখা হচ্ছে যখন কাফিরও মু'মিন হয়ে যায় এবং পাপীও ভয় পেতে থাকে। আমি হযরত ওমর (রা)-কে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করলাম। যদি তিনি সুপথ গ্রহণ করেন এবং ন্যায় বিচার করেন তাহলে এটা হবে তাঁর সেই আবরণ যা আমি তাঁর সম্পর্কে জানি। যদি তিনি যুলুম করেন এবং বদলে যান তাহলে আমার অদৃশ্যের কোন জ্ঞান নেই। আমি তো মঙ্গলেরই আশা করেছি। বস্তুত প্রত্যেকেই তাঁর কাজ অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। অত্যাচারী ব্যক্তি অচিরেই জ্ঞাত হতে পারবে, সে কোথায় দিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যে দীর্ঘ পত্র লিখেন তাতে তিনি বলেন,

وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاء به نبيكم وأن تهتدوا بهديه وأن تعتصموا بدين الله عز وجل فإنه من لم يهد الله ضل وكل من لم يعافه مبتلي وكان من لم بتصور مخذول فمن هداه الله كان مهديا ومن أضله الله كان ضالا ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه فلم يقبل له في الآخرة صرف ولا عدل فمن أمن فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله -

"আল্লাহ্ তা'আলা-কে ভয় করার জন্য আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের যে অংশ নির্ধারিত হয়েছে এবং তোমাদের নবী তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর। নবীর নির্দেশিত পথে চল এবং আল্লাহ্‌র দীনের রশিকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর। কেননা আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত প্রদান করেন না সে গুমরাহ্ হয়ে যায়। এবং আল্লাহ্ যাকে সুস্থ রাখেন না সে অসুস্থ হয়ে যায়। যাকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন না সে লাঞ্ছিত হয়। যাকে আল্লাহ্ হিদায়েত প্রদান করেন সে পথের দিশা পায়। আর যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ্ করে সে পথ হারিয়ে বসে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তার দুনিয়ার কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না। এবং আখিরাতে তার পক্ষ হতে কোন ফিদাইয়া গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, তা তার জন্য উত্তম হবে, যে তা করবে না তার জানা উচিৎ যে, সে আল্লাহ্‌কে কোন ব্যাপারে অক্ষম করতে পারবে না।"

www.pathagar.com

হস্তাক্ষর জ্ঞান

ইসলামের যুগে আরবে যে কয়জন লিখা জানতেন তারা সবার নিকট সম্মানিত ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন অন্যতম। তিনি ওহী লিখকদের একজন ছিলেন।[১]

ইলমে কুরআন

এতক্ষণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রকৃতি প্রদত্ত যোগ্যতা ও গুণাবলীর কথা বলা হল। এখন আমরা তার ঐ সমস্ত জ্ঞান ও গুণাবলীর উল্লেখ করব যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) যেহেতু জীবনের প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জনসমক্ষে ও নির্জনে, ভ্রমণে ও অবস্থানে, যুদ্ধে ও সভাস্থলে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র হুযূরের সাথে ছিলেন, তাই তাঁর অন্তর হুযূর (সা)-এর ইল্‌ম ও কামালাতের একটি ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল।

এই বিশেষত্বের কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) সাধারণভাবে বলতেন,[২]

هو (أبو بكر الصديق) أعلمنا بالرسول ﷺ

তিনি (হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের মধ্যে হুযূর (সা) সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।" প্রকাশ থাকে যে, ঐ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রথম নম্বর হলো ইলমে কুরআন। হযরত আবূ বকর (রা) কোন আয়াত শ্রবণ করার পর তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতেন। এ পর্যায়ে তাঁর চিন্তাশক্তি ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম রহস্যাবলী পর্যন্ত পৌঁছত যেখানে অন্যান্যদের বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন আঁ-হযরত (সা)-কে মক্কার লোকেরা হিজরত করতে বাধ্য করে তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেনإنا لله وإنا إليه راجعون এই সমস্ত লোকেরা তাদের নবীকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। অতএব এরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।"

হযরত আবূ বকর (রা) এটা শুনেই বুঝতে পারেন যে, শীঘ্রই জিহাদের হুকুম নাযিল[৩] হবে।"

হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের সময় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে, পয়গাম্বরের মৃত্যুই হতে পারে না কিন্তু

---

১. استيعاب ابن عبد البر تذكرة حضرت أبو بكر

২. ইলাতুল খাফা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২০।

৩. ইজালাতুল খাফা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২০।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) যখনই কুরআনের আয়াত إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ পাঠ করেন তখন সবার চেতনা ফিরে আসে। হযরত ওমর (রা) ভাবলেন, যেন তিনি এই আয়াত পূর্বে কখনো শ্রবণ করেননি।[১]

সর্বদা হুযূর (সা)-এর সাহচার্য লাভ করার ফলে হযরত আবূ বকর (রা) এর এই সুযোগ ছিল যে, কোন আয়াত সম্পর্কে তাঁর কিছু জানবার থাকলে তা তিনি নিঃসঙ্কোচে হুযূরকে জিজ্ঞাসা করতেন। একবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আয়াতের পর আমাদের কি উপায়? প্রতিটি অন্যায় কাজের পরিবর্তে আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে?

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به

"তোমার খেয়াল খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল খুশি অনুসারে কাজ হবে না, কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।" তখন আঁ-হযরত (সা) বলেন, "হে আবূ বকর (রা), আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।"[২] তুমি কি অসুস্থ হও না? তোমার কি কোন দুঃখ-কষ্ট হয় না? তোমার উপর কি কোন বিপদ আসে না? এসবই হলো ঐ সমস্ত পাপের শাস্তি।

একবার কোন বস্তুর শপথ করে তা ভঙ্গ করা দুর্বল চিত্তের পরিচায়ক। তাই হযরত আবূ বকর (রা) ও শপথ করে তা কখনো ভঙ্গ করতেন না। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যখন শপথের কাফ্ফারাহ (كفارة يمين) এর আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি উপরোক্ত আয়াতের এই ভাবার্থ উপলব্ধি করেন যে, যে বস্তুর শপথ করা হয়, যদি তা থেকে অন্য কিছু অধিকতর উত্তম হয় তা হলে সেজন্য শপথ ভঙ্গ করা চলে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

أن أبو بكر لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني –

"হযরত আবূ বকর (রা) একবার শপথ (কসম) করে কখনো তা ভঙ্গ করতেন না। কিন্তু যখন কসম এর কাফ্ফারাহ্ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি বলেন, যদি কসমের পর আমি এর চেয়ে উত্তম কোন বস্তু পাই তা হলে সেটাই গ্রহণ করব এবং কসমের কাফফারাহ্ আদায় করব।"[৩]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই বাণীর দ্বারা ফিকাহ্ বিদগণ প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, উপরোল্লিখিত অবস্থায় কসম ভঙ্গ করা প্রকৃতপক্ষে কোন অপরাধ নয়, যদিও কাফফারাহ্ আদায় করা অত্যন্ত জরুরী।

---

১. হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা হলো فو الذي نفسي بيده فكأنما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت তাবারীর উদ্ধৃতিসহ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।
২. মুসনাদে আহমদ : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১১।
৩. সহীহ বুখারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৯৮০।

www.pathagar.com

এ প্রেক্ষিতে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা আছে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের বাড়ীতে একবার কয়েকজন মেহমান আসেন। রাতে আমার পিতা বলেন, আমি এখন হুযূর (সা)-এর খিদমতে যাচ্ছি, ফিরতে বিলম্ব হবে। তুমি মেহমানদেরকে আহার করাবে। হযরত আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদেরকে খাবার গ্রহণের অনুরোধ করি, কিন্তু তারা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা আহার করব না। অতঃপর রাত গভীর হলে হযরত আবূ বকর (রা) ঘরে ফিরে আসেন। যখন তিনি অবগত হন যে, এখনো মেহমানরা আহার করেন নি তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এই রাগত অবস্থায়ই শপথ করেন যে, তিনি রাতে আহার করবেন না। এটা দেখে মেহমানরাও শপথ করে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আহার না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও আহার করব না।' তখন হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় ভুল বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথে খাদ্য পরিবেশনের নির্দেশ দেন। সেদিন শপথ ভঙ্গ করে তিনি নিজে আহার করেন এবং মেহমানদেরকে আহার করান।[১]

পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বলেই হযরত আবূ বকর (রা) যখন কুরআনের কোন শব্দের একটি অর্থ নির্ধারণ করতেন তখন নেতৃস্থানীয় কোন সাহাবা তার বিরোধীতা করার সাহস পেতেন না। 'কালালাহ্' كلالة শব্দের অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যখন স্বীয় মতানুযায়ী এর অর্থ নির্ধারণ করেন তখন তা সকলেই মেনে নেন। হযরত ওমর ফারূক(রা)-এর খিলাফতকালে এ সম্পর্কে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেন,

إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر —

"আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জাবোধ করি যে, হযরত আবূ বকর (রা) যা বলেছেন আমি তা বাতিল করি।"

সহীহ্ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে কালালাহ্‌র كلالة ব্যাখ্যা সম্পর্কে কেউ হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরোধিতা করেনি।

হাদীস

ইল্‌মে নবূওতের মধ্যে পবিত্র কুরআনের পর হলো হাদীসের স্থান। প্রকাশ থাকে যে, নবূওতের সকাল-সন্ধা তথা সর্বমুহূর্তের সর্বপ্রকার দীপ্তি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট দৃশ্যমান ছিল। এর ফলে আঁ-হযরত (সা)-এর কার্যাবলী ও বাণীসমূহের যে ভাণ্ডার তাঁর নিকট রক্ষিত ছিল এ ব্যাপারে অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

আল্লামা যাহাবী বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) লোকদের সমবেত করে বলেন, "তোমরা হুযূর (সা)-এর হাদীস

---

১. সহীহ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৮০।

www.pathagar.com

বর্ণনা কর, অতঃপর তাতে মতবিরোধ পোষণ কর। তোমরাই যখন এরূপ কর তখন তোমাদের পর যারা আগমন করবে তারাতো তোমাদের চেয়েও অধিক মতভেদ পোষণ করবে। অতএব তোমরা রাসূল (সা)-এর থেকে কিছু বর্ণনা কর না। হ্যাঁ তবে যখন লোকজন তোমাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করে তখন অবশ্যই কিছু বল। দেখ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব বিদ্যামান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবে যে বস্তু হালাল করা হয়েছে সেটাকে হালাল মনে কর এবং যেটাকে হারাম করা হয়েছে সেটাকে হারাম মনে কর।[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপরোক্ত উক্তির সারমর্ম হল যে আঁ-হযরত (সা)হয়ত কোন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী একরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন, এবং অন্য সময় প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন, তাছাড়া শ্রবণকারী আরব আবার আনাবর হতে পারে। বুদ্ধিদীপ্ত হতে পারে, আবার বোকাও হতে পারে, কোন শ্রোতা পূর্ণাঙ্গ কথা শ্রবণ করতে পারে, আবার অর্ধেকও শ্রবণ করতে পারে, কেউ কোন বাক্যের একরূপ অর্থ বুঝতে পারে, আবার কেউ অন্যরূপ। হুযূর (সা)-এর বর্ণিত সব বাক্যতো কেউ অবিকল স্মরণ রাখতে পারবে না। সুতরাং বর্ণনাকারীর বর্ণনা অর্থের অনুপাতেই হবে। তাই এতে দু-একটি শব্দের পরিবর্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এ দু-একটি শব্দের পরিবর্তনে অর্থের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এ সমস্ত কারণেই হযরত আবূ বকর (রা) সঠিক ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যদি বর্ণনা অধিক হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট যা কিছু শ্রবণ করেছে, কোনরূপ সতর্কতা ছাড়া তার সব কিছুই বর্ণনা করতে শুরু করে তাহলে বিভিন্ন প্রকার মত পার্থক্যের সৃষ্টি হবে এবং মূল শরীয়ত ও দীনের ভিত্তির উপরও এর প্রভাব পড়বে। তাই এই অবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই তিনি শুধু প্রয়োজন দেখা দিলেই হাদীস বর্ণনা করার নির্দেশ দেন। অপর দিকে তিনি এই ব্যাখ্যাও দেন যে, কোন হাদীসের সঠিকতা পরীক্ষা করার প্রকৃত মাপকাঠি হলো কুরআন। অতএব রিওয়ায়েত কুরআনের প্রকাশ্য আয়াতের বিরোধী হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাফিয জাহবী হযরত আয়েশা (রা) হতে এই মর্মে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা) পাঁচশত হাদীস জমা করেছিলেন, কিন্তু এক রাতে তাঁকে খুব অস্থির মনে হচ্ছিল। অবশেষে সকাল হওয়ার সাথে সাথে তিনি হাদীসের এই ভান্ডার পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এই আশংকায় ছিলাম যে, আমি মৃত্যুবরণ করব এবং হাদীসের এই ভাণ্ডারকে এমনিভাবে ছেড়ে যাব যাতে এমন কিছু হাদীসও রয়েছে যা আমি এমন এক ব্যক্তি হতে সংগ্রহ করেছি যাকে আমি বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য মনে করেছি বটে কিন্তু বাস্তবে এই রিওয়ায়েত এরূপ ছিল না যেমন সে আমার নিকট বর্ণনা করছে। এই অবস্থায় উক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনার দায়িত্ব বাস্তবে আমার উপরই[২] বর্তাবে।

---

১. তাযকিয়ায়ে হুফফায, ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৩।

২. তাযকিরায়ে হুফ্‌ফাযঃ ১ম খণ্ডঃ ৩য় খণ্ড।

www.pathagar.com

যদিও হাফিয সাহেব এই রিওয়ায়েতকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে মিযাজ ও দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল তাতে একথা বলা চলে যে, এই রিওয়ায়েতে এমন কিছু নেই যা দেরায়েত (বিবেক) বিরোধী। কেননা শরীয়তের ভিত্তি পবিত্র কুরআনকে সন্দেহ মুক্ত রাখা এবং অন্যান্য গ্রন্থের মিশ্রন থেকে এটা রক্ষা করার জন্য খোদ হুযূর (সা) নিদেশ প্রদান করেছেন — لا تكتبوا عني غير القرآن (কুরআন ব্যতীত তোমরা আমার থেকে অন্য কিছু লিখ না)। অতএব রিওয়ায়েত সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা নবী (সা)-এর ঐ ইরশাদের ফলশ্রুতি ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এটা ছিল না যে, হাদীসের রিওয়ায়েত পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাক। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করা উচিত তেমনিভাবে প্রয়োজনানুযায়ী তা থেকে চুপ থাকাও উচিত।

হযরত আবূ বকর (রা) সর্বদা উপরোক্ত নীতিই অবলম্বন করতেন। ফলে তাঁর থেকে যে মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সংখ্যায় খুব বেশী নয়।[১] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাকীফায়ে বনু সায়েদায় যখন আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় তখন তিনি الأئمة من قريش এই হাদীস পেশ করে বিতর্কিত বিষয়টির মীমাংসা করে। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র দেহ কোথায় সমাধিস্থ করা হবে এটা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন তিনি হুযূর (সা)-এরই হাদীস বর্ণনা করে এর চূড়ান্ত সামধান করেন। হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর পক্ষ হতে ফিদাক ও খায়বার এর দাবী যখন উত্থাপিত হয় তখন তিনি হুযূর (সা)-এরই হাদীস দ্বারা এর উত্তর প্রদান করেন। প্রশাসক ও সদ্কা আদায়কারীদের নামে নিসাব তথা যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে যে বিস্তারিত নির্দেশ তিনি প্রেরণ করেন; তাও হুযূর (সা)-এর হাদীসের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল।

খবরে ওয়াহেদ (خبر واحد) সম্পর্কে নীতিমালা

এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, তিনি একক বর্ণনাকারী (خبر واحد) সম্পর্কে এই নীতি নির্ধারণ করেন যে, এরূপ রিওয়ায়েত ঐ সময় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই বর্ণনাকারীর জন্য

---

১. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) ইযালাতুল খাফা গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কম রিওয়ায়েত বর্ণনায় নিম্নলিখিত কারণ উল্লেখ করেছেন। ১.তিনি হুযূর (সা)-এর পর খুব অল্প সময় জীবিত ছিলেন। ২. এই অল্প সময় তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সুসমাধানের কাজেই ব্যয় করেন। ৩. তাঁর সে সকল সাহাবীই বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁরা স্বয়ং হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর (রা) এ বিষয়ে খুব মনোযোগী হননি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয় হযরত আবূ বকর (রা)-এর কম রিওয়াতের অন্যতম কারণ। কিন্তু এর মূল কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। প্রকৃত পক্ষে এটা হযরত আবূ বকর (রা) এর দূরদর্শিতা ও শরীয়ত সম্পর্কে তাঁর সুক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচায়ক। পরে মুসলমানদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও দলাদলির সৃষ্টি হয়, গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, এই অধিক বর্ণনা ও অসাবধানতাই এর মূল কারণ।

www.pathagar.com

অন্য কোন ব্যক্তি সাক্ষী প্রদান না করবে। (অর্থাৎ অন্য কোন ভাবে এই রিওয়ায়েতের সমর্থন না পাওয়া যাবে) যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কে হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শু'বা (রা)-এর রিওয়ায়েত শুনার পর তিনি এর পক্ষে সাক্ষী দাবী করেন। যখন মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রা)-কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয় তখন তিনি ঐ রিওয়ায়েত গ্রহণ করেন। এমনিভাবে কুরআন জমা করার সময় কোন একজন সাহাবীর নিকট একটি আয়াত পাওয়া গেলে তিনি তা প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করতেন না এবং একক বর্ণিত (خبر واحد) দ্বারা পবিত্র কুরআনের উপর কোন কিছু বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করাকে তিনি বৈধও মনে করতেন না।[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতের সংখ্যা

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত একশ' বিয়াল্লিশটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রথম রিওয়ায়েতটি হযরত আবূ বকর (রা) হতেই বর্ণিত। হাফিয ইবনে হাজর (রহ) আল ইসাবা নামক গ্রন্থে সাহাবীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত ইবনে আমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), হযরত হুযায়ফাহ (র) হযতর কা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা), হযরত উকবা ইবনে আমির (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আবূ আমামাহ (রা), হযরত আবূ বারযাহ্ , হযরত আবূ মুসা এবং তার দুকন্যা হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আসমা (রা), নেতৃস্থানীয় তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত দাবিজী (রহ) হযরত মুররাহ ইবনে শারাহবিল, হযরত ওয়াসিতুল বিজলী, হযরত কায়েস ইবনে আবি। হাযিম এবং হযরত সুভায়দ ইবনে গাফলাহ্ প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন, যারা হযরত আবূ বকর (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাও লিখেছেন যে, মূল রিওয়ায়েতকারীর সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশী।

ফিকাহ্

ইসলামে শরীয়তী আইন প্রণয়নের মূল উৎস চারটি। যথা—আল্লাহ্র কিতাব, রাসূল (সা)-এর সুন্নত বা হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস। এই চারটি উসূল সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা) নির্ধারণ করেন এবং আজ পর্যন্ত তাই কার্যকর করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ এই চারটি উসূলের উল্লেখ করে বলেছেন,[২]

---

১. শরীয়তের আহকামের চারটি উসূলের মত একক বর্ননা (خبر واحد) গ্রহণ করা সম্পর্কে এই নীতির ভিত্তি ও মাওঃ শিবলী (রা) আল-ফারুক নামক গ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথচ হাদীস ও ফিক্হের বিষয়ে বিধি-বিধানের পদ্ধতি হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট থেকেই হযরত ওমর (রা) গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অবশ্য হযরত ওমর (রা)-এর বিস্তৃতি এমনিভাবে ঘটিয়েছেন যে, পরবর্তীকালে তা ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ১১৯।

www.pathagar.com

وكانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم

"এই উসূলগুলো প্রথম যুগের সাহাবীদের আমল এবং তাদের বিশেষণ থেকেই উৎসারিত হয়েছে।"

প্রথম যুগের সাহাবীদের 'আমল' ও 'বিশেষণ' বলতে কি বুঝায় ? হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ্) এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমল সম্পর্কিত মায়মুন ইবনে বাহরান-এর ঐ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যা আমরা ইজতিহাদ ও কিয়াস অধ্যায়ে সুনানে দারমীর বরাতে বর্ণনা করেছি। হযরত ওমর ফারূক (রা) এ ব্যাপারে যা কিছু করেছেন এবং গভর্নর ও বিচারকদের প্রতি যে নির্দেশ প্রেরণ করতেন তা প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-ই তৈরি করেছিলেন।

ফকীহের সবচেয়ে বড় গুণ হলো 'তাফাক্কুহ্' (সূক্ষ্মজ্ঞান), যা একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে এই গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ইল্‌মে নবূওয়তের একটি শাখা, ইলমে তা'বীর বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। শুভ স্বপ্নকে সহীহ্ হাদীসে নবুওতের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। আবার কোন কোন রিওয়ায়েতে সত্তুর ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর যে জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই বিষয়টির সম্পর্ক বস্তুজগতের চাইতে আধ্যাত্মিক জগতের সাথেই বেশী, তাই যে ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা ও পবিত্রতা যত অধিক এবিষয়ে তার জ্ঞানও তত প্রখর। কাজে কাজেই হযরত আবূ বকর (রা) এক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইলমে তা'বীরের ইমাম ইবনে সীরীন বলেন,

كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي ﷺ

"হুযূর (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন স্বপ্নের সবচাইতে বড় ব্যাখ্যাতা।"

হুযূর (সা) যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখতেন তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তার যে ব্যাখ্যা দিতেন (সা) সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিতেন। তাই গাযওয়ায়ে তায়েফের সময় সাহাবায়ে কিরাম যখন শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন হুযূর (সা) স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে একটি ভর্তি পেয়ালা হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর মারাতে পেয়ালাতে যা কিছু ছিল তা পড়ে গেছে। হযরত আবূ বকর (রা) এটা শুনে আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি মনে করি না যে, আপনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন। হুযূর (সা) ইরশাদ করেন, "হাঁ আমিও তাই মনে[১] করি।

১. তাবারী, ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৫।

www.pathagar.com

একবার হযরত আয়েশা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর হুজরায় (কামরায়) তিনটি চন্দ্র পতিত হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এই স্বপ্নটি বর্ণনা করা হয়। অতঃপর হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর যখন তাঁকে হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরায় দাফন করা হয় তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, কন্যা! রাসূল (সা) হলেন একটি চাঁদ যিনি তোমার হুজরায় চির নিদ্রায় শায়িত[১] আছেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র) এমনি ধরনের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

তাসাউফ

দীনের দু'টি দিক রয়েছে। একটি বাহ্যিক صوري অপরটি আভ্যন্তরীণ معنوي বাহ্যিক দিকের নাম হলো শরীয়ত যা বাহ্যিক আহকামের সাথে সম্পর্কিত এবং আভ্যন্তরীণ দিকের নাম হলো তরীকত বা তাসাউফ, যা হৃদয়োত্তাপ ও আত্মিক পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত। এর উদ্দেশ্য হলো, নফ্সকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষতা দূরীকরণের মাধ্যমে একজন মানুষ স্বীয় আবেগ ও অনুভূতিকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করবে যে, আহকামে এলাহী স্বয়ং তার আবেগ ও নফ্সের দাবীতে এবং সে আগা-গোড়া ইবাদতে রূপায়িত হয়ে যাবে। শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান। দীনের মৌলিক ব্যাপারে এর একটির অস্তিত্ব অন্যটি ব্যতীত অর্থহীন। যদি বাহ্যিক ও প্রচলিত নীতি অনুযায়ী নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ পালন করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র মহব্বত ও ইশ্ক থেকে পালনকারীর অন্তর বঞ্চিত থাকে তাহলে ঐ ফুলের মত যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয় কিন্তু তাতে কোন ঘ্রাণ নেই। যদি অন্তরে মহব্বত ইলাহী থাকে তাহলে এর উদাহরণ ঐ সঙ্গীতের মত যার সুর সুন্দর ও আকর্ষণীয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষা করতে হয় তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তাসাউফ ও তরীকতের ক্ষেত্রে তার স্থান ও মর্যাদা কোথায়। কেননা এছাড়া তার ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামোই নড়বড়ে থেকে যায়।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ্) 'তাসাউফে সিদ্দিকী'-এর উপর এক দীর্ঘ আলোচনার পর এটা প্রমাণ করেছেন যে, তরীকতের পূর্ণতার জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন, যেমন—তাওয়াক্কাল, পরহিযগারী, সতর্কতা, মুখের নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য, আত্মতুষ্টি, প্রবৃত্তির বিরোধিতা, সংসারের প্রতি অনাশক্তি, অন্তরের কোমলতা, ইত্যাদি তার সবগুলোই হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি ছিলেন তরীকত পন্থীদের ইমাম। 'কাশ্ফুল

১. ইযালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চাঁদ হলো হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) যিনি এই হুজরায় আঁ-হযরত (সা)-এর পাশে দাফন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মাহজুবে' আছে, তাসাউফের মূল হলো সাফা। এই গুণের একটি হলো মূল (أصل) এবং একটি হলো শাখা (فرع)। মূলের অর্থ গায়রুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং এর শাখার অর্থ দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে নিজকে দূর রাখা যেহেতু সাফা সিদ্দীকিয়ত (صديقيت) -এর একটি অপরিহার্য গুণ। তাই হযরত আবূ বকর (রা) হলেন তরীকত পন্থীদের ইমাম ও নেতা।[১]

নেতৃস্থানীয় সূফীদের অন্যতম হযরত আবুল আব্বাস ইবনে আতাকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, كونوا ربانيين এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন, এর অর্থ হলো হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত হয়ে যাও। 'রাব্বানী' প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার ইহকাল ও পরকাল একীভূত হয়ে যায়, অথচ তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য বা দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্রও ছিল তাই। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের সময় সাহাবী মাত্রই উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে কোন রূপ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়নি। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাহিত বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর পূজা করত তার জেনে নেওয়া উচিৎ যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পূজা করে তার বিশ্বাস রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনো তার মৃত্যু আসবে না।[২]

গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় হযরত আবূ বকর (রা) নিজের যাবতীয় সম্পদ হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির করেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ বকর (রা) তুমি স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দেন, "আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে রেখে এসেছি।" হযরত আবূ বকর (রা) ওয়াসেতী বলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা), তার এই উক্তি দ্বারা মারিফত ও তরীকত জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদঘাটন করে[৩] দিয়েছেন।

হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল মুযনী হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) এমন একটি বস্তুর কারণে যা তাঁর অন্তরে বিদ্যমান ছিল এবং তাহলো আল্লাহ্র মহব্বত ও তাঁর উদ্দেশ্যেই বাঁচা ও মরা।[৪] হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রা) বলেন, তাওহীদ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হযরত আবূ বকর (রা)-এর সেই উক্তি যা তিনি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন —[৫]

---

১. ইযালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১।

২. كتاب اللمع في التصوف مطبوعة ليدن صف ١٢١

৩. كتاب اللمع في التصوف صف ١٢٣

৪. كتاب اللمع في التصوف ص ١٢٤ এ কথাটি আকবার ইলাহাবাদী কি সুন্দর ভাবেই না বর্ণনা করেছিলেন

৫. تو دل مين تو آتا هيـــ سمجه مين نهين آتا

لبس جان گيا مين تيرى پهچان بهي هيـــ

سبحان من لم يجعل للخلق طريقا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার পরিচয়ের জন্য কোন পথই বলে দেননি। একথা বলা ছাড়া যে, মানুষ তার পরিচয় লাভে অপারগ।"

মারিফত ও তরীকতের এই উচ্চ মর্যাদার কারণেই হযরত আবূ বকর তাসাউফ পন্থীদের ইমাম ও নেতা ছিলেন। এবং সুফীদের শ্রেষ্ঠ সিলসিলা যেমন চিশতিয়া ও নকশবন্দীয়া এবং অন্যান্য তরীকার সমাপ্তি বা মূল খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

নবী প্রেম

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিভিন্ন গুণাবলী ও কামালাতের মূল উৎস হলো সেই ইশ্‌ক ও প্রেম যা হুযূর (সা)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি জীবন বাজী রেখেও হুযূর(সা)-এর সাথে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে এই ইশ্‌কই ছিল মূলধন। যার ফলে তার মধ্যে অন্যান্য কামালাত সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন রিসালাত ও নবূওয়তের সূর্য পৃথিবীতে আলো বিকিরণ করেছে। (যতদিন হুযূর জীবিত ছিলেন) ততদিন এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তার স্নেহ পরশ থেকে পৃথক থাকেন নি। হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর মুখে হুযূর (সা) এর নাম উচ্চারণ করতেই তার চোখ অশ্রু আপ্লুত হয়ে যেত। হযরত ওরওয়াহ্‌ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের দ্বিতীয় বছর হযরত আবূ বকর (রা) একবার খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে শুধু —

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول

(রাসূল (সা) প্রথম বছর যখন খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়ালেন) এতটুকু বলেছেন অমনি হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের ঘটনা স্মরণ হয়ে যাওয়ায় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন পুনরায় খুতবা শুরু করেন তখনও দম আটকে যায়। অবশেষে তৃতীয়বার নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি খুতবা সমাপ্ত করেন।[১]

হযরত উম্মে আয়মান (রা), আঁ-হযরত (সা)-কে কোলে নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন এবং সুবাদে হুযূর (সা)-তার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। হুযূর (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)ও এই রীতি চালু রাখেন। একদিন তিনি এবং হযরত ওমর (রা) সেখানে যান এবং উম্মে আয়মান তাদেরকে দেখে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে বলেন, কেন কাঁদছেন? আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়াই তো আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য উত্তম।' হযরত উম্মে আয়মান (রা) বলেন, "এটাতো আমিও জানি, কিন্তু দুঃখ হলো এই যে, এখন ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।"

১. মুসনাদে আহমদ : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৮।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) উভয়ের উপর এ কথার এমনি প্রতিক্রিয়া হলো যে, তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদতে শুরু করেন।[১]

তাবারী এবং ইবনে আসীব এর একটি রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের মূল কারণ হলো, তিনি হুযূর (সা)-এর বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বিচ্ছেদ অনলে জ্বলতে জ্বলতেই শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনের সাথে মিলিত হলেন।

"একবার হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে দেখেন, হযরত আয়েশা (রা) উচ্চস্বরে কথা বলছেন। যেহেতু হুযূর (সা)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা শিষ্টাচার বিরোধী—তাই তিনি রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে চড় মারতে উদ্যত হন।[২]

ইফ্ক বা অপবাদের ঘটনায় (واقعة إفك) স্বীয় কন্যার নিরাপরাধ হওয়া সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা) নিঃসন্দেহ ছিলেন, তবু হুযূর (সা) যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর গৃহে গমন করে হযরত আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যদি তুমি এই অভিযোগ হতে মুক্ত হও তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নির্দোষিতার ঘোষণা অবশ্যই দেবেন। আর যদি তোমার কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। কেননা বান্দাহ্ যখন তওবা করে তখন তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আঁ-হযরত (সা)-এর এই কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) তার সম্মানিত পিতাকে তার পক্ষ থেকে উত্তর দানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আদব ও সম্মানের খাতিরে হযরত আবূ বকর (রা) তার মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারলেন না এবং বললেন, 'আমি জানি না কি বলব?[৩] 'ইলার ঘটনায়' (واقعة إيلاء) উম্মুল মু'মিনীনরা খোরপোষ দাবী করেন এবং আঁ-হযরত (সা) তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে 'ইলা' করেন। এতে সব সাহাবায়ে কিরাম চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর চিন্তার সীমা ছিল না। কেননা তাঁদের উভয়েরই কন্যা আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশেষে উভয়ে হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, 'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা এই দু'জন (হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসার) গর্দান উড়িয়ে দেব।[৪]

হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা) প্রথম স্বামীর মৃত্যুতে যখন বিধবা হন, তখন হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) চুপ থাকেন। এতে তিনি (হযরত ওমর (রা)) অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর যখন হুযুর (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন তখন

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৫ম খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৫।
২. ইযালাতুল খাফা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ১৫।
৩. সহীহ্ বুখারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৯৬।
৪. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুল ইলা।

www.pathagar.com

হযরত আবূ বকর (রা) এক দিন হযরত ওমর (রা)-কে বলেন, 'তুমি আমাকে হযরত হাফসা (রা) সম্পর্কে যে অনুরোধ জানিয়েছিলে আমি তা এই জন্য গ্রহণ করিনি যে, আঁ-হযরত (সা)-এর একটি কথা দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, হুযূর (সা) নিজেই তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। আমি তখন ইচ্ছা করিনি যে, রাসূল (সা)-এর গোপনীয়তা তোমার কাছে প্রকাশ করি।[১]

কোন এক ঈদের দিন হযরত আবূ বকর (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, আয়েশা (রা)-এর কাছে দু'জন বালিকা বসে আছে। তারা গান জানত না, কিন্তু বেসুরা একটি গান গাচ্ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) এতে চুপ থাকতে পারেন নি। তিনি বলে উঠেন, আরে রাসূল (সা)-এর ঘরে এই গান? হুযূর (সা) পিছন ফিরে শুয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে এটা বলতে শুনে তিনি বলেন, হে আবূ বকর (রা)! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আছে। আর আজ আমাদের ঈদ।[২]

কোন কোন লিখক এই ঘটনাকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাকওয়ার ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা যদি তাকওয়ার বিষয় হত তাহলে এর চিন্তা তো আঁ-হযরত (সা)-এর চেয়ে বেশী কারো হতে পারত না। আসল কথা হলো হযরত আবূ বকর (রা) এটাকে হুযূর (সা)-এর আদব ও মর্যাদা বিরোধী মনে করতেন, তাই এই ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

হুযূর(সা)-এর সম্ভ্রম রক্ষা

আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে যদি হযরত আবূ বকর (রা) কখনো এমন কোন ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতেন, যার প্রতিক্রিয়া হুযূর (সা)-এর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হতেন। হযরত আশ্‌সাস বিন কায়েস এর ভগ্নি কাতীলা বিনতে কায়েস ইবনে মাদিকরবকে হুযূর (সা)-এর মৃত্যু রোগের সময় অথবা এর দুমাস পূর্বে (মতান্তরে) বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি নিয়মানুযায়ী হুযূর (সা)-এর ঘরে আগমন করেন নি। এমন সময় হুযূর (সা) ইন্‌তিকাল করেন। অতঃপর তিনি হযরত ইকরামা বিন আবি জেহেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত আবূ বকর (রা) এটা অবগত হওয়ার পর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং উভয়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর বিরোধিতা করে বলেন, কাতীলাহ্ উম্মুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তিনি নবীর ঘরে প্রবেশ করেন নি এবং তার জন্য 'হেজাব' এর হুকুমও হয়নি।[৩]

---

১. বুখারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫৭১।
২. বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ১৩০।
৩. الاستيعاب ابن عبد البر باب القلف

www.pathagar.com

হুযূর (সা)-এর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ

হযরত আবূ বকর (রা) রাসূল-এর খলীফা ছিলেন এবং রাসূল প্রেমিকও ছিলেন। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি ঘোষণা করেন, যদি কারো সাথে হুযূর (সা) কোন জিনিসের ওয়াদা করে থাকেন অথবা হুযূর (সা)-এর নিকট কারো পাওনা থাকে তাহলে সে যেন আমার কাছে আসে।[১]

আহ্‌লে বায়ত বা নবী পরিবারের সাথে মহব্বত

আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অস্বাভাবিক ইশ্‌ক ও মহব্বত থাকার কারণে আহ্‌লে বায়তকেও তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি নিজ পরিবারের চাইতেও ওদের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখতেন। 'ফিদাক ও খায়বারের' ঘটনার সময় তিনি বলেন, "ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেয়ে রাসূল (সা)-এর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে অধিক পছন্দ করি। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর বাড়ী গমন করেন। সেখানে হযরত আলী (রা) হুযূর (সা)-এর সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটি বর্ণনা করতে থাকেন। তখন অবস্থা এই হ'ল যে, হযরত আলী (রা) কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা) এক একটি কথা বলছিলেন, আর হযরত আবূ বকর (রা) তা শুনে ক্রন্দন করছিলেন।[২]

হুযূর (সা) ইন্তিকালের পর একদিন হযরত আবূ বকর (রা) আসরের নামায আদায় করে মসজিদ থেকে রেব হয়ে আসছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রা)-কে মহল্লার শিশুদের সাথে খেলা করতে দেখেন এবং তখন তখনি তাকে আদর করে কোলে তুলে নেন।[৩]

ইরাক বিজয়ের পর একবার হযরত খালিদ (রা) গনীমতের যে মাল মদীনায় প্রেরণ করেন সেগুলোর সাথে উপঢৌকন হিসেবে একটি মূল্যবান তিলসানও আবূ বকরের কাছে পাঠান। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) ঐ তিলসান নিজে না নিয়ে হযরত হুসায়ন ইবনে আলী (রা)-কে প্রদান করেন।[৪] হযরত আবূ বকর (রা) নবী পরিবারের সাথে শুধু নিজেই সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার করতেন না, অন্য মুসলমানদেরকেও নির্দেশ দিতেন (নবী পরিবারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে)

ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته [৫]

সাধারণ রিওয়ায়েত অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ফতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) রাতের বেলাই তাঁর কাফন-দাফনের কাজ

---

১. বুখারীঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৩০, ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬২৯।
২ তাবারী ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃ ঃ ৪৪৯।
৩. বুখারী ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৩০, আল বিদায়া ঃ ৫ম খণ্ডঃ পৃঃ ২৮৬।
৪. ফুতুহুল বুলদানঃ বালাযুরি ঃ পৃঃ ২৫৪।
৫. বুখারী ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৩০।

www.pathagar.com

সমাধা করেন। কিন্তু হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) তাদের বাড়ীতে যান এবং জানাযা তৈরী হয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, চলুন নামায পড়ান। তিনি বলেন, আপনি রাসূল (সা)-এর খলীফা, আপনিই নামাযে ইমামতি করুন। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা) ইমামতি করেন।[১]

এই বর্ণনাই বাস্তব সম্মত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) সাধারণ বায়'আতের দিনই হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন। হযরত আলী হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথী ও সাহয্যকারী ছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন না। রাসূল (সা)-এর খলীফার সাথে তারও মধুর সম্পর্ক ছিল। এতদসত্ত্বেও এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, হুযূর (সা)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করেছেন অথচ হুযূর (সা)-এর খলীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তাঁর জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করেন নি। মূল ঘটনা হলো এই যে, বনু উমাইয়ার মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল যাদের অন্তর ছিল কলুষতায় পূর্ণ। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কথাবার্তা বলত এবং সাধারণ সভায়ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা হ'ত। ফলে অনুরূপ ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং উপরোক্ত রিওয়ায়েতে তারই কু-প্রভাব বিদ্যমান।

উত্তম চরিত্র

নফ্সের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী অর্জন করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। আর উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই হুযূর (সা)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি বর্ণনা করেছেন —

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

হযরত আবূ বকর (রা) স্বভাবগতভাবেই পুণ্যবান ছিলেন। তাই জাহেলী যুগেও তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনো মদ্যপান করেন নি, কখনো জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করেন নি, কখনো মূর্তি পূজা করেন নি। অথচ এ তিনটিই ছিল আরবদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি দরিদ্রদের খোঁজ নিতেন, অসহায়, বিকলাঙ্গদের সাহায্য করতেন, মুসাফির ও মেহমানদের সেবা করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর এই সমস্ত গুণাবলীর আরো শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং তিনি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ আদর্শে পরিণত হন।

তাকওয়াহ্ ও পবিত্রতা

হযরত আবূ বকর (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর প্রধান দু'টি গুণ ছিল তাকওয়াহ্ ও পবিত্রতা। এমনকি তার পাকস্থলীও এমন কোন বস্তু গ্রহণ করতে

---

১. কানযুল উম্মাল (উদ্ধৃতি) মুসনাদে আহমদ ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৫।

www.pathagar.com

পারত না, যার সাথে অপবিত্রতার সংমিশ্রণ রয়েছে। একদা হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি গোলাম তাকে একটি জিনিস দেয়, এবং তিনি তা খেয়ে ফেলেন। পরে গোলাম বলে, "আপনি কি জানেন এটা কি জিনিস ছিল?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কি জিনিস?" সে জবাবে বলে আমি জাহেলি যুগে মিথ্যা ভাগ্য গণনার কাজ করতাম। এই জিনিস ঐ কাজেরই বিনিময়। এটা শুনেই হযরত আবূ বকর (রা) বমি করে পেটে যা কিছু ছিল বের করে[১] ফেলেন।

একবার হযরত আবূ বকর (রা) আঁ-হযরত (সা) ও অন্যান্যদের সাথে সফর করছিলেন পথিমধ্যে এক জায়াগায় তাদেরকে অবস্থান করতে হয়। তাদের এক একজন স্থানীয় এক একজন লোকের বাড়ীতে অবস্থান করেন। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও অন্যান্যদের সাথে এক আরবীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাদের সাথে অন্য একজন আরবীও ছিল। মেজবানের স্ত্রী গর্ভবর্তী ছিল। এই আরবী মেজবানের স্ত্রীর সাথে শর্ত করেন যে, যদি সে তাদেরকে বকরীর গোশ্ত পরিবেশন করে তাহলে তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হবে। মহিলা এই শর্ত মেনে নিয়ে বকরী যবেহ্ করেন। অতঃপর উক্ত আরবী কিছু আজে বাজে ছন্দ বাক্য উচ্চারণ করে। বকরীর গোশত খাওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) যখন সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন সাথে সাথে পেটের সব গোশত বমি করে ফেলে[২] দেন।

চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়াহ্ ও পবিত্রতার কারণে যেভাবে হযরত আবূ বকর (রা) এর পাকস্থলী কোন অবৈধ বস্তু গ্রহণ করত না তেমনি তিনি এমন পথেও চলতেন না যে পথ দিয়ে ফাসিক ও দুষ্কৃতিকারীরা চলাফেরা করে। একবার এক ব্যক্তি এমন একটি রাস্তা দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল যা তার চেনা ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করেন এটা কোন রাস্তা? ঐ ব্যক্তি বললো, এই রাস্তার পাশে এমন লোকজন বাস করে যাদের নিকট দিয়ে গমন করতেও আমি লজ্জা বোধ করি। হযরত আবূ বকর (রা) তখন বলেন, এই পথে চলতে লজ্জা কর অথচ চলছ তুমি যাও, আমি যাব না।[৩]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাকওয়ার প্রভাব তাঁর পরিবারের মহিলারাও মুত্তাকী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্ত্রী (হযরত আসমা (রা)-এর মা) ইসলাম গ্রহণ না করায় তিনি তাঁকে তালাক দেন। একবার স্নেহের বশবর্তী হয়ে মা মেয়ের জন্য কিছু খাদ্য তুহ্ফা হিসেবে নিয়ে আসেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করায় জিনিসটি সন্দেহজনক হওয়ার কারণে হযরত আসমা (রা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে হযরত আয়েশা (রা) হুযূর (সা)-এর নিকট এ সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে হুযূর (সা) তা গ্রহণ করতে অনুমতি প্রদান করেন।[৪]

---

১. সহীহ্ বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৪২।
২. মুসনাদে আহমদ : ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৫১।
৩. কানযুল উম্মাল : ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৪৭।
৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তাযকিরায়ে হযরত সা'দ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ভীতি

رأس الحكمة مخافة الله

তাকওয়াহ্ পবিত্রতা এবং সকল নেকীর মূল হলো আল্লাহ্র ভয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় এত প্রবল ছিল যে, একবার একটি চড়ুই পাখীকে একটি বৃক্ষের উপর বসা দেখে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে চড়ুই, তুমি কতই না সৌভাগ্যবান! আমি যদি তোমার মত হতাম, তাহলে বৃক্ষের উপর বসতাম, ফল খেতাম, তারপর যথা ইচ্ছা উড়ে যেতাম। তোমার কোন হিসেব নেই। হায় আমি যদি রাস্তার একটি বৃক্ষ হতাম, সেখান দিয়ে একটি উট আসত আমাকে মুকে নিয়ে চিবাত, হযম করত, অতঃপর বিষ্ঠা হিসেবে বের করে ফেলে দিত! এ সব কিছুই হত এবং আমি মানুষ না হতাম।[১]

অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ

আল্লাহ্র ভয় তার অন্তরে এত প্রবল ছিল যে, কখনো কোন সাধারণ ভুল হয়ে গেলেও তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিবিধান না করতেন, শান্তি পেতেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব আসলামীর মধ্যে একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। হযরত আবূ বকর (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে কিছু কটু কথা বলেন। পরে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরে হযরত রাবিয়া (রা)-কে বলেন 'তুমিও এরূপ কটূ কথা বলে আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" কিন্তু হযরত রাবীয়া (রা) তা করতে অস্বীকার করেন, অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, "যদি তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না কর তাহলে আমি হুযূর (সা)-এর নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব," হযরত রাবীয়া বলেন, আমি কখনো এরূপ করতে পারব না। উপরন্তু তিনি (রাবিয়া) যে জমি নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার দাবীও প্রত্যাহার করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) তা মানলেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর দরবারে রওনা হন। রাবীয়াও তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। রাবীয়ার গোত্রের লোকেরা এটা দেখে রাবীয়ার সাহায্যের জন্য একত্র হল এবং বললো, কি অদ্ভুত ঘটনা! হযরত আবূ বকর (রা)-ই তোমাকে কটু কথা বললেন, আবার তিনিই হুযূর (সা)এর নিকট অভিযোগ করার জন্য যাচ্ছেন। রাবীয়া বললেন, চুপ থাক, তোমরা জাননা ইনি কে। ইনি হলেন হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর সাওর পর্বতের গুহার সাথী। তিনি পিছন ফিরে তোমাদেরকে দেখলে রাগান্বিত হবেন। এর ফলে হুযূর (সা) রাগান্বিত হতে পারেন। আর এ দু'জনের ক্রোধের কারণে আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে রাবীয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এই সমস্ত লোক ফিরে চলে যায়। তখন হযরত আবূ বকর

১. কানযুল উম্মাল ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬১।

www.pathagar.com

(রা) হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর (সা) যখন হযরত রাবীয়ার নিকট হতে ঘটনা শুনেন তখন রাবীয়াকে বললেন, তুমি হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতিবাদে তাঁকে একই ধরনের কটুকথা না বলে উত্তম করেছ।' হ্যাঁ তবে এখন বল, হে আবূ বকর (রা), 'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।' হযরত রাবীয়া (রা), হুযূর (সা)-এর এই নির্দেশ পালন করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং এই অবস্থায়ই সেখান থেকে ফিরে[১] আসেন।

এমনিভাবে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে একবার তাঁর কিছু কটু কথাবার্তা হয় এবং তিনি হযরত ওমর (রা)-কে কিছু অবাঞ্ছিত কথা বলেন। পরে তিনি এটা উপলব্ধি করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং হযরত ওমর (রা)-কে বলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হযরত ওমর (রা) তা অস্বীকার করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) তার লুঙ্গীর এক কোনা টেনে ধরে হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন হুযূর (সা) তিনবার বললেন, "আবূ বকর আল্লাহ্ তোমার ত্রুটি ক্ষমা করুন।" তখন হযরত ওমর (রা) অনুতপ্ত হন এবং দ্রুত হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়ী গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাকে পান নি, তাই সোজা হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। হযরত ওমর (রা)-কে দেখেই হুযূর (সা)-এর পবিত্র চেহারা রাগে টগবগ করতে থাকে। এতে হযরত ওমর (রা)-এর কোন প্রকার শাস্তি পতিত হতে পারে—এই ভয়ে হযরত আবূ বকর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে হুযূর (সা)-এর নিকট অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেন, "হে রাসূল (সা)! আল্লাহ্র শপথ, অপরাধ আমিই করেছি।[২]

একবার কোন কারণে তিনি তাঁর কোন একজন গোলামের উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ দেন। হুযূর (সা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেন, "হে আবূ বকর, সিদ্দীকীন ও লা'আন্নীন (সত্যবাদী ও অভিশাপকারী) কখনো একত্র হতে পারে না।" হযরত আবূ বকর (রা) এটা শুনেই কাফফারা হিসেবে কয়েকজন গোলাম আযাদ করেন এবং আরয করেন, "আমি কখনো এরূপ[৩] করব না।" মানুষ হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর এ ধরনের কোন ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হতেন। একবার হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে দেখেন তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে টানছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন আপনি এরূপ করবেন না। হযরত আবূ বকর (রা)বলেন, "এই জিহ্বা আমাকে ধ্বংস করেছে।"[৪]

---

১. মুসনাদে আহমদ : ৪র্থঃ পৃঃ ৫৯।

২. সহীহ্ বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫১৬।

৩. الأدب المفرد باب من لعن عبده فأعتقه

৪. موطأ إمام مالك ما جاء فيما يخاف من النسيان

www.pathagar.com

সংসারের প্রতি উদাসীনতা

আল্লাহ্ ভীতি ও তাকওয়ার কারণে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার ক্ষণ স্থায়িত্বের ধারণা দৃঢ় মূল হয় এবং দুনিয়া ও সংসারের প্রতি উদাসীনতা জন্মে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মুসলমানরা জয় করে। এতদসত্ত্বেও তার উদাসীনতার অবস্থা ছিল এই যে, একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন। লোকজন পানির সাথে মধু মিশ্রিত করে পেশ করে। তিনি পেয়ালা মুখে তুলেন এবং সংগে সংগে তা নামিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের উপর এর এমনি প্রভাব পড়লো যে, তারাও ক্রন্দন করতে থাকে। তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ হলেন এবং পুনরায় ক্রন্দন করতে থাকেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি একদিন হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমি দেখি তিনি কাউকে 'দূর দূর' বলছেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল আপনি কাকে 'দূর দূর' বলছেন ? আমি তো এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হুযূর (সা) ইরশাদ করেন, দুনিয়া আমার সামনে মূর্তিমান হয়ে এসেছে। আমি তাকে আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। কিন্তু দ্বিতীয়বার এসে আমাকে বলে, "আপনি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন কিন্তু আপনার পর যারা আগমন করবে তারা মুক্তি পাবে না"। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, এখন ঐ ঘটনাটিই আমার মনে পড়েছে এবং আমার ভয় হচ্ছে না জানি আমাকে সেটা গ্রাস[১] করে ফেলে।

হযরত রাফি ইবনে আবি রাফি' বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তাঁর নিকট একটি ফদাকী জামা ছিল। আমরা যখন কোথাও তাঁবু স্থাপন করেছি তখন উভয়েই তা ব্যবহার করেছি।[২] এক বার তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কে নসীহত করে বলেন,[৩]

فرعن الشرف يتبعك الشرف وأحرص على الموت توهب لك الحياة

"সম্মান ও মর্যাদা হতে যদি পলায়ন কর তা হলে মর্যাদাই তোমাকে অনুসরণ করবে। আর যদি মৃত্যু কামনা কর তাহলে তোমার হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হবে"।

বিনয় ও সরলতা

হযরত আবূ বকর (রা) যদিও একজন মর্যাদাবান খলীফা ছিলেন, তবু তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের ব্যক্তিগত সাধারণ প্রয়োজন মিটাতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এবং তিনি অত্যন্ত গোপনে এ ধরনের কাজ করতে আনন্দ অনুভব করতেন। মদীনায় একজন অন্ধ মহিলার ব্যক্তিগত কাজ কর্ম হযরত ওমর (রা) করে দিতেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি অবগত হন যে, তাঁর পূর্বেই অন্য-এক ব্যক্তি এসে তার সমস্ত কাজ করে দিয়ে যায়। তখন তিনি ঐ ব্যক্তি কে, তা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে

---

১. উসদুলগাবাহ ঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ২১৭।
২. ইযালাতুল খাফাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২২।
৩. আল ইকদুল ফরীদ ঃ পৃঃ ৩।

www.pathagar.com

উঠেন। এক রাতে তিনি ধারে কাছে কোথাও গোপনে ওৎ পেতে বসে থাকেন এবং তিনি এই দেখে আশ্চর্য হন যে, স্বয়ং খলীফা আবূ বকর (রা)-ই ঐ মহিলার ঘরে এসে তার সমস্ত কাজ করে দিয়ে যাচ্ছেন।[১]

মসনদে খিলাফত আরোহণ করার পূর্বে তিনি মহল্লার বালিকাদের বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। খলীফা হওয়ার পর একজন কোমলমতি বালিকার চিন্তা হলো, 'এখন আমাদের বকরীর দুধ কে দোহন করে দেবে? হযরত আবূ বকর (রা) তা অবগত হয়ে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এখনো বকরী দোহন করব। খিলাফত আমাকে জনসেবা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।[২]

খিলাফতের পূর্বে ব্যবসাই ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবিকার উপায়। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার কিছু দিন পরও তার এই পেশা ছিল। একদিন পূর্বের নিয়মানুযায়ী কাঁধে কাপড়ের থান নিয়ে তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা বলেন, খলীফাই রাসূল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বলেন, বাজারে যাচ্ছি। তারা বলেন, এখন আপনি মুসলমানদের নেতা। চলুন আমরা আপনার ভাতা নির্ধারণ করে দেব।[৩] কিন্তু অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) কিছুদিন ব্যবসা অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, এর দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা থাকে না এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তখন তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনানুযায়ী নিজের ভাতা নির্ধারণ করে নেন।[৪]

বিনয়ের চূড়ান্ত অবস্থা ছিল এই যে, লোকজন যখন খলীফায়ে রাসূল হিসেবে তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করত তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে করতেন এবং বলতেন, 'তোমরা আমাকে এত উচ্চে পৌছিয়ে দিয়েছ।' যখন কেউ তার প্রশংসা করত তখন তিনি বলতেন 'হে আল্লাহ্' তুমি আমাকে এ সমস্ত লোক যেরূপ ধারণা করছে ঠিক সেরূপ বানিয়ে দাও, আমার গুনাহ্ মার্জনা কর এবং লোকদের অমূল্য প্রশংসার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না।[৫]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি অহংকারের কোন আলামত তার থেকে প্রকাশ পেয়ে যেত তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। একবার আঁ-হযরত (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকারের সাথে মাটিতে ছড়িয়ে চলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। হযরত আবূ বকর (রা) তখন বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কাপড়ের একটি কোণা কোন কোন সময় মাটিতে ঝুলে যায়। হুযূর (সা) বলেন, তুমিতো অহংকারের সাথে এটা করো না।[৬]

---

১. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯০।
২. তাবাকাতে ইবনে 'সাদ' তাযকিয়ায়ে হযরত আবূ বকর (রা) এবং ইবনে আসীরঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯১।
৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ তাযকিয়ায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।
৪. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯১।
৫. ইসদুল গাবা : ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ২১৭।
৬. সহীহ বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫১৭।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত স্বার্থ

অপরের সাধারণ কাজ করে দিতে যদিও হযরত আবূ বকর (রা) লজ্জাবোধ করতেন না, কিন্তু অপরের দ্বারা নিজের কোন কাজ করানোকে তিনি অপছন্দ করতেন না। ইবনে আবি মালিকা বর্ণনা করেন, কোন সময় চলতে চলতে যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত থেকে উটের লাগাম ছুটে পড়ে যেত তখন তিনি উট থামিয়ে লাগাম তুলে নিতেন। একবার লোকজন বলল, "আপনি কেন এত কষ্ট করেন। নির্দেশ দিলে আমরাই তো উঠিয়ে দিতে পারি।" তিনি তখন বলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাসূল (সা) আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি লোকদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন না করি।[১]

ফকিরী ও দরবেশী

হযরত আবূ বকর (রা) বায়তুলমাল হতে ভাতা গ্রহণ করতেন, কিন্তু ভাতার পরিমাণ কি ছিল তা নিম্নের একটি ঘটনার দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাবে। একবার তাঁর স্ত্রীর হালুয়া খাওয়ার সাধ জাগলো। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা স্বামীকে জানালে তিনি উত্তরে বললেন, সে পরিমাণ সামর্থ্য আমার নেই। স্ত্রী বলেন, আচ্ছা! আপনি প্রতি দিনের খরচের জন্য আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন এখন থেকে আমি কিছু করে সঞ্চয় করে হালুয়ার মূল্য সংগ্রহ করব। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, 'আচ্ছা তা কর।' কয়েক দিনের মধ্যে হালুয়ার পয়সা সংগৃহীত হয়ে গেল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, জানতে পারলাম, কিছু পয়সা হ্রাস করলেও আমাদের প্রতি দিনের ব্যয় হতে পারে, অতএব প্রতিদিন তুমি যে অর্থ জমা কর, সে পরিমাণ অর্থ এখন থেকে কম দেয়া হবে। আর তুমি ইতিমধ্যে হালুয়ার জন্য যে, অর্থ জমা করেছ তা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দাও।[২]

আল্লাহ্র পথে ব্যয়

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট চল্লিশ হাযার দিরহাম জমা ছিল, কিন্তু মদীনা পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচ হাযার অবশিষ্ট রইল এবং তাও তিনি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেন। এখানে হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে তিনি ব্যবসা শুরু করেন এবং তা থেকে যা কিছু আয় হয়, গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় তার সব কিছুই হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির করেন। এবং পরবারবর্গের জন্য আপন ঘরে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে আসেন। এ সমস্ত ঘটনাবলী ছিল খিলাফতের পূর্বেকার। কিন্তু খলীফা হওয়ার সাথে সাথে তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করেন। মৃত্যু-রোগের সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন, খলীফা হওয়ার পর আমি মুসলমানদের না কোন দিরহাম খেয়েছি, আর না দিনার, তারা যা আহার করত, যা পরিধান করত আমিও শুধু তাই আহার করেছি ও পরিধান করেছি। এখন আমার সম্পদের মধ্যে

---

১. মুসনাদে আহমদ : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৯১।
২. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯১।

www.pathagar.com

রয়েছে একটি উট, একটি গোলাম ও একটি চাদর।[১] নিজে কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন কিন্তু দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি এত খেয়াল ছিল যে, শীতকালে কাপড় ক্রয়[২] করে তাদের মধ্যে বণ্টন করতেন।

বীরত্ব ও সাহসিকতা

বীরত্ব এমন একটি গুণ যা দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং বিনয়ের সাথে খুব কমই একত্র হয়ে থাকে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যেন ছিলেন কুরআনে বর্ণিত

أشداء على الكفار رحماء بينهم -

"এই গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি। শিশিরের কোমলতার সাথে সূর্যের প্রখরতা এবং শিশিরের কমনীয়তার সাথে পাথরের কঠোরতার মত হযরত আবূ বকর (রা) কোমলতার সাথে বীরত্বেরও অধিকারী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আকীল বর্ণনা করেন, একবার হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) খুতবা প্রদানের সময় জিজ্ঞেস করেন, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ বীর কে? আমরা বললাম, আপনি। তিনি বললেন, না। শ্রেষ্ঠবীর ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। গাযওয়ায়ে বদরের সময় আমরা হুযূর (সা)-এর অবস্থানের জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করেছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই তাঁবু পাহারার দায়িত্ব কে বহন করবে? তখন কেউ অগ্রসর হল না একমাত্র হযরত আবূ বকর (রা) অগ্রসর হন এবং হাতে তরবারি নিয়ে এমনভাবে হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন, যেন কোন শত্রু এদিকে আসলে সাথে সাথে তার উপর আক্রমণ করবেন। এমনিভাবে একদিন মক্কায় কুরাইশরা হুযূর (সা)-কে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতে লাগল। ঐ সময়ও হযরত আবূ বকর (রা) একাকী ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে থাপ্পর মেরে, কাউকে লাথি মেরে, কাউকে পিটিয়ে অবশেষে বলেন, 'হে অত্যাচারীর দল! তোমরা কি এমনি একজন লোককে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্। এভাবে তিনি হুযূর (সা)-কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রা) এতটুকু বলে এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে যায়।[৩]

সহনশীলতা ও নম্রতা

বিরত্বের সাথে সহনশীলতাও থাকা প্রয়োজন। একবার জনৈক ব্যক্তি হুযূর (সা) এবং কিছু সংখ্যক সাহাবা কিরামের সামনে হযরত আবূ বকর (রা)-কে গালি-গালাজ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। ঐ ব্যক্তিটি দ্বিতীয় বারও ঐ একই ধরনের আচরণ করে। এবারও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। কিন্তু তৃতীয়বারও যখন লোকটি একই আচরণ করে তখন তিনি উত্তর দেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর জবাব শুনে হুযূর (সা) সেখান থেকে প্রস্থান করেন। হুযূর (সা)-এর মনস্তুষ্টির দিকে তাঁর যথেষ্ট খেয়াল ছিল। ভাবলেন হুযূর (সা) এতে অসন্তুষ্ট হননি তো? তাই আরম্ভ করলেন,

---

১. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯০।
২. ইবনে আসীর : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯০।
৩. কানযুল উম্মাল : ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৫৯।

www.pathagar.com

أوجدت علي يا رسول الله -

(হে আল্লাহর রাসুল (সা) আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন) তখন হুযূর (সা) ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তি যখন তোমাকে অন্যায়ভাবে কিছু বলছিল তখন আকাশ থেকে একজন ফিরিশ্তা নাযিল হয়ে স্বয়ং তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করছিল। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছ তখন মধ্যখানে শয়তান এসে হাযির হল। অতঃপর আমার জন্য সেখানে থাকা সমীচীন ছিল না যেখানে শয়তান অবস্থান[১] করছে।

হযরত আবূ বারয়াহ্ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে এক ব্যক্তি মুখের উপর তাকে কটূ কথা বলে। এতে একজন সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন, একমাত্র হুযূর (সা)-এর সাথে অভদ্র আচরণকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করা জায়েয নয়।

উত্তম চরিত্র

উত্তম চরিত্র ইসলামী আখলাকের মূল। হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্রের চেয়ে অধিক ওযনের আর কিছু হবে না। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবেচেয় উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সব চেয়ে উত্তম। উত্তম চরিত্রের প্রথম নিদর্শন হলো সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময়। এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নীতি ছিল এই যে, তিনি সর্বাগ্রে সালাম করতেন। যদি কেউ সালামের জবাবে আরো কিছু বৃদ্ধি করত তখন তিনি আরো বৃদ্ধি করে পুনরায় তাকে সালাম করতেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, একদিন আমি ও হযরত আবূ বকর (রা) একই বাহনে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথে কয়েকজন লোকের সাথে দেখা হলে হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন । السلام عليكم ঐ লোকগুলো উত্তরে বললো السلام عليكم ورحمة الله এবার হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, السلام عليكم ورحمة الله তখন ঐ লোকগুলো বললো السلام عليكم ورحمة الله وبركاته অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আজ এই লোকগুলো আমাকে হারিয়ে[২] দিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, একবার একটি বিবাদ মীমাংসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে আমার সাথে প্রেরণ করেন। পথে লোকজন প্রথমে আমাকে সালাম করতে থাকে। এটা লক্ষ্য করে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, তুমি কি দেখ না যে, লোকেরা তোমাকে সর্বাগ্রে সালাম দিয়ে সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। তুমি অগ্রগামী হও তা হলে তুমিও সওয়াবের অধিকারী হতে[৩] পারবে।

---

১. سنن أبي داود كتاب الأدب باب في الانتصار

২. الأدب المفرد ص ١٤٥ باب فضل السلام

৩. الأدب المفرد باب من بدأ بالسلام

www.pathagar.com

উত্তম চরিত্রের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, অন্যের বিপদ-আপদে সমবেদনা প্রকাশ করা। হযরত আবূ বকর (রা)-এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সুহায়ল নামক একজন কুরাইশী গাযওয়ায়ে বদরে কাফিরদের পক্ষ হয়ে আগমন করে, কিন্তু এখানে এসে আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করে। হজ্জের সময় তার পিতা সুহায়ল ইবনে আমরের সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দেখা হয় তখন তিনি তার পুত্রের শাহাদাতে সমবেদনা জ্ঞাপন[১] করেন।

অন্যের দোষ-ক্রটি গোপন রাখাও উন্নত চরিত্রাবলীর অন্যতম। এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, একবার তিনি বলেন, "যদি আমি চোর ধরি তাহলেও আমার কামনা হয় যেন আল্লাহ্ তার অপরাধ গোপন[২] করেন।

কিন্তু যেখানে সৎকাজের আদেশ দেয়ার প্রয়োজন সেখানে কোমলতার কোন অর্থ হয় না। সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। একবার সাহাবায়ে কিরাম কোন একটি জানাযার সাথে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলো। হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে হাযির হয়ে বলেন, "আমরা হুযুর (সা)-এর সাথে জানাযায় দ্রুতগতিতে গমন[৩] করেছি।

ব্যঙ্গ ও কৌতুক

সামান্য ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রফুল্লচিত্ততার প্রমাণ বহন করে। হুযূর (সা)-এর ব্যঙ্গ কৌতুকের বিভিন্ন ঘটনা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, রাসূল (সা)-এর খলীফার মধ্যে এই গুণ থাকবে না। একদিন তিনি মসজিদে নববীতে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় শিশু হযরত ইমাম (রা)-কে মহল্লার অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করতে দেখেন। হযরত আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর কলিজার টুকরাকে স্নেহের আতিশয্যে কোলে তুলে নেন এবং সেখানে অবস্থানরত হযরত আলী (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

يا بأبي شبه النبي ﷺ ليس شبيها بعلي -[৪]

"হে মানুষ যে নবী সদৃশ এবং আলী সদৃশ আপনার উপর আমার পিতা উৎসর্গ হোক।" হযরত আলী (রা) এটা শুনে হেসে ফেলেন।

আত্ম-সমালোচনা

হযরত আবূ বকর (রা) যা কিছু করতেন তা একজন পরীক্ষকের মত নিজেই পরীক্ষা করতেন। মৃত্যু রোগের সময় তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর নিকট বলেন, "কোন বিষয়ে আমার দুঃখ নেই। অবশ্য তিনটি কাজ আমি করেছি। হায়, যদি আমি তা না করতাম, তিনটি কাজ আমি করিনি। হায়, যদি আমি তা করতাম। তিনটি কথা এমন

---

১. ফুতুহুল বুলদান : বালাযুরী : পৃঃ ৯২।

২. ابن سعد تذكرة زيد بن الصلت

৩. أبو داود كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنائز

৪. সহীহ বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৩০।

www.pathagar.com

আছে, যদি আমি হুযূর (সা)-এর নিকট তা জিজ্ঞেস করতাম। প্রথম তিনটি বিষয়ের মধ্যে আবূ বকর একটির উল্লেখ করেনি। অবশিষ্ট দু'টি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন, "আমার কামনা ছিল, যদি সাকীফায়ে বনী সায়েদা হযরত ওমর (রা) অথবা আবূ উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্কে খলীফা নির্বাচিত করে আমি তাদের উজির হতাম। দ্বিতীয় বিষয় হলো, যখন আমি হযরত খালিদ (রা)-কে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছি তখন আমি নিজে যদি জুল কিসসায় অবস্থান করতাম। দ্বিতীয় প্রকার তিনটি বিষয় হলো, আশ'আঁস ইবনে কায়েস যখন গ্রেফতার হয়ে আসে তখন যদি তাকে হত্যা করে ফেলতাম। আল-ফাজায়াদেরকে আমি জীবিত আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি। হায়! যদি এরূপ না করে তাদের হত্যা করে ফেলতাম অথবা মুক্ত করে দিতাম। হযরত খালিদ (রা)-কে যখন আমি সিরিয়ায় প্রেরণ করেছি তখন হযরত ওমর (রা)-কে যদি ইরাকে প্রেরণ করতাম। এমনিভাবে আল্লাহ্র পথে আমি ডান বাম উভয় হাতই প্রসারিত করতাম। অবশিষ্ট রইল ঐ তিনটি বিষয়, যা আমি যদি রাসূল (সা)-এর জিজ্ঞেস করতাম। এর মধ্যে একটি হলো, খিলাফতের বিষয়। দ্বিতয়টি হলো আনসারদের কি এতে কোন অংশ রয়েছে। তৃতীয় হলো, পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ফুফী ও ভাতিজির কত অংশ[১] রয়েছে?

প্রকৃষ্টতা ও গুণাবলী

হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রকৃষ্টতা ও গুণাবলীর উৎস নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. কুরআন মজীদ

২. হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর বিশেষ উক্তি অথবা হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হযরত ওমর (রা) অথবা বিশেষভাবে অন্য কোন সাহাবী অথবা সাধারণভাবে মুহাজিরদের সম্পর্কে উক্তি।

৩. হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনা ও উক্তি।

ইতিপূর্বে খিলাফত অধ্যায়ে উপরোক্ত তিনটি উৎসের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ফযীলত ও প্রকৃষ্টতার শ্রেষ্ঠতম দলীল হলো দু'টি।

১. প্রথমত কুরআন মজীদে যে রূপ অধিক হারে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশেষ আমল যেমন – হুযূর (সা)-এর আনীত ও প্রচারিত যাবতীয় বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় (إنفاق في سبيل الله) এবং নবীর সাথে বন্ধুত্ব - এর উল্লেখ রয়েছে সেরূপ অন্য কারোই নেই।

২. দ্বিতীয়ত আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে সম্পর্ক ছিল এবং হুযূর (সা)-এর উপর তার যে ধরনের নির্ভরতা ছিল তা অন্য কারো সাথে অন্য কারো উপর ছিল না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের কিতাবুল মানাকিবে এ সম্পর্কে অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ

---

১. কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দা ঃ পৃঃ ১৩১। এই রিওয়ায়েতের উল্লেখ্য ইবনে জারীর তাবারী ঃ ৪র্থ খণ্ডেরঃ ৫২ পৃষ্ঠায় (পুরাতন সংস্করণে) রয়েছে। তবে বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

ফযীলত ও মর্যাদা, যা অন্যান্য সকল মর্যাদার উর্ধ্বে, তা হলো এই যে, আঁ-হযরত (সা) তাকে সিদ্দীক উপাধী প্রদান করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

সিদ্দীকিয়ত-এর অবস্থান ও মর্যাদা

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফ-ই-সানী-(রহঃ) তাঁর বিভিন্ন লেখায় সিদ্দীকিয়তের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন, সুলূক ও মা'রিফাতের (سلوك ومعرفت) অনেক সোপান রয়েছে। যেমন বিলায়েত শাহাদাত ইত্যাদি। এর মধ্যে উচ্চতম সোপান হলো সিদ্দীকিয়ত। সিদ্দীকিয়ত ও নবূওতের মধ্যখানে আর কোন সোপান নেই।

মা'রিফাতের অধিকারী কোন কোন বুযুর্গের মতে, সিদ্দীকিয়ত صديقيت এর উপরেও একটি সোপান রয়েছে যার নাম কুরবত قربت এটা সিদ্দীকিয়ত ও নবূওতের মধ্যবর্তী সোপান। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব এটা খণ্ডন করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে সেটা হচ্ছে উলুম ও মা'আরিফ علوم ومعارف আর যে উলুম বা জ্ঞান বাহ্যিক বা প্রমাণ সাপেক্ষ তা হচ্ছে উলুমে শরীয়ত। আর যে ইলম কাশফী ও বাস্তব তা হচ্ছে উলুমে সুলুক ও মারিফাত علوم سلوك ومعرفت এর মধ্যে সুলুকের মর্যাদা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এর নামই সিদ্দীকিয়ত এর পরবর্তী মুকাম (مقام) হচ্ছে নবুওত। একজন পয়গাম্বর তাঁর ওহীর মাধ্যমে যে বাস্তবতার (حقائق) জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা অন্যের নিকট পৌছান, একজন সিদ্দীক নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করতে পারে। নবী বর্ণিত হকীকত (বাস্তবতা) যতই বিবেক ও ধারণা বহির্ভূত হোক না কেন, তা সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর চোখে নিতান্তই বাস্তব এবং শুনামাত্র কবূল করতে[১] তিনি কোন দ্বিধা করেন না।

মুজাদ্দিদ সাহেবের মতে নবূওত ও সিদ্দীকিয়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে প্রমাণ রয়েছে ঃ

وَمَن يُّطِعَ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ والصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقاً (المائدة)

"কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ যাদের অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে ঃ যেমন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।" (সূরা আল-মায়িদা)

এছাড়া বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, একবার আঁ-হযরত (সা) হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে ওহোদ পাহাড়ের উপর চড়েছিলেন। তখন পাহাড়ের উপর কম্পন সৃষ্টি হয়। এটা লক্ষ্য করে হুযূর (সা) বলেন ঃ

أسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان

১. বুখারী ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫২৩. باب مناقب عثمان

www.pathagar.com

অর্থাৎ "হে ওহোদ থাম; কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ রয়েছেন।"

এই হাদীসেও নবী, সিদ্দীক ও শহীদের কথা কুরআন মজীদের বিন্যাস অনুযায়ী বিন্যাসিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে নবীর পর সিদ্দীকের স্থান। মাঝে অন্য কোন স্থান বা প্রতিবন্ধকতা নেই।

হযরত মুজাদ্দিদ (রা) সাহেব এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করেই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'একজন নবী ও একজন সিদ্দীকের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নবীর জ্ঞানের উৎস হল ওহী, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর সিদ্দীকের জ্ঞানের উৎস হলো ইল্‌হাম যা ওহীর মত কে'তয়ী বা (قطعي) বা নিশ্চিত নয়।[১] তবে ইলম ও আমল এবং চরিত্র ও দূরদর্শিতার মধ্যে একজন সিদ্দীকের মধ্যে একজন নবীর আলো সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রা) সাহেব সিদ্দীকিয়ত (صديقيت) এর উপর অত্যন্ত সুন্দর এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেহেতু এই মুকাম (স্থান) অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সামান্য পরিবর্তনের ফলে এতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে তাই আমরা এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে শুধু শাহ্ সাহেবের ভাষণের সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।[২]

তাসাউফ এর মুকাম ও হাল (স্থান ও অবস্থা) কিভাবে সৃষ্টি হয় এ ব্যাপারে শাহ্ সাহেব লিখেছেন ঃ—"যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের উপর এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তার আত্মা ও দেহের সকল অংশে তা অনুপ্রবেশ করে, অতঃপর যে যিকর ও ফিকর (ذكر وفكر) এর মধ্যে মগ্ন হয় এবং বান্দাহ্ হিসেবে অঙ্গ-পতঙ্গের হক আদায় করে ও সর্বদা এই আমল অব্যাহত রাখে তখন এই তিনটি লতীফার (জ্ঞান, কালব ও নফস) মধ্যে দাসত্বের (عبوديت) মূল চেতনা প্রবেশ করে এবং এই তিনটি লতীফা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মূল স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। আর বুদ্ধি বিবেক (عقل) তখন শরীয়তের আহকামের উপর এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যেন, সে তা স্পষ্টভাবে দর্শন করছে। মুকামাত ও আহওয়াল (مقامات وأحوال) জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত তার মধ্যে মূল হলো ইয়াকিন (يقين) ও বিশ্বাস এবং ইয়াকীনের দ্বারা বিভিন্ন মুকামাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন তাওহীদ, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, শুক্‌র (কৃজ্ঞতা) মহব্বত, ভয়, নির্জনবাস সিদ্দীকিয়ত ও মুহাদ্দেসীয়ত ইত্যাদি।"

অতঃপর শাহ্ সাহেব ইয়াকীনের (يقين) বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইয়াকীন এর তৃতীয় স্তর হল সিদ্দীকিয়ত ও মুহাদ্দেসীয়ত (صديقيت ومحدثيت) এ দুটোর বাস্তবতা হলো এই যে, উম্মতের মধ্যে কোন কোন লোক এরূপ হয়ে যায় যে, সে স্বভাবগতভাবে পয়গাম্বরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যদি এই সাদৃশ্য জ্ঞানের সাথে হয় তাহলে তাকে সিদ্দীক ও মুহাদ্দিস বলে। যদি সাদৃশ্য আমলের সাথে হয় তাহলে তাকে শহীদ বা হাওয়ারী (حواري) বলে।

---

১. মাকতুবাত ঃ ২য় খণ্ডঃ

২. শাহ সাহেবের ভাষণের সারাংশ হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ ঃ ২য় খণ্ডের মুবাহিমুল ইহসান নামক অধ্যায় হতে সংকলিত হয়েছে শাহ সাহেব এ বিষয়টি "ইযালাতুল খাফায় বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

সিদ্দীকের আত্মা পয়গাম্বরের কার্যক্রম খুব দ্রুত গ্রহণ করে থাকে। যেমন — গন্ধক খুব দ্রুত আগুনের ক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একজন সিদ্দীক যখন পয়গাম্বরের মুখে কোন কথা শুনে তখন সাথে সাথে তা তার অন্তরে প্রবেশ করে। ফলে এরূপ মনে হয়, যেন কারো আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত নিজে নিজেই সে এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে। হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন আঁ-হযরত (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হত তখন তিনিও হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর গুন্ গুন্ আওয়াজ শুনতে পেতেন। এর দ্বারা মূলত উপরোক্ত কথাটি প্রমণিত হচ্ছে।

এছাড়া সিদ্দীকের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—নবীর উপর যে সত্য বাণী অবতীর্ণ হয় তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তার জান ও মাল উৎসর্গ করে থাকেন। সত্যের প্রতি মহব্বতের কারণে তিনি এর কোন বিষয়েই বিরোধীতা করেন না। হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই বিশেষত্ব এই জন্য ছিল যে, ওহীর আলোকচ্ছটা আঁ-হযরত (সা)-এর পবিত্র আত্মা হতে বিন্দু বিন্দু করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তরে প্রতিবিম্বিত হ'ত। যখন ভাব ও প্রভাব, এবং কাজ ও অনুভূতির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় তখনই আত্মত্যাগ ও উৎসর্গের মুকাম অর্জিত হয়। আবূ বকর (রা)-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

সিদ্দীকের নিদর্শন হলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের জ্ঞান অর্জন করা, কোন মুজিযা ব্যতীত সবার্গ্রে বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ্র মহব্বতে ডুবে থাকা, আল্লাহ্র ভয় ভীতির কারণে ম্রিয়মান হয়ে থাকা। প্রকাশ থাকে যে, এ সমস্ত গুণাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবূ বকর (রা) ব্যতীত কেউই হুযূর (সা)-এর সরাসরি খলীফা হওয়ার দাবীদার হতে পারেন না।[১]

এরপর শাহ সাহেব তাজাল্লীয়াত (تجليات) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কি মুকাম ছিল সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন কিন্তু এই আলোচনাটি যেহেতু অত্যন্ত সূক্ষ্ম সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে না তাই আমরা এখানেই এ সম্পর্কিত আলোচনার ইতি টানছি। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠ ফযীলত ও মর্যাদা হলো তাঁর সিদ্দীক হওয়া এবং আর এই মর্যাদায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সুতরাং হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) যখন তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত কবিতা হুযূর (সা)-এর নির্দেশে আবৃত্তি করেন—

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد + طاف العدو به إذ صعد الجبلا

وكان حب رسول الله قد علموا + من البرية لم يعدل به رجلا

"হযরত আবূ বকর (রা) উঁচু গুহায় (সাওর) দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন। অথচ শত্রুগণ যখন পাহাড়ের উপর চড়ে তখন তিনি তাদেরকে অবরোধ করেন। তিনি হুযূর (সা)-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এটা জানেন যে, এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পৃথিবীতে কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই।"

---

১. হুযাতুল্লাহিল বালিগা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬৮-৭০।

www.pathagar.com

এই কবিতা শুনে হুযূর (সা) আনন্দিত হয়ে এমনভাবে মুচকি হাসেন যে, তার পবিত্র দন্ত দৃষ্টি গোচর হয়। হুযূর (সা) বলেন, হাঁ হাস্‌সান। তুমি সত্য বলেছ! নিঃসন্দেহে হযরত আবূ বকর (রা)[১] এরূপই।

হযরত আবূ বকর (রা) এই মর্যাদাও সাধারণ নয় যে, তাঁর বংশের চারটি স্তর হুযূর (সা)-এর সহচর্য লাভ করেছে। যেমন—(১) হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা হযরত আবূ কুহাফা। (২) হযরত আবূ বকর (রা) (৩) পুত্র হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আবূ বকর (রা) (৪) পৌত্র হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা)।[২]

অগ্রবর্তিতা

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঐ সমস্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অবদানসমূহ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে তিনি সর্বাগ্রে ছিলেন। যেমনঃ

১। পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
২। কুরআন মজীদের নাম তিনি সর্বপ্রথম মুসহাফ রেখেছেন।
৩। কুরআন মজীদ তিনি সর্বাগ্রে সংকলন করেছেন।
৪। তিনি সর্বপ্রথম আঁ-হযরত (সা)-এর সাহায্যের জন্য কুরাইশ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং কঠোর যাতনা ভোগ করেছেন।
৫। তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছেন।
৬। হুযূর (সা)-এর জীবিতকালে তিনিই সর্বপ্রথম হজ্জের নেতৃত্ব প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।
৭। হুযূর (সা) তাকে ইমামতির দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন।
৮। সর্বপ্রথম খলীয়ায়ে রাশীদ হচ্ছেন তিনি। এই উপাধিতে সর্বপ্রথম একেই সম্বোধন করা হয়েছে।
৯। সর্বপ্রথম খলীফা যিনি পিতার জীবিত কালেই খিলাফত লাভ করেন।
১০। সর্বপ্রথম খলীফা যার ভাতা প্রজা ও জনসাধারণ নির্ধারণ করেন।[৩]
১১। তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন।
১২। ইজতিহাদ ও শরীয়তের আহ্‌কাম বের করার জন্য সর্বপ্রথম তিনিই চারটি উসূল বা নীতি (اصول) নির্ধারণ করেন।
১৩। আঁ-হযরত (সা) সর্বপ্রথম তাঁকেই জাহান্নাম হতে মুক্তির সুসংবাদ দেন এবং আতীক (عتيق) উপাধিতে ভূষিত করেন।
১৪। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নবী (আ)-এর দরবার থেকে কোন উপাধি লাভ করেছেন।
১৫। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছেন — البلاء موكل بالمنطق

---

১. ইবনে শা'দ ঃ ৫ম খণ্ডঃ পৃঃ ৭।
২. الاستيعاب تذكرة محمد بن عبد الرحمن
৩. ইবনে আসীর ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৯১।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত অবস্থা ও জীবনচরিত

আকৃতি

হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হযরত আবূ বকর (রা)-এর আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

"তিনি ফর্সা ও হালকা পাতলা ছিলেন। উভয় গণ্ডদেশ পুরো ছিল, কোমর সামান্য বক্র ছিল। লুঙ্গি কোমরের উপর থাকত না। নীচে ঝুলে যেত। মুখ-মণ্ডলের হাড় দেখা যেত। চক্ষু ছিল কোটরাগত। কপাল উচ্চ ছিল। আঙ্গুলের জোড়া গোশত শূন্য এবং পায়ের গোছা ও রান গোশত পূর্ণ ছিল। দেহের উচ্চতা মধ্যম ছিল। মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করতেন।[২]

পোশাক ও খাদ্য

হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত সরল ছিলেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন। তার আহার ও খাদ্য অতি সাধারণ ছিল। কোন কোন সময় অভুক্ত থাকতেন। একবার হুযূর (সা) তাঁকে এবং হযরত ওমর (রা)-কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদে দেখতে পেয়ে বললেন, আমিও তোমাদের মত ক্ষুধার্ত। হযরত আবুল হাইসম এটা জানতে পেরে সকলের আহারের ব্যবস্থা করেন।

জীবিকার উপায়

ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান উপায়। এছাড়া আঁ-হযরত (সা) খায়বারে তাঁকে একটি জায়গীর প্রদান করেছিলেন। বাহরাইনেও তিনি একটি জায়গা পেয়েছিলেন। মদীনার পার্শ্বে বনু নযীরের সম্পদের মধ্যে "হাযার" নামক একটি কুপ ছিল। হুযূর (সা) তাঁকে সেটা দান করেছিলেন। তিনি এটা সংস্কার করে খেজুর বৃক্ষ রোপন করেন। অতঃপর এটা হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন। এমনিভাবে বাহরাইনের জায়গীরও তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে হিবাহ (هبه) করে দেন। কিন্তু ইন্তিকালের সময় তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন যাতে অন্য ছেলেমেয়েদের অধিকার খর্ব না[১] হয়।

খিলাফতের ভাতা

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর লোকজন তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দেন। এর পরিমাণ কি ছিল সে সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। ইবনে সা'দ বিভিন্ন রিওয়ায়েতসহ ঐ সমস্ত মত পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে ঐ সমস্ত রিওয়ায়েতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাতা বাৎসরিক দু'হাযার দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয় না তখন তাঁর ভাতা আরো বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিজয়ের কারণে ইসলামী সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যখন উন্নত হতে থাকে তখন তাঁর ভাতার পরিমাণও ক্রমশ ছয় হাযার দিরহামে উন্নীত হয়। পরিধানের জন্য তাঁকে দু'টি চাদর প্রদান করা হ'ত। পুরাতন হয়ে গেলে তা ফেরৎ নিয়ে নতুন দু'টি দেয়া

---

২. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১৫।

১. الاستيعاب تذكره أسماء بنت عميس

www.pathagar.com

হ'ত। যখন ভ্রমণে যেতেন তখন বাহন ও পরিবারবর্গের খরচের জন্য তিনি সেই পরিমাণ অর্থ পেতেন যা তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে এ কাজে ব্যয় করতেন।[১]

খলীফা হওয়ার পরবর্তী জীবন-পদ্ধতি

হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মদীনার নিকটবর্তী "সুনাহ্" নামক স্থানে স্বীয় স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনতে খারিজাহ্কে নিয়ে বাস করতেন। বায়'আতের পরও তিনি ছয় মাস সেখানে বাস করেন। এ সময় সকালে কখনো পদব্রজে আবার কখনো ঘোড়ার চড়ে তিনি মদীনায় আগমন করতেন। গেরুয়া রং-এর লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করতেন। সম্পূর্ণ দিন মদীনায় কাটাতেন। এবং নামাযের ইমামতি করতেন। যখন তিনি উপস্থিত না থাকতেন তখন হযরত ওমর (রা) নামাযের ইমামতি করতেন।[২] ছয় মাস এভাবে কাটানো পর তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

ইবাদত

এত বিনয়ের সাথে নামায আদায় করতেন যে, নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় মনে হত একটি সোজা কাঠের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।[৩]

জনগণের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি

আল্লাহ্র অধিকার ব্যতীত জনগণের অধিকারের প্রতিও তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একবার রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামদের নিকট জিজ্ঞেস করেন, আজ তোমাদের মধ্যে রোযাদার কে আছে ? হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, "আমি, হে আল্লাহ্র রাসূল" এরপর হুযূর (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে জানাযার অনুসরণ বা পশ্চাদ্ধাবণ করেছ? তোমাদের মধ্যে আজ কে মিসকীনকে আহার দিয়েছ? কে রোগীর সেবা করেছ? যে ব্যক্তি এই সব প্রশ্নের হাঁ সূচক জবাব দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একমাত্র হযরত আবূ বকর (রা)। হুযূর (সা) এটা শুনে ইরশাদ করেন, যিনি একদিনে এগুলো নেককাজ করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন।[৪]

অন্তরের কোমলতা

হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর কোমল ছিল। যখন তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন তখন গণ্ড দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। তিনি এমনি ফুফিয়ে ফুফিয়ে ক্রন্দন করতেন যে, যারা সেখানে উপস্থিত থাকত তারাও তার দেখাদেখী ক্রন্দন করতে শুরু করত। দ্বাদশ হিজরীতে যখন তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় গমন করেন তখন মক্কায় হযরত ইকরামা ইবনে আবি জেহেল (রা) এবং আরো কিছু লোক হুযূর (সা) এর শোক প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট আসেন। যখন লোকজন হুযূর (সা)-এর উপর শোক প্রকাশ

---

১. ইবনে সা'দ তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।
২. ইবনে সাদ তাযকিরায়ে হযরত আবূ বকর (রা)।
৩. কানযুল উম্মাল : ৪র্থ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬।
৪. সহীহ মুসলিম : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৪।

www.pathagar.com

করছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) ক্রন্দন করতে থাকেন।[১] কথায় কথায় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করার দরুন তার উপর أَوَّاهٌ مُنِيبٌ হয়ে যায়।

কিভাবে শপথ (قسم) করতেন

হযরত আবূ বকর (রা)-এর কিছু কিছু উক্তি এমন ছিল যার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তার একটি বিশেষ পরিচিত ছিল। যেমন—যদি তিনি শপথ করে বলতে চাইতেন, এটা কখনো হবে না তখন বলতেন—لا ها الله إذا [২]

বৈবাহিক জীবন

তাবারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আবূ বকর (রা) মোট ৪টি বিয়ে করেছিলেন। দু'টি ইসলামের পূর্বে আর দু'টি ইসলাম গ্রহণের পরে। ইসলামের পূর্বে যে সমস্ত মহিলাদের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, তারা হলেন (১) কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা এবং (২) উম্মে রোমান বিনতে আমির ইবনে উমাইয়া। ইসলাম গ্রহণের পর যে মহিলাদের সাথে তার বিয়ে হয় তারা হলেন (১) হযরত আসমা বিনতে উমায়স এবং (২) হাবিবা বিনতে খারিজা।[৩] এরা সবাই মিলে হলেন চার। কিন্তু বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বনু কাল্‌ব গোত্রের "উম্মে বকর" নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু হিজরতের সময় তাকে তালাক প্রদান করেন।[৪]

উম্মে রোমান

কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা এর ইসলাম গ্রহণের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। হাফিয ইবনে হাযার এই মত পেশ করেছেন যে, যদি তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত জীবিত থাকেন তাহলে সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অবশ্য উম্মে রোমানের এই সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল। উম্মে রোমান সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন। সে জাহেলী যুগে মক্কায় আগমন করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিরোধিতা করেছিল। যখন তার মৃত্যু হয় তখন হযরত আবূ বকর (রা) উম্মে রোমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিজরতের সময় হযরত আবূ বকর (রা) তাকে মক্কায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে আবদুল্লাহ্ ইবনে আরিফাতকে পাঠিয়ে তাঁকে মদীনায় নিয়ে যান। উম্মে রোমানের মৃত্যুর বছর সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনে সাদ বলেছেন ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলহজ্জ মাস। কোন কোন মুহাদ্দিস চাঁর বা পাঁচ হিজরীকে তার মৃত্যুর সাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] কিন্তু ইবনে সাদের রিওয়ায়েতই সঠিক। কেননা হাদীসে ইফক-এর মধ্যে উম্মে রোমানের নাম পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এটা ৫ম হিজরীর ঘটনা। হযরত উম্মে রোমানের মর্যাদা এর চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে যে, আঁ-হযরত (সা) যখন তাঁর মৃতদেহ কবরে রাখেন তখন তার

---

১. ইবনে সা'দ তাযকিরায়ে হযরত আবু বকর (রা)।
২. বুখারীর : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৪৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮১।
৩. তাবারী : ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৬১৬, ইবনে আসিরেও তাই রয়েছে।
৪. বুখারী : ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৫৫৮।
৫. ইসাবা : ৪র্থ খণ্ডঃ তাযকিরায়ে উম্মে রোমান।

www.pathagar.com

ক্ষমার জন্য দু'আ করে বলেন, "হে আল্লাহ্! তোমার কাছে তো গোপন নয় যে, উম্মে রোমান তোমার জন্য এবং তোমার নবীর জন্য কি কি যাতনা ভোগ করেছেন।[১]

আসমা বিনতে উমায়স

হযরত আসমা বিনতে উমায়স হলেন 'খাস'আম' গোত্রের। তিনি হুযুর (সা)-এর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত মায়মূনার খালা ছিলেন। তিনি প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর ভাই হযরত জাফর (রা)-এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।

হাবশা হিজরতের নির্দেশ দেয়া হলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে হাবসা হিজরত করেন। হযরত জাফর (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত আবূ বকর (রা) তাকে বিয়ে করেন। একবার হযরত আসমা (রা) হুযুর (সা)-এর নিকট অভিযোগ করেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল, লোকেরা আমাদের নিকট তাদের ফযীলত অধিক বলে গর্ব করে। হুযুর (সা) বলেন, এখন থেকে যদি কেউ এরূপ বলে তাহলে তুমি বলবে, 'তোমরা একবার হিজরত করেছ, পক্ষান্তরে আমার দু'বার হিজরত করার সৌভাগ্য হয়েছে। সম্ভবত একারণেই হযরত আবূ বকর (রা)-তার ফযীলত ও মর্যাদার কথা সর্বদা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন। তিনি ইন্তিকালের সময় হযরত আসমা (রা) কর্তৃক তাঁর জানাযার গোসল দানের জন্য ওসীয়ত করে যান।[২] হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আসমা (রা)-হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৩]

হাবীবা বিনতে খারিজা

হাবীবা বিনতে খারিজা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, মদীনায় হিজরতের পর হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খারিজা বিন যায়েদ-এর সাথে ভ্রাতত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত হাবীবা তাঁরই কন্যা ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বিয়ের পর তাঁকে নিয়ে 'সাখ' নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি আসাফ ইবনে ওতবা ইবনে আমরের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[৪]

সন্তান

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ছয় জন সন্তান ছিলেন। তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে। ছেলেদের নাম হলো, হযরত আবদুর রহমান, হযরত আবদুল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ এবং মেয়েদের নাম হলো, হযরত আসমা, হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে কুলসূম।

হযরত আবদুর রহমান

তিনি হলেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি হযরত উম্মে রোমানের গর্ভজাত সন্তান। গাযওয়ায়ে বদরের সময় মক্কা হতে কুরাইশ কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগমন করেছিলেন। যুদ্ধে অগ্রগামী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার

---

১. ইসাবা ঃ ৪র্থ খণ্ডঃ তাযকিরায়ে উম্মে রোমান।

২. আল ইবাসা ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫-২২৬।

৩. الاستيعاب تذكره محمد بن عبد الرحمن

৪. আল ইবাসা ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬১।

www.pathagar.com

অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু হুযূর (সা) অনুমতি প্রদান করেননি। এরপর গাযওয়ায়ে ওহোদের সময় কুরাইশ মুশরিকদের দলে ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় এসে পিতার সাথে বাস করতে থাকেন। বীরত্ব ও তীরন্দাযীতে সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর এই দক্ষতা সত্য দীনের সাহায্যে নিয়োজিত করেন। হুদায়বিয়ার পর হুযূর (সা)-এর যুগে যতগুলো গাযওয়া সংঘঠিত হয়, সবগুলোতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে শত্রুদের সাতজন নেতৃস্থানীয় বীর যোদ্ধাকে তীরের আঘাতে ধরাশায়ী করেন। মুসলমানগণ ইয়ামামার দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহ্কাম ইবনে তোফায়েল নামক একজন সর্দার এর পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিলো না। তখন হযরত আবদুর রহমান ঐ সর্দারের বুক লক্ষ্য করে এমনিভাবে তীর নিক্ষেপ করেন যে, সে সাথে সাথে ধরাশায়ী হয়ে যায় এবং মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে।[১] হযরত আয়েশা (রা) এবং তিনি সহোদর ভাই বোন ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর মহব্বত ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। হিজরী ৫৩ সালে হযরত আবদুর রহমান (রা) ইন্তিকাল করলে হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

وكنا كندمانى جذيمة حقبة + من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكا + لطول اجتماع لم نبت ليلة معا[২]

আবদুল্লাহ্

হযরত আবদুল্লাহ্ হযরত কাতিলাহ্ এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন এবং হযরত আসমা (রা) ছিলেন তার সহোদর। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের পথে যখন হুযূর (সা) আবূ বকরসহ সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্র উপর এই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি সারা দিন কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে বিকালে তা হুযূর (সা)-এর নিকট পৌছিয়ে দিয়ে আসতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আরিকাত (রা) মদীনায় হিজরতের সময়, পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। যখন তিনি মক্কায় পৌছে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, হুযূর (সা) নিরাপদে মদীনায় পৌছে গেছেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে আবূ বকর (রা) হযরত উম্মে রোমান, হযরত হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আসমা, (রা)-কে সংগে নিয়ে মদীনায় গমন করেন। তিনি মক্কা বিজয়ে এবং গাযওয়ায়ে হুনায়ন ও তায়েফে অংশ গ্রহণ কেরন। এই সর্বশেষ যুদ্ধে (তায়েফ) একটি তীরের আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার পর সুস্থ হলেও হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের চল্লিশ দিন পর ক্ষতস্থান পুনরায় ফুলে উঠে এবং তাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩]

---

১. আল ইসাবাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৯২।

২. আল ইসতিয়াব ঃ আল ইসাবাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৯৩ এই কবিতার উল্লেখ সহীহ্ বুখারীতেও রয়েছে।

৩. আল ইসাবা ঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৫।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (রা)

তিনি আবূ বকর (রা)-এর পুত্রদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। বিদায় হজ্জের বছর জিলকাদ মাসের শেষ দিকে জুল হালিফা নামক স্থানে হযরত আসমা (রা)-এর গর্ভে তার জন্ম হয়। তাঁর একজন ছেলের নাম ছিল কাসিম। এর ফলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর উপনাম রেখেছিলেন আবুল কাসিম। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর মা যখন হযরত আলী (রা)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তখন এই সম্পর্কের কারণে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (রা) শৈশব কালে হযরত আলীর ঘরে লালিত-পালিত হবার সুযোগ পান। কোন কোন বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যার অপরাধ থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু হাফিয ইবনে আবদুল বার এর বিরোধিতা করে লিখেছেন—[1]

لم ينل محمد بن أبي بكر من دم عثمان بشيء

হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার সাথে মুহাম্মদ, ইবনে আবূ বকর (রা) মোটেই জড়িত ছিলেন না।"

হযরত ওসমান (রা) যখন বলেন মুহাম্মদ, তোমার পিতা তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে কখনো পছন্দ করতেন না। তখন তিনি সংগে সংগে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রা) অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে ৩৭ হিজরীতে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মিসর পৌঁছেন তখন হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর পরাজয় বরণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আয়েশা (রা) এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাঁর পুত্র কাসিমকে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[2] হযরত আয়েশা (রা)-এর লালন-পালনের প্রভাবেই হযরত কাসিম ছিলেন ঐ যুগের সাতজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্-এর অন্যতম।

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)

হযরত আসমা (রা) বোনদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল কীলাহ্ বা কাতীলাহ্। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। হাফিয ইবনে আবদুল বার-এর মতে তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৮তম ছিলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)-এর সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। হিজরতের প্রেক্ষাপটে মদীনায় গমনের সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কুবা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করেন। তাঁর উপাধিতে ذات النطاقين হয়েছিল সে সম্পর্কে হিজরত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খলীফায়ে রাসূলের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করতেন। স্বামী হযরত যুবায়ের (রা)-এর ঘোড়ার জন্য নিজেই খাদ্য তৈরি করতেন

---

১. আল ইসাবাঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৭৫।

২. আল ইসাবা ঃ ৩য় খণ্ডঃ পৃঃ ৪৫১।

www.pathagar.com

এবং তা মাথায় নিয়ে নয় নয় মাইল পদব্রজে গমন করতেন।[১] যখন হযরত আবূ বকর (রা) এই সংবাদ পান তখন তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন।

হাজ্জাজ সাক্‌ফী হযরত আসমা (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে শহীদ করে তাঁর লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আসমা (রা) এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পুত্রের লাশ দেখে বলেন, এখানো কি বরের বিয়ের মঞ্চ থেকে নামার সময় হয়নি। হজ্জাজ এটা শুনে লাশ নামিয়ে ফেলেন। এর কয়েক দিন পর হযরত আসমা (রা) হিজরী ৭৩ সালে কম বেশী একশো বছর বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[২]

হযরত আয়েশা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হুযূর (সা)-এর আবির্ভাবের চার বা পাঁচ বছর পর উম্মে রোমানের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা এবং হুযূর (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। হযরত আতা ইবনে আবিরিবাহ্ বলেন,

كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة

"হযরত আয়েশা (রা) সকল মানুষ হইতে অধিক ফকীহ্, জ্ঞানী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারিণী ছিলেন।"

ইমাম যুহরী বলেন, সকল নবী সহধর্মিণী ও সমগ্র মহিলাদের জ্ঞানের তুলনা হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞানের সাথে যদি করা হয় তাহলে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান সবার থেকে শ্রেষ্ঠ[৩] হবে। তাঁর কামালাত ও প্রকৃষ্ঠতা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

উর্দূ ভাষায় মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহ) "সীরাতে আয়েশা" নামক একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য তা পাঠ করা যেতে পারে। ফিক্‌হা ও ইজ্‌তিহাদী মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত ঠিকানা ও শেষ ভরসাস্থল ছিলেন। চিকিৎসা এবং কাব্য চর্চায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা রাখতেন। তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীও ছিলেন। যখন বক্তৃতা প্রদান করতেন তখন শ্রোতাদের উপর যাদুর মত তার প্রভাব পড়ত। ৫৮ হিজরীর ১৭ ই রমযানের দিন তিনি ইন্‌তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪]

উম্মে কুলসূম

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি হযরত হাবীবা বিনতে খারিজা (রা)-এর গর্ভহতে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সম্মানিত সন্তানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাবীয়াহ ছিলেন। তার থেকে বেশ কিছু রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। জাবির ইবনে হাবীব, তাল্‌হা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ও মুগীরা ইবনে হাকিম ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

---

১. আল-ইসতিয়াব, আল-ইসাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৮-২২৯।
২. সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮।
৩. আল-ইসাবা, ৪র্থ, পৃঃ ৩৪৯।
৪. আল-ইসাবা, ৪র্থ, পৃঃ ৩৪৯।

www.pathagar.com

অঙ্গুরী

হযরত আবূ বকর (রা) একটি অঙ্গুরী ব্যবহার করতেন যার উপর নিম্নলিখিত বাক্যটি লিখিত ছিল ঃ نعم القادر الله

একটি পর্যালোচনা

রাসূল (সা)-এর প্রথম খলীফার পবিত্র জীবনী পাঠের দ্বারা এমনি একজন ব্যক্তির আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয় যাঁর মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। একজন মানুষের পূর্ণতা নির্ভর করে তার ঐ গোপন শক্তি ও উন্নত শিক্ষার উপর যা প্রকৃতি তাঁকে দান করেছে। নীতিগতভাবে এই শক্তি দু'প্রকার — প্রথমটি হলো বাহ্যিক শক্তি আর দ্বিতীয়টি হলো ব্যবহারিক শক্তি। প্রথম শক্তির দ্বারা যে দক্ষতা সৃষ্টি হয় তা হলো বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্মবোধ, চিন্তা-গবেষণা, ইত্যাদি। ব্যবহারিক শক্তির মাধ্যমে যে গুণাবলী অর্জিত হয় তা হলো বীরত্ব, দানশীলতা, পবিত্রতা, মর্যাদাবোধ, সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তির মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী একই সময়ে একত্র হওয়াটা মানবীয় সৌভাগ্যের চরম উন্নতির পরিচায়ক। কুরআন মজীদে এটাকে উত্তম বা خير বলা হয়েছে। ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا সাধারণভাবে এই বিশেষ গুণের সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে যুক্ত রয়েছেন বটে, তবে তাদের স্তর ও মর্যাদার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, হযরত আবূ বকর (রা) সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি জ্ঞান ও সৌভাগ্যের (حكمت وسعادت) এমন স্তরে অবস্থান করছিলেন যা ছিল নবূওতের নীচে, কিন্তু অন্য সব স্তরের উপরে।

খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে হযরত ওমর (রা) ইসলামের বিরাট বিজয় দীনের আহ্কাম বাস্তবায়ন, নিয়ম শৃংখলা এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামের ইতিহাসে যে, অত্যন্ত বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এখানে দেখার বিষয় হলো এই যে, হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল দশ বছর, আর হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল সর্বমোট সোয়া দু'বছর। আর এই সোয়া দু' বছরে তিনি যে গুরু দায়িত্ব পালন করেন তা হচ্ছে ফারূকী ইতিহাসের মূল ভিত্তি।

বিরাট বিজয় এবং রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ঐ সময় পর্যন্ত অসম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির মধ্যে ঐক্য না হয়, কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। এই জাতীয় ঐক্য কে সৃষ্টি করেছিলেন ? কে সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন ? কে জাতীয় ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিলেন ? আঁ-হযরত (সা)-এর ইনতিকালের সাথে সাথে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের যে বন্যা চতুর্দিক প্লাবিত করে ফেলেছিল,মদীনায় অবরুদ্ধ সাহাবায়ে কিরামের বস্তুগত আসবাবের মাধ্যমে তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কতটুকু ছিল? নেতৃস্থানীয় সাহাবা, এমন কি স্বয়ং হযরত ওমর (রা) নিজেদের সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হতবুদ্ধি হয়ে যান এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে পরামর্শ দেন যে, উসামা বাহিনীকে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করা না হয়, এবং যাকাত প্রদানে বিরোধীতাকারীদের সাথেও যেন যুদ্ধ করা না হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) যে সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, ও দৃঢ়তা ও উদ্যমের সাথে ঐ পরিস্থিতির যথাযথ মুকাবিলা

www.pathagar.com

করেন এবং যাবতীয় বাধাবিঘ্ন প্রতিহত করেন তা মানবীয় দূরদর্শিতার ও দৃঢ়তার ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই দূরদর্শিতার ফলেই পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যে, এই সংকটময় মুহূর্তে উসামা বাহিনী প্রেরণ করা একটি বিরাট রাজনৈতিক যুদ্ধ ছিল, যার ফলে আরব গোত্র এবং ইরান ও রোমীয় শক্তি মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার অবস্থা ছিল এই যে, কোমল হৃদয়ের অধিকারী ঐ হাল্কা পাতলা মানুষটি যিনি হুযূর (সা)-এর নাম শুনেই কেঁদে ফেলতেন তিনি হযরত ওমর (রা)-এর মত ব্যক্তিকে বিদ্রুপ করে বলেছিলেন। তুমি আইয়ামে জাহেলিয়াতে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলে কিন্তু এখন দুর্বল হয়ে গিয়েছ। মোটকথা, তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের মতের বিরুদ্ধেই উসামা বাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। সেগুলো সমাধা করে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহী গোত্রসমূহকে দমন করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে এগারটি দলে বিভক্ত করে আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে দেন যার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায় এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ একই সত্য দীনের পতাকাতলে সমবেত হয়। দেখতে দেখতে অবস্থা যেন দাঁড়ায় عالم تمام مطلع أنوار هو گيا (সমস্ত বিশ্ব আলোকময় হয়ে গেল)।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর আত্মনির্ভরশীলতা, দৃঢ়তা ও উদ্যমশীলতা এত জোর ছিল যে, ধর্মত্যাগীদের দমন করে পূর্ণাঙ্গভাবে অবসর না হতেই তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বিশ্বের তাৎকালীন বৃহৎশক্তি ইরান ও রোম সাম্রাজ্যকে চেলেঞ্জ করে বসেন এবং তা তিনি শুধু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাড়াহুড়ার মধ্যে করেন নি। বরং অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে করেছেন। এবং করেছেন ইরাক ও সিরিয়ার রণাঙ্গন থেকে হাযার হাযার মাইল দূরে মদীনার একটি ক্ষুদ্র ও সাজ-সজ্জাহীন ঘরে বসে। এখান থেকেই মুসলিম বাহিনীকে তিনি পরিচালনা করেছেন, তাদেরকে উঁচু নিচু রাস্তার দিক-নির্দেশ করেছেন, এবং শত্রুদলের দুর্গের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। মদীনায় বসেই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিভিন্ন সেক্টরের প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখেছেন এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী তাদের কাছে নির্দেশাবলী প্রেরণ করেছেন। সিরিয়ার রণাঙ্গনে যখন স্থবিরতার সৃষ্টি হয় তখন তিনি হযরত খালিদ (রা)-কে ইরাক হতে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশ সাথে সাথে পালিত হয় এবং যুদ্ধের অবস্থাও মুসলমানদের অনুকূলে চলে আসে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যদি আরবে এই ঐক্য সৃষ্টি না হত এবং হিরাহ্‌র রণাঙ্গনে ইরানী বাহিনী পরাজিত না হত তাহলে হযরত ওমর (রা)-এর যুগে যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তা কি সম্ভব হ'ত? এ কারণেই হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন حسنة من حسنات أبي بكر স্বয়ং হযরত ওমর (রা) স্বীকার করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর বুকের একটি পশম মাত্র।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন, আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লঙ্গ প্রমুখ এমন অনেক দিগ্বিজয়ী ছিলেন যারা বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা করে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল পৃথিবীতে কি এমন কোন জগৎ বিখ্যাত ছিলেন যিনি পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টিয়ে দিয়েছেন, অথচ না তার মাথার উপর ছিল যেন স্বর্ণ মুকুট, না ছিল তার কোন বিরাট সাম্রাজ্য। তিনি একবারে সাধারণ মানুষের মত থাকতেন। জাঁক-জমক ও

www.pathagar.com

প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তাঁর ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি মহল্লার লোকদের বকরী দোহন করে দিতেন, রাতে চুপে চুপে অন্ধ মহিলার ঘরের কাজকর্ম করে দিতেন, সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, মোটা ও সাধারণ খাদ্য খেতেন, তাঁর নিকট না ছিল সাজ-সরঞ্জাম, না ছিল তার কোন রাজ প্রসাদ, না কোষাগার, না স্বর্ণ রৌপ্যের ভান্ডার, না চৌকিদার ও দারোয়ান, না মিলিটারী গার্ড আর না নিরাপত্তা পুলিশ একজন সাধারণ লোক প্রকাশ্যে তার নিকট গমন করতে পারত, প্রকাশ্যে ও জনসমাবেশে তাঁকে যে কোন প্রশ্ন করতে পারত। যখন তিনি তার সেনাবাহিনীকে কোন রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা করতেন তখন কিছু দূরে পর্যন্ত পদব্রজে তাদের সাথে যেতেন এবং তাঁর নিযুক্ত সেনাপতি তখন ঘোড়ার পিঠে থাকতেন। তাঁরই কন্যা স্বামীর ঘোড়ার খাদ্য মাথায় নিয়ে নয় মাইল পদব্রজে গমন করতেন। এবং তিনি নিজে কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে যাতায়াত করতেন। এরূপ গণতন্ত্র ও সাম্য, বিনয় ও ভদ্রতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কি দৃষ্টিগোচর হয়? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র ও সাম্যের যে উদাহরণ হযরত ওমর (রা), তাঁর খিলাফত কালে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ঐ যুগের জন্য অদ্বিতীয়, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই নিঃস্বার্থপরতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সরলতা প্রত্যক্ষ করে হযরত ওমর (রা) বলেছেন, 'হে আবূ বকর (রা), তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য অত্যন্ত বিপদ সৃষ্টি করেছ। অর্থাৎ—তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

অতঃপর দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক আছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সেনাবাহিনীর মত যার সেনাবাহিনী কোন আবাদী ভূমি বিধ্বস্ত করেনি বরং বৃদ্ধ-শিশু এবং মহিলাদের উপর করুণা প্রদর্শন করেছে, ফসলাদির নষ্ট না করে এবং বৃক্ষ কর্তন না করে দেশের পর দেশ জয় করেছে। হযরত আবূ বকর সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার সময় এ সমস্ত ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে এমন ক্ষমতা কারো ছিল না। এ সমস্ত কারণেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা রণাঙ্গনে তরবারী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের মুখেই বিজয়ীদের জন্য দু'আ উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে যুদ্ধ সমাপ্তির পর যুদ্ধের ভয়াভহতার চিহ্ন রণাঙ্গনের বাহিরে কোথাও পরিলক্ষিত হত না বরং রাজ্যে পূর্বের চেয়ে অধিক শান্তি ও সন্তুষ্টি বিরাজ করত।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা হয়েছে হযরত আবূ বকর (রা) এর কার্যাবলীর বাহ্যিক দিক। সঠিকভাবে শারয়ী ও দীনি, মৌলিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, আঁ-হযরত (রা)-এর জীবনে যে কার্যক্রম পূর্ণতা লাভ করেনি, প্রথম খলীফার হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা ব্যতীত কুরআন মজীদ জমা করা এবং এটাকে ধ্বংস ও সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে একটি পয়গাম্বর সুলভ কাজ, যার ফলে স্বয়ং আল্লাহ্র ওয়াদা إن علينا جمعه পূর্ণ হয়েছে। যে পবিত্র কুরআনের উপর ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তা জমা করে করে অনন্তকালের জন্য হিফাযত করা, যাকাত ও সাদকাহ্র আহকাম প্রচার ও প্রসার, উসামা বাহিনী প্রেরণ, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ও বিদ্রোহীদের দমন, নবুওতের দাবীকারীদের উৎখাত, ইসলামের প্রতি শত্রুতার কারণে ইরান ও রোমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইসলামের প্রসার ও প্রচার আরব গোত্রসমূহকে পরস্পর

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ করা। এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ মোট সোয়া দু'বছরের প্রতিকূল অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতেই সমাপ্ত হয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এ সমস্ত ঘটনা সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে এটা কি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, হযরত আবূ বকর (রা) নবী ছিলেন না এবং তা হতেও পারেন না, কিন্তু তাঁর এ সমস্ত কাজই নবী সুলভ কাজ। একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "যদি আবূ বকর (রা) না হতেন তাহলে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হত না। বস্তুত পবিত্র কুরআন ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ বলে শেষ যুগের নবীর সাথে যার দৈহিক সহচরত্বের উপর মোহর অঙ্কন করেছে, ভাগ্যলিপি তার জন্য এই সৌভাগ্যও নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, দৈহিক সহচরত্বের সাথে আধ্যাত্মিক সহচরত্বও তার দ্বারা প্রকাশমান হবে।

এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালকে বিশেষ খিলাফতকাল আখ্যা দিয়েছেন। মুকাম বা স্তর যেহেতু খুবই নাজুক তাই আমরা এর কোন ব্যাখ্যা করব না। আমরা শাহ্ সাহেবের বক্তৃতার বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের এই কিতাবের ইতি টানবো। তিনি বলেছেন—

"এই উম্মতের মধ্যে কিছু এরূপ লোক রয়েছে যাঁদের হৃদয়ের জাওহার (আধ্যাত্মিক শক্তি) নবীদের জাওহারের (আধ্যাত্মিক শক্তি) প্রায় নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এ সমস্ত লোক সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে নবীদের খলীফা হয়ে থাকেন। তাদের উদাহরণ ঐ আয়নার মত যা সূর্য হতে সরাসরি আলো গ্রহণ করে থাকে, আর এটা মাটি, কাষ্ঠখণ্ড বা পাথরের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জতীয় লোকই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা হুযূর (সা)-এর পবিত্র জীবন দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যেরূপ অন্য লোক হতে পারে না। হুজুর (সা)-এর নিকট থেকে তারা যা কিছু গ্রহণ করেছে তা তাদের অন্তরের সাক্ষ্য দ্বারাই করেছে সম্ভবত তাদের অন্তর পূর্ব হতেই সংক্ষিপ্তভাবে এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিল। আঁ-হযরত (সা) শুধু যেন এগুলো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

"অতঃপর বিশেষ খিলাফত হলো এই যে, এই ব্যক্তি যেভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের নেতা হয়ে থাকেন, তেমনি ভাবে নেতা হয়ে থাকেন প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তির মধ্যে মানবজাতির পার্থক্য ও বিভিন্নতার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা ও মর্যাদায় তাঁর বাহ্যিক সাম্রাজ্যের মত তাঁর আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যেও হয়ে থাকে। (ইযালাতুল খাফা,পৃঃ ৯)

"যখন একজন খলীফা এরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি স্বয়ং নবী না হলেও একজন নবীর দক্ষিণ হস্ত এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গে পরিণত হন। এর ফলে তার সমস্ত কার্যক্রম নবীর কার্যক্রমের মতই হয়ে থাকে।"

"আল্লাহ্‌র রহমতের যা কিছু নবী লাভ করেন তা তিনি সমাপ্ত করার পূর্বেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয় গুলোকে খলীফাদের হাতেই পূর্ণতা দান করেন। প্রকৃতপক্ষে পয়গাম্বরদের দেহতুল্য। সুতরাং বিশেষ খিলাফতের অর্থ হলো এই যে, যে কাজ কুরআন মজীদ বা হাদীসে কুদসীতে আঁ-হযরত (সা)-এর অংশে লিখা হয়েছে তা এই খলীফাদের হাতে বাস্তবায়িত হয়। আঁ-হযরত (সা) প্রকাশ্যভাবে ও ইঙ্গিতে তাঁর খিলাফতের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেছেন। তাই এই খিলাফতের অধিকারীদের সকল কার্যক্রম হযরত নবী (সা)-এর কার্যক্রমের মধ্যেই গণ্য হয়। আর খলীফারা এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন মাত্র।

ইফাবা-১৯৯৮-১৯৯৯-প্র/৮০৭৪(উ)-৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ